কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর

বিষ্ণুপুরী রামায়ণ

ও

অন্যান্য বাংলা রামায়ণ

ডঃ গীতা নিয়োগী

রীতা প্রকাশনী
শ্রীরামপুর, হুগলী

প্রকাশক : রীতা নিয়োগী
১৫/এস, লেনিন সরণি
পোঃ মল্লিক পাড়া, শ্রীরামপুর, হুগলী
পিনকোড-৭১২ ২০৩

প্রথম প্রকাশ : ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০০০

মুদ্রাকর : শ্রীসৌম্য লাহা
লেসার আর্ট
৭৭এ, জি. টি. রোড
শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২০১

প্রাপ্তিস্থান : আদি নাথ ব্রাদার্স
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩

দে বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩

প্রয়াত   পিতা ও মাতার
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

নিবেদন

কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্ত্তী বাংলার বিশেষ একটি অঞ্চলের অত্যন্ত জনপ্রিয় কবি ছিলেন। বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাসকারগণ তাঁহার সম্পর্কে তাঁহাদেব গ্রন্থে বিভিন্ন আলোচনা কবিয়াছেন কিন্তু তাহাতেও নানা মতবিরোধ আছে। সেইজন্য আমি কবিচন্দ্র সম্পর্কে গবেষণাকার্যে ব্রতী হই এবং দীর্ঘকাল ধবিয়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও নানা পরিষদে রক্ষিত কবিচন্দ্র নামাঙ্কিত পুথিসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা কবি। কেবল পুথিসমূহের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ না রাখিয়া বাঁকুডাব বিভিন্ন অঞ্চলেব যেখানে যেখানে কবিচন্দ্রেব সম্পর্কে কোনও কিছু তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি তাহাও অত্যন্ত শ্রদ্ধাব সঙ্গে গ্রহণ করিয়া তাহাব মধ্য হইতে যথাসম্ভব সত্য নির্ধারণেব চেষ্টা করিয়াছি।

কবিচন্দ্রেব 'রামায়ণ'-এর পুথি নকলের উদ্দেশে প্রথমে কলিকাতাব বিভিন্ন সংগ্রহালযে তৎপবে বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষৎ (বাঁকুডা) ও পানুয়া গ্রামে কবিচন্দ্রেব বাস্তুভিটায (কোতলপুর থানা, বাঁকুডা) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালযের (শান্তিনিকেতন) সংগ্রহাগারে পুথির পুনর্লিখন কার্যে ব্রতী হই। পানুযায (বাঁকুড়া) কবিগৃহে সকলেব প্রচেষ্টায ও পল্লীর বিশিষ্ট গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তি কবিচন্দ্র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং পল্লীব বিশিষ্ট শিক্ষক তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ সহযোগিতায় কবি-জীবন সম্পর্কিত বহু তথ্য লাভে সমর্থ হই। কবিব বংশ-তালিকা এবং মল্লবাজা গোপাল সিংহ কর্তৃক প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর ভূসম্পত্তি লাভেব দলিল লাভ করি কবিরই বর্তমান বংশধরদিগের নিকট হইতে। ঐ সকল সবকারী সীলমোহরযুক্ত নথিপত্রেব বিপরীত পৃষ্ঠায় লিখিত তথ্য হইতে জানা যায় যে, কবিচন্দ্রেব কোনও এক অধস্তন পুরুষ হারাধন চক্রবর্তী নাম স্বাক্ষবিত উক্ত দলিলসমূহ তিনি ১৮৭২ সনের ১৬ই ডিসেম্বর তাবিখে বাঁকুডা ডেপুটি কালেকটরী অফিস হইতে লাভ করেন। বিপবীত পৃষ্ঠার ঐ নাম ও সনেব উল্লেখ হইতে আমরা অনুমান করি, উক্ত দলিলসমূহ রাজা গোপাল সিংহের (১ম) ও বাজা চৈতন্য সিংহের পববর্তীকালে অনুলিখিত, মূল দলিলেব প্রত্যযিত নকল।

কলিকাতার সেটেলমেন্ট অফিসে উক্ত দলিলেব অনুসন্ধানকালে সুপ্রসিদ্ধ সার্ভেয়াব মেজর রেণেলের অঙ্কিত বঙ্গের পশ্চিমাংশেব একখানা প্রাচীন মানচিত্র লাভ করি। উহাতে বিষ্ণুপুর অঞ্চলেব নিম্নে মল্লভূম ('Mul boom') নামেব উল্লেখ থাকায় উহার গুরুত্ব আমাদের কাছে অপরিসীম বলিয়া মনে হইযাছে।

পানুয়া গ্রামে কবিচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষায় উৎসাহী বামকৃষ্ণ পাঠাগাবেব কর্মিবৃন্দের আগ্রহ ও নিষ্ঠা প্রশংসার অপেক্ষা বাখে না। কবিব সপ্তম অধস্তন পুরুষ প্রয়াত অরবিন্দ চক্রবর্তীব পুত্রদ্বয় বিপদভঞ্জন চক্রবর্তী ও অস্নুনন্দন চক্রবর্তী এক সপ্তাহকাল সুদূব পল্লী

অঞ্চলে আমাকে নানাভাবে নানা তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেন। তাঁহারা আমাকে লেগো গ্রামে কবিচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, মাধবগঞ্জে কবিচন্দ্র হাসপাতাল এবং পানুযাগ্রামে কবিচন্দ্র পুকুর ও কবিচন্দ্র সরণি প্রভৃতি দর্শন করান। কবিগৃহে মহিলাদের (মমতা দেবী, সরস্বতী দেবী ও অপর সকলের) সহৃদয় ব্যবহার আমার গবেষণা কর্মের একান্ত সহায়ক হইয়াছে। বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের তৎকালীন সম্পাদক মানিক লাল সিংহ মহাশয় এবং সহসম্পাদক চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয়ের অকুণ্ঠ সাহায্য এবং রামকৃষ্ণ আশ্রমে হৃদ্যতাপূর্ণ আতিথ্য অবিস্মরণীয়।

মূল পাট্টাপত্র উদ্ধারের উদ্দেশে গবেষণায় নবীন উৎসাহী কোতলপুরের (বাঁকুড়া) সদানন্দ ভদ্রের বাঁকুড়া মহাফেজখানায় তায়দাদ রিপোর্টের অনুসন্ধান দ্বারা এবং বিষ্ণুপুর হইতে প্রকাশিত 'অভিযান' পত্রিকার ম্যানেজার বীরেন্দ্রনাথ বসু এবং প্রকাশক রথীন্দ্রনাথ বসু নানাভাবে আমাকে গবেষণায় সহায়তা করেন। এই কর্মে ঐ অঞ্চলের বহু খ্যাত-অখ্যাত, গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তির বিশেষ সাহায্য লাভ করি। তাঁহাদের সকলের উদ্দেশে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

পরম শ্রদ্ধেয় আচার্যদেব অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় আমার গবেষণা কর্মের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়া আমাকে বিশেষভাবে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। কাজটি সম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার আকস্মিক প্রয়াণে তাঁহার পরিচালনায় আমার গবেষণা পত্রটি যথাসময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। এই অবস্থায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান এবং আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ মহাশয় আমার অসম্পূর্ণ কাজটির তত্ত্বাবধায়ক হইতে সম্মত হইয়া আমাকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত আমার গবেষণা সংক্রান্ত সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইত। আজ কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাদের বিদেহী আত্মার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ নরেশচন্দ্র জানা এবং মনীন্দ্র কলেজের অধ্যাপক ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট হইতে গবেষণায় বহু সাহায্য লাভ করিয়াছি। শ্রদ্ধেয় ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় 'সূর্যবংশ কথা' পুথিটির কিছু অংশের অস্পষ্ট পাঠ উদ্ধার করিয়া এবং পুথির বানান সংস্কার সম্পর্কে আলোচনার দ্বারা আমাকে সাহায্য করেন। পুথি বিষয়ে সর্বদা নানাভাবে সাহায্য লাভ করিয়াছি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র পাল মহাশয়ের নিকট হইতে। সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বঙ্গবাসী মর্ণিং কলেজের বাংলা সাহিত্যের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক

ডঃ রমেন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত মহাশয়ের আন্তরিক সাহায্য — যিনি গ্রন্থটি নিষ্ঠাভরে পর্যালোচনা করিয়া আমাকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। অপর যাঁহারা আমাকে আমার গবেষণায় সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের উদ্দেশে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিলাম।

গবেষণার সময়কাল হইতে বইটি প্রকাশনার সময় পর্যন্ত বহু বাধার — বহু চড়াই উৎরাই পার হওয়ার মত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইয়াছি। কাজ ব্যাহত হইয়াছে বহুবার। ফলে সময় দীর্ঘায়িত হইয়াছে কেবল। অবশেষে কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন উপ গ্রন্থাগারিক এবং বর্তমানে গণশক্তি পত্রিকার গ্রন্থাগারিক শ্রীশান্তনু মুখোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য আমাকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করেন। চন্দননগর খলিসানি কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ এবং রিষড়া বিধানচন্দ্র কলেজের বাংলার প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য পরামর্শ দান করিয়া আশার আলো জাগ্রত করেন। এই দুই কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। সুদীর্ঘ সময় আমার গবেষণা কার্যের খুঁটিনাটি বিষয়ে ও প্রুফ দেখায় সাহায্য পাইয়াছি আমার কনিষ্ঠা ভগিনী অধ্যাপিকা রীতা নিয়োগীর নিকট হইতে। তাহার প্রতি রহিল আমার সস্নেহ ভালোবাসা। মল্লভূমের মূল মানচিত্রটিকে দীর্ঘাকার হইতে বর্তমান রূপে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন চন্দননগর বি.এড. কলেজের অধ্যাপিকা ডঃ আভা রায়। তাঁহাকে জানাই আমার সপ্রীতি কৃতজ্ঞতা।

ইঁহারা ব্যতীত যাঁহাদের সাহায্য ভুলিবার নহে তাঁহারা হইলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও ডঃ অরুণা চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থখানি প্রকাশের জন্য লেসার আর্ট প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা শ্রীসৌম্য লাহা ও সেখানকার কর্মিবৃন্দকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই।

মূল গবেষণাকর্মের আলোচনা অংশই কেবল বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইল। অন্য যাহা কিছু ত্রুটি ও মুদ্রণ ঘটিত প্রমাদ আছে তাহার জন্য আমি দুঃখিত।

বহু বাধা অপসারণের পর যাঁহার কৃপালাভে গ্রন্থখানি রূপায়িত করা সম্ভব হইল তিনি পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সর্বজনপূজ্যা শ্রীমা ; তাঁহার জন্মদিন তথা বাংলাভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দিনটিকে বিশেষভাবে স্মরণে রাখিয়া ২১শে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে গ্রন্থ প্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট করিলাম।

নিবেদিকা
গীতা নিয়োগী

ভূমিকা

প্রথম পর্যায়

তমসার পুণ্যতীরে একদা যে মহাকাব্যের উদ্ভব ঘটে, মহাকবির হৃদয়-নিঃসৃত অমৃত নিস্যন্দী সেই করুণ কাহিনী নিখিল মানবহৃদয়ের চিরন্তন ইতিহাস। বস্তুতঃ মহর্ষি বাল্মীকির পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত রাম-কাহিনী বিশ্বসাহিত্যের এক অনন্য রিক্থ, মানবহৃদয়ের রস-সর্জনার এক অপূর্ব রসায়ন, যেন অমরার অমিয়-নির্ঝর। ভারতের এবং বহির্ভারতের বিভিন্ন কথ্যভাষায় অনূদিত রামকাহিনীর মধ্যে মূল 'রামায়ণ'কে আশ্রয় করিয়া নানা প্রাচীন আখ্যায়িকা দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া, মৌখিক রূপভেদকে স্বীকার করিয়া, প্রাকৃতজনের মুখে মুখে গীত ও পঠিত হইয়া নবতররূপে আপামর জনসাধারণের মধ্যে 'রামায়ণ' কথার প্রবাহকে অক্ষুণ্ন রাখিবার সার্থক প্রয়াস সর্বকালে ও সর্বদেশে দেখা গিয়াছে। অতএব ভাষা-রামায়ণে যেমন আছে বিদগ্ধ কবিচিত্তের রসপ্রেরণা তেমনি আছে প্রাকৃতজনের সহজকথা এবং রসের অমোঘ মায়া। আর্য রামায়ণের আদর্শ কবিদিগকে প্রভাবিত করিলেও পল্লী-বাংলার জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার লাভের জন্যই হউক অথবা রামায়ণ গানের সহজ আকর্ষণ বশতঃই হউক কবিসত্তার অবচেতনে লৌকিক শিল্প সংস্কার তাহার প্রকাশ ভঙ্গিতে সহজে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এইহেতু মূল 'রামায়ণ'-এর সুবর্ণরেখার পাশাপাশি নানা মৌখিক উপাখ্যানের ধারা ভাষা-রামায়ণগুলিতে বহমান। কি ধর্মে, কি লোকজীবনে ও লোক-সঙ্গীতে ভাষা-রামায়ণের প্রভাব অনস্বীকার্য। বঙ্গের জাতীয় কবি কৃত্তিবাস এই ধারার প্রথম পথিকৃৎ। সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর কবিমানসটিও এইরূপ পল্লী-বাংলার ঐতিহ্যের অনুসারী। তাঁহার 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' আর্য আদর্শ ও প্রচলিত কাহিনীর সংমিশ্রণে রচিত। গায়ক ও কথকদিগের মুখে মুখে এই 'রামায়ণ' খানি বিষ্ণুপুর অঞ্চলে সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার লাভ করে। কাব্যখানির জনপ্রিয়তা কবির যুগমানসের রসবোধের এক নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ অঞ্চল বিশেষে বাংলা পুঁথি সম্পর্কে একবার বলিয়াছিলেন —

"......................রাম সীতার কত কাহিনী যাহা মূল রামায়ণে পাওয়া যায় না, গ্রামের গায়ক-কথকদের মুখে মুখে পল্লীর আঙ্গিনায় ভাঙ্গা ছন্দ ও গ্রাম্যভাষার বাহনে কতকাল ধরিয়া ফিরিয়া বেড়াইযাছে। এমন সময় কোনো রাজসভার কবি যখন, কুটিরের প্রাঙ্গণে নহে, কোনো বৃহৎ বিশিষ্ট সভায় গান গাহিবার জন্য আহূত হইয়াছেন, তখন সেই গ্রাম্য কথাগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়া মার্জিত ছন্দে গম্ভীর ভাষায় বড়ো করিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন।"[১]

বিশ্বকবির এই মন্তব্য কবিচন্দ্রের 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' সম্পর্কেও যথার্থই প্রযোজ্য।

'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' আলোচনা ও সম্পাদনার কথা ঃ-

এই 'রামায়ণ' খানি আলোচনা ও সম্পাদনার প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, এই নামে মুদ্রিত একখানি সংস্করণ ১৩৮৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে।[১] 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' সম্পাদনার প্রথম সুযোগ আমরাই লাভ করি, কেননা আমাদের গবেষণার প্রারম্ভে কাব্যখানির কোনও মুদ্রিত সংস্করণ ছিল না। পূর্ণাঙ্গ কাব্য প্রাপ্তিতে কিছু বিলম্ব ঘটায় আমাদের সম্পাদনাকর্ম মন্দীভূত হইয়া পড়ে, ফলে উক্ত অবসরে মুদ্রিত সংস্করণটি প্রকাশিত হওয়ায় আমাদের উৎসাহ বর্ধিত হয়। তবে মুদ্রিত গ্রন্থখানির সঙ্গে আমাদের সম্পাদিত রামায়ণের কিছু প্রভেদ গোচরীভূত হওয়ায় আমাদের আরব্ধ কর্মকে মধ্যপথে অসমাপ্ত অবস্থায় ফেলিয়া রাখাও সঙ্গত মনে হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ নিম্নে প্রদত্ত হইল ; যথা ঃ-

(ক) ১৩৮৬ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' খানির ভূমিকা (ঐ. পৃ. XXX) হইতে জানা যায় যে, উহা ১২০৮ সালে লিপিকৃত একখানি কাণ্ড পর্যায়ে গ্রথিত সম্পূর্ণ পুথির প্রতিরূপ। আর আমাদের প্রাপ্ত সমস্ত পুথিই পালাকারে অনুলিখিত এবং অধিকাংশ পালার আদর্শ পাঠ উক্ত ১২০৮ সালের পূর্বে লিপিকৃত।

(খ) পূর্বে মুদ্রিত গ্রন্থের 'শিবরামের যুদ্ধ' অংশের প্রতিটি ছত্রই দ্বিজ লক্ষ্মণ কবিচন্দ্রের (ক.বি. ২৮৪, ১১০৫ সন) রচনা। উহা কিরূপে একটি অখণ্ড পুথির মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহাও আশ্চর্যের বিষয়।

(গ) আমাদের প্রাপ্ত কবিচন্দ্রের রামকথা পালার বিষয়বস্তুর সঙ্গে উক্ত মুদ্রিত গ্রন্থের সর্বত্র মিল নাই। আমাদের 'রঘুনাথের বনবাস' ও 'রাম-সুগ্রীব মিলন' পালার সঙ্গে মুদ্রিত গ্রন্থের বেশ মিল আছে, অথচ 'রঘুনাথের দেশাগমন' পালার সঙ্গে বৈসাদৃশ্যই পরিলক্ষিত হয়।

উভয়ের মধ্যে এইরূপ নানা প্রভেদ লক্ষ্য করিয়া উক্ত মুদ্রণকার্যের পরেও বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত কবিচন্দ্রের পুথিগুলির যথাযথ মূল্য নিরূপণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইতে থাকে। সম্পাদিকা যে পুথিখানি মুদ্রিত গ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন তাহার সম্পর্কে ভূমিকায় বলিয়াছেন —"মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ বাসনা ছিল — পুঁথিটি মুদ্রিত করে জনসমক্ষে শঙ্কর কবিচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত করা।"[২]

আমরা পণ্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায়ের সযত্নরক্ষিত পুথির বিস্তারিত রূপ ও আলোচনা সম্পর্কে মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক লিখিত "কবিচন্দ্র ও বিষ্ণুপুরী রামায়ণের ভূমিকা" নামক প্রবন্ধ (ফাল্গুনী, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭) হইতে পূর্বেই জ্ঞাত হইয়াছি।[৩] উহা পাঠের পর দেখা যায় যে, মুদ্রিত বিষ্ণুপুরী রামায়ণে উক্ত প্রবন্ধ হইতে কয়েকটি বিষয়

বর্জিত হইয়াছে, যথা ঃ--

১। গয়াধামে সীতাদেবী কর্তৃক বালুকাপিণ্ড সম্প্রদান বহস্য।

২। হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান বর্ণনা।

৩। যযাতির নরমেধ যজ্ঞের বিবরণ কথন।

৪। রামরাস।

৫। উত্তরকাণ্ডে সীতাদেবীব অসিতামূর্তি ধারণপূর্বক সহস্রস্কন্ধ রাবণবধ, প্রভৃতি।"

কবিচন্দ্র 'হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান', 'নরমেধ যজ্ঞ' এবং 'গয়াশ্রাদ্ধ' পালা লিখিয়াছেন, অথচ তাহা উক্ত সম্পূর্ণ পুথিটিতে সন্নিবিষ্ট না হওয়াতে পুথিটির পক্ষে আর একটি প্রধান অসঙ্গতি বলিয়া আমাদেব মনে হইয়াছে। তবে কবিচন্দ্র 'অদ্ভুত রামায়ণ'-এব আদর্শে কোনও পালা রচনা কবিয়াছেন বলিয়া আমবা জানিনা। কিন্তু পণ্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায়ের উল্লিখিত 'সহস্রস্কন্ধ রাবণবধ' বচনাটি 'অদ্ভুত রামায়ণ'-এব বিষয়। উহা কবিচন্দ্রের নামে প্রচাবিত হওয়ায় নানারূপ সন্দেহ উদ্রেক করে। উহা দ্বিজ লক্ষ্মণ কবিচন্দ্রের বচনা নয়তো ? কেননা পূর্বে মুদ্রিত 'বিষ্ণুপুরী রামাযণ'-এ (১৩৮৬ সাল) 'শিবরামের যুদ্ধ' অংশ দ্বিজ লক্ষ্মণ কবিচন্দ্রেব রচনা এবং 'লক্ষ্মণের কৃচ্ছ্রসাধন' প্রসঙ্গেও (পৃ. ১৯৪-১৯৫) দ্বিজ লক্ষ্মণের 'বঘুনাথের দেশাগমন' (ক.বি. ৩৬২৭ নং) পালার সঙ্গে কিছু মিল পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের গবেষণায় আবও যে সকল অসুবিধাব সম্মুখীন হইতে হইযাছে তাহা দ্বিজ লক্ষ্মণ কবিচন্দ্রের পুথি সম্পর্কেও। কবিচন্দ্রের নামে পাওয়া যায় 'নবমেধযজ্ঞ' পালা। আর 'যযাতি রাজার উপাখ্যান' (ক.বি. ৬৮৫) নামক একখানি পুথিতে 'কবিচন্দ্র' ভণিতা, 'ভাগবতামৃত' এবং 'পানুয়া' কথার উল্লেখ থাকায় স্বভাবতঃই উহা আমাদেব কবিচন্দ্রের রচনা বলিয়া মনে হইয়াছে। পরে দ্বিজ লক্ষ্মণের ভণিতায় ঐ পালাব অপর পুথিব (ক.বি. ৬৮৬) সঙ্গে উহাব সম্পূর্ণ মিল পাওযায এইরূপ সংশয়েব নিরসন ঘটে।

তৃতীয়তঃ অনুরূপ আর একটি অসুবিধা দেখা দিয়াছে শঙ্কব ভণিতায়। তবে তাহা পুথির ক্ষেত্রে নহে, উহা শঙ্কব সম্পর্কিত রামায়ণেব আলোচনা ক্ষেত্রেই মূলতঃ নিবদ্ধ। শঙ্কর বা ভবানীশঙ্কব নামে বাংলা রামাযণের এক কবিব সন্ধান পাওযা যায়, যিনি সাগবদিযার অধিবাসী এবং রাজা তিলকচন্দ্রের দেশে তাঁহার জন্ম। এই তিলকচন্দ্র খুব সম্ভব বর্ধমানের মহাবাজা তিলকচন্দ্র সিংহ। যিনি কীর্তিচন্দ্রের মৃত্যুর পর কিছুকাল (১৭৪৪-১৭৭০ খ্রীঃ) রাজত্ব পরিচালনা কবেন। আমাদেব মনে হয উভয় কবিব নাম শঙ্কর, এইহেতু লিপিকবদেব অনামনস্কতায় এইরূপ জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছে।

'তবণীসেন বধ' পালাব রচয়িতা শঙ্কব সম্পর্কেও একটি ধাবণা প্রচলিত আছে

যে, উহা কবিচন্দ্র শঙ্কব চক্রবর্তীব বচনা । কিন্তু শঙ্কর ভণিতাযুক্ত ঐ পালার যত পুঁথি পাওয়া গিযাছে সমস্ত পুঁথিতেই 'বন্দিয়্যা জানকীনাথ শ্রীশঙ্করে গায়', এইরূপ বিশেষ ছত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় । এইরূপ ভণিতা লিখিবার প্রবণতা ভবানীশঙ্কবেব, কবিচন্দ্রেব নহে । ঐ পালার সমস্ত পুঁথির পাঠ প্রায় হুবহু এক । কাজেই শঙ্কর ভণিতা থাকা সত্ত্বেও ঐ পালাব পুঁথিগুলিকে কবিচন্দ্রের বচনা বলিয়া গ্রহণ কবা যায় নাই। কাব্য আলোচনা কালেও দেখা যাইবে যে, বাক্ষসবংশে বৈষ্ণবীয় ভক্তিস্রোত কবিচন্দ্র অপেক্ষা ভবানীশঙ্কব ও দ্বিজ লক্ষ্মণের কাব্যেই অধিক প্রকটিত । আমাদের প্রাপ্ত কবিচন্দ্রের রামায়ণের পালাতে বাক্ষসবংশে ভক্তির এহেন 'নিকুঞ্জবনেব' পবিচয় পাওয়া যায় না । যতদূব মনে হয ভবানীশঙ্কবই (শঙ্কর) উক্ত ভক্তিমূলক পালাব জনপ্রিযতার গৌরব লাভ করেন । খুব স্বল্প দূবত্বের মধ্যে অবস্থানহেতুই হউক কিংবা লিপিকরদের অনবধানতাবশতঃই হউক, কবিচন্দ্র, দ্বিজলক্ষ্মণ ও ভবানীশঙ্করেব মধ্যে বহস্যের জট পাকাইয়াছে বেশ ভালভাবেই । আমাদেব আলোচিত চতুর্থ অধ্যায়টিব অন্তর্গত 'কবিচন্দ্রেব বামাযণের পুথি নির্বাচনে সতর্কতা' অনুচ্ছেদটির সঙ্গে দশম অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট 'বাংলা বামাযণকার তিন কবিচন্দ্র' নামক আলোচনার মধ্যে যে নিবিড় যোগ আছে তাহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক ।

কবিচন্দ্র শঙ্কব চক্রবর্তীর বামাযণেব পুথি সমূহে 'দ্বিজকবিচন্দ্র', 'কবিচন্দ্র' ও 'কবিচন্দ্র চক্রবর্তী' ভণিতা পাওয়া যায় । শঙ্কব নামের ভণিতা না পাওযায় এবং রামাযণের অপর এক কবির নাম শঙ্কর থাকায় আমাদেব আলোচনায় তাঁহাকে সর্বত্র 'কবিচন্দ্র' নামে উল্লেখ কবিয়াছি । দ্বিজ লক্ষ্মণ এবং ভবানীশঙ্কবের কয়েকটি পুঁথিতেও কবিচন্দ্র ভণিতার সাক্ষাৎ মেলে । কাজেই এই কবিদ্বয়েব উপাধিও কবিচন্দ্র ছিল বলিয়া ধবিতে হইবে । এইজন্য কবিচন্দ্রেব বামাযণের পুথি নির্বাচনকালে সর্বাগ্রে প্রযোজন প্রচুব অন্বীক্ষা । ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের অভিমতে —"কবিচন্দ্রের ভণিতায 'বামায়ণ' বিশেষ সতর্কতার সহিত আলোচিত হওয়া উচিত,"[৮] --- আমাদের মতেব সমর্থন মেলে ।

যুগ পরিচিতি ঃ

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ এই দুইটি কালেব সন্ধিক্ষণে কবিচন্দ্রেব কাব্য সাধনার উদ্ভব । বিশ্বের ইতিহাসে এই সময়ে বিজ্ঞানচিন্তাব এক অভিনব বিকাশ ঘটে । প্রতিবেশী চীনদেশেব তিনটি আবিষ্কার — মুদ্রণযন্ত্র, আগ্নেযাস্ত্র ও চুম্বক-দিগ্‌দর্শন যন্ত্র যথাক্রমে শিক্ষা ও চিন্তাজগতে, যুদ্ধে এবং সমুদ্রযাত্রায সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করায় পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগান্তব দেখা দেয় । বাংলার কবিগণ এই সকল আবিষ্কারেব কোনও সংবাদই পান নাই । নব যুগেব নব ভাবনার এই স্ফুবিত বশ্মিচ্ছটা বাংলা তথা

ভারতবর্ষেব চিত্তাকাশে প্রবেশ লাভ করিতে না পারায় এই দেশের সামাজিক ও বাজনৈতিক জীবনে তখন ঘোর অমানিশা ।

মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের বাজত্বকালে (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীঃ) ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত পবিবর্তিত হইতে থাকে । দিল্লীব বাষ্ট্রবিপ্লবেব তরঙ্গ এবং ইউবোপীয় বণিককুলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাংলার তটভূমে আঘাত কবায় ইহাব বহুকালের শান্তিপূর্ণ জীবনধারা সহসা উদ্বেলিত হইয়া ওঠে । মোগল ও ইংরাজ এই দুই পবাক্রমী শক্তির টানাপোড়েনে নিপীড়িত অসহায় বাঙালীর জীবন ও সমাজ আত্মরক্ষায় অনিবার্য প্রেবণা অনুভব করে । শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে যুক্তিহীন ধর্মীয় সংস্কার এবং সামাজিক কঠোরতা বিস্তার লাভ করিয়াছিল, মানুষ তখনও বিনা বিচারে তাহাকেই নিয়তিব অমোঘ বিধান বলিয়া ধরিয়া বসিয়াছিল । বহির্জীবনেব এই তপশ্চারণার ফল অন্তর্জীবনেও দেখা দিল । এইহেতু মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যেব মূল সুবে ধর্মীয় চেতনার প্রাধান্য ! অন্ত-মধ্য যুগেও এই ধর্মীয় ভাব অধ্যাত্ম চেতনাব প্রভাবে অব্যাহত রহিল । বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য এবং রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত অনুবাদের ধাবা এই যুগেও প্রবহমান ।

মধ্যযুগের সাহিত্যে দেববাদের জয় ঘোষিত হইলেও কবিচন্দ্রের কোনও কাব্যেই কোনওরূপ দৈব ঘটনাব পুচ্ছতাড়িত অসহায় ভাবের প্রকাশ নাই । পরিবর্তে তাঁহার কাব্যে দেখা যায় ঈশ্ববীয় চেতনার শান্ত আলোক বিচ্ছুরণ । কবিচন্দ্রের কাব্য-প্রতিভা তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল দিককেই স্পর্শ করিয়াছে । শিবমঙ্গল, অনাদিমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, রামমঙ্গল বা রামায়ণ এবং ভারতপুরাণ বা মহাভারত এই পাঁচটি বড় কাব্য এবং বহু পালা ও বন্দনা রচনা বিদগ্ধ কবিব অসামান্য সাহিত্য কীর্তির অবিস্মরণীয় ফল ।

আধুনিক সাহিত্য মধ্যযুগীয় দেববাদকে সর্বতোভাবে পরিহার করিতে পারে নাই। এইহেতু আধুনিক যুগের জন্মলগ্নে সাধাবণ বাস্তব জীবনের প্রেক্ষাপটেও মধ্যযুগীয় কথা ও কাহিনী, ভাব ও ভাষা, উপমা ও অলঙ্কারেব বর্ণাঢ্য গগনে পক্ষ বিস্তার কবিতে দেখা যায় বহু কবিকে । এইখানেই মধ্যযুগেব অন্যতম কাব্যসিদ্ধি । অন্ত-মধ্যযুগেব কবি কবিচন্দ্রের সাহিত্যকর্ম এই আধুনিক সিদ্ধিযোগে তির্যক্‌ভাবে আলোক বিস্তার করিযাছে ।

পাদটীকা

১. ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সাহিত্য, বিশ্বভারতী, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৮৯, পৃ. ৯৯

২. চিত্রা দেব সম্পাদিত : শঙ্কর কবিচন্দ্র বচিত বিষ্ণুপুরী বামায়ণ প্রথম প্রকাশ ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ ।

৩. প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃ. VI

৪. মাখনলাল মুখোপাধ্যায : 'কবিচন্দ্র ও বিষ্ণুপুরী রামায়ণেব ভূমিকা, ফাল্গুনী পত্রিকা --- সুধীররঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায সম্পাদিত, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭ সাল, পৃ. ৩৬৩-৩৬৯ ।

৫. প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪-৩৬৫ ।

৬. পঞ্চানন মণ্ডল সঙ্কলিত : পুথি পবিচয, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভাবতী, ১৯৬৩ খ্রীঃ ভূমিকা, পৃ. ১৯

দ্বিতীয় পর্যায় : ।। তালিকা সঙ্কলন ।।

পুথিসমূহকে লিপিকাল ও অবস্থান অনুযাযী চাবিটি শ্রেণীতে বিভক্ত কবিতে হইয়াছে । এই চাবিটি শ্রেণী যথাক্রমে ক, খ, গ, ঘ সংকেতের দ্বাবা নির্দিষ্ট, যথা

ক - লিপিকালের উল্লেখযুক্ত সম্পূর্ণ পুথি ।

খ - লিপিকালের উল্লেখহীন সম্পূর্ণ পুথি ।

গ - লিপিকালের উল্লেখযুক্ত খণ্ডিত পুথি ।

ঘ - লিপিকালের উল্লেখহীন খণ্ডিত পুথি ।

উপবেব এই সংকেতের ব্যবহার শুধুমাত্র পুথির তালিকায় প্রদর্শিত হইযাছে । অন্যত্র এই সংকেত উল্লেখেব কোনও প্রয়োজন হয নাই ।

[ডঃ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের 'বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয়, 'প্রথম খণ্ড (১৯৭৮ খ্রীঃ) গ্রন্থে বর্ণিত সংকেতের সঙ্গে আমাদেব সংকেত গ্রহণে কিছু প্রভেদ আছে । আমাদের 'খ' সংকেতেব পুথিসমূহ উক্ত গ্রন্থে 'গ' সংকেতে এবং আমাদের 'গ' সংকেতেব পুথিসমূহ উহাতে 'খ' সংকেতের মধ্যে প্রদর্শিত হইযাছে ।]

১. পুথিব তালিকায় ব্যবহৃত হইয়াছে কেবল 'সাল' । আমাদের ব্যবহৃত বাঁকুড়া অঞ্চলের কোনও পুথিতে 'মল্লাব্দ' কথাব উল্লেখ পাওয়া যায় নাই । ঐ সকল পুথিতে কেবল 'সন' ও 'সাল' কথা দুইটিব উল্লেখ পাওযা যায । তবে ঐ অঞ্চলে দশ শতকে লিখিত পুথিগুলি 'মল্লাব্দ' হওয়াই সম্ভব । এই 'মল্লাব্দ' বঙ্গাব্দ হইতে ১০১ বৎসব কম ।

২. সংগৃহীত পুথির নাম —

i) 'সূর্যবংশকথা' পালা । ii) 'শিবরামের যুদ্ধ' পালা । iii) 'সীতা সবমাব কথা' পালা ।

(তিনটি পুথিই ডঃ প্রফুল্ল পাল মহাশযেব সৌজন্যে শ্রীসত্যব্রত বায়েব নিকট হইতে প্রাপ্ত)

৩. গ্রন্থালয়েব নাম কিংবা ব্যক্তিগত সংগ্রহাগারেব নাম সংক্ষেপে পুথিব ক্রমিক সংখ্যাব পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে, দ্র. ক.বি. ১৬৩ নং ।
নিম্নে অনুরূপ সংক্ষিপ্ত নামের তালিকা প্রদত্ত হইল ।

(ক) ।। বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থাগারসমূহের ও ব্যক্তিগত সংগ্রহের নাম সংকেত ।।

এ.সো -- এশিয়াটিক সোসাইটি সংগ্রহ, কলিকাতা ।
এ.জি. --- এশিয়াটিক সোসাইটিতে বক্ষিত বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট সংগ্রহ, কলিকাতা ।
ক.বি. --- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয বাংলা পুথি সংগ্রহ (বাংলা বিভাগ) ।
ক.চ. --- কবিচন্দ্র শঙ্কব চক্রবর্তীব গৃহে বক্ষিত বাংলা পুথি, পানুয়া, বাঁকুড়া ।
প. --- ড. পঞ্চানন চক্রবর্তীর গৃহে বক্ষিত পুথি, কলিকাতা ।
পাঠ -- ববাহনগব পাঠবাড়ী গৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিব, ববাহনগব, কলিকাতা ।
প্রা.পু.বি.— প্রাচীন পুথির বিবরণ, আব্দুল কবিম সাহিত্য বিশাবদ সংগৃহীত, কলিকাতা ।
ব.বি.মি.— বরেন্দ্র বিসার্চ মিউজিযাম গ্রন্থাগাব, বাজশাহী, বাংলাদেশ।
বি.ভা. --- বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয সংগ্রহ, শান্তিনিকেতন ।
বি.সা. --- বিষ্ণুপুব সাহিত্য পবিষৎ সংগ্রহ, বাঁকুড়া ।
মো --- মোক্ষদা সংগ্রহেব বাংলা পুথি, কলিকাতা ।
শ্রী --- কেবী লাইব্রেবী, শ্রীরামপুর কলেজ, হুগলী ।
স.সা --- সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা।
সা -- বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংগ্রহ, কলিকাতা ।
সা. চি. — বঙ্গীয সাহিত্য পবিষৎ, দেশবন্ধু চিত্তবঞ্জন দাস সংগ্রহ, কলিকাতা ।
সা.প.প. --- বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ পত্রিকা ।
হেম --- হেমেন্দ্র নাথ পালিত সংগ্রহ, পোঃ ভাদুল, বাঁকুড়া ।

(খ) কবিচন্দ্রের 'রামায়ণ'-এর পালানুক্রমিক পুথির তালিকা।

গ্রন্থালয় ও পুথি নং	পালার নাম	কবির নাম	পত্র সং	স/ খণ্ডিত	লিপিকাল	শ্রেণী
ক.বি. ৬৮৫	যযাতি উপাখ্যান	কবিচন্দ্র (লক্ষ্মণ)	১-৮	স	১২০০ সাল	ক
সা. ১৭১৫	"	কবিচন্দ্র (ভবানী শঙ্কব)	১-১০	স	১২১৯ "	ক
ব.বি.মি. ১০৭/১০৭	"	কবিচন্দ্র	১-৬	স	১২২৩ "	ক
ব.বি.মি. ১০৬/১০৬	"	দ্বিজ কবিচন্দ্র	১-১২	স		খ
ক.বি. ৬৮৬	"	কবিচন্দ্র (লক্ষ্মণ)	১-২, ৪-৯	খণ্ডিত	১২২৯ "	গ
**সংগৃহীত	সূর্যবংশকথা	কবিচন্দ্র (আ.পা)	১-৭	স		খ
*সা.চি ১৩২	নবমেধ যজ্ঞ	কবিচন্দ্র চক্রবর্তী (সং.পা)	১-৮	স		খ
মে.১৭৭	"	কবিচন্দ্র	৩-১০,	খণ্ডিত	১২২৯ "	গ
ক.চ. ১	"	"	৪-৯, ১১-১৪,	খণ্ডিত	১১৫১ "	গ
বি.ভা. ৬১৯১	"	"	১-৩, ৫-৬ ৮-১৭,	খণ্ডিত		ঘ
সা. ৪২৮	"	কৃত্তিবাস (১নং পত্র) ও কবিচন্দ্র (৪ক পত্র)	১-৬,	খণ্ডিত		ঘ
*স.চি. ১৭১	হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান	কবিচন্দ্র (সং.পা)	১-৭	স	১০৮৫ "	ক
**ক.বি. ১৬৩৫	হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান	কবিচন্দ্র (আ.পা.)	১-১২	"	১০৮৭ "	"
সা.চি. ১৬৬	"	"	১-১৪	"	১০৯৬ "	"
ক.বি. ৩৫৬৪	"	"	১-২৫	"	১০৯৯ "	"
এ.জি. ৫৪৩৯	"	"	১-১০	"	১১০৪ "	"
সা. ১৭১২	"	"	১-১৭	"	১১০৫ "	"
সা.চি. ১২৮	"	"	১-১৭	"	১১০৬ "	"
ক.বি ৬৫৭	"	"	১-১৪	"	১২১৩ "	"
বি.সা. ২৪	"	"	১-১৩	"	১২১৭ "	"
ক.বি. ৩৫২৮	"	"	১-১৮	"	১২২১ "	"
বি.সা. ১৭/১৭১	"	"	১-২২	"	১২৩৪ "	"
বি.ভা. ১৯১৬	"	"	১-২৪	"	১২৩৫ "	"
সা. ১৭১১	"	"	১-৩৭	"	১২৩৭ "	"
সা. ১৮৮৪	"	"	১-১০	"	১২৪০ "	"
ক.বি. ৩৭০৩	"	"	১ ১১	"	১২৪৩ "	"
বি.ভা ১৭১৫	"	"	১ ১১	"	১২৪৫ "	"
ক.বি. ৬৮৩	"	"	১-১১	"	১২৪৭ "	"
সা. ২৪৯৮	"	"	১-১৬	"	১২৫০ "	"
সা.চি. ২৯	"	"	১-১৩	"	১২৫০ "	"

গ্রন্থালয় ও পুথি নং	পালার নাম	কবির নাম	পত্র সং	স/খণ্ডিত	লিপিকাল	শ্রেণী
ক.বি. ৬৮৪	হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান	কবিচন্দ্র	১-৮	স	১২৫৩ সাল	ক
সা. ১৮৮৩	”	”	১-৯	”	১২৫৬ ”	”
সা. ৪৪১	”	”	১-১০	”	১২৫৮ ”	”
সা. ১৮৮৫	”	”	১-১১	”	১২৬৫ ”	”
ক.বি ৩৫৩৮	”	”	১-১৮	”	১২৬৬ ”	”
ক.বি. ৩৪৫৩	”	”	১-১১	”	১২৭৪ ”	”
সা.চি. ৫৪	”	”	১-১৫	”	১২৬৮ ”	”
ক.বি. ৫৬৯২	”	”	১-৯	”		খ
ক.বি. ৪৯৪১	”	”	১-৮	”		”
বি.সা ১৬/১৭০	”	”	১-৮	”		”
সা. ১৭১৩	”	”	১, ৩-৯	খণ্ডিত	১০৬০ ”	গ
সা. ১৭১৪	”	”	১, ৩, ৫-১৪	”	১০৭৯ ”	”
ক.বি. ২১৭২	”	”	৭-১২	”	১০৮৩ ”	”
ক.বি. ৬৭০	”	”	১, ৩-১০	”	১০৮৮ ”	”
ক.বি. ৫৮৮৮	”	”	৯-১১	”	১১৮৪ ”	”
সা. ৩৭৯	”	”	২-২৪	”	১১৮৬ ”	”
ক.বি. ৬৭৬	”	”	১০-১২	”	১১৯৫ ”	”
সা.চি. ১৭০	”	”	১, ৩-১৪	”	১২২৯ ”	”
সা.চি. ২৫	”	”	২-২২	”	১২৪৭ ”	”
বি.ভা. ৩১৯৩	”	”	২৫	”	১২৫১ ”	”
বি.ভা. ১৬৪৮	”	”	৯	”	১২৫৯ ”	”
সা. ১৮৮৬	”	”	৩-২৩	”	১২৭৪ ”	”
ক.বি. ৩৩৩৬	”	”	২-১৮	”		ঘ
ক.বি. ৫৭৮৪	”	”	১-১৩	”		”
ক.বি. ৫৮৮৭	”	”	২,৫, ১১-১৯	”		”
সা. ১৮৮৭	”	”	৩, ১১, ১৪-২০	”		”
সা. ১৮৮৮	”	”	১, ৩-১০	”		”
বি. ভা. ৮৫৪	”	”	১৪	”		”
বি.ভা. ১৮৮৪	”	”	১৪	”		”
বি.ভা. ৪৫২৬	”	”	৬	”		”
বি.ভা. ৫৭৩১	”	”	১৮	”		”
বি.ভা. ৫৭৯৫	”	”	৫	”		”
বি.ভা. ৬১৯২	”	”	১-১২	”		”
বি.ভা. ৬২৫০	”	”	১২	”		”
বি.সা. ২৪	”	”	১-৬	”		”

গ্রন্থালয় ও পুথি নং	পালার নাম	কবির নাম	পত্র সং	স/ খণ্ডিত	লিপিকাল	শ্রেণী
ক.বি. ৯০২	হবিশ্চন্দ্র উপাখ্যান	কবিচন্দ্র	১-৬	খণ্ডিত		ঘ
ক.বি. ১৬৩২	"	"	১-৯	"		"
ক.বি. ১৬৪৭	"	"	১-৬	"		"
ক.বি. ৬৭২	"	"	১০-১২, ১৪	"		"
ক.বি. ৬৭৩	"	"	৪-৯, ১২-১৩	"		"
ক.বি. ৬৭৪	"	"	২-১১	"		"
ক.বি. ৬৭৫	"	"	২, ৪-৫, ৭	"		"
ক.বি. ৬৭৮	"	"	১-১৩	"		"
ক.বি ৬৭৯	"	"	১-১৫	"		"
ক.বি. ৬৮০	"	"	১-৯	"		"
ক.বি. ৬৮১	"	"	১-৭	"		"
ক.বি. ৬৮২	"	"	১-৪	"		"
*ক.বি. ১৬৪৩	শ্রীরামের বনবাস	" (সং.পা)	১-১৪	স.	১১৭২ সাল	ক
ক.বি. ৫০৭৭	বামেব বনবাস	" (সং.পা)	১-১৪	স.	১২৫৭ সাল	ক
*ক.বি. ৩৯	রঘুনাথেব বনবাস	"	১-১৬,১৮-১৯	খণ্ডিত	১০৫০ " ১১৫৪ (?)	গ
**সা.চি. ২৫০	বঘুনাথেব বনবাস	" (আ.পা)	২-১৬, ১৮-২৬	"	১১৩২সাল	"
বি.সা. ৪৬৮১	"	"	১,৩-৬, ৮	"	১২২৩ "	"
বি.ভা. ৪১৬	"	"	২-৫	"	১২৪৬ "	"
বি.ভা. ১২১৮	শ্রীরামেব বনবাস	"	১, ৩-১০ ১৩-১৪	"	১২৫৫ "	"
ক.বি. ৪০	"	" ও শঙ্কর	১-৩২, ৩৫-৩৬	"		ঘ
ক.বি. ৪৭৮৫	রামেব বনবাস	"	৩-৭	"		"
বি.ভা. ২০২৩	"	"	১-৩	"		"
বি.ভা. ১২৩১	"	"	৮	"		"
বি.ভা. ৮২০	"	"	২-৪	"		"
বি.ভা. ৫৫৭৯	"	"	৪	"		"
ব.রি.মি. ১০৮/১০৮	"	"	১-৭	"		"
বি.ভা. ৬৩৮৮	"	"	(বিক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট পত্র)	"		"

***সা.চি. ২৫০ নং পুথির অসম্পূর্ণ অংশ ক.বি. ৩৯ নং পুথির ১নং এবং ১৫-১৬ নং পত্র হইতে গৃহীত।*

গ্রন্থালয় ও পুথি নং	পালার নাম	কবির নাম	পত্র সং	স/ খণ্ডিত	লিপিকাল	শ্রেণী
**ক.বি. ২৬	ভরতের পিতৃশ্রাদ্ধ	কবিচন্দ্র (আ.পা)	২-৬	খণ্ডিত		ঘ
*সা. ২৪০৩	”	”	১	”		”
সা. ১৭৬৪	বালির পিণ্ডদান	দ্বিজ কবিচন্দ্র (লক্ষ্মণ)	১-১১	স	১২৫৭ সাল	ক
**ক.বি. ২৬০	গয়া শ্রাদ্ধ	কবিচন্দ্র (আ.পা)	১-৭	স		খ
**ক.বি. ৫৭	সীতাহরণ	” (আ.পা)	১-১০	”	১১৯৭ ”	ক
সা. ১৭১৬	”	”	১-৫	”	১২১১ ”	”
ক.বি. ৫৮	”	”	১-৪	”	১২১৬ ”	”
বি.সা. ২৬	”	”	১-১৯	”	১২২২ ”	”
ক.বি. ৬৯৩	”	”	১-৯	”	১২২৮ ”	”
ক.বি. ৬০	”	”	১-৯	”	১২৩২ ”	”
ক.বি. ৫০৯০	”	”	১-৭	”	১২৩৮ ”	”
সা. ২৩৯৯	”	”	১-৬	”	১২৪০ ”	”
সা. ২৫০০	”	”	১-১১	”	১২৪৫ ”	”
ক.বি. ৬১	”	”	১-৭	”	১২৪৮ ”	”
ক.বি. ৫২৫৩	”	”	১-২, ৫-৮	খণ্ডিত		ঘ
ক.বি. ৫৯	”	”	১, (বৃহৎ পত্র)	”		”
ক.বি. ৫৬৩৬	”	কবিচন্দ্র ও কৃত্তিবাস	১-৮	”		”
			(৮ম পত্রে কবিচন্দ্র ভণিতা ৬ষ্ঠ পত্রে কৃত্তিবাস ভণিতা)			
সা. ২৩৮৯	”	কবিচন্দ্র	১-৫	খণ্ডিত		”
সা. ২৫৪৩	”	”	১-৮	”		”
ব.রি.মি.৮৪/৮৪	”	”	১-৭, ১২, ১৬	”		”
ব.বি.মি. ৮৫/৮৫	”	”	১-৩	খণ্ডিত		”
বি.ভা. ৫৭২১	”	”	৫	”		”
**এ.জি. ৩৬২২	শিবরামেব যুদ্ধ	” (আ.পা)	১-১২	স	১২২২ সাল	ক
ক.বি. ২৪৯	”	”	১-৭	”	১২২৫ ”	”
বি.ভা. ১১০৭	”	”	১-২৭ (চিত্রিত)	”	১২২৮ ”	”
সংগৃহীত	”	”	১-১০	”	১২২৯ ”	”
বি.ভা. ১৮৭৫	”	”	১-১৬	”	১২৩৯ ”	”
বি.ভা. ১০৮৪	”	”	১-১০	”	১২৩৯ ”	”

***ক.বি. ২৬ নং এবং সা ২৪০৩ নং পুথি দুইটিকে একত্র গ্রথিত করিয়া এই পালার আদর্শ পাঠটির উদ্ভব। পুথি দুইখানি খুব সম্ভব একই পুথির দুই অংশ।*

গ্রন্থালয় ও পুথি নং	পালার নাম	কবির নাম	পত্র সং	স/ খণ্ডিত	লিপিকাল	শ্রেণী
সা. ১৭৬২	শিববামেব যুদ্ধ	কবিচন্দ্র	১-১২	স	১২৪৬ সাল	ক
ক.বি. ২৫০	”	”	১-১০ (অমিল পাঠ)	”	১২৫০ ”	”
ক.বি. ৬৯২	”	”	১-১২	”	১২৫৩ ”	”
বি.ভা. ৪৭৩৭	”	”	১-১১	”	১২৫৪ ”	”
ব.রি.মি. ৮৬/৮৬	”	”	১-৭	”	১২৫৭ ”	”
বি.সা ১৯/৯	”	”	১-৭	”	১২৭১ ”	”
বি.সা. ৬/৮৭	”	”	১-৯	”	১২৭৩ ”	”
বি.সা. ৫১	”	”	১-১০	”		খ
সা. ৪২৭	”	”	৩-৭ (অমিল পাঠ)	খণ্ডিত	১১৩৯ ”	গ
বি.ভা ৯৫৫	”	”	৫ (১নং নাই)	”	১২১৯ ”	গ
বি.ভা. ৮৫০	”	”	৪ ”	”	১২২৬ ”	”
বি.ভা. ৬১১১	”	”	১,৫,৭,৮,	”	১২৪৪ ”	”
মো.লা. ১৬৯	”	”	২-১৬	”	১২৪৪ ”	”
ক.বি. ৫৮১৫	”	”	৩-৮ (সা. ৪২৭ নং পাঠেব সঙ্গে মিল আছে)	”	১২৪৮ ”	”
ক.বি. ৪৫০০	”	”	২-১১	খণ্ডিত	১২৬২ ”	”
ক.বি. ৫৮২৬	”	”	১১নং কবিচন্দ্র (১-১০ দ্বিজ তুলসীব অযোধ্যাকাণ্ড)	”	১২৬২ ”	”
ক.বি. ৬৬৫১	”	”	১-৯, ১২	”	১২৬৪ ”	গ
বি.সা. ৩	”	”	৫-৮, ১০, ১২-১৩	”	১২৭১ ”	”
বি.সা. ১৮	”	”	১-৬	”	১২৭৩ ”	”
ক.বি. ২৫১	”	”	৭-১২	”		ঘ
ক.বি. ৬৯১	”	”	১-৭	”		”
ক.বি. ৬০১১	”	”	১-৯ (৫ম পৃ.অন্য পুথিব)	”		”
সা. ৪০৬	”	”	৩, ৪, ৫, ৭	”		”
সা. ২৫১৬	”	”	৩-১২	”		”
বি.সা ৫২	”	”	২-১০	”		”
বি.সা ৭০	”	”	২-৯	”		”

গ্রন্থালয় ও পুথি নং	পালার নাম	কবির নাম	পত্র সং	স/ খণ্ডিত	লিপিকাল	শ্রেণী
বি.সা. ১১/১৬৫	শিবরামেব যুদ্ধ	কবিচন্দ্র	২-৯	খণ্ডিত		ঘ
বি.সা. ১২/১৬৬	”	”	৩-৯	”		”
বি.ভা. ৭৮৫	”	”	(জমাট বাঁধা)	”		”
বি.ভা ২৫৪৯	”	”	৭	”		”
ক.বি. ৫৩০১	বামলীলা (শিবরামেব যুদ্ধ)	”	২-১০	”		”
ক.বি. ৫৮০৯	”	”	১-৬	”		”
ক.বি. ৫২১৮	”	”	৭-৯	”		”
বি.সা. ৫৮	”	”		”		”
বি.সা. ৪০	বামযুদ্ধ	”		”		”
**বি.ভা. ১২৬৮	বাম-সুগ্রীব মিলন	” (আ.পা)	১-১০ (অর্ধেক সাদা পাতা) ১১-১২ নং পত্র অন্য পুথিব।)	খণ্ডিত		”
**বি.ভা. ৫৮৮৩	সীতাব উদ্দেশ	” (আ.পা)	১-১৩	স.	১২৬৫ ”	ক
বি.ভা. ৬২০৩	”	”	১,৫,১২-১৩	খণ্ডিত	১২৫৮সাল	গ
ব.রি.মি. ৮৩/৮৩	”	”	১, ৬-৮	”		ঘ
বি.সা ৪১	”	”		”		”
*সা. ৪৫৭	অঙ্গুবী সংবাদ	” (সং.পা) (ও কৃত্তিবাস)	১-৪ কবিচন্দ্র (৫-১৭ কৃত্তিবাস)	স.	১২৭২ ”	ক
**ক.বি. ১৬৩	অঙ্গদ রাযবার	কবিচন্দ্র (আ.পা)	১-৮	স.	১০৫৯ ”	”
ব.বি.মি. ৮৭/৮৭	”	”	১-২০	”	১০৭৩ ”	”
ব.রি.মি. ৮৮/৮৮	”	”	১-১০	”	১০৮১ ”	”
ক.বি. ৬৮৭	”	”	১-১১	”	১০৮৪ ”	”
ক.বি. ৬৮৮	”	”	১-১০	”	১০৯০ ”	”
সা. ১৫৪৫	”	”	১-১২	”	১০৯৫ ”	”
সা. ৩৮৮	”	”	১-১২	”	১১০০ ”	”
সা. ১৭৬৬	”	”	১-১১	”	১১২২ ”	”
সা. ৪৪৬	”	”	১-৯	”	১১৯৫ ”	”
ক.বি. ১৬৭	”	”	১-১০	”	১২০২ ”	”
ক.বি. ১৬৯	”	”	১-১১	”	১২০৩ ”	”
সা. ১৭৬৫	”	”	১-১১	”	১২০৫ ”	”
সা.চি. ৪২১	”	”	১-১০	”	১২০৭ ”	”
ব.বি.মি. ১০৯৬/৫	”	”	১-২৮	”	১২১০ ”	”
ক.বি. ৬৪৫০	”	”	১-১১	”	১২১১ ”	”

গ্রন্থালয় ও পুথি নং	পালার নাম	কবির নাম	পত্র সং	স/ খণ্ডিত	লিপিকাল	শ্রেণী
পাঠ. ২৭৪০/১৮ছ	অঙ্গদ বাযবাব	কবিচন্দ্র (আ.পা)	১-১১	স.	১২১৭ সাল	ক
ক.বি. ৫০৪৯	”	”	১-১৪	”	১২১৮ ”	”
সা.চি. ৩৪৩	”	”	১-১১	”	১২২২ ”	”
সা.চি. ৩৪৬	”	”	১-১৯	”	১২২৫ ”	”
ব.বি.মি. ৮৯/৮৯	”	”	১-১৮	”	১২২৬ ”	”
সা.চি. ৮২	”	”	১-১২	”	১২৩১ ”	”
সা. ১৮৯৭	”	”	১-১০	”	১২৩৬ ”	”
বি.ভা. ৪৩৩১	”	”	১-১৪	”	১২৪০ ”	”
সা. ৪১৫	”	”	১-৯	”	১২৪১ ”	”
সা. ১৮৯৬	”	”	১-১০	”	১২৪৫ ”	”
ক.বি. ৬৮৯	”	”	১-১৫	”	১২৪৭ ”	”
ক.বি. ৪১৭০	”	”	১-৯	”	১২৪৭ ”	”
ক.বি. ৫০৪৮	”	”	১-১৪	”	১২৪৯ ”	”
সা. ৪৪৪	”	”	১-১৭	”	১২৫২ ”	”
ক.বি. ১৭৩	”	”	১-৯ (ভণিতা নাই)	”	১২৫৩ ”	”
ক.বি. ১৭৪	”	”	১-৯	স.	১২৫৬ ”	”
ব.বি.মি. ৯১/৯১	”	”	১-১০	”	১২৫৬ ”	”
ব.বি.মি. ১০৯৭/৬	”	”	১-১২	”	১২৫৭ ”	”
বি.ভা. ২০৫৫	”	”	১-৮	”	১২৬০ ”	”
বি.ভা. ৩৯৯৯	”	”	১-১০	”	১২৭৩ ”	”
বি.ভা. ৬১৩৭	”	” ও কৃত্তিবাস	১-৮	”	১২৮২ ”	”
পাঠ ২৭৭২/৪	”	কবিচন্দ্র	১-১০	”	১২৪০ ”	”
ক.বি. ৫২১৯	”	”	১-১৭	”		খ
সা. ১৮৯৩	”	”	১-৭	”		”
সা. ১৮৯৫	”	”	১-১৫	”		”
সা.চি. ৩৮২	”	”	১-১৫	”		”
ক.বি. ৫১৮৫	”	”	১-৫, ৯-১০, ১২-১৪, ১৭-২১	খণ্ডিত	১০৬৩ ”	গ
ক.বি. ১৬৪	”	”	৬-৭, ৯-১০ ১২-১৩	”	১০৭৮ ”	”
সা. ৩৮১	”	”	২-৫, ৭-১৪	”	১০৮৮ ”	”
ক.বি. ৬৬৩৩	”	”	৩-৪, ৬-৮ ১১-১৬	”	১১৪৪ ”	”

গ্রন্থাগার ও পুথি নং	পালার নাম	কবির নাম	পত্র সং	স/ খণ্ডিত	লিপিকাল	শ্রেণী
ক.বি. ১৬৬	অঙ্গদ বাযবাব	কবিচন্দ্র	১৩-১৪	খণ্ডিত	১১৮৩ সাল	গ
সা. ৪৬১	”	”	২-১১	”	১২০২ ”	”
সা. ১৮৯১	”	”	২-১৬	”	১২১৭ ”	”
সা. ১৮৯২	”	”	১, ৩-১১	”	১২৩২ ”	”
সা. ৪১৪	”	”	২-১৩	”	১২৪০ ”	”
ব.বি.মি. ৯০/৯০	”	”	২-১	”	১২৪৬ ”	”
ক.বি. ১৭১	”	”	-	”	১২৪৭ ”	”
ক.বি. ২৭৫	”	”	৩-১১	”	১২৬১ ”	”
ক.বি. ১৬৫	”	”	-	”		ঘ
ক.বি. ১৬৮	”	”	-	”		”
ক.বি. ১৭০	”	”	১-৬	”		”
ক.বি. ১৭২	”	”	-	”		”
ক.বি. ৫৪৮৬	”	”	১-৩	”		”
ক.বি. ৫৭৩৯	”	”	৩৩-৩৪ ৩৬-৩৮	”		”
ব.বি.মি. ৯৩/৯৩	”	”	১-৩	”		”
ব.বি.মি. ৯৪/৯৪	”	”	১-৩	”		”
ব.বি.মি. ৯৫/৯৫	”	”	১-৩	”		”
সা. ১৮৯৪	”	”	২-২৬	”		”
বি.ভা. ৪২৫	”	”	২ পত্র	”		”
বি.ভা. ৬০২	”	”	১ ”	”		”
বি.ভা. ১২৫৩	”	”	১৪ ”	”		”
বি.ভা. ৫৭৬৪	”	”	৮ ”	”		”
ব.বি.মি. ৯৬/৯৬	কুম্ভকর্ণেব বাযবাব	”	১-৩	স	১০৫০ ”	ক
**সা. ১৭৬৭	রাবণ কুম্ভকর্ণেব সংবাদ	” (আ.পা)	১-৭	”	১০৬১ ”	”
সা.চি. ৩৪৭	কুম্ভকর্ণেব রাযবাব	”	১-১০	”	১০৭৬ ”	”
সা. ১৭৬১	”	”	১-৬	”	১০৮৬ ”	”
ব.বি.মি. ৯৭/৯৭	”	”	১-৩	”	১০৮৭ ”	”
সা. ১৭৬৯	”	”	১-৫	”	১০৯১ ”	”
ব.বি.মি. ৯৮/৯৮	”	”	১-৫	”	১০৯২ ”	”
সা. ১৫৪৩	”	”	১-৪	”	১০৯৩ ”	”
ক.বি. ১৭৬	”	”	১-৯	”	১০৯৯ ”	”
ক.বি. ৬৪০২	কুম্ভকর্ণেব নিদ্রাভঙ্গ	”	১-৫	”	১১০১ ”	”

গ্রন্থালয় ও পুথি নং	পালার নাম	কবির নাম	পত্র সং	স/ খণ্ডিত	লিপিকাল	শ্রেণী
সা.চি. ৫৯	কুম্ভকর্ণের রাযবাব	কবিচন্দ্র	১-৬	স	১১০২ সাল	ক
ব.বি.মি. ৯৯/৯৯	”	”	১-৩	”	১১১৬ ”	”
ক.বি. ১৭৫	”	”	১-৪	”	১১৯৪ ”	”
সা. ৩৪৮	”	”	১-৯	”	১২০২ ”	”
ব.বি.মি. ১০০/১০০	”	”	১-৭	”	১২২০ ”	”
সা. ৪৩০	”	”	১-৪	”	১২২১ ”	”
সা. ৪৫০	”	”	১-৪	”	১২২৩ ”	”
ক.বি. ১৭৭	কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ	”	১-৭	”	১২৩০ ”	”
ব.বি.মি. ১০১/১০১	কুম্ভকর্ণের বাযবাব	”	১-৫	”	১২২৭ ”	”
বি.ভা. ২৮৯৫	”	”	১-৬	”	১২৪০ ”	”
ব.রি.মি. ১০২/১০২	”	”	১-৮	”	১২৫৭ ”	”
ব.রি.মি. ১০৩/১০৩	”	”	১-৬	”	১২৫৮ ”	”
ক.বি. ৩৫৮০	”	”	১-৬	”	১২৯৯ ”	”
ক.বি. ১৩৭৮	”	”	১-৭	”		খ
সা. ১৮৯৮	”	”	১-৮	”		”
পাঠ. ২৭৩৭/১৮ঘ	”	”	১-৫	”		”
সা. ১৭৬৮	”	”	২-৭	খণ্ডিত	১১৯২ ”	গ
বি.ভা. ৩৩১২	কুম্ভকর্ণেব নিদ্রাভঙ্গ	”	২ পত্র	”		ঘ
ক.বি. ৬৯০	কুম্ভকর্ণেব বায়বার	”	১-৭	”		”
সা. ১৮৯৯	”	”	২-৭	”		”
বি.সা. ৬/১৪৪	”	”	-			”
বি.ভা. ১০৩৫	”	”	১,২,৪,৫ ” ৮-৯ (৩ খানা অন্য পুথিব পত্র)		-	”
বি.ভা. ৪৭৩৯	কুম্ভকর্ণেব নিদ্রাভঙ্গ	”	৭পত্র,	খণ্ডিত	-	”
**সা. ৩৮২	লক্ষ্মণেব শক্তিশেল	” (আ.পা)	১-১৫	স	১১৩৮ ”	ক
সা. ৪৪৩	”	”	১-১৬	”	১১৭২ ”	”
সা. ১৭৬৩	”	”	১-২৫	”	১২০৩ ”	”
পাঠ ২৭৩৯/১৮চ	”	”	১-১৬	”	১৭৩২ শক (১২১৭ সাল)	”
*ক.বি. ৩৮৪৩	”	” (সং.পা)	১-৬	”	১২২০ সাল	”
সা. ৩৯২	”	”	১-৯	”	১২২৮ ”	”
বি.ভা. ১০৭৬	”	”	১-১১ (কীট দষ্ট)	”	১২৩৩ ”	”

গ্রন্থালয় ও পুথি নং	পালার নাম	কবির নাম	পত্র সং	স/খণ্ডিত	লিপিকাল	শ্রেণী
সা.৪৪৭	লক্ষ্মণের শক্তিশেল	কবিচন্দ্র	১-১৪	স	১২৩৪ সাল	ক
সা. ১৮৮৯	"	"	১-১৪	"	১২৩৮ "	"
ক.বি. ৩৭৪১	"	"	১-২৫	"	১২৫০ "	"
ক.বি. ১৮৪	"	"	১-১৭	"	১২৫১ "	"
ব.বি.মি. ১০৪/১০৪	"	"	১-১৭	"	১২৫৩ "	"
সা.চি. ৬০	"	"	১-১৩	"	১২৬৩ "	"
বি.ভা. ৬৩১৫	"	"	১-১২	"	১২৬৫ "	"
ক.বি. ১৭৯	"	"	১-১৪ (স্থানাভাবে সালেব উল্লেখ নাই)	"	-	খ
বি.ভা. ৬২৬২	"	"	১-১৬	স	-	"
বি.ভা. ৬৩০৮	"	"	৭-১৯ (অন্য ২খানা পত্র আছে)	খণ্ডিত	১২০১ "	গ
মো.	"	"	-		১২১১ "	"
ক.বি. ১৮৩	"	"	১-৬, ৮-২০	"	১২৩২ "	"
ক.বি. ১৮৫	"	"	৩-১৭	"	১২৫৩ "	"
ক.বি. ১৮৬	"	"	১-২০	"	১২৬৬ "	"
ক.বি. ৩৩৪৩	"	"	২-১৬	"	১২৮৭ "	"
ক.বি. ১৮০	"	"	২-৬, ৮-১৪	"		ঘ
ক.বি. ১৮১	"	"	১-১৩, ১৫	"		"
ক.বি. ১৮২	"	"	২-১১	"		"
ক.বি. ২৭৫	"	"	৩-১১	"		"
ক.বি. ৪৮৯৭	"	"	৫-১৫	"		"
ক.বি. ৫২৪০	"	"	১,৫,৯	"		"
সা. ৪৩৫	"	"	১-১৩	"		"
সা. ৪৪৯	"	"	১৫-১৮	"		"
সা. ১৮৯০	"	"	১-৭	"		"
সা. ২৩৭৮	"	"	১-৫	"		"
বি.ভা. ৪২১	"	"	৩টি পত্র কবিচন্দ্রেব (৪টি পত্র কৃত্তিবাসের)			"
বি.ভা. ৬০৪	"	"	২পত্র	খণ্ডিত		"
বি.ভা. ১১৫২	"	"	২নং পত্র (৬টি পত্র অন্য পুথিব)	"		"

গ্রন্থালয় ও পুথি নং	পালার নাম	কবির নাম	পত্র সং	স/ খণ্ডিত	লিপিকাল	শ্রেণী
বি.ভা. ১৮৫৭	লক্ষ্মণেব শক্তিশেল	কবিচন্দ্র	২,৫,১৩	খণ্ডিত		ঘ
বি.ভা. ৪৫২৮	”	”	৯পত্র	”		”
বি.ভা. ৫৭৫৯	”	”	১-১২, ১৪	”		”
ক.বি. ৬৪০১	যোগাদ্যা বন্দনা	”	১-৭	স	১২৫২ সাল	ক
ক.বি. ৬৪০৬	”	”	১-২ (বিবাট আকাবেব পত্র)	”		খ
বি.সা. -	”	”	১-৭	স	১২৭৪ সাল	ক
**সংগৃহীত	সীতা সবমাব কথা	”	৩পত্র,	খণ্ডিত	-	ঘ
**সা.প.প. ১৩০৪ সাল, (৪র্থ পৃ. ৩৩৭. নং ১৬৮)	বাবণ বধ	”	(দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত)		১২৪৬ ”	গ
**বি.ভা. ৫৭৩৩	সীতাব পবীক্ষা	”(আ.পা)	১-৮ ১০-১৪ (অতিরিক্ত কযেকটি ভাগবতেব পত্র আছে)	খণ্ডিত		ঘ
বি.ভা. ৩৮০	রাঘব কীর্তন	”	(১টি পত্র শিববামের যুদ্ধ। অপরটি বনবাস পালাব)			ঘ
হেম. ৪৩৮	শ্রীবামের দেশাগমন	”	-	স	১০৭২ সাল	ক
**ক.বি. ৩৭০৮	রঘুনাথেব দেশাগমন	”(আ.পা)	১-৮	স	১১৯৬ ”	ক
মো.	(অজ্ঞাত কাণ্ড)	”	-		১২৫৭ ”	গ
ক.বি. ৫০৩৩	লবকুশের যুদ্ধ	দ্বিজমধুকণ্ঠ, দ্বিজ কবি ও কৃত্তিবাস	২-১৫, ১৭-৪১, ৪৩-৬৭ পত্র (৩৭ নং পত্রে দ্বিজ কবিচন্দ্র ভনে। অন্যান্য ভণিতা কৃত্তিবাসেব)			ঘ

দ্রঃ- যে সকল পুথিতে কবিচন্দ্রের ভণিতা নাই অথচ মূল পুথির তালিকায় কবিচন্দ্র নামে লিখিত, তাহা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই ; যথা:- বি.সা. ৫/৮৬, বি.ভা. ১৪৯, ৪১১, ৯৯০, ১৫০৮, ৫৮৫৬, ৫৮৭১, ৬৩৩৫, ৬০৯৩ নং এবং ক.বি. ৫৭৫৮ ও ৫০৩৩ নং। সং.সা.প. ১৫ নং পুথিটি খোঁজ করিয়া পাওয়া যায় নাই।

বি.ভা. ৫১৭ এবং ৪৫১৭ নং পুথি দুইটি রামায়ণের বিষয় নয়, উহাতে ভাগবতের বলি রাজার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। মো. অজ্ঞাত কাণ্ডটির বিষয় কি তাহা জানা যায় নাই।

** তাবকা চিহ্নিত পুথিগুলি সম্পাদনার জন্য ব্যবহৃত।

সূচীপত্র

দ্বিতীয় অধ্যায় ৬০-৭৯

।। কবি জীবন ।।

জনশ্রুতিতে কবির বাল্যজীবন, কৈশোব ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বার্ধক্য জীবন । লেগো গ্রামে কবিচন্দ্র কর্তৃক বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা । কবিচন্দ্র উপাধি এবং রাজসম্মান লাভ । কাব্যে মল্লনৃপতিদেব উল্লেখ, বাল্মীকি ও ব্যাসদেব বন্দনা, কবির শ্রদ্ধাভাজন অভিরাম গোস্বামীর উল্লেখ । কবিখ্যাতি । বিভিন্ন সমালোচকের দৃষ্টিতে কবিচন্দ্র ।

আবির্ভাব কাল :- কবির জন্মকাল সম্পর্কে কবিচন্দ্রের দৌহিত্র বংশীয় পণ্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় এবং ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মত, কাব্যরচনাকাল ও দলিলে প্রাপ্ত সময়কাল সম্পর্কে প্রদত্ত তথ্যের আলোচনা । শ্রদ্ধেয় গঙ্গাগোবিন্দ বায়ের মতেব বিচারে এবং প্রাপ্ত তথ্যেব ভিত্তিতে কবির সময়কাল নির্ধাবণ । মল্লরাজাগণ কর্তৃক কবিপুত্রকে প্রদত্ত ভূমিদানের দলিলের তাবিখ হইতে কবিচন্দ্রেব তিরোভাব কাল সম্পর্কে ধারণা । কয়েকটি দলিলে পরবর্তী তিনপুরুষের উল্লেখ এবং কবির বংশ তালিকার সঙ্গে তাঁহাদেব নামের মিল । বিষ্ণুপুরের মল্লরাজসভার সঙ্গে কবিচন্দ্রের প্রত্যক্ষ যোগ এবং চাকদহ গ্রামে বসতি স্থাপন ।

বংশ পরিচয় :— পরিবারের পদবী, পেশা ও গৃহদেবতার পরিচয় । বংশেব বিদ্যানুরাগ ।

গ্রাম পরিচিতি :- পানুয়া গ্রামের বিবরণ ।

কবির ধর্মমত :- বিভিন্ন কাব্যে উল্লিখিত কবির ঈশ্বব সম্পর্কিত উপলব্ধি ও গুরুবন্দনা হইতে কবিব ধর্মমতের আলোচনা । কবির বিষ্ণুপ্রীতি ।

রামায়ণ রচনার অনুপ্রেরণা :- অনুপ্রেরণার কারণ

কাব্য রচনাকাল :- কবিচন্দ্রের বিভিন্ন কাব্যে প্রাপ্ত মল্লরাজাদেব নামের উল্লেখ হইতে কাব্য বচনাকালের অনুমান ।

তৃতীয় অধ্যায় ৮০-১০৬

।। দেশ ও কাল ।।

মল্লবাজবংশ :- কবিচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক মল্লরাজবংশের অবতারণা । 'মল্লভূম'-এব পরিচয় ও সীমা — কালে কালে ঐ সীমারেখার হ্রাস ও বৃদ্ধি । মেজর বেণেলেব অঙ্কিত (১৭৬৭-৭৪ খ্রীঃ)মানচিত্রে প্রদত্ত মল্লভূমেব সীমা — মল্লভূম নামে প্রদত্ত সর্বশেষ এই সীমারেখার গুরুত্ব । মল্লরাজবংশের উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ — বিভিন্ন গবেষকের মতামত । ধাড়ি মল্ল বা ধার হাম্বীরেব সময় হইতে নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের সূচনা । মোগল সেনাপতি মানসিংহের বঙ্গে আগমন ও মোগল আফগান বিদ্রোহ । 'আকববনামা' গ্রন্থে উল্লিখিত 'হামিব' সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ । আফগানদেব বশ্যতা । বাৎসরিক পেস্কোস প্রদান — গ্রান্টের রিপোর্ট । ধার হাম্বীর ও বীর হাম্বীরের মধ্যে কে প্রথম করদাতা সে সম্পর্কেও সংশয় ।

বীরহাম্বীবের বাজত্বকাল — পাঞ্চেতে প্রাপ্ত শিলালেখ হইতে প্রাপ্ত সন, মোগল অভিযান ও বীবহাম্বীবের মোগল আনুগত্য, সাহসী রাজারূপে বীরহাম্বীরের পরিচয। বীরহাম্বীবেব জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় —শ্রীনিবাসাচার্যের নিকট দীক্ষাগ্রহণ ও জীবনের নব রূপান্তর। বীর সিংহ (১ম) অথবা ধাড়ি হাম্বীরের রাজত্বকাল। রঘুনাথসিংহের (১ম) বাজত্ব কাল ও মন্দিব নির্মাণ। বীর সিংহেব (২য়) রাজত্বকাল ও মন্দির প্রতিষ্ঠা, বীর সিংহেব সম্পর্কে জনশ্রুতি। দুর্জন সিংহের রাজত্বকাল ও সুপ্রসিদ্ধ মদনমোহন মন্দির প্রতিষ্ঠা। প্রাপ্ত তথ্যেব ভিত্তিতে বঘুনাথ সিংহের (২য়) সম্ভাব্য রাজত্বকাল। রঘুনাথ সিংহের (২য়) কাল ও ইতিহাসেব ক্ষীণসূত্র, শোভা সিংহ এবং সর্দার রহিম খানের বর্ধমানের রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এই চেতোযা ববদাব বিদ্রোহে বঘুনাথ সিংহের (২য়) মোগল পক্ষাবলম্বন। বীরভূম ও বিষ্ণুপুরেব জমিদাবকে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁব বিশেষ সুবিধা দান। লালবাঈ সম্পর্কে জনশ্রুতি ও ভ্রাতা গোপাল সিংহেব (১ম) ষড়যন্ত্রে রাজা রঘুনাথ সিংহের (২য) মৃত্যুবরণ। রঘুনাথ সিংহেব (২য) সঙ্গীতপ্রিয় নৃপতি নামে এবং সুগঠিত সেনাদলেব অধিনাযকরূপে পবিচয়। অস্তমিত মল্লসৌভাগ্যরবি।

গোপাল সিংহেব (১ম) রাজত্বকাল — পট্টমহিষীদের নাম, মল্লভূমে বৈষ্ণব ধর্মের প্লাবন। বর্ধমানবাজেব শক্তিবৃদ্ধি। মোগল অভিযান এবং বর্গী আক্রমণে বিধ্বস্ত মল্লভূম। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁব বার্ষিক কব আদায় হ্রাস, বর্গী আক্রমণের উপর রচিত ঐতিহাসিক ছড়া, ইংবাজ পর্যটকেব দৃষ্টিতে বিষ্ণুপুবের বাজাদের ঐশ্বর্য ও সততার বর্ণনা।

গোপাল সিংহেব (১ম) পর পৌত্র চৈতন্য সিংহের রাজত্ব লাভ — ভ্রাতৃবিবোধ, মদনমোহনকে বন্ধকদান। মাধব সিংহের রাজত্বকালে মল্লবংশেব পরিণাম। বাজবংশ তালিকা।

।। শঙ্কর ও কবিচন্দ্র সমস্যা এবং কবিচন্দ্রের 'রামায়ণ'-এব পুথি নির্বাচনে সতর্কতা ।।

সমস্যার স্বরূপ। মধ্যযুগেব বাংলা সাহিত্যে শঙ্কর নামক বহু কবির আবির্ভাব ও রচনাব সংক্ষিপ্ত পরিচয। 'অধ্যাত্ম বামাযণ'-এর ভাবানুবাদক ভবানীশঙ্কর, 'লক্ষ্মীর চরিত্র' পাঁচালী রচয়িতা শঙ্কব কিঙ্কর, 'গুরুদক্ষিণা' পালার কবি কুলচণ্ডাব শঙ্কর আচার্য এবং শীতলামঙ্গলেব বিবাট পালাব নবাবিষ্কৃত কবি শঙ্কব দে— এই চাবিজনের সঙ্গে কবিচন্দ্রেব রচনার অভিন্নত্ব আরোপ। কবিচন্দ্র সমস্যা :- কবিচন্দ্র উপাধি গ্রহণের প্রবণতা — মধ্যযুগে এই উপাধি অথবা নামেব ব্যাপক ব্যবহাব। কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর সঙ্গে অন্যান্য কবিচন্দ্রের পবিচযে জটিলতা নিণয — এই জটিলতার মূল প্রধানতঃ আলোচনা ক্ষেত্রে, অন্য কবিব বচনায কবিচন্দ্রের ভণিতা এবং কবিচন্দ্রের পুথিতে অন্য কবির ভণিতাব সাক্ষাৎ।

কবিচন্দ্রের 'বামায়ণ'-এর পুথি নির্বাচনে সতর্কতা ঃ-

সতর্কতার কারণ — কয়েকটি সমস্যা বা জটিলতার উল্লেখ —

(ক) ভবানীশঙ্কর বা শঙ্করের সঙ্গে কবিচন্দ্রের নামের জটিলতা মূলতঃ আলোচনা ক্ষেত্রে । ভবানীশঙ্করের ভণিতার রীতি বিশ্লেষণ ।

(খ) ভবানীশঙ্করের কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডকে কবিচন্দ্রের রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত ।

(গ) ভবানীশঙ্করের 'তরণীসেনের যুদ্ধ' এবং 'মহীরাবণ বধ' পালার জনপ্রিয়তার গৌরব কবিচন্দ্রে আরোপ ।

(ঘ) দ্বিজ লক্ষ্মণ কবিচন্দ্রের পুথিতে কবিচন্দ্রের সঙ্গে অভিন্নত্ব আবোপ । কবিচন্দ্রের ভণিতার স্বাতন্ত্র্যে সমস্যার সমাধান ।

পঞ্চম অধ্যায় ১৩১-১৬৩

।। কবিচন্দ্রেব বচনার পবিচয় ।।

রচনার প্রাচুর্য —প্রথম মঙ্গলকাব্য শিবায়ন বা 'শিব মঙ্গল' । 'শিব মঙ্গল' কাব্যের প্রাপ্ত পুথির বিবরণ । 'গৌরীমঙ্গল', 'মর্ছধরা' পালা — পালাটির নাটকীযতা ও প্রকাশবৈচিত্র্য, 'হরগৌরী সংবাদ' এবং 'মহামায়াব শঙ্খপরা' পালা ।

দ্বিতীয় গ্রন্থ 'অনাদি মঙ্গল' — পুথির বিবরণ ও কাহিনী বিশ্লেষণ ।

তৃতীয় গ্রন্থ 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' — সংক্ষিপ্ত পরিচয় ।

কবিচন্দ্রের চতুর্থ এবং প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গল.' — কৃষ্ণ বিষয়ক পালার সঙ্কলন গ্রন্থ । সম্পাদক মাখনলাল মুখোপাধ্যায়ের সংযোজন ও পরিবর্তন । মুদ্রিত গ্রন্থাতিরিক্ত পালার অনুসন্ধান । রাধিকামঙ্গল ও কৃষ্ণমঙ্গল । পঞ্চম গ্রন্থ 'মহাভারত' — পর্ব ও পালাব বিবরণ । কাহিনী আলোচনা — ব্যাসদেব প্রণীত 'মহাভাবত' এর ভাবানুবাদ, রচনার বৈশিষ্ট্য ।

কবিচন্দ্রের ক্ষুদ্র পালাসমূহ ঃ-

৬। মশার কবিতা
৭। জীবিতবাহন বা জীমূতবাহন রাজার উপাখ্যান
৮। শিবিরাজার উপাখ্যান
৯। কপিলামঙ্গল
১০। কাপাসের পালা
১১। বারমাসী ছড়া
১২। কলিকালের ছড়া

১৩। *বিভিন্ন বন্দনা ঃ-*

(ক) মদনমোহন বন্দনা (ভাগবতের অন্তর্গত)

(খ) যোগাদ্যা বন্দনা

(গ) রাজবল্লভীর বন্দনা

১৪। পুরাণ প্রসঙ্গ ঃ-

ভবিষ্য পুরাণ ও আগম পুরাণের উল্লেখ

১৫। অন্যান্য প্রসঙ্গ — হরিবংশ ও দণ্ডীপর্ব সন্ন্যাসখণ্ড ও দানখণ্ড

ষষ্ঠ অধ্যায় ১৬৪-২২০

।। বিষ্ণুপুরী রামায়ণের উৎস বিচার ।।

কাব্যের স্বরূপ —

(ক) মূল বাল্মীকি 'রামাযণ'-এর প্রভাব ঃ- 'সূর্যবংশ কথা' বা নরমেধ যজ্ঞ পালা। শুনঃশেফ কাহিনীর উল্লেখ ঋগ্বেদ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে। মূল 'রামায়ণ'-এর বাল কাণ্ডেব (৬১-৬৫ সর্গ) সঙ্গে কবিচন্দ্রের পালার মিল ও প্রভেদ।

(খ) পুরাণের প্রভাব ঃ- 'হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান' পালা ও 'গয়াশ্রাদ্ধ' পালা। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-এ হরিশ্চন্দ্র রাজার উল্লেখ। কবিচন্দ্রের পালায় 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ'-এর (পূর্ব খণ্ড) প্রভাব। পালাটি কবিচন্দ্রের 'রামায়ণ'-এ অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে যুক্তি। ধর্মমঙ্গলে হরিশ্চন্দ্র রাজাব প্রসঙ্গ বিষয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্য। কবিচন্দ্রের পালা ধর্মমঙ্গলের প্রভাবহীন।

'গয়াশ্রাদ্ধ' পালা — মূল 'বামায়ণ'-এ গয়াশ্রাদ্ধের উল্লেখ। বিভিন্ন পুরাণ ও 'চৈতন্য ভাগবত'-এ গয়া-মাহাত্ম্য বর্ণনা। কবিচন্দ্রের পালায় 'শিব পুরাণ'-এর প্রভাব এবং বাঙালী সংস্কার।

(গ) 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর প্রভাব ঃ- 'রঘুনাথের বনবাস' পালার প্রথমাংশে 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর (৯ম/১০অঃ) মূলানুসরণ। 'শ্রীমদ্ভাগবত' ও 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এর প্রভাবে পালাগুলি সংক্ষিপ্ত।

(ঘ) 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' এর প্রভাব ঃ- 'রঘুনাথের বনবাস' পালার আলোচনা — কৈকেয়ীকে দশরথের বরদান, মন্থরাকে কৈকেয়ীর পুরস্কাব, কৈকেয়ীকে দশরথের সান্ত্বনা দান, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীব বনগমনের প্রস্তুতি, লক্ষ্মণ কর্তৃক অস্ত্র সংগ্রহ, বাল্মীকি মুনির রাম-নাম মাহাত্ম্যকথা, অন্ধক মুনির পুত্রবধ কথা, দশরথের মৃত্যু, রামচন্দ্রের পিতৃপিণ্ড দান, প্রভৃতি বিষয়ে উভয় কাব্যের মিল।

দশরথ কর্তৃক বামচন্দ্রকে বলপূর্বক রাজ্যভাব গ্রহণের পরামর্শ, কৈকেয়ীর ব্যবহারে মাত্রাতিরিক্ত ঈর্ষা, বশিষ্ঠ মুনিব স্নেহোক্তি, লক্ষ্মণের দৃঢ়তা, রামচন্দ্র কর্তৃক সীতাদেবীর আভরণ ব্রাহ্মণকে প্রদানেব পরামর্শ, শুক কর্তৃক বর্ণিত এবং পরীক্ষিৎ কর্তৃক শ্রুত প্রসঙ্গের উল্লেখ প্রভৃতি বিষয়ে 'অধ্যাত্ম বামায়ণ'-এর সঙ্গে অমিল।

'ভরতের পিতৃশ্রাদ্ধ' পালা ঃ- কৈকেয়ী কর্তৃক রামচন্দ্রের বন্দনায় উভয় কাব্যের মিল।

'সীতা হরণ' পালা ঃ- 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এর প্রভাব মুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন রচনা।

'রামসুগ্রীব মিলন' পালা ঃ- বহিরাঙ্গিক আলোচনা ও পালাটির নামকরণের প্রয়োজনীয়তা। 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এব সঙ্গে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য।

'সীতার উদ্দেশ' পালা ঃ- 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এর প্রভাব কম — সম্পূর্ণ লৌকিক পালা।

'অঙ্গদ রায়বার' ও 'রাবণ কুম্ভকর্ণ সংবাদ' পালা ঃ- 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এর সঙ্গে যোগসূত্র এবং বাল্মীকি 'রামায়ণ'-এর প্রভাব আলোচনা।

'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' পালা ঃ- 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এর প্রভাবে হনূমান কর্তৃক গন্ধকালী অপ্সরার শাপমোচন এবং কালনেমি বধ কাহিনী। গন্ধমাদন পর্বত সহ হনূমানের লঙ্কা গমনকালে ভরত কর্তৃক বাটুল নিক্ষেপ এবং হনূমান কর্তৃক সূর্যকে কক্ষতলে স্থাপন 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' বহির্ভূত বিষয়।

'সীতার অগ্নিপরীক্ষা' পালা ঃ- 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এর প্রভাবশূন্য মূল 'রামায়ণ'-এর অনুসারী।

'রঘুনাথের দেশাগমন' পালা ঃ- 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এর প্রভাব কম, 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এব প্রভাবে বিষয় সংক্ষিপ্ত।

(ঙ) 'মহানাটক'-এর প্রভাব ঃ-

'সীতার উদ্দেশ' পালায লোকশ্রুতির প্রভাব, সীতা কর্তৃক হনূমানকে আম্রফল প্রদান ও আম্রবন উৎপাটন প্রসঙ্গে 'মহানাটক'-এর সঙ্গে মিল।

'অঙ্গদ রায়বার' পালায বাল্মীকির 'বামায়ণ' ও 'মহানাটক'-এর আদর্শেব অনুসবণ, সংলাপে 'মহানাটক'-এব (সপ্তম অঙ্ক) অনুসৃতি। বায়বার প্রসঙ্গ, 'অঙ্গদ রায়বার' সম্পর্কে সমালোচকদের অভিমত। পালাটির গুণগত দিক।

(চ) লোকশ্রুতি ঃ-

'শিবরামের যুদ্ধ' পালায় লোকশ্রুতির প্রভাব।

।। 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ'-এব কাব্যগুণ ।।

বাল্মীকির 'রামায়ণ' ও আঞ্চলিক রামায়ণ, —

বিষ্ণুপুরী রামায়ণের অবতারণা, পালা বিন্যাস ও কাহিনী সংযোজনের বৈশিষ্ট্য। চরিত্রচিত্রণ — দশরথ, রামচন্দ্র, ভরত, লক্ষ্মণ, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা এবং সীতা।

রসবিচার ঃ

করুণরস, বীররস, হাস্যরস ও ভক্তিরসের দৃষ্টান্ত।

সমাজ-চিত্র ঃ

বাল্মীকির রামায়ণ ও বাংলা রামায়ণ —

কবিচন্দ্রের রামায়ণে বাংলাদেশের সমাজ — চিত্রধর্মী রচনা, —'হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান' এবং 'সূর্যবংশ কথা' পালায় দরিদ্রতার জীবন্ত চিত্র। বসন ও ভূষণের নাম, দুই একটি পরিচিত মিষ্টান্নের উল্লেখ, বঙ্গদেশে প্রচলিত নিয়ম, সামাজিক সংস্কারবোধ। রাজনীতি ও বাঙালীয়ানার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ঃ—

(ক) কুম্ভকর্ণের রাজনীতি, (খ) বাঙালীর বাক্‌ভঙ্গী ও প্রবাদ প্রবচন, (গ) সম্বোধনের রীতি, (ঘ) শিষ্টতার রীতি, (ঙ) বাঙালীর সংস্কার, (চ) অমঙ্গল ও অশুভ ধারণা, (ছ) ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধাভাব, (জ) প্রবাসীর গৃহগত প্রাণ, (ঝ) প্রণাম ও কোলদানের রীতি, (ঞ) বাঙালীঘরের শাশুড়ী-পুত্রবধূর সম্পর্ক, (ট) হনূমানের আচরণ ও স্বর্ণলঙ্কা সম্পর্কে বাঙালী কবির ধারণা, (ঠ) মাছরাঙ্গার কাহিনী, কিষাণের কাহিনী এবং হনূমান-অঞ্জনার প্রসঙ্গ — লোকশিক্ষার অঙ্গস্বরূপ, (ড) শিবের কানন — বাংলারই ফুল, ফল, বৃক্ষ ও পক্ষী সম্বলিত উপবন, (ঢ) লোকজীবনে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র। কবির সমসাময়িককালের ধর্মচেতনা — রামচন্দ্রের ব্যবহারে মানবিক রসের উপাদান। কাব্যটির জনপ্রিয়তা — কবির সহজ সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ।

।। বিষ্ণুপুরী রামায়ণের ভাষা-ব্যবহার, ছন্দ ও অলঙ্কার ।।

বিষ্ণুপুরী রামায়ণে অন্ত্যমধ্য বাংলাভাষার বৈশিষ্ট্য। আদিমধ্য বাংলার দুই একটি নিদর্শন। অন্ত্যমধ্য বাংলার উদাহরণ — ধ্বনি বিচার ঃ- স্বরাগম, অপিনিহিতি, স্বরলোপ, অভিশ্রুতি, স্বরসঙ্গতি, স্বরভক্তি, সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব, সমাক্ষর লোপ, নাসিক্যীভবন, সমীভবন, ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন।

পদ বিচার ঃ- নামধাতু, অস্ত্যর্থ ও নাস্ত্যর্থ ক্রিয়া, অসমাপিকা ক্রিয়া, ক্রিয়ার কাল — অনুজ্ঞাভাবে বর্তমান কাল। প্রত্যয়, সন্ধি, সমাস এবং শব্দ ভাণ্ডারের উদাহরণ।

ছন্দ ঃ-

কবিচন্দ্রের রামায়ণে পয়ার ও ত্রিপদীর ব্যবহার। গেয়কাব্যের ফল — পয়ার ও ত্রিপদীর

অসমান মাত্রার নিদর্শন । তের মাত্রার পয়ার, ষোল মাত্রার পয়ার এবং 'অঙ্গদ রায়বার' পালার শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দের দৃষ্টান্ত ।

অলঙ্কার ঃ-

কবিচন্দ্রের অলঙ্কার ব্যবহারে নিপুণতা —

উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, ব্যাজস্তুতি, ব্যতিরেক এবং অনুপ্রাস ইত্যাদি ।

অপ্রচলিত শব্দ ও তাহার অর্থ ।

নবম অধ্যায় ৩০৪–৩৩৫

।। মল্লভূমের সাহিত্য-ধর্ম-সংস্কৃতিতে কবিচন্দ্রের স্থান এবং পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যে কবিচন্দ্রের প্রভাব ।।

মল্লভূমের সাহিত্য — শ্রীনিবাসাচার্যের প্রভাবে মল্লভূমে ধর্মীয় প্লাবন, বৈষ্ণব সাহিত্যচর্চা, মল্লরাজাদের ভণিতায় প্রাপ্ত পদ ও বন্দনা, শ্রীলহেমলতাদেবীর 'মানবী বিলাস', নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস' কাব্য, যদুনন্দন দাসের 'কর্ণানন্দ' ও 'ভ্রমর গীতা', ঘনশ্যাম দাসের রচিত 'গোবিন্দরতি মঞ্জরী', পরাণ দাসের 'রসমাধুরী', উত্তম দাসের 'শ্রীকৃষ্ণ-প্রকাশরত্ন' এবং মননশীল রচয়িতাদের মধ্যে মনোহর দাস, শুভঙ্কর রায় ও কাশীরাম বাচস্পতির নাম উল্লেখযোগ্য । চারিজন মনোহর দাসের অস্তিত্ব । বহু ক্ষুদ্র কাব্য ও নিবন্ধ রচয়িতার উল্লেখ ।

মল্লরাজ বীরসিংহের কালে অনুবাদ সাহিত্যের সমৃদ্ধি — কবিচন্দ্রের রচনা পালা-গানধর্মী । আখ্যানধর্মী পালা রচনায় কবিচন্দ্রের সাফল্য । মল্লভূমে কাব্য রচনার প্রধান বিষয় – (ক)রাম-কথা, (খ) ভারত-পাঁচালী, (গ) কৃষ্ণলীলা, (ঘ) মদনমোহন বন্দনা, (ঙ) সত্যপীর বন্দনা, (চ) ধর্মমঙ্গল, (ছ) মনসা মঙ্গল এবং কৌতুক রচনা । মনসা মঙ্গল ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে কবিচন্দ্রের প্রতিভার স্বাক্ষর ।

সাহিত্য আঞ্চলিক সীমারেখা ও রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার ঊর্ধ্বে — নদনদীর তটপ্রান্তে বাণী বিনিময়ের মুক্তাকাশ ।

মল্লভূমে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের স্রোত —

রামায়েত সম্প্রদায়ের প্রভাব, মল্লরাজাদের পরধর্মমত-সহিষ্ণুতা, — রামভক্তির প্রভাব রামন্দির প্রতিষ্ঠায়, ব্যক্তি নামে, পল্লী নামে ও তাসখেলায় । মল্লভূমের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ধর্মনিরপেক্ষতার দৃষ্টান্ত ।

ধর্মমত সমন্বয়ের নিখুঁত আলেখ্য টেরাকোটা মন্দিরের চিত্রে, কবিচন্দ্রের 'শিবরামের যুদ্ধ' ও 'অর্জুনের দর্পচূর্ণ' পালা দুইটি ধর্মমত সমন্বয়ের প্রভাবের ফল ।

মল্লভূমের লোক সংস্কৃতি- —পাঁচালী ও কথকতায় কবিচন্দ্রের রামায়ণ - গানের প্রচার সম্পর্কে অনুমান । কবিচন্দ্রের রামায়ণে গানের বিভিন্ন লক্ষণ আলোচনা এবং দুই একটি প্রমাণ উল্লেখ । পরবর্তীকালের যাত্রায় ও কথকতায় কবিচন্দ্রের রামায়ণের প্রভাব সম্পর্কে অনুমান । পটুয়া গানে কবিচন্দ্রের শিবমঙ্গলের প্রভাব, ছৌনৃত্যে কবিচন্দ্রের পালার অনুসরণ । পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যে কবিচন্দ্রের রচনার পরোক্ষ প্রভাব । শিশুবোধকে, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'দাতাকর্ণ' নাটকে ও কৃত্তিবাসের 'অঙ্গদ রায়বার' পালার পুথিতে কবিচন্দ্রের পালার অনুসরণ ।

দশম অধ্যায় ৩৩৬-৩৫৭

।। বাংলা রামায়ণকার তিন কবিচন্দ্র ।।

বাংলা রামায়ণকার তিন কবিচন্দ্র — পানুয়ার কবিচন্দ্র শঙ্কর, দক্ষিণবাড়ের (বাঁকুড়া) দ্বিজ লক্ষ্মণ এবং সাগরদিয়ার ভবানীশঙ্কর । দ্বিজ লক্ষ্মণের পরিচয় ও ভবানীশঙ্করের পরিচয় । মল্লভূম কথার উল্লেখ কেবল কবিচন্দ্র শঙ্করের কাব্যে ।

তিন কবির জনপ্রিয়তার কারণ ঃ

কবিচন্দ্র — কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পালার স্রষ্টা, 'শিবরামের যুদ্ধ' পালা সম্পর্কে অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসুর মত, 'অঙ্গদ রায়বার' পালা কবিচন্দ্রের অবিস্মরণীয় কীর্তি ।

দ্বিজ লক্ষ্মণ ঃ- কবিচন্দ্রের সঙ্গে দ্বিজ লক্ষ্মণের পুথির জটিলতা, 'মহীরাবণ বধ' পালা রচনায় দ্বিজ লক্ষ্মণের খ্যাতি ।

ভবানীশঙ্কর ঃ-

ভবানীশঙ্কর রচিত 'তরণীসেনের যুদ্ধ' পালার খ্যাতি কবিচন্দ্রে আরোপ । ভবানীশঙ্করের বৈষ্ণবীয় ভক্তির প্রকাশ 'অরণ্যকাণ্ডে' ও 'তরণীসেনের যুদ্ধ' পালায় । দ্বিজ লক্ষ্মণ ও ভবানীশঙ্কর এই কবিদ্বয়ের কবিখ্যাতি কবিচন্দ্রে আরোপ ।

কাব্য রচনার উদ্দেশ্য — বীর, শান্ত ও হাস্যরসের ধারায় স্নাত তিন কবির পালায় নীতি ও ভক্তির সহজ নম্র আদর্শ ।

তিন কবির প্রাপ্ত পালার বিচার - - তুলনামূলক সূচী । কাব্য বিচার — অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রভাব, কাহিনী বিশ্লেষণ - প্রাপ্ত পালার তুলনামূলক আলোচনা । বৈষ্ণবীয় ভক্তির প্রকাশ ভবানীশঙ্করের কাব্যে অধিক । দ্বিজ লক্ষ্মণ ও ভবানীশঙ্করের কাব্যে নর্তক ছন্দ বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার । ভাষায় তিন কবির রচনায় মিল ।

একাদশ অধ্যায় ৩৫৮ ৩৮৭

।। কৃত্তিবাস ও কবিচন্দ্র এবং প্রকাশিত 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' ও মৎ-সম্পাদিত 'রামায়ণ'-এর আলোচনা ।।

এক। কৃত্তিবাস ও কবিচন্দ্র ঃ

কৃত্তিবাস ও কবিচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা --- কৃত্তিবাস বঙ্গের কবি, কবিচন্দ্র মল্লভূমের। উভয়ের কাহিনী রচনার আদর্শ। বাল্মীকির প্রভাব ঃ— কৃত্তিবাসের তুলনায় কবিচন্দ্রে কম। বাঙালীয়ানার প্রভাব।

দুই কবির কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা —

(ক) কৃত্তিবাসের 'যযাতি রাজার' পালা ও 'শিবরামের যুদ্ধ' পালা এই দুইটি অপ্রকাশিত বিষয়ের সঙ্গে কবিচন্দ্রের পালার আলোচনা।

(খ) কৃত্তিবাসের মুদ্রিত রামায়ণের সঙ্গে কবিচন্দ্রের রামায়ণের আলোচনা — কাহিনীগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য। রচনাগত বৈশিষ্ট্য। রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতাররূপে চিত্রিত। উভয় কাব্যের শিব প্রসঙ্গ।

'অঙ্গদ রায়বার' পালা ঃ— কৃত্তিবাসের কাব্যে কবিচন্দ্রের রচনার প্রক্ষেপ সম্পর্কে বাংলা ইতিহাসকারদের অভিমত। কৃত্তিবাসের মুদ্রিত তিনটি গ্রন্থের সঙ্গে কবিচন্দ্রের পালাটির আলোচনা ! কবিচন্দ্র ও কৃত্তিবাসের ছত্র উল্লেখপূর্বক তুলনামূলক সূচী। কৃত্তিবাসের তিনটি মুদ্রিত সংস্করণের মধ্যে বটতলায় প্রকাশিত সংস্করণে কবিচন্দ্রের রচনার প্রভাব অধিক।

দুই। ।। প্রকাশিত 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' ও মৎ-সম্পাদিত 'রামায়ণ'-এর আলোচনা ।।

মুদ্রিত বিষ্ণুপুরী রামায়ণের সঙ্গে আমাদের সম্পাদিত রামায়ণের আলোচনা --- বহিরাঙ্গিক প্রভেদ ঃ—

(ক) আমাদের সম্পাদিত রামায়ণের গুরুত্ব —প্রাচীনত্বে ও কাব্যগুণে।

(খ) মুদ্রিত গ্রন্থে প্রক্ষেপ —'শিবরামের যুদ্ধ' অংশ দ্বিজ লক্ষ্মণের রচনা।

দ্বিজ লক্ষ্মণের পুঁথির উদ্ধৃতি সহযোগে প্রক্ষেপ নির্ণয়।

(গ) 'পালা' শব্দটি সম্পর্কে অভিমত। কবিচন্দ্রের প্রাপ্ত সমস্ত পুথি পালাকারে অনুলিখিত।

(ঘ) মুদ্রিত গ্রন্থে শঙ্কর নামের উল্লেখ।

রচনাগত প্রভেদ ঃ

মুদ্রিত গ্রন্থের সঙ্গে আমাদের সম্পাদিত রামায়ণের মিল ও প্রভেদ নির্ণয়---

(ক) আমাদের সম্পাদনায় তিনটি অতিরিক্ত পালা

(খ) মুদ্রিত গ্রন্থে অতিরিক্ত কিছু অংশ

সঙ্কেত সূচী

অঃ	—	অধ্যায়
আ	—	আরবী
আঃ	—	আনুমানিক
আ.পা.	—	আদর্শ পাঠ
খ্রীঃ	—	খ্রীষ্টাব্দ
তু	—	তুলনীয়
দ্র	—	দ্রষ্টব্য
দৈ	—	দৈর্ঘ্য
নং	—	নম্বর
পাঠ	—	মূল পাঠ
পু.পৃ.	—	পুথি পৃষ্ঠা
পৃ.	—	পৃষ্ঠা
প্র	—	প্রস্থ
পং	—	পংক্তি
ফা	—	ফারসী
ব্রজ	—	ব্রজবুলি
স	—	সম্পূর্ণ
সং	—	সংস্করণ
সংস্ক	—	সংস্কৃত
সং. পা.	—	সংক্ষিপ্ত পাঠ
সেঃমিঃ	—	সেন্টিমিটার

পালার সংক্ষিপ্ত নাম

অ. রা	—	অঙ্গদ রায়বার
গ. শ্রা	—	গয়াশ্রাদ্ধ
ভ. পি.	—	ভরতের পিতৃশ্রাদ্ধ
র. দে	—	রঘুনাথের দেশাগমন

ব. ব	—	রঘুনাথের বনবাস
রা. ব	--	বাবণ বধ
বা. কু	---	রাবণ কুম্ভকর্ণ সংবাদ
রা. সু.	-—	বাম সুগ্রীব মিলন
ল. শ.	--	লক্ষ্মণেব শক্তিশেল
শি. যু.	--	শিবরামের যুদ্ধ
সী. উ.	–	সীতার উদ্দেশ
সী. প.		সীতার পবীক্ষা
সী.স.	----	সীতা সরমাব কথা
সী. হ.	----	সীতা হবণ
সূ. ক.	--	সূর্যবংশ কথা
হ. উ.	---	হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান

প্রথম অধ্যায়

।। বঙ্গে রামায়ণ চর্চা এবং কবিচন্দ্রের 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' ।।

তমসার তীরে ক্রৌঞ্চ মিথুনের একটিকে নিষাদের শরে বিদ্ধ দেখিয়া শোকাপ্লুত মহর্ষিব উচ্চারিত বাক্যই *'রামায়ণ'-এর মূল উৎস। কোন স্মরণাতীত কালে আদিকাব্য 'রামায়ণ' ও আদিকবি বাল্মীকির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল কে জানে ? তবে পণ্ডিতদের অনুমান বহু শতাব্দী মুখে মুখে প্রচলিত হইয়া এই কাহিনী কাব্যরূপ লাভ করে, আর তাহা বর্তমান রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে যুগ যুগ ধরিয়া পরিবর্তন ও সংযোজনাদির প্রলেপে। ভিন্টাবনিৎস্ প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর দিকে রামায়ণ কাহিনীকে বাল্মীকি বর্তমান রূপ দান করেন।[১] বাংলাদেশ নানা ক্ষেত্রেই স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়াছে। "কাব্যেঽপি কোমলধিয়ো বয়মেব নান্যে"--- বাঙালী পণ্ডিতের এই আত্মপ্রত্যয়সূচক উক্তি বাগাড়ম্বর মাত্র নহে। গৌড়ী রীতি বাণভট্টের (খ্রীঃ ষষ্ঠ শতক) পূর্বেই বিদ্বৎ-সমাজে স্বীকৃত হইযাছিল। 'রামায়ণ'-এর তিনটি সংস্করণের মধ্যে 'গৌড়ীয় রামায়ণ'- খানিই সমধিক প্রচলিত ছিল[২]।

রামায়ণচর্চায় বাঙালী গতানুগতিক পাঠপ্রণালীতে তৃপ্ত না থাকিয়া নিজস্ব একটি পাঠপ্রণালী উদ্ভাবিত করিয়াছিল। তাহাই 'গৌড়ীয় রামায়ণ' নামে সুপরিচিত। গুপ্তযুগের সাহিত্যিক চরমোৎকর্ষের ফলেই সংস্কৃতে রচিত এই প্রণালীর উদ্ভব ঘটে। অতঃপর কালে কালে ভাষান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে ইহার সাহিত্যিক অভিব্যক্তি ঘটিতে থাকে নানাভাবে। খ্রীষ্টীয় নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণচর্চাব ব্যাপক প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। সেই প্রত্যুষ লগ্নে বঙ্গের যে দুই কবির রচনা খ্যাতি লাভে সমর্থ হয় তন্মধ্যে পাল যুগের সুপ্রসিদ্ধ নৃপতি দেবপালেব (খ্রীঃ নবম শতক) সময়ে রচিত গৌড় অভিনন্দর "রামচরিত" এবং রাম পালের (খ্রীঃ একাদশ-দ্বাদশ) রাজত্বকালে রচিত সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত" সমধিক উল্লেখযোগ্য। বাঙালী কবির বৈশিষ্ট্য অভিনন্দের কাব্যেই প্রথম ধরা পড়ে। এই কাব্যেই প্রথম হনূমানের মুখে দেবীমাহাত্ম্যের বর্ণনা এবং রাবণবধের পূর্বে বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্রকে দেবী পূজায় নিযুক্ত দেখা যায়। 'রামচরিত' গ্রন্থের টীকায় যুবরাজ দেব পালের উল্লেখ আছে[৩]। গ্রন্থটি ৪০ সর্গে রচিত। প্রথম ৩৬টি সর্গ অভিনন্দের রচনা, অবশিষ্ট ৪টি সর্গে ভীম নামে এক ব্যক্তির ভণিতা পাওয়া যায়। প্রথম সর্গ "রাম লক্ষ্মণ সংবাদ" হইতে শেষ সর্গ "সীতা চরিত্রের শুদ্ধি ও দেবতাদের সমাবেশ" পর্যন্ত অর্থাৎ মূল 'রামায়ণ'-এব কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের মধ্যভাগ হইতে যুদ্ধ কাণ্ড

---

*মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ।।

পর্যন্ত আখ্যানভাগ অবলম্বনপূর্বক কবি রামচন্দ্রের চরিত্রকে মহত্ত্বর রূপে অঙ্কিত করিয়া স্বীয় শিল্পচাতুর্যের প্রকাশ ঘটাইয়াছেন। কাব্যটি বৈদর্ভী রীতিতে রচিত এবং রচনা প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট ও সাবলীল।

সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' খানি দ্ব্যর্থবোধক। কবি আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন —

'অবদানং রঘুপরিবৃঢ় গৌড়াধিপ রাম দেবয়োরেতৎ।
কলিযুগ রামায়ণমিদং কবিরপি কলিকাল বাল্মীকিঃ' ।। ১১ ।।

অনুঃ রঘুপতি রামদেব (রামচন্দ্র) ও গৌড়াধিপ রামদেব (রাম পালদেব) — এই দুই রাজার এই অবদান বা প্রশস্ত কর্ম্মের ইতিহাস কলিযুগের রামায়ণরূপে পরিগণনীয়; এবং এই কবিও (সন্ধ্যাকর নন্দী) কলিকালের বাল্মীকি স্বরূপ ছিলেন"।

এই গ্রন্থটি আর্যাছন্দে রচিত এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। কাব্যটির প্রতিটি শ্লোকেই দুইটি অর্থ নিহিত আছে। কবি অযোধ্যার রঘুপতি রাম ও বঙ্গেশ্বর রামপালের কাহিনী যুগপৎ দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। অলঙ্কার-চাতুর্যের বাহুল্য থাকিলেও কাব্যটি ঐতিহাসিক। কেননা নৃপতি রামপালের কাহিনী ইহাতে বর্তমান। কবি নিজেকে 'কলিকাল বাল্মীকি' বলিয়া যে দম্ভোক্তি করিয়াছেন তাহা নিতান্তই অসার। যেহেতু বাল্মীকি কাব্যের সঙ্গে 'রামচরিত' কাব্যের কোনো ভাবেই তুলনা করা যায় না। ইহাতে ভীম নামে এক কৈবর্ত রাজার উল্লেখ আছে।[৮]

পাল যুগের অপর এক কবি মৌদ্গল্য গোত্রীয় বর্ধমানাংক পুত্র 'অনর্ঘরাঘব' রচয়িতা মুরারি মিশ্রকেও (খ্রীঃ ৯ম-১০ম শতক) অনেকে বাঙালী বলিয়া মনে করেন। টীকাকার প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ তাহাই বলেন। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে উৎসবাভিনয়ের জন্য "অনর্ঘ রাঘব" কাব্য-নাটকটি রচিত হইয়া থাকিবে। 'রামায়ণ'-এর বালকাণ্ড হইতে যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত ঘটনাবলী এই নাটকের উপজীব্য। সপ্তমাঙ্কে রামচন্দ্রের অভিষেক পর্যন্ত রচিত এই নাটকটিতে রামায়ণ কাহিনীর সঙ্গে কিছু বিভিন্নতাও লক্ষিত হয়।[৯]

'প্রসন্ন রাঘব' নাটকের রচয়িতা জয়দেব খ্রীঃ দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীর কবি। ইনি গীতগোবিন্দের প্রখ্যাতনামা কবি জয়দেব কিংবা মিথিলার বিখ্যাত নৈয়ায়িক জয়দেব পক্ষধর নহেন। ইনি 'পীযূষবর্ষ' উপাধি লাভ করেন। তাঁহার নাটকটি সপ্তমাঙ্কে গ্রথিত। ইহাতে বাল্মীকির প্রভাব থাকা সত্ত্বেও কিছু নূতনত্ব আছে।[১০]

"আর্যা সপ্তশতী" মনন-প্রধান প্রকীর্ণ কবিতার সমষ্টি হইলেও ইহাতে রামায়ণের কিছু কিছু উপাদান রহিয়াছে। ইহার প্রণেতা গোবর্ধন আচার্য নৃপতি লক্ষ্মণ সেনের (আঃ রাজত্ব লাভের কাল ১১৭৯ খ্রীঃ মধ্যে)[১১] সভাকবি এবং পঞ্চরত্নের একরত্ন। কবি ইহাতে শ্রদ্ধার সঙ্গে 'শ্রীরামায়ণ' (আরম্ভ ৩৪) এবং 'বল্মীকভব' কবির (আরম্ভ ৩০) বন্দনা

করিয়াছেন। একটি শ্লোকে ভগীরথের পশ্চাতে গমনশীলা গঙ্গার (অনুধাবিত বিমুখং গঙ্গেব ভগীরথম্ ৩৪) এবং অপর একটি শ্লোকে ইন্দ্র অহল্যার (৫৩৬) প্রসঙ্গ আছে। গঙ্গা-ঐরাবত প্রসঙ্গ (৬৭২), বিন্ধ্যাচল কর্তৃক সূর্যের গতিরোধ (৫৫৬) এবং দুইটি শ্লোকে প্রৌঢ়োক্তিরূপে রাম সেনা কর্তৃক সমুদ্রে শিলা ভাসানের প্রসঙ্গ (১৯৫, ৬৩১) উল্লিখিত হইয়াছে।[১০] এই সমুদয় বিষয়ই 'রামায়ণ' হইতে আহৃত।

'আর্যাসপ্তশতী'র শ্লোকসমূহ আচার্যের নিজস্ব রচনা। অধ্যাপক জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী আর্যায় নিহিত এই প্রসঙ্গগুলির যেরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা অতিশয় মনোজ্ঞ। তিনি লিখিয়াছেন —

"আর্যা সপ্তশতী"র রামায়ণীয় প্রসঙ্গগুলিতে বাঙালীর রামায়ণ-চর্চার বৈশিষ্ট্যগুলি সুপরিস্ফুট। রামায়ণ-চর্চায় বাংলাদেশ কোথাও সর্বাংশে বাল্মীকি রামায়ণের অন্ধ অনুকরণ করে নাই। ইহার বহু উপাদান 'অধ্যাত্ম রামায়ণ', পুরাণ বা লোকশ্রুতি হইতে সমাহৃত। আর্যায় উল্লিখিত রামায়ণ প্রসঙ্গও সর্বথা বাল্মীকি রামায়ণের অনুকৃতি নহে। আর্যায় বাল্মীকিকে বলা হইয়াছে 'বাল্মীকভূ' (আরম্ভ ৩০) — এই কাহিনী বাল্মীকি-রামায়ণে নাই। ইহা 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এর প্রসঙ্গ। ঋষিগণের নির্দেশে দস্যু রত্নাকর রাম নাম জপ করিতে থাকিলে, তাহার উপর বল্মীক স্তূপ জন্মে; এই বল্মীক হইতে দ্বিতীয়বার নির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া ঋষিগণ তাঁহার নাম রাখেন বাল্মীকি। দ্বিতীয়তঃ গঙ্গা ঐরাবতকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন, এ প্রসঙ্গও বাল্মীকি রামায়ণে নাই; অধ্যাত্ম রামায়ণেও নাই। অথচ ইহা অতি সুপরিচিত কাহিনী। খুব সম্ভব কোন পুরাণ বা লোককাহিনী হইতে ইহা সংগৃহীত। আর্যার প্রসঙ্গ বাঙালীর সংস্কার বিশ্বাসকেই অনুসরণ করিয়াছে"।[১১]

"সদুক্তি কর্ণামৃত" গ্রন্থখানি সঙ্কলিত হয় ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে (১১২৭ শকাব্দে)। নৃপতি লক্ষ্মণ সেনের মহাসামন্ত শ্রী বটুদাসের পুত্র শ্রীধর দাস গ্রন্থখানি সঙ্কলন করেন। সঙ্কলনটি প্রধানতঃ বাঙালীর রচিত বলিয়া গৃহীত। ইহাতে মোট পাঁচটি প্রবাহ। তন্মধ্যে দেবপ্রবাহে "শ্রীরাম" ও "বিরহী শ্রীরাম" নামে দুইটি কবিতা পাওয়া যায়[১২]।

খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের বাংলাদেশ নাট্য রচনায় যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করে। কারণ ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে সাগরনন্দী রচিত "নাটক লক্ষণ রত্নকোষ" গ্রন্থে বহু বাঙালী নাট্যকারের নাট্য রচনার উল্লেখ আছে। তাহার মধ্যে "জানকীরাঘব", 'রামানন্দ', 'কৈকেয়ী-ভরত', 'অযোধ্যা ভরত', 'বালিবধ', 'রাম বিক্রম', 'মারীচ-বঞ্চিতক' ইত্যাদি গ্রন্থ যে রামায়ণ অবলম্বনে রচিত তাহা স্পষ্টতঃ বোঝা যায়।[১৩]

প্রাচীনকালে নারীদের মধ্যেও রামায়ণ কাহিনী সুপরিচিত ছিল। এই প্রসঙ্গে মদন পালের মহিষী চিত্রমতিকার নাম উল্লেখযোগ্য।[১৪] প্রাচীন বাংলার অন্যতম বিস্ময় পাহাড়পুরের মন্দির। খ্রীঃ অষ্টম শতকে নির্মিত পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রে সমসাময়িক

লোকায়ত জীবনযাত্রার সঙ্গে 'রামায়ণ'-এর নানা চিত্রাবলী যথা, 'বানব সেনা কর্তৃক সেতু নির্মাণ, 'বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ইহাব ফলস্বরূপ গুপ্ত ও গুপ্তোত্তব যুগেব লোকায়ত বাঙালী জীবনে কৃষ্ণায়ণ ও রামায়ণেব কাহিনী যথেষ্ট সমাদর লাভ কবায় এই দুই সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়াই বৈষ্ণবধর্মেব পরিসীমা বিস্তৃততব হওযাব সুযোগ লাভ কবে।[১৫]

গুপ্তযুগে বাংলায় পৌরাণিক ধর্মের যথেষ্ট প্রসাব ঘটায় এই স্থানে যে সমুদয তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে অনেক পৌবাণিক দেবদেবী ও তাহাদের সম্বন্ধে বহু আখ্যান পাওয়া যায়। পবশুরাম কর্তৃক ক্ষত্রিয়কুল সংহার ; বামচন্দ্রের বীরত্ব ; সগর ; যযাতি ও অম্বরীষ প্রভৃতির কাহিনী — তাম্রশাসনে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে [১৬]। ইহারা সকলেই রামায়ণোক্ত পুরুষ।

বাংলাদেশে রাম কাহিনী প্রচারে পুরাণেব দান অনস্বীকার্য। প্রায় সমস্ত পুরাণেই বাম কাহিনীর কিছু না কিছু প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ 'পদ্মপুরাণ'-এর পাতালখণ্ডে রাম কাহিনীরই প্রাধান্য। তথাপি যেহেতু এই সকল পুবাণেব উদ্ভব কোথায় তাহা সঠিক নির্ণীত না হওয়ায় পুবাণ ও উপপুরাণ শ্রেণীর যে সকল গ্রন্থ বাংলাদেশের রচনা বলিয়া অনুমান, উহাদের সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হইল। ডঃ হাজরা এই পুরাণগুলিকে খ্রীষ্টীয় এগারশ হইতে চৌদ্দশ শতকের মধ্যবর্তীকালে রচিত অথবা সঙ্কলিত বলিয়া মনে করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ কবেন তাহাদেব মধ্যে 'দেবীপুরাণ' (আঃ খ্রীঃ ৭ম শতক) অন্যতম। ইহাতে রামায়ণের কাহিনী না থাকিলেও দেবী পূজার প্রসঙ্গ আছে। এই দেবী প্রধানতঃ শিবের শক্তিরূপিণী কালী ও চণ্ডীর মতই পূজিতা[১৭]।

'বৃহদ্ধর্ম পুরাণ'-এর (খ্রীঃ ১৫শ শতকের মধ্যভাগ) অন্তর্গত, রামায়ণের কাহিনীগুলি —'রাবণ বধোপায়', 'সীতা বৃত্তান্ত', 'হনূমদাগমন', 'দেবী বোধনোপায়', 'রাবণবধ', 'বামায়ণোৎপত্তি', 'গঙ্গাবতরণ' এবং 'সগব পুত্রোদ্ধার' ইত্যাদি রচনার মধ্যে তাবৎকালীন বঙ্গ সমাজেব চিত্রটিও সুস্পষ্ট।[১৮]

"বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ" ও 'নন্দিকেশ্বর পুরাণে' বামকাহিনী অপেক্ষা বাংলা রামায়ণোক্ত শরৎকালে দুর্গাপূজার পদ্ধতি বিশদভাবে বর্ণিত হইযাছে।[১৯] ইহাব প্রায় সকল পুঁথি বঙ্গাক্ষরে লিখিত ও বঙ্গদেশে প্রাপ্ত হওয়ায় ইহাদেব উদ্ভব বঙ্গদেশ বলিয়া অনেকে মনে করেন। ইহার রচনাকাল অনির্ণেয়।[২০]

এই শ্রেণীর অপর গ্রন্থ 'মহাভাগবত পুরাণ'-এ (খ্রীষ্টীয ত্রয়োদশ শতকের পূর্বে) বর্ণিত বাম কর্তৃক তাড়কাবধ হইতে রাম রাবণের যুদ্ধ পর্যন্ত কাহিনী সংক্ষিপ্তভাবে গ্রন্থের শেষ ভাগে পাওয়া যায়।[২১] ইহাতে শারদীযা পূজায় দেবীর অকাল বোধনেব যে বৃত্তান্ত

পাওয়া যায় তাহা বাংলাদেশে প্রচলিত দুর্গাপূজা পদ্ধতির অনুরূপ।[২২]

'দেবী ভাগবত' বাংলাদেশে বচিত 'মহাভাগবত' ও 'বৃহদ্ধর্ম পুরাণ' -এব ন্যায রাবণ বধার্থে বামকর্তৃক দুর্গার অকালবোধনের বর্ণনা (৩/২৭-৩০ অধ্যায় ; ৯/১/১৪৬) আছে[২৩]। ইহার রচনাকাল আঃ খ্রীষ্টীয় দশম শতক।[২৪]

'পদ্মপুরাণ'-এর দুইটি সংস্করণের মধ্যে একটি বঙ্গদেশীয়[২৫] অপরটি দক্ষিণ ভাবতীয। ইহাব পাঁচটি খণ্ডের মধ্যে পাতাল খণ্ডেই (৩৭-৭১ তম অঃ) রামকাহিনী বিচিত্ররূপে সুবিন্যস্ত। ব্রাহ্মণ রাবণের হত্যাজনিত পাপক্ষালনের নিমিত্ত বামকর্তৃক অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন, শত্রুঘ্ন প্রমুখ যোদ্ধৃগণের সমভিব্যাহারে অশ্বের বিভিন্ন স্থান পবিক্রমা এবং অবশেষে বাল্মীকি আশ্রমে আগমন ইত্যাদি কাহিনী আংশিকভাবে রামায়ণানুগ এবং মধ্যে মধ্যে 'রঘুবংশ'-এর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। পণ্ডিতদের মতে 'পদ্মপুরাণ'-এর সময়কাল মোটামুটিভাবে খ্রীষ্টীয় অষ্টম হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ব্যাপ্ত।[২৬]

বাংলাদেশে পুরাণের পঠন-পাঠন ব্যাপকভাবে প্রচলিত থাকায পুবাণেব দ্বারা প্রভাবিত বাঙালী বাংলা রামায়ণ ও মঙ্গল কাব্যকে নবভাবে সজ্জিত করিয়াছে। উপবোক্ত পুবাণ কয়টি বাঙালীর বচিত বলিযা অনুমিত হইলেও পঠন-পাঠন-কালে বাঙালী সমস্ত পুবাণের কাহিনীকেই গ্রহণ করিয়াছে।

বাঙালীর বচিত যে-সকল সংস্কৃত পুথি, গ্রন্থ, টীকা এবং প্রবন্ধ রামবিষয়ক অথচ যাহাদের সময়কাল ঠিক জানা যায় না নিম্নে তাহাদের নাম বর্ণানুক্রমিক প্রদত্ত হইল ; যথা ঃ-

(১) 'আদিকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড এবং কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড — মনোহবা' লোকনাথ চক্রবর্তী রচিত বাল্মীকি 'রামায়ণ'-এর একখানি ব্যাখ্যা। বাংলা লিপিতে লিখিত এই পুথিসমূহ শ্রীবামপুর কলেজে রক্ষিত।[২৭]

(২) 'কুন্দমালা' কাব্যখানির গদ্যরূপ উপেন্দ্রনাথ সেনের নামে পাওয়া যায়।[২৮] মূল কাব্যখানি দিঙ্‌নাগের রচনা বলিয়া পরিচিত হইলেও আসল বচয়িতাব নাম জানা যায় নাই।

(৩) 'জানকী পবিণয়' নাটকটি সপ্তদশ শতাব্দীর কবি রামচন্দ্র ভদ্র দীক্ষিত কর্তৃক বচিত।[২৯] পুথিব লিপি সংস্কৃত, অনুলিপি সংবৎ ১৯১৪.। সপ্তম অঙ্কেব এই নাটকটির বিষয়বস্তু সীতার বিবাহে উৎসবাদির বর্ণনা।

(৪) 'দশাননবধ' কাব্যখানি যোগীন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণি কলিকাতা হইতে ১৮০১ শতকে প্রকাশ কবেন।[৩০]

(৫) 'পদ্মদূত' কাব্যখানি সিদ্ধিনাথ বিপ্র কর্তৃক ১৯২৫ খ্রীঃ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ইহাব বিষয় সেতুবন্ধনার্থে সমুদ্রতীরাগত বামচন্দ্রের নিকট সীতাদেবী কর্তৃক একটি পদ্মকে দূতরূপে প্রেবণ।

(৬) ‘ভবতচাবত্র’ বিধুশেখর ভট্টাচার্যের একখানি গদ্যরচনা ।[৩১]

(৭) ‘বালরামাযণ’ রাজশেখর কবিরাজ লিখিত একখানি নাটকেব পুথি, রামের জীবন সম্পর্কিত রচনা । ইহার নাট্যমূল্য প্রশংসনীয় ।[৩২]

(৮) ‘রামগুণাকব’ কাব্য বামদেব ন্যাযলঙ্কার রচিত বঙ্গাক্ষরে লিখিত পুথি । ইহার বিষযবস্তু রামের বিবাহ ও বনবাস বর্ণনা ।[৩৩]

(৯)‘বামচন্দ্রভান’ তারাচন্দ্র বচিত একখানি নাট্য সাহিত্য গ্রন্থ ।[৩৪]

(১০) ‘রামচন্দ্র চম্পূ’ বিশ্বনাথ সিংহের লিখিত সংস্কৃত ভাষায় সটীকা পুথি ।[৩৫]

(১১) ‘রামবিলাস’ কাব্য রামচবণ তর্কবাগীশ রচিত (১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে ‘সাহিত্য দর্পণ বৃত্তি’ রচনা করিয়াছিলেন)।

(১২) ‘রামপ্রকাশ’ চিবঞ্জীবের পুত্র রাঘবেন্দ্র রচিত স্মৃতি বিষয়ক রচনা ।[৩৬]

(১৩) ‘রাম লীলামৃতং’ কৃষ্ণমোহন রচিত বঙ্গাক্ষরে লিখিত একখানি কাব্যেব পুথি ।[৩৭] ইহার বিষয়বস্তু রামেব জীবন কাহিনী । পুথিটি চতুর্থ সর্গে বিভক্ত ।

(১৪) ‘রামলীলামৃত ক্রমদীপিকা’ কৃষ্ণমোহন কর্তৃক চতুর্থ সর্গে রামলীলামৃত সটীক ব্যাখ্যা ।[৩৮]

(১৫) ‘রামলীলোদয’ বমাকান্ত রচিত রামচন্দ্রের জন্ম হইতে অভিষেক পর্যন্ত ২০ সর্গে গ্রথিত কাব্যেব পুথি ।[৩৯]

(১৬) ‘রামায়ণতত্ত্ব দীপিকা’ শিবরাম যতী কর্তৃক সংস্কৃতে লিখিত ব্যাখ্যামূলক পুথি ।[৪০]

(১৭) ‘রামায়ণ দীপিকা’ মহেশ্বর তীর্থ রচিত বাল্মীকি ‘রামায়ণ’-এর কেবল যুদ্ধকাণ্ডের সংস্কৃত ভাষায় গদ্যে ব্যাখ্যা ।[৪১]

(১৮) ‘সীতা পবিণয’[৪২] দধিভূষণ কাব্যতীর্থ এবং

(১৯) ‘হরিশ্চন্দ্রচরিত’[৪৩] বিধুশেখর ভট্টাচার্য রচিত কাব্যগ্রন্থ ।

এতক্ষণ বঙ্গে সংস্কৃত ভাষায ‘রামায়ণ’ চর্চাব কিছু নিদর্শন প্রদত্ত হইল । বঙ্গদেশ রামায়ণের প্রভাব হইতে বিচ্ছিন্ন কোনও অঞ্চল নয়, তাহার প্রমাণ রামায়ণেই পাওয়া যায় । আব এই কারণেই বঙ্গে চিবকাল রামায়ণের প্রভাব নিবিড়ভাবে অনুভূত হইয়াছে ।

রামায়ণ ও বঙ্গদেশ ঃ

‘রামায়ণ’-এ দেখা যায় মৎস্য, কাশী, কোশল ও কোমের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ অঙ্গ এবং মগধ রাজবংশগুলিও অযোধ্যা রাজবংশের সঙ্গে পরিণযসূত্রে আবদ্ধ হয় । সূর্যবংশীয় রাজা ভগীরথ কর্তৃক মর্ত্যে গঙ্গা আনয়ন কাহিনী ‘রামায়ণ’ এ পাওয়া যায় । গঙ্গাব যে অংশেব নাম ভাগীবথী, তাহা বাজমহল হইতে বঙ্গের সুদূব দক্ষিণে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত প্রবাহকেই

যথার্থভাবে বোঝায়। এই পুণ্যতোয়া ভাগীরথী নদীর সঙ্গে রাজা ভগীরথের স্মৃতি বিজড়িত, ইহাই 'রামায়ণ', 'মহাভারত' এবং পুরাণের ইঙ্গিত।

বাল্মীকি 'রামায়ণ'-এর অযোধ্যাকাণ্ডে (দশম সর্গ, ৩৭নং শ্লোঃ) অভিমানিনী কৈকেয়ীদেবীকে প্রসন্ন করিবার জন্য নৃপতি দশরথ যে ভাষায় তাঁহার সুবিশাল রাজ্যের পরিসীমা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহা এইরূপ—

"সুসমৃদ্ধ দ্রাবিড়, সিন্ধু, সৌবীর, কোশল, কাশী, সৌরাষ্ট্র, মৎস্য, বঙ্গ, অঙ্গ, মাগধ এবং দক্ষিণরাজ্য প্রভৃতি সমুদয় রাজ্যই আমার অধীন।"[৪৪]

অর্থাৎ পূর্বপ্রান্তের 'অঙ্গ', 'মাগধ' প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে বঙ্গদেশও রাজা দশরথের রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে (৪০শ সর্গ, ২৩ নং শ্লোঃ) আরেকবার পাওয়া যায় সুগ্রীব প্রবলপরাক্রম বিনত নামক বানরকে সীতা অন্বেষণের জন্য পূর্বদিকে 'মাগধ', 'পুণ্ড্র' ও 'অঙ্গ' প্রভৃতি দেশে গমন করিতে বলেন।[৪৫]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে যে, ইক্ষ্বাকু বংশীয় রঘু কর্তৃক সুহ্ম ও বঙ্গ বিজয়ের প্রতিধ্বনি কালিদাসের 'রঘুবংশ' (৪/৩৫-৩৬ শ্লোঃ) কাব্যেও পাওয়া যায়।

রাম ভক্তিবাদ ও বঙ্গদেশ ঃ

'রামায়ণ' প্রধানতঃ মহাকাব্য, বাল্মীকি রামচন্দ্রকে মহাকাব্যের বীর নায়করূপেই চিত্রিত করিয়াছেন। 'রামায়ণ'-এর প্রথম সর্গে মুনিবর বাল্মীকি পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ নারদকে প্রশ্ন করেন,—

কোন্বস্মিন্সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্য্যবান্।
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ২ ॥
চারিত্রেণ চ কো যুক্তঃ সর্ব্বভূতেষু কো হিতঃ।
বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈকপ্রিয়দর্শনঃ ॥ ৩ ॥
আত্মবান্ কো জিতক্রোধো দ্যুতিমান্ কোঽনসূয়কঃ।
কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে ॥ ৪ ॥ (আদি, ১/২-৪)

"অধুনা এই ভূমণ্ডলে এমন কে আছেন, যিনি গুণবান্, বীর্য্যবান্, ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত, সচ্চরিত্র, সকল প্রাণীর হিতৈষী, বিদ্বান্, সর্ব্ববিষয়ে, দক্ষ, অদ্বিতীয় প্রিয়দর্শন, সংযতচিত্ত, জিতক্রোধ, দীপ্তিমান্ ও অসূয়াশূন্য এবং সমরক্ষেত্রে কাহার ক্রোধ দর্শনে সুরগণও শঙ্কিত হইয়া থাকেন"।[৪৬]

নারদ উত্তরে বলিয়াছিলেন, এতগুলি গুণের সমাবেশ না হইলেও ইহার কিছু কিছু গুণ লক্ষ্য করা যায় তেমন ব্যক্তি একজনই আছেন, তিনি হইলেন অযোধ্যার রঘুপতি রাম।

এই প্রশ্নোত্তরের মধ্যেই নরচন্দ্রমা রামচন্দ্রের সুমহান্ চরিত্রের প্রকাশ ঘটিয়াছে। রামচন্দ্র নিজেকে অবতার বলিয়া উল্লেখ করেন নাই, বাল্মীকিও তাহা সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করেন নাই। তবে তিনি সাধারণ মানব নহেন। তাঁহার প্রতিটি কর্মই ঐশী ভাবনা প্রসূত।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন — "রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজের গুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।" [৪৭] রামচন্দ্র বীর শ্রেষ্ঠ পুরুষরূপেই ভারতবর্ষে প্রথমে সম্মান লাভ করিলেও সেই অপরাজেয় পৌরুষ লইয়া দীর্ঘকাল সন্তুষ্ট থাকা ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কৃষ্ণের সঙ্গে রামচন্দ্রও ধীরে ধীরে দেবমহিমায় ভূষিত হইয়া ওঠেন। কিন্তু ঠিক কোন সময় হইতে এইরূপ পরিবর্তন ঘটে সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। খুব সম্ভব 'মহাভারত' (আঃ খ্রীঃপূঃ ৩য়-৪র্থ শতক) রচনার পূর্ব হইতে এবং 'রামায়ণ'-এর 'উত্তরকাণ্ড' রচনার সময় হইতে রামচন্দ্রের চরিত্রে দেবভাবের সূত্রপাত ঘটে।[৪৮] আবার কেহ কেহ এই মত স্বীকার করেন না।[৪৯]

যাহাই হউক, 'মহাভারত' (বনপর্ব এবং শান্তিপর্ব), 'ভাগবত' (নবম স্কন্ধ, ১০ম-১১শ অঃ), 'বিষ্ণুপুরাণ' (৪র্থ খণ্ড, ৪র্থ-৫ম অঃ) এবং 'বায়ুপুরাণ'-এ (৮৮তম অঃ) যে রামকাহিনী পাওয়া যায়, তাহাতে রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতাররূপেই উল্লেখ করা হইয়াছে। 'বিষ্ণুপুরাণ' খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে এবং 'বায়ুপুরাণ' খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের মধ্যে রচিত বলিয়া পণ্ডিতদের অনুমান। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত কালিদাসের 'রঘুবংশ'-এ (১০ম সর্গ, ৬৫ শ্লোঃ) বিষ্ণুকে রাবণের নিধনকারী হইয়া দশরথের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। অথচ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রচিত ভবভূতির কাব্যে রামচন্দ্র বীরশ্রেষ্ঠ পুরুষরূপেই চিত্রিত।

রামভক্তি উত্তর ভারত হইতে সুদূর দক্ষিণ ভারতেও প্রভাব বিস্তার করে। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে কেরল নৃপতি কুলশেখর আলবার তাঁহার ইষ্ট দেবতা শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা কীর্তনের নিমিত্ত যে সকল ভক্তিসঙ্গীত রচনা করেন, তাহা সত্যই মর্মস্পর্শী।[৫০] এই আলবার সম্প্রদায় 'রামায়ণ'কে তাঁহাদের সাধনার ধনরূপে গ্রহণ করেন। ক্রমেই এই ভক্তিধর্মের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটিতে থাকে। খ্রীষ্টীয় ১০১৪ অব্দে জৈন লেখক অমিতগতি রামচন্দ্রকে সৃষ্টিকর্তা ভগবানরূপে প্রকাশ করেন।[৫১] ১১১৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরের অন্তবর্তী আরিগোম নামক স্থানে রামদেব নামক এক বৌদ্ধ নৃপতি পূর্বে প্রতিষ্ঠিত রামচন্দ্রের মন্দিরটির নূতনভাবে সংস্কার সাধন করেন।[৫২] অর্থাৎ রামদেবের পূর্বেও রামচন্দ্রের মন্দিরটি ও রামবিগ্রহ তথায় বর্তমান ছিল।

মধ্বাচার্য (আনন্দতীর্থ) হিমালয়ের বদরিকাশ্রম হইতে একটি রামের প্রতিমূর্তি সংগ্রহ করেন এবং উড়িষ্যার জগন্নাথ মন্দির হইতে তাঁহার শিষ্য নরহরিতীর্থকে ১২৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রামচন্দ্রের

আসল বিগ্রহ সংগ্রহার্থে প্রেরণ করেন —

"Thus Madhva.................... is declared to have brought the image of Rama from Badarikasram in the Himalaya, and to have sent his pupil Naraharitirtha to Jagannatha in Orissa, about A.D. 1264, to bring back what were called the original idols of Rama".[৫৩]

খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে সংস্কৃত সাহিত্যের সুবিখ্যাত লেখক হিমাদ্রি চৈত্রমাসের পূর্ণিমা তিথিতে ৯ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত রাম জন্মোৎসব বর্ণনা করেন।[৫৪] এই ঘটনাসমূহ হইতে এই ধারণা জন্মে যে, খ্রীষ্টীয় দশম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে আসমুদ্র হিমাচল রামভক্তি প্রচারে মাতিয়া উঠিয়াছিল। রামানুজাচার্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মমতের পঞ্চম অনুপন্থী ছিলেন রামানন্দ (আবির্ভাব কাল ১২৯৯ খ্রীঃ)[৫৫]। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে তিনি রাঘবানন্দের নিকট ভক্তিবাদ শিক্ষা করেন এবং রামচন্দ্রকেই বিষ্ণুর অবতাররূপে গ্রহণ করিয়া রামভক্তিবাদ প্রচার করেন। তৎপন্থিগণ 'রামায়েত' সম্প্রদায় নামে পরবর্তীকালে সুপরিচিত হন। 'রাম' নাম স্মরণে পাপ দূর হয়, এই নাম পরম পবিত্র, অতি পরিচিত। পরবর্তীকালে 'রাম' নামের প্রভাব বৃদ্ধি লাভ করায় মন্ত্র, জপ ও ধ্যানের বিধিবদ্ধ নিয়মও অপসারিত হইয়া যায়। ফলে উচ্চ-নীচ-নির্বিশেষে সকল বর্ণ এবং সম্প্রদায়ের মানুষ রামায়েত ধর্মমতে আকৃষ্ট হওয়ায় জাতীয় জীবনে এই ধর্ম এক নবযুগের সঞ্চার করে। এই সময়ে মরমী কবির কণ্ঠে শুনিতে পাওয়া যায় —

"পূরব দিশা হরিকো বাসা
পশ্চিম অলহ্ মুকামা।
দিলমেঁ খোজি দিলহিমা খোজো
ইহৈ করীমা রামা" ॥ (কবীর)

'পূর্বদিকে হরির বাস, পশ্চিমদিকে আল্লার মোকাম। হৃদয়ে খুঁজিয়া হৃদয়ের মধ্যেই খোঁজ। এইখানেই করীম ও রাম'।[৫৬] রামানন্দপন্থী ভক্ত কবীর ও দাদূর মর্মস্পর্শী দোঁহাগুলি রাম ও রহিমের অভেদত্ব প্রকাশের দ্বারা মানুষে মানুষে প্রেম ও মিলনের বন্ধন সুদৃঢ় করে। কবীর, রামদাস ও দাদূ ধর্ম সমন্বয়ের ক্ষেত্রে রামানন্দের অনুসৃত পথেই অগ্রসর হইয়া অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ফলে অচিরেই রামভক্তিবাদ সর্বধর্ম সমন্বয়ে এক মহামিলনের সঙ্গীতরূপে পরিচিত হইয়া ওঠে। ইহার প্রতিফলন ঘটে আধুনিক কালে —"যো হি আল্লা সো হি রাম, পতিত পাবন সীতা রাম" প্রভৃতি পংক্তির মধ্যে। মধ্যযুগে রামায়েত সম্প্রদায়ই আধুনিক সেক্যুলারিজমের পথ সুপ্রশস্ত করেন। ইহার অন্তরে ছিল রাম-সীতার উন্নত প্রেমের নৈতিক আদর্শ এবং বাহিরে ছিল শুষ্ক বৈরাগ্য বর্জিত সামাজিক কর্তব্য নিষ্ঠার মহৎ অনুপ্রেরণা। রাম-ভক্তিবাদের ফলস্বরূপ রামচন্দ্র ও সীতা, বিষ্ণু ও

লক্ষ্মীতে রূপান্তরিত হন । খুব সম্ভব মূল রাম-কাহিনীর সহিত বিচিত্র ধর্মীয় আকুতি ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাস সংযুক্ত হওয়ার ফলেই এইযুগে "অধ্যাত্ম রামায়ণ" নামে এক নবতর রামায়ণ সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছে।[৫৭] রামচন্দ্রের পরব্রহ্মত্ব প্রতিষ্ঠাই 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এর প্রতিপাদ্য বিষয় ।

বঙ্গদেশে 'মহাভারত' অপেক্ষা 'রামায়ণ' এবং রাম চরিত্রই সাহিত্যে মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে । এদেশে রামচন্দ্রের ঈশ্বরত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেও বিশেষ বিলম্ব ঘটে নাই । গুপ্তযুগে বাংলাদেশে যে সকল তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে রামচন্দ্র এবং 'রামায়ণ'-এর কিছু কিছু কাহিনী অনুপ্রবিষ্ট হইতে দেখা যায় ।[৫৮] ইহাদ্বারা অনুমান করা চলে পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে রামচন্দ্রও তখন দেবমহিমায় ভূষিত ছিলেন । এই সম্পর্কে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখিয়াছেন, "............রঘুপতি রামের পূজা এবং তাহার প্রতি শ্রদ্ধা পরবর্তী সেন-বর্মণ পর্বে বোধহয় বাড়িয়াই গিয়াছিল এবং হয়তো রামের মূর্তিপূজাও প্রচলিত হইয়া থাকিবে । ধোয়ী-কবি তাঁহার 'পবনদূতে' যে ভাবে স্বর্নদী বা ভাগীরথীতীরে রঘুকুল গুরু দেবতার উল্লেখ করিয়াছেন, মনে হয়, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের মত বাংলাদেশেও রাম-সীতার পূজা প্রচলিত ছিল । পরে কোনো সময়ে তাহা অপ্রচলিত হইয়া থাকিবে" ।[৫৯] কাজেই দেখা যায় বাংলাদেশে কৃষ্ণভক্তির মত রামভক্তি ব্যাপক আকার ধারণ না করিলেও উক্ত রামভক্তিবাদ[৬০] ও রাম পূজার তরঙ্গাভিঘাত বঙ্গতট-প্রান্তকেও কম উদ্বেলিত করে নাই । তবে রামপূজা অপেক্ষা রাম-নাম জপই মধ্যযুগের বাংলা-রামায়ণে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে সর্বাধিক । প্রায় সকল রামায়ণকার কবির রচনায় রত্নাকর দস্যুর ঋষিদের নির্দেশে একাগ্র মনে রাম নামের অক্ষর-বিপর্যয় 'মরা' শব্দ জপিয়া 'রাম' নাম উচ্চারণের ও বাল্মীকি মুনিতে রূপান্তরের কাহিনী পাওয়া যায় ।

পণ্ডিতদের অভিমত 'তন্ত্রসার'-এর উদ্ভব বঙ্গদেশে । ইহাতে অন্যান্য দেবদেবীর মন্ত্র ও পূজাবিধির মতই রামস্তব (হনূমান কর্তৃক কথিত), রামের অষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্র (১৪-৩১ শ্লোক), রামকবচ এবং হনূমান মন্ত্র লিপিবদ্ধ আছে ।[৬১]
রাম মন্ত্রের উপর লিখিত, 'বামার্চন চন্দ্রিকা'[৬২], 'রামচন্দ্র পূজাবিধি'[৬৩] এবং 'রাম মন্ত্রার্থ নির্ণয়'[৬৪] প্রভৃতি পুথির অধিকাংশই বঙ্গাক্ষরে (প্রায় ১৭০০-১৮০০ খ্রীঃ মধ্যে) লিপিকৃত । রামচন্দ্রের প্রতি ভক্তিবশতঃই এবং রামপূজা প্রচলনের উদ্দেশ্যেই যে পুথিসমূহ লিপিকৃত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই । রাম-সীতা এবং হনূমানের মূর্তি ও বিগ্রহ সমন্বিত যে সকল দেবদেউল বিগত তিনশত বৎসর যাবৎ বঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাও সমকালীন ধর্মীয় অনুভূতিব উপর আধারিত । উহাদের মধ্যে কিছু কিছু মন্দিরের উল্লেখ করা যাইতে পারে ; যথা ঃ-

১.	সীতারাম মন্দির	-	জনার্দনপুর ; মেদিনীপুর ।
২.	রাজারামের মন্দির	-	খালিয়া, ফরিদপুর, ১৮শ খ্রীঃ ।
৩.	রঘুনাথ মন্দির	-	বিষ্ণুপুরী রীতির ; গনপুর, পুরুলিয়া ।
৪.	রামেশ্বর মন্দির	-	বিষ্ণুপুরী রীতির ; বর্দ্ধমান ।
৫.	রামচন্দ্র মন্দির	-	গুপ্তিপাড়া, হুগলী, ১৭শ খ্রীঃ ।
৬.	রঘুনাথ মন্দির	-	রাধানগর, মেদিনীপুর, ১৭১৮ খ্রীঃ ।
৭.	রঘুনাথ মন্দির	-	দিনাপুর, মেদিনীপুর, ১৮০৪ খ্রীঃ ।
৮.	বঘুনাথ মন্দির	-	রঘুনাথ বাড়ী, মেদিনীপুর, ১৭শ-১৮শ খ্রীঃ ।
৯.	সীতারাম মন্দির	-	খড়ার, মেদিনীপুর, ১৮৬৫ খ্রীঃ ।
১০.	রঘুনাথ মন্দির	-	গোপালপুর, বীরভূম ।
১১.	সীতারাম মন্দির	-	বলরামপুর, মেদিনীপুর, ১৮৬০ খ্রীঃ ।
১২.	হনূমান মন্দির	-	মেদিনীপুর শহরে অবস্থিত ।[৬৫]

এই মন্দিরসমূহ ব্যতীত বাঁকুড়া জিলায় আরও কিছু উল্লেখযোগ্য রাম-মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায় ; যথা - (১৩) কোতলপুরের নিকট কোঙারপুর গ্রামে অবস্থিত পঞ্চরত্ন মন্দির (রঘুনাথ শালগ্রাম) ; (১৪) পাত্রসায়ের ঘোষাল পাড়ায় আটচালা মন্দির (রাম বঘুবীর শালগ্রাম) ; (১৫) বাঁকুড়ার রামপুর পাড়ার মন্দির (রঘুনাথ জীউর) এবং (১৬) বিষ্ণুপুরের মাধবগঞ্জের রঘুনাথ মন্দির[৬৬] । (১৭) কাটানধারতলার (বিষ্ণুপুর) রঘুনাথ জিউর মন্দিরটিও প্রসিদ্ধ ।

বীরভূম জিলার ইলামবাজার থানার ঘুরিষা গ্রামের (শ্রীপুর) (১৮) রঘুনাথজীর মন্দিরটি (১৬৩৩ খ্রীঃ) প্রাচীনত্বের জন্য সুবিখ্যাত[৬৭] । ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ত্রিবেণী হিন্দু মন্দিবের ফলকে "সীতাবিবাহ" ও অন্যান্য চিত্র যথা, "শ্রীরামের রাবণবধ" এবং "শ্রী সীতা নির্বাসঃ শ্রীরামাভিষেকঃ" প্রভৃতি রামকাহিনীর নানা চিত্র "বাংলাদেশের ইতিহাস" [২য় খণ্ড, মধ্যযুগ] গ্রন্থে প্রদান করিয়াছেন[৬৮] । অনুসন্ধান করিলে বৃহত্তর বঙ্গে নিশ্চয়ই আরও কিছু রাম-সীতার মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু আমরা সে আলোচনা হইতে বিরত হইলাম । কেননা এই সকল দেবদেউল ও দেববিগ্রহের মধ্যে শান্ত ভক্তিধর্মের বিনম্র স্রোত প্রবাহিত হইলেও এই সমুদয় আনুষ্ঠানিক বিধি বিধানের দ্বারা ভক্তিধর্ম সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপক আকারে জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে নাই । ইহার জন্য প্রয়োজন ধর্মের প্রশস্ততর উদার প্রাঙ্গণ । এইরূপ এক প্রশস্ততর উদার-নৈতিক প্রাঙ্গণের জীবন্ত নিদর্শন রহিয়াছে বঙ্গের তটপ্রান্তে সাগর তটে কপিল মুনির মন্দিরে ; মকর সংক্রান্তির মহামিলনেব পুণ্য লগ্নে, লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগমে, যুগ যুগ ধরিয়া যে তীর্থক্ষেত্রটি

হইয়া ওঠে প্রাণবন্ত তাহার মূলেও নিহিত রামায়ণ কাহিনীরই এক অতীত স্মৃতি বিজড়িত ইতিহাস।

রামের প্রতি বাঙালীব লোকসংস্কার ও লোকবিশ্বাস যে কি পরিমাণ গভীরে নিহিত তাহাব প্রমাণ পাই একটি উক্তির মধ্যে —

'ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি।
বাম লক্ষ্মণ সাথে আছে, ভয়টা আমার কি?'

এই একটি দৃষ্টান্তই বিশ্বাসেব প্রগাঢ়তা বোঝাইবার পক্ষে যথেষ্ট। বাংলার লোকসঙ্গীতে, বিবাহ সঙ্গীতে, বাঙালীব রামায়ণ গানে, কথকতায়, যাত্রায়, বাংলার নর্মে, কর্মে, ধর্মে, আমরণ সর্ববিষয়ে, সর্বকার্যে, রামকাহিনীর সমাদর। রামায়ণের প্রায় প্রতিটি চরিত্রের মূলে যে আদর্শ নিহিত আছে তাহাকেই গানে রূপায়িত করিয়াছেন গ্রাম বাংলার মানুষেরা। কিন্তু কৈকেয়ী ও মন্থরাকে বাঙালী কোনোদিন সুনজরে দেখেন নাই। বিবাহ সঙ্গীতে প্রত্যেক বর-বধূ যেন রাম-সীতার বিবাহের অভিনয় করে। মেয়েদের ব্রত অনুষ্ঠানেও ('পুণ্যিপুকুর ব্রত') এইরূপ মন্ত্র প্রচলিত আছে, —

"রামের মত পতি পাব।
সীতার মত সতী হব।"[৬৯]

উত্তর ভারত হইতে আবম্ভ করিয়া বাংলাদেশ পর্যন্ত রাম সীতার প্রসঙ্গই মেয়েলী বিবাহ সঙ্গীতের উপজীব্য। রাধাকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক আদর্শ যতই উচ্চ শ্রেণীর হউক না কেন, তাহা পারিবারিক জীবনেব আদর্শের বিরোধী। অতএব রামায়ণ-বন্দিত চরিত্র রাম-সীতাই পাবিবারিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে আদর্শস্থল,

"রামচন্দ্র খেলে পাশা গো সীতারে লইয়া"।
"শ্রীরাম হারিল খেলায়, জিত্‌ল জানকী"।[৭০]

বিবাহের স্ত্রী-আচার সম্পর্কিত পাশাখেলায় সীতা সর্বদা জয়লাভ করিয়া থাকেন এবং রাম সর্বদাই পরাজিত হন।

সাংস্কৃতিক জীবনেও কৃষ্ণলীলা অপেক্ষা রামলীলাই প্রাধান্য লাভ করে। চৈতন্যদেবের সময় হইতেই রামলীলার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৭১] ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ব্যারাকপুরের সিপাহীরা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া রামলীলা অভিনয় করিত। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজা বৈদ্যনাথের বাগানে এবং ৭০/৮০ বৎসর পূর্বেও পাতিপুকুরের নিকট রামলীলা অভিনয় এবং রামলীলাব মেলা প্রচলিত ছিল। অভিনয়ের শেষে রামলীলার মিছিল বাহির হইত। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যানিপার্কস্ ইংলণ্ড হইতে এদেশে আসিয়া রামলীলা উৎসব ও মিছিল দর্শন করেন। অবশ্য এইসব ঘটনা বহু পরবর্তীকালের।

এত হওয়া সত্ত্বেও 'রামায়ণ' বাঙালীর সাহিত্যকে যত প্রভাবিত করিয়াছে তাহার একাংশও আমাদের চারিত্রনীতি ও ধর্মকে প্রেরণা দান করে নাই। এই সম্পর্কে গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন - "......... রামায়ণ কথায় একদিকে কর্তব্যের দুরূহ কাঠিন্য, অপরদিকে ভাবের অপরিসীম মাধুর্য, একত্র সম্মিলিত। তাহাতে দাম্পত্য, সৌভ্রাত্র, পিতৃভক্তি, প্রভুভক্তি, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি মানুষের যত প্রকার উচ্চ অঙ্গেব হৃদয়বন্ধন আছে তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহাতে সর্বপ্রকার হৃদয়বৃত্তিকে মহৎ ধর্ম নিয়মের দ্বারা পদে পদে সংযত করিবার কঠোর শাসন প্রচারিত। সর্বতোভাবে মানুষকে মানুষ করিবার উপযোগী এমন শিক্ষা আর কোনো দেশে কোনো সাহিত্যের নাই। বাংলাদেশের মাটিতে সেই রামায়ণ-কথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। রামকে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে নরদেবতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের পৌরুষ, কর্তব্য নিষ্ঠা ও ধর্মপরতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর।"[৭২] কবিগুরুর এই ক্ষোভ যথার্থ, কেননা কৃষ্ণভক্তির প্রভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পৌরুষহীনতাই প্রাধান্য লাভ করে। আর রাম-সীতার উন্নত প্রেমের আদর্শ শ্রেয়কেই বরণ করিতে শিক্ষা দিয়াছিল। এই সম্পর্কে প্রবোধ সেন মহাশয় মনে করেন—"বঙ্কিমচন্দ্র যদি কৃষ্ণ চরিত্রকে কলঙ্কমুক্ত করে পুনঃ প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ সাধনায় ব্রতী না হয়ে রামচরিত্রকে আদর্শরূপে উপস্থাপিত করতেন, তা হলে সম্ভবতঃ বাঙালী জাতির অধিকতর উপকার হত"।[৭৩] এই দুই মনীষীর বক্তব্যের মধ্যেই রামচন্দ্রের মহৎ চরিত্রের প্রতি বাঙালী জাতির চরম অবহেলার পরিণাম যে কতদূর ক্ষতিকারক তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। তবে ইহাও ঠিক যে, সীতার চরিত্রের আদর্শ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল আখ্যায়িকা কাব্যের নারী চরিত্রকে প্রভাবিত করিয়াছে। আবার একদিকে যেমন বেহুলার চরিত্র সীতার চরিত্র-প্রভাব হইতে মুক্ত নয়, তেমনি নাথসাহিত্যে গোপীনাথের চরিত্রে রামচন্দ্রের প্রভাব সুপ্রকট। তথাপি বলিতে হয়, উত্তর ভারত হইতে 'রামায়েত' সম্প্রদায়ের ভক্তগণ দীর্ঘদিন যাবৎ বঙ্গদেশে আসিয়া কৃষ্ণায়েৎ বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া বৈষ্ণব নামে সুপরিচিত হইয়াছেন। বহু ভাষা-রামায়ণ রচয়িতা রামোপাসক ছিলেন বলিয়া জানা যায়। চৈতন্য পরিকর মুরারি গুপ্ত হনূমানের অবতার নামে বৈষ্ণব সমাজে সমাদর লাভ করেন,[৭৪] তিনিও প্রথম জীবনে রামভক্ত ছিলেন।

রাম ভক্তিবাদের প্রত্যক্ষ ফল ঃ

এই গেল রাম-ভক্তিবাদের দিক। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রাম-কাহিনী চর্চার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে প্রচারিত তিনখানি

সংস্কৃত 'রামায়ণ'-এর অমোঘ প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল এইযুগে। রামভক্তির আধ্যাত্মিক আদর্শে ও মূল 'রামায়ণ'-এর প্রত্যক্ষ প্রভাবে তিনখানি উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হয় —'অদ্ভুত রামায়ণ' (আঃ খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতক) 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ' (আঃ খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতক) এবং 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' (আঃ খ্রীঃ চতুর্দশ শতক)। 'অদ্ভুত রামায়ণ' বাল্মীকির নামে প্রচারিত এবং সপ্তবিংশতি সর্গে বিভক্ত। ইহার কাহিনীর মধ্যে সীতার উৎপত্তি ও সহস্রস্কন্ধ রাবণবধ এই দুইটি কাহিনী উল্লেখযোগ্য। এই কাহিনীদ্বয়ের মাধ্যমে সীতা রাবণের কন্যা এবং সহস্রস্কন্ধ রাবণ মহাকালী বেশে সীতা কর্তৃক নিহত হওয়ায় সীতা-মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়। এই গ্রন্থখানি যে অলৌকিক বিচিত্রতায় পরিপূর্ণ তাহা সূচনায় বাল্মীকির নিকট শিষ্য ভরদ্বাজের অদ্ভুত-আশ্চর্য-রামকথা-মাহাত্ম্য বর্ণনা করার প্রস্তাবের মধ্যেই পাওয়া যায়। কাহিনী-প্রধান এই রামায়ণেও রামচন্দ্রকে ব্রহ্মরূপে প্রচার করা হইয়াছে।[৭৫]

বাল্মীকির নামে প্রচলিত 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ'-খানি পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ এই দুইভাগে এবং বৈরাগ্য, মুমুক্ষু, উৎপত্তি, স্থিতি, উপশম ও নির্বাণ এই ছয় প্রকরণে বিভক্ত। রামচন্দ্র বৈরাগ্যবশতঃ বিষয়কর্মে বীতস্পৃহ হইলে বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে যোগযুক্ত হইয়া ভোগ, এবং জ্ঞানযুক্ত হইয়া কর্ম সাধনের উপদেশ প্রদান করেন। তত্ত্বপ্রধান এই 'রামায়ণ'-খানি একাধারে জ্ঞান ও কর্মের দ্বৈরথ। ইহাতেও রামচন্দ্র পূর্ণ ব্রহ্মরূপে কল্পিত।[৭৬] আর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-খানি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের নামে প্রচারিত হইলেও ভাব, ভাষা ও উপস্থাপনা রীতিতে প্রচুর পার্থক্য থাকায় ইহাকে ব্যাসদেব কিংবা বাল্মীকির রচনা বলা যায় না। খুব সম্ভব রামভক্তদের প্রচারের প্রভাবে খ্রীঃ চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে এই নবতর 'রামায়ণ'-খানির উদ্ভব ঘটে। ইহাতেও শ্রীরামচন্দ্র পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ অথচ প্রাকৃত জনের মতই তাহাতে বিস্মৃতি ও বিমোহ। তাঁহার প্রতিটি কার্য, এমনকি মোহ-ভ্রান্তি পর্যন্ত জ্ঞানকৃত। রাম-সংক্রান্ত অধ্যাত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা মহাদেব পার্বতীকে বলিয়াছেন। সমগ্র বিষয়টি বর্ণনা করিয়াছেন সুত। ইহাতে যে সকল নূতন বিষয় সংযোজিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে প্রধান বিষয়গুলি এইরূপ, ঃ—

(১) নারদ কর্তৃক রামচন্দ্রের অবতারত্ব প্রকাশ (অযোধ্যা, ১ম অঃ),
(২) বাল্মীকি মুনির পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণনা (অযোধ্যা, ৬ষ্ঠ অঃ),
(৩) রামচন্দ্রের ঈশ্বরত্বের উপলব্ধি (অযোধ্যা, ৯ম অঃ),
(৪) বিরাধের মৃত্যুরহস্য (অরণ্য, ১ম অঃ),
(৫) অগস্ত্যমুনি কর্তৃক রামচন্দ্রের বন্দনা (অরণ্য, ৩য় অঃ),
(৬) ছায়া সীতার কল্পনা (অরণ্য, ৭ম অঃ),
(৭) স্বয়ংপ্রভাব শ্রীরাম পাদপদ্ম প্রাপ্তি (কিষ্কিন্ধ্যা, ৬ষ্ঠ অঃ),

(৮) লঙ্কাদেবীর মুখে রামচন্দ্রের নারায়ণত্ব বর্ণনা (সুন্দরা, ১ম অঃ),
(৯) কালনেমির হনূমানকে ছলনা (লঙ্কা, ৬ষ্ঠ অঃ),
(১০) ধান্যমালীর স্বর্গপ্রাপ্তি (লঙ্কা, ৭ম অঃ),
(১১) ইন্দ্রজিৎ বধের কারণ লক্ষ্মণ (লঙ্কা, ৮ম অঃ)
(১২) রাবণের অভিচার হোম (লঙ্কা, ১০ম অঃ),
(১৩) রাবণের নাভিদেশে কুণ্ডলাকার অমৃতের কল্পনা (লঙ্কা, ১১শ অঃ),
(১৪) রামগীতা — রামচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া বেদান্তাশ্রিত ব্রহ্মতত্ত্বের নিগূঢ় ব্যাখ্যা (উত্তরা, ৫ম অঃ)[৭৭]। এই অভিনব বিষয়সমূহ পরবর্তীকালের মনন ও সাহিত্যকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। বাংলা সাহিত্যেও ইহার উল্লেখ আছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন —

'মায়া সীতা রাবণ নিল শুনিল আখ্যানে।
শুনি মহাপ্রভু হৈলা আনন্দিত মনে ॥"[৭৮]

কাজেই চৈতন্যদেবও 'অধ্যাত্ম বামায়ণ'-এর কাহিনী শ্রবণে পরম প্রীত হইতেন। এই কাব্যত্রয়ের অমোঘ প্রভাববশতঃই হউক কিংবা রামানন্দী সাধুসন্তের দ্বারা রামচন্দ্রকে উপাস্য দেবতারূপে প্রচার করার ফলেই হউক, রামাশ্রয়ী ভক্তিবাদ অচিরে সমগ্র উত্তর ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহারই প্রভাবে খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গে কৃত্তিবাস রামাশ্রয়ী ভক্তিকল্লোলে এবং খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে তুলসীদাস রামভক্তির আবেগাকুল হিল্লোলে সাহিত্য সৃষ্টি দ্বারা সমগ্র দেশ ও জাতিকে রোদনভরা আনন্দে আপ্লুত করেন। পরবর্তীকালে উত্তরভারতে তুলসীদাসের "রামচরিত মানস" [১৫৭৪-৭৫ খ্রীঃ] অবলম্বনে ধর্ম সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিলেও বঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণকে আশ্রয় করিয়া অনুরূপ ধর্মমত গড়িয়া উঠিবার অবকাশ ঘটে নাই। কেননা বঙ্গে রামনাম তত্ত্ব পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের প্রভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। রাম তো বিষ্ণুরই অবতার, কাজেই রামায়েত ভক্তগণ চৈতন্যোত্তর বঙ্গদেশে বৈষ্ণব নামেই পরিচিত হইতে থাকেন। কৃত্তিবাসের পূর্বে বাংলাদেশে রামকাহিনী সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করিলেও বাংলা সাহিত্যে ইহার সীমারেখাটি ছিল শীর্ণপ্রায়। খ্রীঃ পঞ্চদশ শতকে রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থে রামকাহিনীর সামান্য উল্লেখ পাওয়া যায় মাত্র।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রাম কথার সূচনা ঃ—

কৃত্তিবাসের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে যে রামকথা পাওয়া যায় তাহা খুব সামান্য হইলেও উল্লেখযোগ্য। চর্যা-গীতিকার ৩৪ সংখ্যক পদে "রাআ রাআ রাআরে, অবর রাঅ মোহরে

বাধা" পংক্তিটিতে "যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ"-এ (উৎপত্তি প্রকরণ ১৫শ ২০শ সর্গ) বর্ণিত রাজা পদ্ম ও রাণী লীলার সম্পর্কে যে অধ্যাত্ম প্রসঙ্গ আছে তাহার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে 'রাআ' অর্থাৎ রাজা শব্দ তিনবার ব্যবহারের দ্বারা কায়-বাক্-চিত্তৈশ্বর্যাদি লক্ষ্য করা হইয়াছে। রাণী লীলা নির্বিকল্প সমাধির দ্বারা তাঁহার মৃত স্বামীকে রাজত্ব করিতে দেখিতে পান। কিন্তু সমাধিভঙ্গে আবার ভ্রান্তির মধ্যে ফিরিয়া আসেন। 'রাআ' শব্দের পুনরুক্তি দ্বারা একাধিক রাজা এবং তাঁহাদের মোহাবদ্ধ অবস্থার উল্লেখ থাকাতে মনে হয় যে, 'যোগবাশিষ্ঠ'-এর ঐ কাহিনীটিই লুইপাদের বক্তব্য বিষয়।[৭৯]

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে 'রামায়ণ'-এর প্রসঙ্গ 'চর্যাপদ' অপেক্ষা আরো স্পষ্ট।[৮০] উহার বহুস্থলে রাম, রাবণ ও হনূমানের উল্লেখ পাওয়া যায়। দানখণ্ডে কৃষ্ণ রাধাকে নিজের পূর্ব ক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়া বলিতেছেন —

"শ্রীরাম রূপেঁ আহ্মে বধিল রাবণ।
আহ্মার আগত বীর নাহিঁ কোণ জন"॥ [দানখণ্ড, পৃ. ৫০]

কৃষ্ণ রাধাকে আরো বিবরণ দিয়াছেন, : —

"রাম রূপেঁ রাবণ বধিলোঁ
লঙ্কা কইলোঁ ছারখার।
লক্ষ্মণ সহাত্রেঁ সাধিলোঁ মান
সীতার কইলোঁ উদ্ধার॥" [দানখণ্ড, পৃ. ৪০]

কিংবা —

"হনুমান মহাবীর হৈলা সারথী।
তবেঁ কৈলোঁ সেতুবন্ধ আহ্মে দাশরথী॥
মাইল ইন্দ্রজিত ভায়ি লক্ষ্মণে।
জয় জয় হুলাহুলী দিল দেবগণে॥" [দানখণ্ড, পৃ. ৩৮]

বাংলা রামায়ণ পূর্ণাঙ্গরূপ গ্রহণের পূর্বেও এইরূপ খণ্ড খণ্ড চিত্র বাংলা সাহিত্যে বর্তমান ছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে কবি কৃত্তিবাস রামাশ্রয়ী ভক্তিবাদ দ্বারা সমগ্র বঙ্গদেশকে পরিপ্লাবিত করেন। বাংলা রামায়ণের যথার্থ সূচনা ঘটে কবি কৃত্তিবাসের কাব্যে। সমগ্র ভারতবর্ষে আদিকবি বাল্মীকির যে সম্মান, সমগ্র উত্তর ভারতে তুলসীদাস যে গৌরবের অধিকারী, বাংলাদেশে কৃত্তিবাসের তাহাই প্রাপ্য। কৃত্তিবাসের নাম জানেন না এমন বাঙালীও বিরল। তিনিই প্রথম, বাঙালীর একান্ত আকাঙ্ক্ষিত গৃহধর্ম, নীতিধর্ম ও ভক্তিধর্মের অপূর্ব মিশ্রণে সমগ্র গৌড়বঙ্গকে রামায়ণী কথার সুধারসে অভিষিক্ত করেন।

বিগত পাঁচশত বৎসরকাল এই কাব্যখানি বাঙালীর জীবনকে নানাভাবে আলোড়িত করিয়াছে। এখনও ইহার প্রভাব আমাদের জীবন হইতে মুছিয়া যায় নাই। বাঙালী যাহা চাহিয়াছে, কৃত্তিবাসী রামায়ণে সে তাহাই পাইয়াছে। কাজেই কৃত্তিবাস বাঙলার জাতীয় কবি এবং তাঁহার 'রামায়ণ' বাংলার জাতীয় কাব্য।[৮১]

শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে উইলিয়াম কেরীর প্রচেষ্টায় ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' পাঁচ খন্ডে প্রকাশিত হয়।[৮২] এই সংস্করণটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। ১৮২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন হইতে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ জয়গোপাল তর্কালংকার দ্বারা সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালের বহু মুদ্রিত সংস্করণে জয়গোপালের পরিমার্জিত এই দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠই কিছুটা পরিবর্তিতাকারে গৃহীত হইয়াছে। মধুসূদন শীল নামক একজন পুস্তক বিক্রেতা বটতলা হইতে তের জন পণ্ডিত কর্তৃক পরিমার্জিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রকাশ করেন। মধুসূদন শীলের সংস্করণটি পরবর্তীকালে অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করে।[৮৩] ধীরে ধীরে পাঠকসমাজে কৃত্তিবাসী রামায়ণের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহার সম্পাদক ও সংস্করণের সংখ্যাও বর্ধিত হইতে থাকে। কিন্তু এত সংস্করণ প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রামাণ্য পাঠ সম্পর্কে সংশয়ের নিরসন ঘটে নাই। অত্যধিক প্রচারেব ফলেই কৃত্তিবাসের মূল রামায়ণ তাহাব বিশুদ্ধি হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং তৎস্থলে প্রবিষ্ট হইয়াছে পরবর্তীকালের কবি, গায়েন ও লিপিকরদের রচনা।

গবেষক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালীর[৮৪] সম্পাদনায় যে দুইটি গ্রন্থ স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা কৃত্তিবাসী রামায়ণের খণ্ডাংশ মাত্র এবং উক্ত দুইটি গ্রন্থের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কেও সমালোচকদের মধ্যে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। কাজেই দীর্ঘকাল ধরিযা জনগণের কবি কৃত্তিবাস রাজার প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্যন্ত প্রক্ষিপ্ত রচনার দ্বারাই পরিচিত হইয়া আসিয়াছেন। তাহাতে জাতীয় কবির গৌরব বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হওয়া তো দূরে থাকুক, বরং বর্ধিত হইয়াছে। ফলে জাতীয় কাব্যখানির সম্পূর্ণ প্রামাণ্যরূপ উদ্ধারের প্রচেষ্টা একেবারে শেষ হয় নাই। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত (ডিসেম্বর ১৯৮০ এবং ২য় সং ; আগষ্ট ১৯৮১) 'ভারবি' প্রকাশনালয় হইতে মুদ্রিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের আর একখানা প্রামাণিক গ্রন্থ প্রকাশের সংবাদ পাওয়া যায়।[৮৫]

কৃত্তিবাসী রামায়ণেব মতই, কৃত্তিবাসেব সময়কাল সম্পর্কেও এতকাল বহু বাদানুবাদ সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার পরিচয় সম্বলিত আত্মকাহিনীটি হইতে জানা যায় যে, কবি কৃত্তিবাস মুরারি ওঝার নাতি ও বনমালী ওঝার পুত্র। তাঁহাদের আদিনিবাস পূর্ববঙ্গে, পরে বসতি স্থাপন করেন ফুলিয়া গ্রামে। ডঃ ভট্টশালীর প্রকাশিত কৃত্তিবাসের

আত্মকাহিনীটির [ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯ সাল, পৃ ৫৫১-৫৫৬] দুই ছত্র এইরূপ —

"আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্মিলেন পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥" [ঐ, পৃ. ৫৫৪]

এই দুইটি ছত্র হইতে জানা যায় মাঘমাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে রবিবার দিন কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাহা দ্বারা জন্মসাল সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসা যায় না। কবির জন্মের সাল তারিখ সম্পর্কেও অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় একটি দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় ব্রতী হন। বিভিন্ন প্রমাণ প্রয়োগ বলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, "............কৃত্তিবাস ১৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ১৪৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য উত্তরবঙ্গের দিকে রওনা হয়েছিলেন এবং ১৪৬৫ থেকে ১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে তিনি রুকনুদ্দীন বারবক শাহের সভায় গিয়ে গৌড়েশ্বরের কাছে সংবর্ধনা লাভ করেছিলেন।[৮৬]" তবে ফুলিয়ায় কৃত্তিবাসের স্মৃতিস্তম্ভে ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে কবির আবির্ভাব কালের উল্লেখ পাওয়া যায়। যাহাই হউক, তিনি পঞ্চাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কবিরূপে বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত।

কৃত্তিবাসের পর বহু কবি বাংলায় রামকাহিনী রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। অধ্যাপক মণীন্দ্র মোহন বসু 'বাঙ্গলা সাহিত্য' (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৪৭, পৃ ১০৩-১০৪) গ্রন্থে এইরূপ ৫১জন রামায়ণ রচয়িতার তালিকা দিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, অনুসন্ধান করিলে আরো বেশ কিছু রামায়ণ রচয়িতার সন্ধান মিলিতে পারে। তবে সকলের রচনা সম্পূর্ণাকারে পাওয়া যায় না। আবার যাঁহাদের কাব্য পূর্ণাঙ্গ কিংবা আংশিকরূপে পাওয়া যায় তাঁহাদের মধ্যে কয়জনের কাব্যই-বা মুদ্রিতাকারে লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থাপিত হইয়াছে ? ফলে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক অভূতপূর্ব রসভাণ্ডার এখনও গবেষণাগারের জীর্ণ পুথিপত্রের মধ্যে প্রায় বন্দী। আমরা যে সকল কবির রামায়ণ মুদ্রিতাকাবে দেখিতে পাই তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্তই মুষ্টিমেয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য অদ্ভুতাচার্যের 'রামায়ণ'[৮৭] (আদ্যকাণ্ড), চন্দ্রাবতীর 'রামায়ণ'[৮৮] (আংশিক মুদ্রিত), 'রামপ্রসাদী জগদ্রামী রামায়ণ'[৮৯] (অদ্ভুত অষ্টকাণ্ডে), রঘুনন্দন গোস্বামীর 'রাম রসায়ন',[৯০] শ্রীরাধামাধব ঘোষের বৃহৎ সারাবলি অবলম্বনে 'রামলীলা'[৯১] গ্রন্থ এবং ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' (প্রথম খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯১৪ খ্রীঃ) গ্রন্থে আরো কয়েকজন কবির রচিত কিছু পালা মুদ্রিতাকারে পাওয়া যায়। স্বতন্ত্রভাবেও মধাযুগেব কবিদিগের রচিত দুই একখানি পালা মুদ্রিত হইয়াছে, যেমন — লক্ষ্মণের 'সীতার উদ্দেশ' (১৮৬৮ খ্রীঃ), ভবানীনাথের 'লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়' (শ্রী উমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত, তারিখ নাই), শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'রামের রাজ্যাভিষেক' (নবম সংস্করণ,

কলিকাতা, সংবৎ ১৯৩৫), রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত 'তরণীসেন বধ' (ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনীত, ১২৯১ সাল) এবং লক্ষ্মণচন্দ্র শর্মা সম্পাদিত 'বালির পিণ্ড ও শিবরামের যুদ্ধ' ১২৮৩ সাল (২য় সং)। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের রামায়ণ-চর্চার নিরিখে এই প্রকাশনার অপ্রতুলতা যে নিতান্তই অগৌরবের তাহা বলাই বাহুল্য। বস্তুতঃ কৃত্তিবাসের পরবর্তীকালের সাহিত্যে বাংলা রাম-কাহিনী কোন্ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল তাহার যথার্থ মূল্যায়ন হওয়া উচিত। এই অন্বীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে যত অধিক সংখ্যক বাংলা রামায়ণের পুথি সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশিত হইবে ততই আলোচনার পথ প্রশস্ততর হইয়া উঠিবে।[১১]

রচনার বৈচিত্র্যে ও ভাবের প্রকর্ষে প্রাগাধুনিক কালের যে কোনো প্রথম শ্রেণীর কবির সমকক্ষ এমন এক কবির 'রামায়ণ' আলোচনা ও সম্পাদনা কর্মে আমরা ব্রতী যাঁহার সাহিত্যসাধনা কালের কষ্টিপাথরে বিচার হইয়া গিয়াছে এবং যিনি বৈষ্ণব অধ্যুষিত বিষ্ণুপুরের মল্ল নৃপতিদিগের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের ভাবানুবাদের মাধ্যমে অসংখ্য পালা রচনা করিয়া একদা জনপ্রিয় কবিরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। বাংলার প্লাবন ও আর্দ্র জলবায়ুকে উপেক্ষা করিয়াও যাঁহার রচনার শত শত অনুলিপি এখনও আমাদের সম্মুখে বর্তমান তিনি সেই প্রথিতযশা কবি কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী।

মধ্যযুগের যবনিকার অন্তরাল হইতে কবিচন্দ্রের যে কাব্যখানি আমাদের সর্বাধিক বিস্ময় উৎপন্ন করে তাহার নাম 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ'। 'বিষ্ণুপুরী', — শব্দটি কৃষ্টিবোধক। সাহিত্যকে এইরূপ এক অঞ্চল বিশেষের অভিধায় যুক্ত হইতে ক্বচিৎ দেখা যায়। বনবিষ্ণুপুর অঞ্চলে একদা বহুশ্রুত পালা গানরূপে পরিচিত হওয়ার ফলেই খুব সম্ভব কাব্যখানি এইরূপ নামে পরিচিত হইয়া থাকিবে। কবি কোথায়ও স্বীয়কাব্যকে এইরূপ নামে অভিহিত করেন নাই। তাঁহার রচনায় 'রামলীলা', 'রামমঙ্গল' (ক.বি. ৫৮ নং ; পু. পৃ. ৪) এমন কি 'গোবিন্দ মঙ্গল' ও 'ভাগবতামৃত' কথার উল্লেখও পাওয়া যায়। কবিপ্রদত্ত নামে কাব্যখানি পরিচিত না হইয়া অঞ্চল বিশেষের দ্বারা চিহ্নিত হওয়ার মধ্যে একটি বিশেষ যুগমানসের ইঙ্গিত বহন করে। কাব্যখানির পক্ষে তাহাই যথার্থ গৌরব। কবিচন্দ্রের দৌহিত্র বংশজ মাখনলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদিত 'ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গল' গ্রন্থের ভূমিকা (১৩৪১ সাল, পৃ. ভূমিকা — তিন ও ছয় আনা) হইতে "বিষ্ণুপুরী রামায়ণ" কথাটির সঙ্গে আমরা প্রথম পরিচিত হই। অধ্যাপক মণীন্দ্র মোহন বসুর মতে, "কবিচন্দ্রের গ্রন্থ বিষ্ণুপুর অঞ্চলে গীত ও পঠিত হইত, এজন্য ইহা বিষ্ণুপুরী রামায়ণ নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল"।[১০] এই বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেন যে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এইরূপ — "কবিচন্দ্রের রামায়ণ 'বিষ্ণুপুরী রামাযণ' বলিয়া মল্লভূমি ও দক্ষিণ রাঢ়ে প্রচলিত ছিল। কাব্যটি জনপ্রিয় ছিল বলিয়া মনে হয়।"[১১] ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কবিচন্দ্রের

কাব্যটি সম্পর্কে ঈষৎ বিস্তৃত মন্তব্য করিয়া বলিয়াছেন —
"কবি যে নিষ্ঠা সহকারে কোন বিশেষ সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ করেন নাই তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন । বাল্মীকি রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, নিজস্ব কল্পনা প্রভৃতি মিশাইয়া কবি এই মিশ্র ধরনের রামকাব্য লিখিয়াছেন । ইহা বিষ্ণুপুর অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার অপর নাম 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' "।[১৫] আমরা বিদগ্ধ পণ্ডিতবৃন্দেব মত আলোচনা কবিয়া দেখিলাম, সর্বসম্মতিক্রমে তাঁহাদের স্বীকৃত নাম গ্রহণে আমাদেরও কোনো বাধা নাই । অতএব 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' আঞ্চলিক সাহিত্যের এক অনন্য উপোদ্ঘাত ।

পাদটীকা :—

১। 'বাংলাদেশ' বা 'বঙ্গদেশ' বলিতে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গকে বুঝিতে হইবে ।

২। মূল রামায়ণের তিনখানি সংস্করণের মধ্যে গৌড়ীয় রামায়ণ খানিই সর্বপ্রথম প্রেরিত হয় য়ুরোপে । একখানি বন্ হইতে A.W. Von Schlegel (1829-38 A.D.) দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন ।
অপবটি G. Gorresio (Text X Italian, 1843-58 A.D., Vol. 1-10) মুদ্রিত করেন ।

৩। K. S. Ramswami Sastri-ed : Ramcharit, Oriental Institute, Baroda, 1930 : P. 253

৪। Haraprasad Sastri,ed : Ramcharit, Calcutta, 1910

৫। রাধাগোবিন্দ বসাক অনূদিত : গৌড় কবি, সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত 'রামচরিত' (বাংলা সং) কলিকাতা, ১৯৫৩ ; পৃ. ১৪৭

৬। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত পৃ. ২০

৭। বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় : সংস্কৃত নাটকে রামায়ণের প্রভাব, পৃ. ২০২

৮। নীহাররঞ্জন রায় : বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৬, পৃ. ৭৪৫

৯। বমেশ চন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, প্রাচীনযুগ ; ৬ষ্ঠ সং ১৯৭৪ খ্রীঃ, পৃ. ১১৭

১০। জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী : আর্যা সপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ ; রামায়ণ: প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৮, কলিকাতা, পৃ. ৮০ হইতে গৃহীত ।

১১। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত পৃ. ৮১
১২। Mitra Notice, Vol.- III 1180 No. P. 142 । ঐ কেটালগের ১৪২ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । যেহেতু ইহার পুথিগুলি বেশীর ভাগই বিভিন্ন স্থানের সংগ্রহ, কাজেই উক্ত কবিতা দুইটির ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নহে । পুথি ১৫০০ শকে বঙ্গাক্ষরে লিখিত, শান্তিপুরে কালিদাস বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত ।
১৩। নীহাররঞ্জন রায় : বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৫৬ সাল, পৃ. ৭৪৫ হইতে উক্ত রচনাসমূহের নাম গৃহীত হইল ।
১৪। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত পৃ. ৫৬৯
১৫। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত পৃ. ৬০১-২
১৬। রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রচীনযুগ (৫ম সং) ১৩৭৭ সাল, পৃ. ১৫৬ হইতে গৃহীত ।
১৭। Rajendra Hazra : The Devi Purana ; New Indian Antiquary, Vol-V., 1942-43 P. 2-20
১৮। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২১২-২১৬ হইতে গৃহীত ।
১৯। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬-২১৭
২০। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭
২১। বেদব্যাস বিরচিত : মহাভাগবত পুরাণ, গুজরাটী প্রিন্টিং প্রেস, বোম্বাই, ১৯১৩ ।
২২। Rajendra Hazra : The Mahabhagavata Purana, a work of Bengal, Indian Historical Quarterly, March, 1952, PP. 23-24
২৩। Rajendra Hazra : The Devi Bhagavata, Journal of Oriental Research, Madras, 1953 Vol XXI. Pts. I-IV. (P. 49-79)
২৪। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান ১৩৬৯ সাল, পৃ. ২২৪-২২৫
২৫। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীতম্ পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত : পদ্মপুরাণম্, পাতাল খণ্ডম্, বঙ্গবাসী প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৮ ।

২৬। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান, পৃ. ২৩০-২৩১ হইতে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত।
২৭। Mitra Notice. Vol. III, PP. 1259, 1260, 1261, 1262.
২৮। M. Krishnamachariar : History of Classical Sanskrit Literature 1937, Index.
২৯। Mitra Notice : Vol. I, P.63.
৩০। M. Krishnamachariar : History of Classical Sanskrit Literature, 1937, P. 304
৩১। M. Krishnamachariar : History of Classical Sanskrit Literature, 1937. Index
৩২। Mitra Notice Vol. III ; P. 1185
৩৩। Mitra Notice Vol. II - P. 521
৩৪। M. Krishnamachariar : History of Classical Sanskrit Literature. 1937. Index
৩৫। Mitra Notice Vol-I P. 73.
৩৬। সা.প.প. ১৩৩৭ পৃ. ১৩৫
৩৭। Mitra Notice. Vol - IV, P. 1533
৩৮। ,, ,, ,, ,, P. 1534
৩৯। ,, ,, ,, I P. 302
৪০। ,, ,, ,, ,, P. 1269 শ্রীরামপুর কলেজে রক্ষিত
৪১। ,, ,, ,, III P. 1268 ,, ,, ,,
৪২। M. Krishnamachariar : History of classical Sanskrit Literature 1937. Index. 993
৪৩। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত
৪৪। পঞ্চানন দেবশর্ম্মণঃ ভট্ট পল্লী নিবাসিন সম্পাদিত ও অনূদিত : 'বাল্মীকি-রামায়ণম্' বঙ্গানুবাদ সহ, সাল ১৩১১ বঙ্গাব্দ। কলিকাতা, পৃ. ১৬২
৪৫। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত পৃ. ৬৫২
৪৬। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত পৃ. ১
৪৭। রবীন্দ্রনাথ : রামায়ণ, প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩শ খন্ড, জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, ১৩৬৮ পশ্চিমবঙ্গ সরকার. পৃ. ৬৬২(৫)
৪৮। অধিকাংশ প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতবৃন্দ 'রামায়ণ'কে 'মহাভারত' রচনার পূর্ববর্তী

বলিয়া অনুমান করেন । এই কথার সমর্থনে কয়েকজন পণ্ডিতের বক্তব্য উদ্ধৃত হইল ; যথা —

ভিন্টারনিৎস্ অনুমান করেন — "The whole Ramayana, including the later portions, was already an old and famous work when the Mahabharata had not yet attained its present form."

M. Winternitz : A history of Indian Literature, Vol. - I. 1927. P. 516

ভিন্টারনিৎস্ এর সঙ্গে জেকোবির কথার মিল আছে । জেকোবি বলেন, —

"The Ramayana was concluded in broad outlines, when the composition of the Mababharata was still in progress."

Dr. Hermann Jacobi : The Ramayana, Das Ramayana, tr. from German - by S. N. Ghosal, Boroda - 1960 P. 54

'মহাভারত' রচনার বহুপূর্বে 'রামায়ণ' গ্রন্থ যে একটি সংহত কাব্যরূপে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল সে সম্পর্কে ম্যাকডোনেল লিখিয়াছেন, —

"Though there is, as we shall see, good reason for supposing the original part of the Ramayana assumed shape at a time when the Mahabharata was still in a state of flux."

A. Macdonell : A History of Sanskrit Literature, Delhi, 2nd ed. 1961. P. 304

হপ্‌কিন্স অবশ্য রামকাহিনীকে পাণ্ডবদের কাহিনী অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়াও 'ভারতীকথা'কে বাল্মীকির কাব্য অপেক্ষা পূর্ববর্তী বলিয়াছেন ; যথা —

"(1) the story of Rama is older than the story of the Pandus. (2) The Pandu story has absorbed the Bharati Katha. (3) The Bharati Katha is older than Valmiki's poem."

E. Washburn Hopkins : The Great epic of India its character and origin. reprinted. 1969. P. 64

ডঃ সুকুমার সেনের মতে, "অশ্বঘোষ 'রামায়ণে'ব ইঙ্গিত করিয়াছেন, কৃষ্ণলীলারও ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু মহাভারত কাহিনীর উল্লেখ করেন নাই । রামায়ণ মহাভারতের অনেককাল আগে পরিণত রূপ লইয়াছিল ।"

সুকুমার সেন : ভাবতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৮ । পৃ. ১১৭

বাল্মীকি 'রামায়ণ' - এ সপ্তম কাণ্ডটি [উত্তর কাণ্ড] যে পরবর্তীকালের সংযোজন সে সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন অধ্যাপক প্রবোধ চন্দ্র সেন :-

"...................পরবর্তীকালে যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিরোধ মিটে গেল এবং সমাজে ক্ষত্রিয়ের পরিবর্তে ব্রাহ্মণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল তখন মূল পঞ্চকাণ্ড রামায়ণে (আদি ও উত্তর বাদে) উত্তরকাণ্ড নামে ষষ্ঠ কাণ্ডটি যুক্ত হল ; শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজের অনুকূল করে রামায়ণের নূতন সংস্করণও রচনা করা হল এবং ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের কাহিনীকেই দাঁড় করানো হল ভ্রাতৃপ্রেমের আদর্শরূপে।"

প্রবোধ চন্দ্র সেন : রামায়ণ ও ভারত সংস্কৃতি, প্রথম প্রকাশ ১৯৬২ । পৃ. ২৭

৪৯। জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী : প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার, প্রথম খণ্ড , ২য় সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৮২ । পৃ. ৩০৫

৫০। প্রবোধ চন্দ্র সেন : রামায়ণ ও ভারত সংস্কৃতি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬২, পৃ. ৬২

৫১। James Hastings and Louis H. Gray, ed : Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol.-X, Latest Impression, December, 1963. P. 567

৫২। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড, ২য় সং, ১৯৬৩ খ্রীঃ । পৃ. ৪৭০-৪৭১

৫৩। James Hastings and Louis H. Gray, ed : Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol.-X, Latest Impression, December, 1963. P. 567

৫৪। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত P. 567

৫৫। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত P. 569

৫৬। ক্ষিতি মোহন সেন : কবীর, ৩য় খণ্ড, ১৯১২ খ্রীঃ পৃ. ২-৩

৫৭। Nagendra Nath Sidhanta Ratna ed. and P.C. Bagchi's Introduction. : Adhyatma Ramayana, Part-I, 1935. Introduction, PP. 7-8

৫৮। রমেশ চন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ ৫ম সং, ১৩৭৭ সাল ; পৃ. ১৫৬ অবলম্বনে গৃহীত ।

৫৯। নীহার রঞ্জন রায় : বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, ১ম সং ১৩৫৬ সাল। পৃ. ৭০২

৬০। সম্রাট আকবরের সময়কালে লাহোর মিন্টে নির্মিত (১৬০৪ খ্রীঃ) রাম-সীতার মূর্তি অঙ্কিত দুই একখানি অর্ধ মোহরের (রামায়ণী প্রতীক মুদ্রা) সন্ধান পাওয়া যায়। উহা রামভক্তিবাদ প্রচারের পরোক্ষ ফল বলিয়া মনে হয়। নিম্নে অর্ধ-মোহরেব ছবির নম্বর সহ গ্রন্থের নাম প্রদত্ত হইল।

Mogul Empire ; Akbar, /N Mohur (Ilahi class), 1584-1605 ; Plate 58, No. 955.

R.A.G. Carson : 'Coins', Ancient, Mediaeval and Modern. Published in London. 2nd ed. 1970. PP. 519, 613.

৬১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত : 'তন্ত্রসার' শ্রীযুক্ত বীরেশ নাথ বিদ্যাসাগরকৃত পাঠবিবেক বঙ্গানুবাদ সংকলিত টীকা সহিত ; বঙ্গবাসী, কলিকাতা, ১৩৩৪ সাল, পৃ. ৭৫৬-৭৬৫।

কৃষ্ণানন্দ আগম বাগীশের জন্ম ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে। তিনি শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য প্রভৃতি তন্ত্রের সার সংকলন করেন।

৬২। এ.জি. ৭৯৫৪, ৪৩৮৫ এবং ২৮৮৪, ২৬৪২ (এশিয়াটিক সোসাইটি, গভর্নমেন্ট সংগ্রহ)।

৬৩। এ.জি. ২৮৮১, ১০৪০৫ " "

৬৪। এ.জি. ৭৯৫৫ " "

৬৫। David J. Mc cutchion : Late Mediaeval temples of Bengal, 1972.
এই গ্রন্থে প্রদত্ত চিত্রসূচী সংখ্যা —
Photo No. - 2, 29, 42, 43, 56, 66, 70, 83, 88, 118, 129 এবং 156 এই ক্রমানুসারে মন্দিরসমূহের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

৬৬। অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাঁকুড়া জেলাব পুরাকীর্তি, ২য় সং ১৯৭৫ খ্রীঃ, কলিকাতা ; পৃ. ৪০, ৬৭-৬৮ ও ৭৪ এই ক্রমানুসারে মন্দিরের নাম উল্লিখিত।

৬৭। দেবকুমার চক্রবর্তী : বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি, ১ম সং, ১৯৭২ খ্রীঃ ; পৃ. ৭-৮ এবং পৃ. ৩২

৬৮। রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড ; মধ্যযুগ, ১ম সং, ১৩৭৩ [উক্ত গ্রন্থের শেষে চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, ৫৪, ৫৬ ও ৫৭ নং চিত্র।]

৬৯। দক্ষিণা রঞ্জন মিত্র মজুমদার সম্পাদিত : ঠানদিদির থলে ; বাংলার ব্রতকথা, বাংলার কথা সাহিত্যে, ৩য় সংখ্যা, ৩য় সং, ১৩৫২ ; পৃ. ১৭৯

৭০। আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলার লোক সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, ৩য় সং, ১৯৬২ খ্রীঃ, পৃ. ৩০৭

৭১। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত : শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদি খণ্ড, সাধনা প্রকাশনী, ১৯৬৬, পৃ. ২২৪

৭২। রবীন্দ্রনাথ : গ্রাম্য সাহিত্য, লোক সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড ; জন্ম শতবার্ষিক সং, ১৩৬৮, পৃ. ৭৩৩-৭৩৪

৭৩। প্রবোধ চন্দ্র সেন : রামায়ণ ও ভারত সংস্কৃতি, ১ম প্রকাশ, ১৯৬২ খ্রীঃ, পৃ. ৯৩

৭৪। বৃন্দাবন দাস : শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য খণ্ড ; বিংশ অধ্যায় [আখ্যা পত্র ছিন্ন] পৃ. ২৫১-২৫৩

৭৫। তারাকান্ত কাব্যতীর্থ ভট্টাচার্য্যেণানূদিতা : অদ্ভুত রামায়ণ, বাল্মীকি প্রণীতম্ সন ১৩১১

৭৬। বাল্মীকি প্রণীতম্ পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত : যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণম্, শক ১৮১৯।

৭৭। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীতম্, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত এবং অনূদিত। : অধ্যাত্ম রামায়ণম্, ২য় সং ১৩৫৫ সাল, কলিকাতা

৭৮। কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিত্যানন্দ গোস্বামী সম্পাদিত : শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ৩য় সং, চৈতন্যাব্দা ৪৪১, মধ্যলীলা, নবম পরিচ্ছেদ, পৃ. ১৪৪

৭৯। মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত : চর্যাপদ ; ১৯৫৯ খ্রীঃ, ভূমিকা, পৃ. ৩- পাঁচ-ছয় আনা, হইতে গৃহীত।

৮০। চণ্ডীদাস বিরচিত বসন্ত বঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ৪র্থ সং ; ১৩৫৬ সাল, পৃ. ৫০, ৪০, ৩৮

৮১। দীনেশ চন্দ্র সেনকৃত ভূমিকা : 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ',কলিকাতা; ১৯২৬ খ্রীঃ, ভূমিকা, পৃ.- এক.

৮২। প্রথম মুদ্রিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের বাংলা আখ্যাপত্র : বাল্মীকি কৃত, রামায়ণ, মহাকাব্য। কীর্ত্তিবাস বাঙালি ভাষায় রচিল। প্রথম কাণ্ড শ্রীরামপূরে ছাপা হইল। ১৮০৩।

৮৩। পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর সম্পাদিত : কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কলিকাতা, ১৩৫৬ সাল, ভূমিকা, পৃ. ১৫-১৬

৮৪। নলিনী কান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত : কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আদিকাণ্ড ; ঢাকা ১৯৩৬ ;

৮৫। সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত : রামায়ণ, কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিরচিত, ২য় সং ১৯৮১। পৃ. ৫২-৫৩

৮৬। সুখময় মুখোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়, পরিশিষ্ট, প্রথম প্রকাশ, আগষ্ট, ১৯৭৩ খ্রীঃ, পৃ. ১৬৮।

৮৭। পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী সম্পাদিত : অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ, আদ্যকাণ্ড, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ কার্যালয়, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

৮৮। দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত : চন্দ্রাবতীর রামায়ণ, পূর্ববঙ্গ গীতিকা, চতুর্থ খণ্ড , ২য় সংখ্যা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩২ (পৃ. ২৩৩-২৬৯)

৮৯। অজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত : অদ্ভুত অষ্টকাণ্ডে সম্পূর্ণ রামপ্রসাদী জগদ্রামী রামায়ণ, সাধক ও কবি জগদ্রাম ও রামপ্রসাদ বিরচিত, কলিকাতা, ১ম সং, ১৩৬১

৯০। অরুণোদয় রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত : i) শ্রীরাম রসায়ণ ; শ্রী রঘুনন্দন গোস্বামী বিরচিত, বঙ্গবাসী প্রেস, ১৩০৮ সাল।
ii) শ্রীরাম রসায়ণ ; শ্রী রঘুনন্দন গোস্বামী বিরচিত, ৫ম সংস্করণ, বঙ্গবাসী কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩৩৫ সাল।

৯১। রাধামাধব ঘোষ : রামলীলা [আখ্যা পত্র ছিন্ন] Bankura Mukherjee Press. 1894-95 A.D.

৯২। বিভিন্ন রাম কাহিনী অবলম্বনে আধুনিককালে আর একখানি রামায়ণ রচিত হয়। গ্রন্থটির নাম 'কথা রামায়ণ' — রচয়িতা শ্রী সীতারাম দাস ওংকার নাথ, প্রথম খন্ড, ১সং, ১৩৬০ সাল। শ্রী রামাশ্রম, ডুমুরদহ, হুগলী। আমাদের আলোচ্য বিষয় মধ্যযুগ, তাই যে সকল মুদ্রিত রামায়ণ মধ্যযুগের কবির রচিত শুধুমাত্র তাঁহাদের উল্লেখ করা হইল। আর ১৩৮৬ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' খানির প্রসঙ্গ ভূমিকায় উল্লেখ করা হইয়াছে।

৯৩। মণীন্দ্র মোহন বসু : বাঙ্গালা সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৪৭ খ্রীঃ, পৃ. ১৪৭।

৯৪। সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম সং, ১৩৪৭ (১৯৪০ খ্রীঃ) পৃ. ৭০৭

৯৫। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড ; প্রথম সং, ১৯৬৬, পৃ. ১০৪৭।

দ্বিতীয় অধ্যায়

।। কবি জীবন ।।

কবিচন্দ্র নিজের পরিচয় দিয়াছেন সংক্ষেপে :-

(ক) চক্রবর্তী মুনিরাম অশেষ গুণের ধাম
তস্য সুত কবিচন্দ্র গায় । (সা.চি. ২৫০. পু. পৃ. ২৬)

(খ) দ্বিজ কবিচন্দ্র ভণে ভাবি রমাপতি ।
লেগোর দক্ষিণে ঘব পানুয়ায় বসতি ।। (সা.প.প. ১৩০৪, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৩২২)

(গ) দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ভাবি রমাপতি ।
লেগ্বার দক্ষিণ দিগে পান্বায় বসতি ।। (ক.বি. ৩৭৯২, পু. পৃ. ৪ক, ১০৭২ সন)

উল্লিখিত এই পরিচয়লিপি হইতে জানা যায় কবি মল্লভূমের অন্তর্গত লেগোর সন্নিকটবর্তী পানুয়া গ্রামের অধিবাসী । কবির পিতার নাম মুনিরাম চক্রবর্তী । বংশতালিকা হইতে জানিতে পারি, কবির মাতার নাম চাঁপাদেবী এবং পিতামহ ও পিতামহীর নাম যথাক্রমে নিত্যানন্দ চক্রবর্তী ও গঙ্গাদেবী । এই কবিচন্দ্রের নাম শঙ্কর চক্রবর্তী । তাঁহার বাল্য ও কৈশোর জীবনের নানা কাহিনী বর্তমানে নানারূপ লোকশ্রুতির মধ্যে পাওয়া যায় । বিদ্যাভাসে অমনোযোগী, পাঠশালা পলাতক দুরন্ত এই বালক পুত্রটির জন্য আকৈশোর পিতামাতার ভাবনার অন্ত ছিল না । তাঁহার বাল-সুলভ চাপল্যের সঙ্গে মিশ্রিত ছিল অনন্য সাধারণ হরিভক্তি ।[১] ক্রমেই এই দুরন্ত বালকের অসীমের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । আকাশের নীচে সাদা মেঘের দল ভাসিয়া বেড়াইতে দেখিয়া বালক তন্ময় হইয়া যাইতেন । পানুয়ার উন্মুক্ত প্রান্তরের প্রতি প্রকৃতির কোলে লালিত বালক একটি বিশেষ মমত্ব অনুভব করিতেন ; তাই উন্মুক্ত প্রকৃতির নিকট ছুটিয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষাও তিনি প্রায়ই ব্যক্ত করিতেন । পিতা কর্তৃক তাড়িত রোরুদ্যমান বালক একদিন লাভ করিলেন জ্যোতির্ময়ী দেবীর সাক্ষাৎ । বীণাপাণি সস্নেহে বালককে শান্ত করিয়া বলেন "......... তুই আমার বরপুত্র, যা ঘরে যা, তুই যা চাস তাই পাবি'। এই কথা বলিয়া জিহ্বায় কাঁটা দ্বারা আঁচড় কাটেন" ।[২] তৎপরে বাক্‌দেবীর এই বরপুত্র ভূর্জপত্রে লেখনী ঠেকাইলে অক্ষরগুলি ছন্দোবদ্ধ হইয়া সৃষ্টি কবিত কাব্য । কবি কালিদাসের অনন্যসাধারণ প্রতিভার উৎস অনুসরণে বঙ্গের বহু কবি সবস্বতীর বরপুত্ররূপে পরিচিত হন । এইরূপ কিংবদন্তীই মধ্যযুগের কবিদের এখন সাধাবণ পবিচয় । সম্ভবতঃ কবিচন্দ্রের বেলায়ও তাহাই প্রচলিত । যাহাই হউক, যৌবনে পৌরোহিত্য কর্ম ছিল কবিচন্দ্রের পেশা । অধ্যাত্ম সাধনার প্রতি ছিল কবির অবিচল নিষ্ঠা । ঈশ্বর-প্রীতির প্রগাঢ়তাই কবিকে কালে সকল সাধনাব সিংহদুয়ারে উপনীত করে । পানুয়া গ্রামেব যেস্থানে বসিয়া তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন

সেই সাধনপীঠ এখন 'ব্যাসাশ্রম' বা 'গৌরাঙ্গ আশ্রম' নামে সুপরিচিত। ব্যাসদেবের মত বিপুল সাহিত্যকীর্তির অধিকারী কবি গ্রামবাসীর নিকট 'ব্যাসদেব' নামে অভিহিত হইতেন। শোনা যায়, তিনি নাকি হঠযোগী সাধক ছিলেন। পানুয়া গ্রামের যে জলাশয়ে তিনি 'নেতিধৌতি' ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন তাহা 'কবিচন্দ্র পুকুর' নামে পরিচিত। সংস্কৃত ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য ও যোগ শক্তির অধিকারী কবির সম্পর্কে বহু প্রচলিত জনশ্রুতির মধ্যে লেগো গ্রামের দ্বিজ গঙ্গারাম রায়ের (দেওয়ান) নির্মিত 'কবিচন্দ্র মন্দির' বা বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠার কাহিনীটি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু কবির যথার্থ পরিচয় কাব্যে রসসৃষ্টির উজ্জীবনে, সৌন্দর্য সৃষ্টির নিপুণতায়, ভাব ও ভাষা নিচয়ের আলঙ্কারিক নিগূঢ় বন্ধনে। সেখানে উদীয়মান স্বল্প সংখ্যক জ্যোতিষ্কের মধ্যে কবিচন্দ্র অন্যতম। এই প্রথিতযশা কবি 'ব্যাসদেব' নামে সম্মানিত হইয়াছিলেন, তিনিই আবার 'কবিচন্দ্র' নামেও ছিলেন পরিচিত। এই 'কবিচন্দ্র' উপাধি তিনি কোন সূত্রে লাভ করেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন, "কবিচন্দ্র মল্লরাজাদের সভাকবির উপাধি"।[৫] কিন্তু মল্লভূমে আরও কবিচন্দ্র ছিলেন, তাঁহাদের রচনাতেও উপাধি লাভের বিষয়ে কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। আবার মল্লসভা অলঙ্কৃত করিয়াছেন এমন অনেক কবির উপাধি কবিচন্দ্র ছিল বলিয়া জানা যায় না। তাই কবিগৃহে শ্রুত তথ্যটির উপর নির্ভর করিয়া বলিতে হয় যে, একবার বাংলার কবি সম্মেলনে বহু কবির সমাগম ঘটে। তখন কাব্যরচনার পুরস্কার স্বরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান 'কবিচন্দ্র' উপাধিটি শঙ্কর চক্রবর্তী উক্ত সভায় লাভ করেন। কিন্তু তাহা ঠিক কোন সময়ে ঘটে, সে সম্পর্কে নিশ্চিত কোনও প্রমাণ নাই। তবে মল্লরাজসভায় তিনি 'কবিচন্দ্র' উপাধি দ্বারাই পরিচিত ছিলেন, তাহার প্রমাণ, ব্রহ্মোত্তর ভূমি লাভের দলিলে উক্ত উপাধির উল্লেখ আছে। আবার ইহা কবির নাম হইলে, উক্ত দলিলে কবিচন্দ্র এবং শঙ্কর দুইটি নামই পাশাপাশি লিখিত হইবে কেন? কবিচন্দ্র নিজেও তাঁহার রচনায় 'কবিচন্দ্র' উপাধি অথবা নাম, সে সম্পর্কে বিশেষ আলোকপাত করেন নাই। তাঁহার রচনায় ক্বচিৎ 'শঙ্কর' নাম এবং অধিকাংশ স্থলে 'কবিচন্দ্র' ভণিতা পাওয়া যায়। তবে 'বীরবৌলী' ভূষণ তিনি মল্লরাজ গোপাল সিংহের (১ম) নিকট হইতে লাভ করেন। সে বিষয়ে উল্লেখ কবির রচনাতেই পাওয়া যায়; যথা :-

"শ্রীযুত গোপাল সিংহ প্রবল প্রতাপ।
যার কীর্ত্তি দেখিলে ঘুচয়ে মনস্তাপ ।।
নৃপ শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাগ্র সবাকার মান্য।
পরম দেবতা সদা ভাবেন শ্রীচৈতন্য ।।

হেন রাজা সমাদরে লইয়া আমারে ।
বীরবৌলী নিজে দিলা পরম সাদরে ।।
তারপর মহারাজা দিয়া ভূমি দান ।
আদেশিলা রচ মহাভারত পুরাণ ।।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ করিয়া ভাবনা ।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কৈল ভারত বর্ণনা ।।" ৪

'মহাভারত' রচনার পূর্বেই কবির খ্যাতি প্রচারিত হইয়াছিল, তাই বীরবৌলী ভূষণ এবং ভূমিদান তিনি উহা রচনার পূর্বেই লাভ করেন । এই কবিখ্যাতি খুব সম্ভব 'শিবমঙ্গল', 'অনাদি মঙ্গল', 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' ও 'ভাগবতামৃত শ্রীশ্রী গোবিন্দমঙ্গল' ইত্যাদি রচনা এবং তাহার প্রচাবের ফলেই হইয়া থাকিবে। কিন্তু পূর্ববর্তী এই রচনাসমূহে মল্লনৃপতিদের নাম দুই একবার উল্লেখ থাকিলেও নৃপতির আদেশের কথা সুস্পষ্টরূপে মহাভারতেই পাওয়া যায় ।

শ্রীযুত গোপাল সিংহ নৃপতির আদেশে ।
সংক্ষেপে ভারত কথা কবিচন্দ্র ভাষে ।।
(আদিপর্ব, সা. ২২৪৭; পু. পৃ. ৩ ক ; ১০৮৩ সন)

'অনাদিমঙ্গলে' কবি একবার বলিয়াছেন :-

রাজা রঘুনাথ ভুবনে বিখ্যাত
নিবাস তাহার দেশে । (সা. ২৬৭১. পু. পৃ. ৬১)

অতএব রাজা রঘুনাথ সিংহের (২য়) সঙ্গেও কবির ক্ষীণ যোগসূত্র থাকা অসম্ভব নয় । কবি দীক্ষাগুরুর মতই, রচনাক্ষেত্রে, কবিগুরু বাল্মীকি এবং ব্যাসাচার্যের বন্দনা করিয়াছেন। কবির রামায়ণে বাল্মীকির বন্দনা থাকিলেও সর্বত্র ব্যাসদেবের প্রশস্তির ছড়াছড়ি।

ব্যাসের বর্ণন গাথা রামলীলা রসকথা
কবিচন্দ্র চক্রবর্তী কয় ।। (সা.চি. ২৫০, পু. পৃ. ২২ক)

অতএব মহাভারতের মত রামায়ণেও ব্যাস-বন্দনাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বাল্মীকি বন্দনা পাওয়া যায় স্বল্প ক্ষেত্রে । অধ্যাত্ম রামায়ণের সঙ্গে কবিচন্দ্র বাল্মীকির নামও যুক্ত করিয়াছেন কোনও কোনও স্থলে ।

ব্যাসদেব কবিকে স্বপ্নে ব্রাহ্মণের বেশে দেখা দেন । কবির 'প্রহ্লাদ চরিত্র' পালায় সেকথার উল্লেখ আছে।

শিব শঙ্করে গান ব্যাসের আদেশে ।
স্বপ্নেতে করিলা কৃপা ব্রাহ্মণের বেশে ।। (বি.সা. ৪৩৫, পু. পৃ. ৬)

ব্রাহ্মণবেশী এই ব্যাসদেব ছিলেন কবির কাব্যরচনার মূল প্রেরণাদাতা ।

স্বপ্নে এবং জাগরণে ব্যাসদেব ও তাঁহার ভাগবতের প্রচারই ছিল কবির একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান ও তপস্যা। ব্যাসদেবের পরেই কবির আর এক শ্রদ্ধাভাজন পুরুষ বৈষ্ণব ভক্ত অভিরাম গোস্বামী। যিনি খুব সম্ভব খানাকুল কৃষ্ণনগর হইতে বিষ্ণুপুরে মদনমোহনের খ্যাতি শ্রবণ কবিয়া দর্শন করিতে আসেন।

পাকুড়ের মহারাজা পৃথ্বীচন্দ্র দেবশর্ম্মণ স্বাক্ষরিত ১৭৩৭ শকে (সন ১২২২ সালে, তারিখ ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ইং ১৮১৫) রচিত "গৌরীমঙ্গল" কাব্যে কবিচন্দ্রের 'গোবিন্দমঙ্গল' কাব্যখানির উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫] উহাতে বাল্মীকি, কৃত্তিবাস হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবিকুলের সঙ্গে কবিচন্দ্রের নাম এক পংক্তিভুক্ত হওয়ায়, তিনি যে মধ্যযুগের সাহিত্যবাসরে যথেষ্ট প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহাই প্রমাণিত হয়। পৃথ্বীচন্দ্রের রচনা অংশতঃ উদ্ধৃত হইল :—

"বাল্মীক করিল ভাষা দ্বিজ কৃত্তিবাস
মনসামঙ্গল ভাষা হইল প্রকাশ ॥
মুকুন্দ পণ্ডিত কৈলা শ্রীকবিকঙ্কণ।
কবিচন্দ্রে গোবিন্দমঙ্গল বিরচন" ॥[৬]

এই কবি প্রশস্তিতে বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ কবিকুলের কাব্যসমূহের সঙ্গে কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গলের উল্লেখ থাকায় তাঁহার কবিখ্যাতি, কবির মৃত্যুর প্রায় অর্ধ শতাব্দীকালের মধ্যেই সমগ্র বঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তাঁহার ধর্মমূলক কাব্যসমুদয় পালাকারে প্রচার লাভ করে। কেননা কবিচন্দ্রের রচিত পাঁচটি বড় কাব্যের মধ্যে কোনও রচনাই কোনও পুথিঘরে সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া যায় না। এই অসুবিধার জন্যই বোধকরি তাঁহার কবিত্বশক্তি সম্যক্ নিরূপণ করা সম্ভব হয় নাই।

কবিচন্দ্রের দৌহিত্র বংশীয় পণ্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় কবিজীবন সম্পর্কে সর্বপ্রথম আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। কবিচন্দ্র রচিত "ভাগবতামৃত শ্রীশ্রী গোবিন্দমঙ্গল" (১৩৪১ স্যলে প্রকাশিত) নামক গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক মাখনবাবু লিখিয়াছেন, "প্রাচীন বাঙ্গলা ভাষা কিরূপে ক্রমপুষ্টি বা ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে তাহার বিস্তর নিগূঢ় তত্ত্ব কবিচন্দ্র বিরচিত গ্রন্থরাশি মধ্যে লুক্কাইত আছে। ঐ গ্রন্থগুলির সমস্তই প্রায় সুকোমল বৈষ্ণবীয় ভাষাভাবে বিরচিত, অতিশয় মধুর চমৎকার দৃশ্য কাব্য"।[৭] কিন্তু তিনি কবির সম্পর্কে যে সকল তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন তাহা সর্বক্ষেত্রে একেবারে অভ্রান্ত নয়। তিনি কবিচন্দ্রকে চৈতন্য-পরিকরদের সমসাময়িক মনে করিয়াছেন। তাঁহার মতানুসরণ করিয়া ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন — 'বোধহয় নিত্যানন্দ ঘোষ হইতেও বিশিষ্টতর একজন কবি তাঁহার সমসময়ে মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইঁহার নাম শঙ্কর এবং

উপাধি ছিল 'কবিচন্দ্র' ।[৮] এইরূপ অনুমানের কারণ 'চৈতন্যভাগবত' -এ কবিচন্দ্র এবং নিত্যানন্দ নামে দুই মহান্তের একত্রে উল্লেখ হইতে হইয়া থাকিবে । কিন্তু এই কবিচন্দ্র ভিন্ন ব্যক্তি এবং শঙ্কর চক্রবর্তী যে চৈতন্যদেবের বহু পরবর্তীকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাও পরে আলোচিত হইবে ।

অধ্যাপক মণীন্দ্র মোহন বসু কবিচন্দ্রের বিভিন্ন কাব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া যে সারগর্ভ মন্তব্য করিয়াছেন তাহা সবিশেষ লক্ষণীয় :—
"কবিত্ব সম্পদে কবিচন্দ্রের কাব্য শ্রেষ্ঠস্থানীয় না হইলেও সরল ও প্রাঞ্জল রচনার জন্য যে ইহা লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল, তাহা কতকগুলি পালার অত্যধিক প্রচার হইতেই বুঝিতে পাবা যায় । .... যে কোন পুথিশালায় কাশীরামের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের ন্যায় কবিচন্দ্রের পালাগুলির অনুলিপিও প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত দেখিতে পাওয়া যায় । ইহা হইতে মনে হয় যে, উক্ত দুই বিখ্যাত কবির প্রাধান্য স্বীকার করিলেও কবিচন্দ্র এদেশে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিলেন" ।[৯] মঙ্গলকাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় কবিচন্দ্রের রচনা সম্পর্কে বলিয়াছেন, —"কবিচন্দ্র শঙ্করের রচনা নিতান্ত সহজ ও সরল । তাঁহার বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোনও বিষয়েই তাঁহার পাণ্ডিত্যের অভাব ছিল না । কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্য তাঁহার সহজ কবিত্ব বিকাশের পক্ষে কোনও অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে নাই" ।[১০]

ড. সুকুমার সেন অবশ্য অতি সংক্ষেপে কবির জনপ্রিয়তার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করিয়াছেন :—
"প্রাপ্ত পুঁথির সংখ্যা বিচার করিলে ইঁহাকে পুরানো কবিদের মধ্যে অত্যন্ত উচ্চ স্থান দিতে হয়" ।[১১]

কবিচন্দ্রেব রচনার পরিমাণ এবং বিষয় নির্বাচনের সাধারণ আলোচনা প্রসঙ্গে ড. শ্রীকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, "......................কবিচন্দ্র শ্রী শঙ্কর চক্রবর্তী মধ্যযুগেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি । বর্তমান পুঁথি সংগ্রহে তাঁহার যে নানা বিষয়ক রচনা সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও বিষয় নির্বাচনের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে আব কোন সংশয় থাকে না । রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, অন্যান্য পুরাণ, বৈষ্ণবশাস্ত্র সমস্ত বিষয়েই তাঁহার সমান অধিকার ও সমস্ত হইতেই তিনি রস আহরণ করিয়া পাঁচালী আকারে সর্বসাধারণের মধ্যে পরিবেশন করিয়াছেন। উদ্ধৃতি সমূহ হইতে তাঁহার রচনার প্রসাদগুণ ও প্রাঞ্জলতা সুপরিস্ফুট । তাঁহার রচনার পরিমাণ ও বিভিন্ন পুঁথির সংখ্যাধিক্যও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে । তাঁহার সমস্ত রচনা একত্র করিয়া প্রকাশ করিলে তাহা বিরাট আকার ধাবণ করিবে, ও তিনি যে ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলার মানস সংস্কৃতি ও চিন্তাধারাব প্রতিনিধিস্থানীয় কবি ছিলেন তাহাও সুস্পষ্ট হইযা উঠিবে" ।[১২]

ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কবিচন্দ্রের বিভিন্ন রচনা সম্পর্কে যে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কবির রচনাশক্তি নির্ধারণের সহায় মাত্র। 'রামায়ণ' সম্পর্কে তাঁহার অভিমত, —"কবিচন্দ্র প্রতিভার দিক দিয়া কখনই কৃত্তিবাসের সমকক্ষ নহেন, কিন্তু তাঁহার রচনার কোন কোন অংশ কৃত্তিবাসের সমতুল্য তাহা স্বীকার করিতে হইবে।" কবিচন্দ্রের 'গোবিন্দমঙ্গল' সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য এইরূপ—"এই পর্বের মধ্যে সাহিত্যিক উৎকর্ষ বিচারে কবিচন্দ্র উপাধিক শঙ্কর চক্রবর্তীকৃত 'গোবিন্দমঙ্গল' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।........................ কবি কখনও সহজ সরল ভাষায়, কখনও বা আলঙ্কারিক ভাষায় বেশ নিপুণতা দেখাইয়াছেন।"[১৩]

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকগণের মতামত আলোচনার দ্বারা এই তথ্যটি প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য যে, কবিচন্দ্র ছিলেন মধ্যযুগের ভক্তিমূলক সাহিত্যের সহজ সরল আবেদনে প্রাণবন্ত এক বিপুল সাহিত্য ধারার শেষ বাণীবাহক।

কবি-জীবনকথা কবির পল্লীবাসী কোনও এক স্মৃতি-মুগ্ধ ভক্তের কবি-প্রশস্তি দ্বারা শেষ করি :—

হে কবি !
কবীশ মাঝে কবিচন্দ্র তুমি,
তব পূত পদরজে ধন্য মল্লভূমি।
বত্নাকব নহ, তবু, রত্নের আকর,
আপন প্রতিজ্ঞা বলে রচেছ স্বাক্ষর
অনন্ত পিয়াসী বুকে, হে কবি।
নব বাল্মীকর তুমি প্রতিচ্ছবি।
তুমি আজি অকৃত্রিম তুমি সবাকার।
নহ শুধু পানুয়ার সম্পদ একার।
ঘাত প্রতিঘাতে ছিন্ন হয়েছে অন্তর
হিমাদ্রির মত স্থির ছিলে নিরন্তর।
নিয়েছিলে ধ্যান মৌনী সাধনার ব্রত
বল্মীক আবৃত তথা বাল্মীকির মত।
মনের মন্দিরে গড়ি মূরতি তোমার
আরতি চলিবে নিত্য এদীন হোতার।[১৪]

রাধিকা প্রসাদ রায়,
শিক্ষক, পানুয়া কবিচন্দ্র হাইস্কুল।

আবির্ভাব কাল :-

কবিচন্দ্রের আবির্ভাব ও তিরোভাব কাল একপ্রকার অনিশ্চিত থাকায় কবির রচনায় প্রাপ্ত মল্লরাজাদিগের নাম ও তাঁহাদের প্রদত্ত ভূমির পরবর্তী দলিলের সন তারিখ দ্বারা কবির সম্ভাব্য সময়কাল নিরূপণের চেষ্টা করিতে হইয়াছে।

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন এবং পণ্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায়, কবিচন্দ্রের এই দুই প্রথম অনুসন্ধিৎসু গবেষক, কবিচন্দ্রকে চৈতন্য মহান্তভুক্ত মনে করিয়া নানা বিভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছিলেন। এই সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় গঙ্গাগোবিন্দ রায় লিখিয়াছেন — "দুর্জন সিংহের পুত্র রঘুনাথ সিংহ দেবের (২য়) সময় কবিচন্দ্রের 'রামায়ণ' হয়, ... কেননা ইহা স্থির নিশ্চয় যে, কবিচন্দ্র গোপাল সিংহের সময় বর্তমান থাকিয়া মহাভারত রচনা করেন"।[১৫]

অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে, কবিচন্দ্র মল্লনৃপতি বীর সিংহের(২য়) সময় হইতে গোপাল সিংহদেবের (১ম) সময় পর্যন্ত বর্তমান থাকিয়া সাহিত্য সাধনা দ্বারা খ্যাতি অর্জন করেন। এই সময়কে আমরা খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ কালরূপে চিহ্নিত করিতে পারি। ডঃ সুকুমার সেন কবিচন্দ্রকে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর কবির শ্রেণীতে ধরিয়াছেন।[১৬] আধুনিক সমালোচকগণ সাধারণতঃ এই মতই পোষণ করেন।

আমরা অনুমান করি যে, ১৬৪০-৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কবির জন্ম হইয়া থাকিবে। আবাব দেখা যায়, ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভাস্কর রাও-এর নেতৃত্বে মল্লভূমে সর্বপ্রথম বর্গীর আক্রমণ ঘটে।[১৭] স্বয়ং মদনমোহন কর্তৃক দলমর্দন কামানের সাহায্যে বর্গী বিতাড়ন কাহিনী পরবর্তীকালে মল্লভূমেব বহুকবিব, রতন কবিরাজ হইতে আরম্ভ করিয়া জয়কৃষ্ণ দাসের সময় পর্যন্ত বচিত, 'মদনমোহন বন্দনা'তে পাওয়া যায়। অথচ কবিচন্দ্রের কাব্যে সে বিষয়ের উল্লেখ মাত্র নাই। ইহা হইতেও অনুমান করা যায় যে, কবি উক্ত ঘটনার সঙ্গে একেবাবে পরিচিত ছিলেন না। খুব সম্ভব ঐ ঘটনার পূর্বে তিনি লোকান্তরিত হইয়াছেন নচেৎ মদনমোহনের এই অলৌকিক কীর্তিকলাপ জনসমক্ষে প্রচার করিতে তিনি কখনই বিস্মৃত হইতেন না। মল্লভূমে বর্গী বিতাড়নের পূর্বেই যে কবি দেহত্যাগ করিয়াছেন তাহার আভাস পাই কবিচন্দ্রের বর্তমান বংশধরদের দ্বারা সংরক্ষিত এবং মল্লরাজা গোপাল সিংহ কর্তৃক প্রদত্ত কিছু ভূসম্পত্তি দানের দলিলে।[১৮] ইহাদের আলোচনা নানাদিক হইতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই দানপত্র বা দলিলসমূহ হইতে তিনটি বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; যথা :—

এক। ১(ক) নং দলিলে শঙ্কর চক্রবর্তীর নামের সঙ্গে 'কবিচন্দ্র' কথার উল্লেখ।

দুই। ঐ দলিলে ১০৪৪ সনেব ৭ই শ্রাবণ (মল্লাব্দ) কবিচন্দ্রের নামে ওয়াকা দাখিল জমি, ১০৪৫ সনের ১১ই আশ্বিন (মল্লাব্দ) পুত্র শ্রী কুঞ্জবিহারীকে প্রত্যর্পণেব কালে 'শঙ্কর' নামের পূর্বে 'শ্রী' শব্দের বর্জন।

তিন। সমস্ত দলিলে উল্লিখিত প্রাপকও হাল দখলকারীদের নামের সঙ্গে কবিচন্দ্রের বংশ তালিকার মিল, এবং অধিকাংশ দলিলে উপরিউক্ত ১০৪৫ মল্লাব্দের উল্লেখ।

১(ক) নং দলিলটি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, মল্লাবনীনাথ শ্রীশ্রীগোপাল সিংহ দেব কর্তৃক পূর্বে কবিচন্দ্রকে প্রদত্ত ২৮ বিঘা জমি, ১০৪৪ মল্লসনের ৭ই শ্রাবণ তারিখ পর্যন্ত কবির নামে ওয়াকা দাখিল ছিল। পরে পুত্র শ্রীকুঞ্জবিহারী চক্রবর্তীকে ১০৪৫ মল্লাব্দের ১১ই আশ্বিন তারিখ উক্ত জমিব মালিকানা পরিবর্তনের কালে কবিচন্দ্রের নামের পূর্বে 'শ্রী' শব্দ বর্জিত হওয়ায় অনুমান হয়, উক্ত তারিখের (১১ই আশ্বিন, ১০৪৫ মল্লাব্দের) পূর্বে কবি লোকান্তরিত হইয়াছেন। কবির অবর্তমানে কবিপুত্রকে ঐ সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে। আর এইহেতু পুত্রেব নামের পূর্বে 'শ্রী' যুক্ত আছে অথচ পিতার নামের পূর্বে তাহা নাই। দলিলে প্রাপ্ত এই ১০৪৪-৪৫ মল্লাব্দ, ১৭৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দের সমার্থক। অতএব মল্লভূমে বর্গী আক্রমণের পূর্বেই যে কবির জীবনদীপ নির্বাপিত হইয়াছিল (১৭৩৮-৩৯ খ্রীঃ), তাহাতে সন্দেহ নাই। অপরপক্ষে, ১০৪৪ সনে (মল্লাব্দ) 'মহাভারত' রচনার জন্য কবিচন্দ্র উক্ত দান গ্রহণ কবিয়াছিলেন মনে করিলে, পরের বৎসরই ১০৪৫ সনে (মল্লাব্দ) কবির জীবিতাবস্থায় রাজা ঐ জমির স্বত্বাধিকার কবিপুত্রকে দিবেন, এইরূপ মনে করিবার পক্ষে কোনও যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কবির বর্তমান উত্তরাধিকারীদের নিকট এখন এই দলিলসমূহের প্রয়োজন থাকুক আর নাই থাকুক, কবির জীবন আলোচনা প্রসঙ্গে ইহাদের একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। দলিলে প্রাপ্ত পুত্রদ্বয়ের নাম কবির ভণিতাতেও পাওয়া যায়।

চক্রবর্তী মুনিরাম অশেষ গুণের ধাম
তস্য সুত শ্রী কবি শঙ্কব।
বিনাশিয়া বিঘ্নপুঞ্জে প্রভু রক্ষাকর কুঞ্জে
লক্ষ্মণে রাখিবে গদাধর ॥

(সা. ১৭২১, পু. পৃ. ৩, ১৭৩৫ শক।)

এই কুঞ্জ ও লক্ষ্মণ, দলিলে প্রাপ্ত কুঞ্জবিহারী ও লক্ষ্মীকান্ত, কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর দুই সুযোগ্য সন্তান। কবির তিরোভাব কালের অনুমান এবং উত্তর পুরুষদের পরিচয়ের বিবরণ বর্তমানে এই দলিলসমূহের একমাত্র পরিচয়।[১১] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণনামূলক পুথির তালিকায় (১ম খণ্ড, ১৯২৬, পৃ. ১৩৯) নকুল নামে এক পুত্রের উল্লেখ থাকিলেও

আমরা উক্ত পুথিতে উহার পাঠ 'নন্দনে' পড়িয়াছি ; যথা :—

কবিচন্দ্র বলে প্রভু রক্ষা কর কুঞ্জে ।
দয়ানিধি নন্দনে রাখিবে বিঘ্নপুঞ্জে ।

(লক্ষ্মণের শক্তিশেল, ক.বি. ১৭৯, পু. পৃ. ১৪)

পূর্বে বর্ণিত দলিলসমূহের সঙ্গে কবিচন্দ্রের বংশ তালিকার একটি সুন্দর মিল আছে। বংশ লতিকাটিতে কোথাও সন্দেহজনক তথ্য নাই । কবির উত্তরপুরুষেবা কবির স্বগ্রামেই বসবাস করিতেন এখনও তাঁহাদের অনেকের সন্ধান পাওয়া যায় । কবিচন্দ্র গোপাল সিংহের (১ম) রাজ সভাকবি ছিলেন । খুব সম্ভব এইহেতু কবিকে বিষ্ণুপুর রাজসভায় উপস্থিত হইতে হইত । কিন্তু কবির স্বগ্রাম পানুয়া হইতে বিষ্ণুপুর রাজধানীর দূরত্ব প্রায় ১৮-২০ মাইল । জীবন-সায়াহ্নে সভাকবির পদ অলঙ্কৃত করিতে এই দীর্ঘ পদযাত্রা কবিব পক্ষে কষ্টকর বোধ হওয়ায় খুব সম্ভব এই সময় তিনি বিষ্ণুপুরের অনতিদূরে চাকদহ গ্রামে বসবাস করিতেন । রাজা গোপাল সিংহের (১ম) পূর্ব হইতেই কবির মল্লরাজসভায় যাতায়াত ছিল । পবে বার্ধক্য হেতু কবি চাকদহে থাকিবার নির্দেশ পান । সেই সময় হইতে কবিচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উক্ত গ্রামের একটি পুকুর 'কবিচন্দ্র পুকুর' নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে ।

বংশ পরিচয় ঃ—

কবিচন্দ্র পরিবারের আসল পদবী বন্দ্যঘটীয় বা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু পৌরোহিত্য পেশার জন্য এই বংশ ভট্টাচার্য পদ লাভ করেন। পরে কবিচন্দ্রের পিতামহ নিত্যানন্দের সময় হইতে তাঁহারা রাজসম্মানসূচক এই চক্রবর্তী পদবী প্রাপ্ত হন। নিত্যানন্দ রাজসভার পণ্ডিত ছিলেন। ভূমিদানের দলিলসমূহেও এই চক্রবর্ত্তী পদবী লিখিত হইয়াছে। ইঁহাদের গোত্র শাণ্ডিল্য এবং প্রবর 'দেবল'। কুলীন ফুলিয়া মেলের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ এবং গৃহেব আদি দেবতা গোপাল ও রঘুবীর। বর্তমানে দেবগৃহে রঘুবীর, গোপাল ও দামোদর শিলা এই তিন বিগ্রহ নিত্য পূজিত হন। কবিচন্দ্র এই রঘুবীর ও দামোদরকে সর্বদা ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। এই সম্পর্কে স্মরণীয় যে, প্রাণাধিক পুত্রদের কল্যাণের নিমিত্ত রঘুবীর ও গদাধবের নিকট কবি কৃপা ভিক্ষা করিয়াছেন ;

বিনাশিয়া বিঘ্নপুঞ্জে প্রভু রক্ষা কর কুঞ্জে
লক্ষ্মণে রাখিব গদাধর॥ (সা. ১৭২১. পু.পৃ.৩)

কবিব সম্পর্কে প্রচলিত জনশ্রুতিগুলির অধিকাংশই কবির পাণ্ডিত্য ও ভক্তি শ্রদ্ধামূলক। ধর্মেব ব্যাপারে এখন এই পরিবারের একটি প্রধান বিশেষত্ব, ইঁহারা গৃহে পূজিত একমাত্র দামোদর ভিন্ন অন্য কোনও দেবতার পূজার্চনা করেন না। কবিচন্দ্রের অবিস্মরণীয় স্মৃতিরক্ষা

করাই হয়ত এই প্রথার একমাত্র উদ্দেশ্য। বর্তমান সময়ে কবিগৃহে হুগলী জিলার বেলেভদ্রপুর হইতে আগত রামায়েত-বৈষ্ণব রামায়ণ গায়কেরা চৈত্র মাসে রামায়ণ গান করেন। মধ্যরাত্রি অবধি এই গান গীত হইয়া থাকে। আর সম্পূর্ণ বৈশাখ মাস ব্যাপী পাঠ হয় ভাগবত । গৃহের কর্তা, বর্তমানে লোকান্তরিত অরবিন্দ চক্রবর্তী, মাঝে মাঝে এই পাঠকার্য সুসম্পন্ন করিতেন । গ্রামে প্রতিষ্ঠিত কবিচন্দ্র বিদ্যালয়ের জমিটিও এই বংশেরই দান । তাহারই সম্মুখে প্রাচীন শিব মন্দিরে প্রত্যহ হরিনাম সংকীর্তন হইয়া থাকে । কবিচন্দ্র বংশে জন্ম হইলে সকলকেই বিদ্যায়তনের সুযোগ্য বিদ্যার্থীরূপে প্রমাণিত করিতে হইবে, শিক্ষকেরা এইরূপ আশাই পোষণ করিতেন । অন্যথা হইলে সুরেন্দ্র নারায়ণ পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট বাক্যবাণে জর্জরিত হইতে হইত, —

"কবিচন্দ্র কুল-ভূষণ
আঁধার ঘরের উজ্বল রতন ।"

বংশের বিদ্যানুরাগ —

কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর পিতা মুনিরাম চক্রবর্তীর একটি চতুষ্পাঠী ছিল । এই চতুষ্পাঠীতে তিনি নিত্য অধ্যাপনা করিয়া মল্লরাজাদের নিকট হইতে সামান্য মাসোহারা লাভ করিতেন । খুব সম্ভব প্রথম রঘুনাথ সিংহের নিকট হইতে উক্ত কর্মের জন্য আধুনিক 'জলপানি' শব্দের মত তৎকালীন 'মুড়ি খাবার জমি' (৯ বিঘা) নামে প্রদত্ত দান তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন । কবিচন্দ্রও পিতার পরিচয় প্রসঙ্গে তাঁহাকে 'অশেষ গুণের ধাম' বলিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন ।

চক্রবর্তী মুনিরাম অশেষ গুণের ধাম
তস্য সুত কবিচন্দ্র গায় । (সা. চি. ২৫০, পু.পৃ. ২৬)

নানা গুণের আধার এই মুনিরামের পাণ্ডিত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই মল্লরাজা রঘুনাথ সিংহ (১ম) কর্তৃক ঐ বৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছিল । কাজেই দেখা যায়, রাজ দববারের সঙ্গে কবিচন্দ্রের পূর্বকাল হইতেই এই পরিবারের যোগাযোগ ছিল । কবিচন্দ্র নিজেও মল্লরাজা গোপাল সিংহ কর্তৃক 'বীরবৌলী' নামক সম্মানসূচক অলঙ্কার এবং ব্রহ্মোত্তর ভূমি দানস্বরূপ লাভ করেন । তাঁহার পুত্র কুঞ্জবিহারীও সাহিত্য রচনা দ্বাবা যশস্বী হইয়াছিলেন । তিনি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন 'কথকচন্দ্র' । তবে তাহা মল্লরাজাদের প্রদত্ত বলিয়া মনে হয় না ।

কবিচন্দ্রের ষষ্ঠ অধস্তন পুরুষ সুরেন্দ্রনাথের রচিত 'সরল চণ্ডী' (সন ১৩৩৪ সাল ১১ই ভাদ্র) এবং সপ্তম অধস্তন পুরুষ অরবিন্দ চক্রবর্তী রচিত 'দুর্গাপূজা ও কার্তিক পূজা'

বিষয়ক পুথি কবিগৃহে পাওয়া যায়। অরবিন্দ চক্রবর্তী মহাশয়ের দশকর্মা বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্য গ্রামে সর্বজন পরিচিত। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি পুঁথি ভিন্নই সমস্ত মন্ত্রাদি সংক্রান্ত কাজকর্ম সুসম্পন্ন করার ক্ষমতা রাখিত। ইঁহারা কবিচন্দ্রের প্রপৌত্র রামহরির পুত্র মধুসূদনের বংশধর। এই বংশধরেরাই এখন পানুয়া গ্রামে কবিচন্দ্রের বাস্তুভিটায় বসতি রক্ষা করিতেছেন।

এই রামহরির দ্বিতীয় পুত্র সুধারামের পুত্র অর্থাৎ কবিচন্দ্রের পঞ্চম অধস্তন পুরুষ ধ্রুব এবং যোগীন্দ্র পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে উভয়েই সক্রিয় অংশ গ্রহণ কবেন। যোগীন্দ্র পানুয়া গ্রামের একজন জননেতারূপে সমগ্র গ্রামে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নারীরাও এই আন্দোলনে রেশমী চুড়ি ও বিলাতী কাপড় বর্জনের দ্বারা নিজেদের চেতনা জাগ্রত করেন। যোগীন্দ্র ছিলেন কোতলপুর উচ্চ বিদ্যালয়েব পণ্ডিত আর ধ্রুব গ্রামেই শিক্ষকতা করিতেন। ধ্রুবের পুত্র সত্যনারায়ণও ছিলেন আজন্মকাল শিক্ষক। কবিচন্দ্রের ষষ্ঠ অধস্তন পুরুষ এবং রামহরির দ্বিতীয় পুত্র সুধারামের বংশধর হৃষীকেশের রচিত একখানা সংস্কৃত ব্যাকরণের পুথি (সন ১২৮৮ সাল তা. ২৪ ফাল্গুন) পাওয়া যায়।

কবিচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র লক্ষ্মীকান্তের (লক্ষ্মণ) চতুর্থ অধস্তন এবং কবিচন্দ্র হইতে পঞ্চম অধস্তন পুরুষ হারাধন। তাঁহার রচিত 'স্মৃতি সর্ব্ব' সন ১২৭৪ সালে এবং 'সংস্কৃত সংক্ষিপ্ত বাল্মীকি রামায়ণ' (শকাব্দ ১৭৮৭) সন ১২৭৪ সালে লিখিত হইয়াছে। এই হাবাধনের নাম আমরা দলিলগুলির বিপরীত পৃষ্ঠায় পাইয়াছি, সন ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর আবেদনকারীর নাম হিসাবে।

গ্রাম পরিচিতি ঃ—

কবিচন্দ্রের পুথিতে উল্লিখিত পানুয়া গ্রাম অধুনা বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর হইতে প্রায় ১৮-২০ মাইল দক্ষিণ পূর্বে এবং লেগো গ্রাম হইতে ১ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে, দ্রাঘিমাংশ ৮৭° ৩২' এবং অক্ষাংশ ২২° ৫৭' -এর মধ্যে অবস্থিত। এই পানুয়া (জে.এল.নং ১৪৬) কোতলপুর থানার অধীন, ইহা হুগলী জিলার জয়রামবাটী হইতে ৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত হইলেও পানুয়া এবং পান্না (জে.এল.নং ১০৮) এক গ্রাম নয়। পানুয়ার প্রচলিত নাম পেনো এবং অধিকাংশ পুথিতে পাওয়া যায় 'পান্ব্যায়' বা 'পানুয়া' বা 'পান্বা'। পূর্বে পানুয়া শিবোমনিপুর থানার অধীন (জে.এল.নং ৫১) ছিল, কিন্তু ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে উহা কোতলপুর থানার অধীনে আসে। এই গ্রামের অনতিদূরেই লেগো (জে.এল. ১৪৫ নং), বালিঠ্যা (জে.এল.নং ১৪৪ নং), গ্রাম সাগরমেজে (জে.এল. ১৪১ নং) এবং

সাগরমেজে (জে.এল.নং ১৩৯ নং) ইত্যাদি স্থানের নাম পাওয়া যায় ।[১০]

গ্রামটির নাম পানুয়া হইল কেন, তাহার ইতিহাস পাওয়া যায় না । গ্রামটি আয়তনে বড় না হইলেও বেশ জনবহুল । ইহার জনসংখ্যা ১,২৩১ হাজার । গ্রামটি ব্রাহ্মণ-প্রধান হইলেও হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি বহু জাতির বাস ।[১১]

"পানুয়ার ইতিকথা" পুস্তিকায় তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্রামের বিস্তৃত বিবরণ তুলিয়া ধরিয়াছেন । উহার ভূমিকায় গ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ সম্পন্ন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রাধারমণ ঘটক মহাশয়ের মন্তব্যটি অত্যন্ত সার্থক, —"পানুয়া পুণ্যস্মৃতি কবিচন্দ্রের আবির্ভাব ক্ষেত্র এবং কবির পূত চরিত্র রসধারায় অভিসিঞ্চিত । এমনকি গ্রামের ধূলিকণার সহিত সাহিত্যরসের সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায় .... গ্রামটির উন্নতি বিধানে সাধারণের মধ্যে যে উদ্দীপনা ও উৎসাহের লক্ষ্মণ দেখিতে পাই তাহাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে পানুয়া অন্যান্য পল্লীর আদর্শস্থল হইয়া উঠিবে । ....[১২] ।

কবিচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতি রক্ষাকল্পে ১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত পাঠশালাটি ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে "পানুয়া কবিচন্দ্র বিদ্যায়তন", গ্রামের প্রধান পথটি 'কবিচন্দ্র সরণি' স্থানীয় জলাশয়টি 'কবিচন্দ্র পুকুর', স্থানীয় গৌরাঙ্গ আশ্রমটি 'কবিচন্দ্র সিদ্ধপীঠ' এবং লেগো গ্রামে 'কবিচন্দ্র মন্দির' (রায় বংশের ভিটায় বর্তমান ভগ্নস্তূপ সহ তুলসী-মঞ্চটি) ও মাধবগঞ্জের বর্তমান চিকিৎসালয়টি 'কবিচন্দ্র হাসপাতাল' নামে পরিচিত । পানুয়া রামকৃষ্ণ পাঠাগারের কর্মিবৃন্দ ও পল্লীর অত্যুৎসাহী শিক্ষানুরাগী বিশিষ্ট সজ্জনসমূহের সযত্ন প্রচেষ্টায় কবিচন্দ্রের স্মৃতি গ্রামবাসীর নিকট এখনও অম্লান । পল্লীর সার্বিক উন্নতিকল্পে তাঁহাদের উদ্যম ও প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ।

কবির ধর্ম্মমত ঃ—

শ্রীনিবাসাচার্যের প্রভাবে শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মমত কবিচন্দ্রের আর্বিভাবের পূর্ব হইতেই মল্লভূমের জনচিত্তে অক্ষয় আসন পাতিয়া রাখিয়াছিল । মল্লরাজা বীর হাম্বীর হইতে গোপাল সিংহ পর্যন্ত সকল নৃপতিই বৈষ্ণবভক্ত ছিলেন । কাজেই মল্লরাজ সভাকবি কবিচন্দ্র যে স্বভাবতঃই বিষ্ণুভক্ত হইবেন এইরূপ অনুমান স্বাভাবিক । তন্মধ্যে আবার তাঁহার বৃহৎ কাব্যগুলি রাম ও কৃষ্ণ বিষয়ক রচনা । সুতরাং তিনি যে পরম বৈষ্ণব-ভক্ত-কবি সে সম্বন্ধে কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । তবে তাঁহার রচিত 'শিবমঙ্গল' এবং 'অনাদিমঙ্গল' কাব্যে শিব ও ধর্ম্মঠাকুর লৌকিক দেবতা হইলেও বিষ্ণুরই অংশ । কবিকে প্রথম জীবনে আমরা শিবভক্ত রূপেই পাই । 'শিবমঙ্গল' কাব্যের অন্তর্গত 'মর্চ্ছধরা পালা'য় (সা. ৪১২) এইরূপ ভণিতা পাওয়া যায় —

বাগ্দিনীর কথা শুনি প্রভু দিল সায় ।

হরপদ আশে দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় ।।

'হরগৌরী সংবাদ' পালায় পাওয়া যায় হরগৌরীর কৃপা লাভের কথা ;

দ্বিজ কবিচন্দ্রে গান ভাবি ত্রিলোচন ।
হরগৌরী যারে কৃপা কৈল দুইজন ।।

(ক.বি. ২২৮৬, পু.পৃ. ১-২)

উপরের উদ্ধৃতিতে হরের কৃপালাভের অভীপ্সা ব্যক্ত হইয়াছে । কাব্যে তিনি লৌকিক দেবতা হইলেও অন্তরে তিনি স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের ধারক ত্রয়ম্ভূব শম্ভু । 'গৌরীমঙ্গল' পালায় (বি.ভা. ২০২) পাওয়া যায় —

জীবন পুত্তলি ছিল হইল আন্ধার ।
শ্রী কবি শঙ্কর গান হরপদ সার ।।

এই শিবানুরক্তি অবশ্য পরে বিষ্ণুপ্রীতিতে পরিণত হয় ।

রাঢ়ের প্রাচীন অভিমত এই যে, রাধাকৃষ্ণ-লীলোপাসনা, ধর্মঠাকুর ও শিবমাহাত্ম্য বন্দনা ইত্যাদি যত প্রকার উপাসনা রাঢ়ে প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল, সবই সূর্য পূজার অঙ্গ । রাঢ়ের প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা মনে করিতেন যেহেতু তাঁহারা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের বংশধর সেইহেতু সূর্য পূজাই তাঁহাদের আদিম এবং প্রধান ব্রত । কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ সর্বভূতে এক ব্রহ্মের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন । 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই ছিল তাঁহাদের সাধনার আদর্শ । কিন্তু তথাপি এক ঈশ্বরের বহুরূপ কখনও অস্বীকৃত হয় নাই । সর্বজীবের আধারস্বরূপ এক ব্রহ্মই আবার অনন্তরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন । সাধক যে কোনও স্থান কাল অথবা রূপের পূজারী হইলেও তিনি সেই একই পরমেশ্বরের অধীন । তৎসত্ত্বেও রুচির বৈচিত্র্য, সাধনার বিভিন্নতা সাধককে নানা ধর্মমতে আকর্ষিত করে । এই বৈচিত্র্যকে স্বীকার করিয়া জ্ঞান-তপস্বী বৈষ্ণব-ভক্ত কবিচন্দ্র আসল সত্যকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন । এই উপলব্ধি ছিল বলিয়াই ভক্ত কবির দৃষ্টি দিয়া রাম ও কৃষ্ণকে, শিব ও ধর্মকে এক করিয়া দেখিয়াছেন । কোনও অবস্থাতেই তাঁহাদের মধ্যে বিরোধাভাসের চিহ্ন পাওয়া যায় না । কবিচন্দ্রের রচিত 'দিগ্‌বন্দনা' বা 'মদনমোহন বন্দনা' বিশ্লেষণ করিলে এই কথাটি সুস্পষ্ট হয় । মল্লভূমের সমস্ত দেবদেবী বন্দনার সঙ্গে গুরুবন্দনা এবং মল্লবংশের প্রভূত শক্তির অধিকারী, নগর-ঈশ্বর মদনমোহনের বন্দনা করিয়াছেন । সেই সঙ্গে পানুয়ার দেব দামোদরকেও স্তুতি করিয়াছেন । কবিগৃহের কুলদেবতা রঘুবীর, গোপাল ও দামোদর । এই দামোদরের জন্য কবির প্রার্থনা এইরূপ :—

"পানুয়া ভিতরে বন্দ দেব দামোদরে ।
নিজগুণে দয়াময় কৃপা করে মোরে ।"[২২]

আবার 'রামায়ণ' রচনাকালে তিনি এই রঘুবীরের কৃপা ভিক্ষা করিয়াছেন ; যথা :—

"প্রভু দূর্ব্বাদল-শ্যাম রাম না হইও বাম
পরকালে কি হইবেক গতি ।
এত কয়ে মুনি যায় দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়
মল্লভূমি পানুয়ায় বসতি" ।।[১৪]

রাজা হবিশ্চন্দ্র, শুনঃশেফ,ভক্ত কাঠুরিয়া, দাতাকর্ণ জীবিতবাহন বা জীমূতবাহন, প্রহ্লাদ এবং শিবিরাজা প্রভৃতি ভক্তের আকুল আহ্বানে ভগবান কৃপা করিয়াছেন । কবিচন্দ্রের কাব্যে তাহাদেরই প্রাধান্য । ভক্তকে রক্ষা এবং দুষ্টকে সমুচিত শাস্তিদান তাঁহার অধিকাংশ পালার মর্ম্মমূলে নিহিত । ভক্তিমূলক সাহিত্যের অনুপ্রেরণা আসে সাধারণতঃ হৃদয়ের গভীর অন্তঃস্থল হইতে । সেখানে রাম ও রহিম, শিব ও কৃষ্ণ, নারায়ণ ও সত্যপীর সব এক । ধর্মের বাহ্যাবরণ হইতে তখন আসল সত্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে । তাহাতে শৈব-বৈষ্ণব, হিন্দু-মুসলমান নামক সাম্প্রদায়িক বেড়াজালও দূরীভূত হইয়া যায় । 'সব ঘটে একৈ আত্মা ক্যা হিন্দু মুসলমান' — ভক্তকবি দাদুর সুপ্রসিদ্ধ এই উক্তির মত সকল শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে ধর্মমত নিরপেক্ষ এক ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশিত হইতে দেখা যায় । কবিচন্দ্রের কাব্যেও কোনও রূপ ধর্মীয় সংকীর্ণতার অবকাশ নাই । কবি মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য রচনার পরিমণ্ডলে মানুষ, সেইহেতু যুগের প্রভাববশতঃ ভগবানের নানাছলে এই মর্ত্যে নামিয়া আসিয়া ভক্তকে রক্ষা করার কথা বলিয়াছেন । তাহা দ্বারা কোনও ধর্মীয় সংস্কার কিংবা ভ্রান্ত ধারণা প্রকাশিত হয় না । শোনা যায়, তিনি পানুয়ার ব্যাসাশ্রমে বসিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন । তাহা 'কবিচন্দ্র সিদ্ধ-পীঠ' নামে পরিচিত । এই সিদ্ধিলাভের জন্যই হউক অথবা বিপুল সম্ভার কাব্য রচনার জন্যই হউক, গ্রামে তিনি 'ব্যাসদেব' নামেই সুপরিচিত ছিলেন । কাব্যে যেখানে গুরুবন্দনা বা দেববন্দনা আসিয়াছে সেখানেই তিনি গভীর ভাবাবেগে আপ্লুত হইয়া পড়িয়াছেন । ভক্তির প্রগাঢ়তা পাওয়া যায়, ভাগবতের অন্তর্গত পালাসমূহে । 'প্রহ্লাদ চরিত্র' পালায় (বি.সা.৪৩৫, ১-১০ পত্র, খণ্ডিত) পাওয়া যায় —

গুরুপাদপদ্ম মুঞি বন্দ অতঃপর ।
গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু মহেশ্বর ।।
গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করে জেইজন ।
গুরুকে নিন্দিলে হয় নরকে গমন ।।
দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় করি একমন ।
স্বপ্নেতে করিলা দয়া মদনমোহন ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১)

গুরুর প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসই অচিরে সকল অজ্ঞানতা নাশ করিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রীতির স্বর্ণদ্বারে উপনীত করে ।

যে জন কৃষ্ণের দাস কে করিতে পারে নাশ
যম হৈতে নাহি তার ভয় ।
ভাবার্থ ভাবের ব্যাখ্যা ভক্তে প্রভু করেন রক্ষা
কবিচন্দ্র চক্রবর্তী কয় ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৭)

শ্রীকৃষ্ণই কবির সর্বশেষ আশ্রয়স্থল । তাঁহার চরণে নিজেকে সমর্পণ করিয়া কবি মুক্তি পাইতে চাহিয়াছেন । এইরূপ নিঃসীম ভক্তি এবং গভীর আত্মপ্রত্যয় একনিষ্ঠ সাধকের অন্তঃসত্তার নিগূঢ় চিন্তার ফল ।

"শ্রী কবি শঙ্কর বলেন প্রভুকর পার ।
তোমা বিনে অন্তকালে গতি নাঞি আর ।।"
(ক.বি. ৮৯০, পু. পৃ. ১৪ক)

রামায়ণের অনুপ্রেরণা :—

পানুয়া এবং তৎসংলগ্ন গ্রামে রামায়ণ কাহিনী নানা উৎসবের মাধ্যমে দীর্ঘকাল যাবৎ পরিবেশিত হইয়া আসিতেছে, যাহা সকল ধর্মপ্রাণ মানুষকে অতি সহজে রামায়ণের ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিতে পারে । এই সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় খুবই উল্লেখযোগ্য, যথা :—(ক) পানুয়ার পার্শ্ববর্তী চাতরা গ্রামে রাবণ কাটা রথ অনুষ্ঠান, (খ) বালিঠ্যা গ্রামে বামনবমীর দিন রামরাস উৎসব, (গ) পানুয়ার গৌরাঙ্গ পাড়ায় 'সীতারামজী' মন্দিরে নিত্য পূজারতির ব্যবস্থা এবং (ঘ) পানুয়ার গায়েনদের (কানাইলাল মুখোপাধ্যায়দের পূর্বপুরুষ) দ্বারা রামায়ণ গানেব প্রচার । এই রামায়ণাশ্রয়ী বিষয়সমুদয় কতদিন হইতে প্রচলিত আছে এবং কবিচন্দ্রের উপর ইহার প্রভাব কতদূর পড়িয়াছিল তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ না থাকিলেও তৎকালীন পল্লীবাসীর উপর আর্যসংস্কারের এই সহজ আদর্শ যে গভীরভাবে অনুভূত হইয়াছিল এবং তাহারই ফলে কবিচন্দ্রও যে রামায়ণ রচনার অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন তাহা একেবারে অস্বীকার করা যায় না ।[১১]

কাব্য রচনাকাল :—

কবিচন্দ্র মল্লভূমের রাজা বীরসিংহের (২য়) সময় হইতে রাজা গোপাল সিংহের (১ম) সময় পর্যন্ত বর্তমান থাকিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন । তাঁহার 'শিবমঙ্গল' কাব্যে পাওয়া যায় বীরসিংহ রাজার উল্লেখ ; যথা :—

১। "বীরসিংহ মহারাজা অবনীতে মহাতেজা
সদামতি ইষ্টের চরণে ।
সংকীর্তন অভিলাষী তাঁহার দেশেতে বসি
দ্বিজ কবিচন্দ্র রস ভণে[১২] ।।"

এই মহারাজা বীবসিংহ মল্লভূমের সুপ্রসিদ্ধ নৃপতি বীরসিংহ (২য়), যাঁহার রাজত্বকালে (আঃ ১৬৫৬-১৬৮২ খ্রীঃ) কবিচন্দ্র তাঁহার প্রথম কাব্য 'শিবমঙ্গল' খানি রচনা সমাপ্ত করেন।

২। 'শিবমঙ্গল' কাব্যেব পরবর্তী রচনা 'অনাদিমঙ্গল' এই কাব্যখানি রচিত হয় দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের রাজত্বকালে। কবি নিজের পরিচয় দিয়াছেন এইভাবে —

শ্রী কবি শঙ্কর ধর্মের কিঙ্কর
পাঁচালী প্রবন্ধে ভাষে।
রাজা রঘুনাথ ভুবনে বিখ্যাত
নিবাস তাঁহার দেশে ॥ (সা. ২৬৭১, পু. পৃ. ৬১)

অপর ভণিতায় আছে 'কবিচন্দ্র' উপাধির উল্লেখ ; যথা :—

দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় অনাদির বরে।
হরির (কৃপায় যার) পাপ যায় দূরে ॥
(সা. ২৬৭১, পু.পৃ. ৮০ক)

৩। রঘুনাথ সিংহেব (২য়) রাজত্বকালে রচিত কবির তৃতীয় গ্রন্থখানির নাম 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ', ভণিতা এইরূপ :—

"দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় পানুয়ায় বসতি।
রঘুনাথ সিংহের জয় কর রঘুপতি[২৭] ॥"

বংশপত্রানুয়ায়ী রঘুনাথ সিংহের (২য়) রাজ্য লাভের কাল ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দ। মল্লভূম আলোচনা কালে রঘুনাথ সিংহের (২য়) নাম চেতুয়া-বরদার বিদ্রোহেব (১৬৯৫-৯৬ খ্রীঃ) সঙ্গে অন্বিতভাবে পাওয়া যায়। এইহেতু কবিচন্দ্রের 'অনাদিমঙ্গল' এবং 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ'-এর রচনাকাল কোনও নির্দিষ্ট একটি সনের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের (আঃ ১৬৯৬-১৭১২ খ্রীঃ) মধ্যে রচিত বলিয়া অনুমান করি।

৪। কবিচন্দ্র বচিত 'গোবিন্দ মঙ্গল' বা 'ভাগবতামৃত' গ্রন্থটিতে স্পষ্টতঃ কোনও রাজার নাম পাওয়া যায় না। কবিচন্দ্রের একটি 'প্রসাদ চরিত্র বা 'প্রহ্লাদ চরিত্র' পালা যাহা তাঁহার 'ভাগবতামৃত'-এর অন্তর্গত, তাহাতে বিষ্ণুপুরের নগর-দেবতা মদনমোহনের স্তুতি পাওয়া যায় —

পূর্বেতে আছিলা প্রভু ব্রাহ্মণের ঘরে।
মল্লবংশে কৃপা করি আইলা বিষ্ণুপুরে ॥
নবরত্ন দিল রাজা দিব্য অট্টালিকা।

গোবিন্দ বামেতে শোভে শ্রীমতী রাধিকা ॥
সম্মুখে বলাঞা দিল কীর্তনের মেলা ।
জীবন মচ্ছব সদা বৈষ্ণবের খেলা ॥

(বি.সা. ৪৩৫, পু.পৃ. ১)

এই 'দিব্য অট্টালিকা' বিষ্ণুপুরে অবস্থিত রাজা দুর্জন সিংহ কর্তৃক নির্মিত সুপ্রসিদ্ধ মদনমোহন মন্দির, যাহা "মল্লাব্দে ফণিরাজ শীর্ষগণিতে" (১০০০) অর্থাৎ ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । কবিচন্দ্রের 'মদনমোহন বন্দনা'র অপর আর একটি পুথিতে মদনমোহনের চারিদিকে রাজা রঘুনাথ সিংহ কর্তৃক ইঁটের প্রাচীর নির্মাণ করিয়া দিবার কথা পাওয়া যায় ; যথা :—

পূর্বে ছিলেন মদনমোহন ব্রাহ্মণের ঘরে ।
মল্লবংশে কৃপা করি আল্যা বিষ্ণুপুরে ॥
বিষ্ণুপুর গ্রামখানি গুপ্ত বৃন্দাবন ।
তাহাতে বিরাজ করেন মদনমোহন ॥
বঘুনাথ সিংহ মহারাজা মনে বড় ধীর।
চৌদিগ বেড়িঞা দিল ইঁটার পাঁচীর ॥

(বি.ভা. ১১৪৮, পু.পৃ. ১)

এই রঘুনাথ সিংহ প্রথম অথবা দ্বিতীয় যিনিই হউন, খুব সম্ভব গোপাল সিংহের পূর্বেই কাব্যখানির অধিকাংশ পালা বচিত হইয়াছিল । অবশ্য ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, "কবি আপনার কাব্যকে 'ভাগবতামৃত', 'শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল' ইত্যাদি নামেও অভিহিত করিয়াছেন । বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহের আমলে এই কাব্য রচিত হয় ।"[১৮] কিন্তু আমরা এইরূপ কোনও প্রমাণ পাই নাই । ডঃ সুকুমার সেন স্পষ্টতঃ কোনও রাজাব নাম উল্লেখ না করিয়া একটি প্রাচীন 'প্রহ্লাদ চরিত্র' পালায় "দিগ্ বন্দনার মধ্যে বিষ্ণুপুরেব মদনমোহনের বৃত্তান্ত" থাকায দুর্জন সিংহের প্রতিষ্ঠিত মদনমোহন মন্দিরের নির্মাণকালেব কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[১৯] কাজেই 'প্রহ্লাদ চরিত্র' পালা 'ভাগবতামৃত'-এর অন্তর্গত, তাহাতে মদনমোহন বন্দনা থাকায, উহা দ্বারা কাব্যখানি গোপাল সিংহের (১ম) রাজত্বকালে লিখিত বলিয়া মনে হয় না । এই বিষয়ে অধ্যাপক মণীন্দ্র মোহন বসু লিখিয়াছেন, "এখানে রাজার নামের উল্লেখ না থাকিলেও এই মন্দির নির্ম্মাণকারী দুর্জন সিংহকেই যে লক্ষ্য করা হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায় ।"[২০]

মল্লভূমের অপরাপর কবিদের 'মদনমোহন বন্দনা'য় যেরূপ নানা যুদ্ধের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়, কবিচন্দ্রের বন্দনায় তাহার উল্লেখ নাই । গোপাল সিংহের রাজত্বকালে

বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের মল্লভূম আক্রমণ এবং বর্গী বিতাড়নের সুপ্রসিদ্ধ কাহিনী রতন কবিরাজের 'মদনমোহন বন্দনা'য় পাওয়া যায় ।[৬৮] কিন্তু কবিচন্দ্রের রচনায় কোনও যুদ্ধবিগ্রহ কিংবা ঈশ্বর মদনমোহনের দলমর্দন কামানেব সাহায্যে বর্গী বিতাড়নের উল্লেখমাত্র পাওয়া যায় না । অধিকন্তু ১০১৮ মল্লাব্দে (১৭১২ খ্রীঃ) অনুলিখিত কবিচন্দ্রের একটি 'রাসপঞ্চাধ্যায়' পালা যাওয়া যায়, তাহা দ্বারা মনে হয় ভগবতান্তর্গত উক্ত পালাটি গোপাল সিংহের (১ম) রাজত্বলাভের পূর্বে লিখিত ।[৬৯]

৫ । মহাভারত রচনার সময় কবিচন্দ্র লিখিয়াছেন —

শ্রীযুত গোপাল সিংহ নৃপতির আদেশে ।
সংক্ষেপে ভারতকথা কবিচন্দ্র ভাষে ।।

(আদিপর্ব, সা. ২২৪৭, পু.পৃ. ৩ ক, ১০৮৩ সন)

গোপাল সিংহের (১ম) আদেশে 'মহাভাবত' রচনার কথা কবিচন্দ্র এই কাব্যখানিতে বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন । অতএব মল্লরাজ গোপাল সিংহের (১ম) (১৭১২-১৭৪৮ খ্রীঃ) আদেশে তাঁহার সভাকবিরূপে কবিচন্দ্র তাঁহার সর্বশেষ গ্রন্থ মল্লভূমবাসীকে উপহার দিয়া যান ।

পাদটীকা

১। তারাপদ মুখোপাধ্যায় : কদম্বের আত্মকথা, পানুয়া বামকৃষ্ণ পাঠাগার, ১৯৬২, পৃ.২ ।

২। নিমাই দাস চট্টোপাধ্যায় : মল্লভূমির বিস্মৃত রত্ন, অভিযান পত্রিকা, ২০শ বর্ষ, ২৪শ সংখ্যা, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৬০ খ্রীঃ পৃ. ২ ।

৩। সুকুমার সেন : বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, অপরার্ধ (২য় সং, ১৯৬৫) পৃ. ৩৫৭, পাদটীকা ।

৪। মাখনলাল মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত : ভাগবতামৃত শ্রীশ্রী গোবিন্দমঙ্গল ১ম সং, ১৩৪১ সাল । ভূমিকা পৃ. ছয়।

৫। অবশ্য ড. দীনেশ চন্দ্র সেন 'গৌবীমঙ্গল' কাব্য ১৭২৮ শকে (১৮০৬ খ্রীঃ) বিরচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সং, ১৩৩৪ । ভূমিকা, পৃ. ১২) ।

৬। পাকুড় রাজ পৃথ্বীচন্দ্র বিরচিত বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত : গৌবীমঙ্গল, এশিয়াটিক সোসাসটি, ১৯৭১, পৃ. ৫১১

৭। মাখনলাল মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত : ভাগবতামৃত শ্রীশ্রী গোবিন্দমঙ্গল, শঙ্কর কবিচন্দ্র চক্রবর্তী বিবচিত, ১ম সং ১৩৪১ সাল । ভূমিকা, পৃ.এক-দুই ।

৮। দীনেশ চন্দ্র সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সং, ১৩৫৬, পৃ. ২৯২

৯। মণীন্দ্রমোহন বসু : বাঙ্গলা সাহিত্য, দ্বিতীয় খন্ড, ১ম সং, ১৯৪৭ খ্রীঃ, পৃ. ২৩৩

১০। আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ৬ষ্ঠ সং ১৯৭৫, পৃ. ২২২

১১। সুকুমার সেন : বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, অপরার্ধ (২য় সং ১৯৬৫) পৃ. ৩৫৭

১২। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ', সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থ সঙ্গমে, ১ম সং, ১৩৬৯, পৃ. ১০৮

১৩। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড, ১ম সং ১৯৬৬, পৃ. ১০৪৬ এবং পৃ. ৪৮৬

১৪। কবিতাটি পানুয়া কবিচন্দ্র বিদ্যালয়ের ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের পুস্তক তালিকায় মুদ্রিত ।

১৫। গঙ্গাগোবিন্দ রায় : 'মল্লভূমির প্রাচীন গ্রন্থকার কবিচন্দ্র ও মল্লনৃপতিগণ', অভিযান পত্রিকা, ৬ই জুন, ১৯৪৩ (দ্বিতীয় বর্ষ, ৪৮শ সংখ্যা); পৃ. ৫-৬

১৬। সুকুমার সেন : বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ২য় সং ১৯৬৫, পৃ. ৩৫৪, ৩৫৮-৩৫৯.

১৭। A. P. Mallik : History of Bishnupur Raj. 1921. P. 54.

১৮। দলিলের উভয় পৃষ্ঠায় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের উল্লেখ আছে। ১নং দলিলে 'লোকসান' এবং 'পড়া যায় নাই', ইত্যাদি লিখিত থাকায় উহা কোনও একটি মূল রূপ হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয়।

১৯। দলিলসমূহের বিবরণ হইতে গৃহীত।

২০। (i)J. List Book in Survey of West Bengal, Bakura. 1920. W.B., (ii)Report of the census of Bengal, 1872 A.D. এবং (iii)Census of India 1961, Vol. XVI, Part X B. 1971. উপরের এই তিন গ্রন্থ হইতে জে.এল. নং গৃহীত।

২১। তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় : পানুয়ার ইতিকথা, রামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৬৭ সাল। পৃ. ৭

২২। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত, ভূমিকা পৃ. এক-দুই

২৩। মাখনলাল মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত : ভাগবতামৃত শ্রীশ্রী গোবিন্দলাল, ১৩৪১। পৃ.৩

২৪। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃ. ৩

২৫। উক্ত সংবাদ দিয়াছেন পল্লীর বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৬। মাখনলাল মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত : ভাগবতামৃত শ্রীশ্রী গোবিন্দমঙ্গল, ১ম সং, ১৩৪১, ভূমিকা, পৃ. ছয়

২৭। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃ. ছয়

২৮। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড, ১ম সং, ১৯৬৬, পৃ. ৪৮৬।

২৯। সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ২য় সং, ১৯৬৫; পৃ. ৩৫৮-৫৯

৩০। মণীন্দ্রমোহন বসু : বাঙ্গালা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, ১৯৪৭ ; পৃ. ২২৮

৩১। এ. জি. ৩৫৬৬, ২-৬ পত্র, খণ্ডিত, ১২২৯ লিপিকাল।

৩২। বি.সা. ২৭/১১৯ নং. ১টি পত্র, ১০১৮ সন ২৬ জ্যৈষ্ঠ।

তৃতীয় অধ্যায়

।। দেশ ও কাল ।।

মল্লরাজ বংশ ঃ

মধ্যযুগে সামন্ত রাজাগণেব উৎসাহে বঙ্গদেশের বহু কবি কাব্য রচনায় উৎসাহ লাভ করেন । অধিকাংশ কবিই আপন উৎসাহদাতার নাম উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই । কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী এইরূপ এক রাজানুগৃহীত এবং রাজগুণ-মুগ্ধ কবি । তাঁহার কাব্যে যে সকল রাজার নাম ও স্থানেব উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা মল্লভূমের ।

(ক) 'এত কযে মুনি যায় দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়
মল্লভূমি পানুয়ায় বসতি'।।

(মাখনলাল মুখোপাধ্যায়, ভাগবতামৃত
শ্রীশ্রী গোবিন্দমঙ্গল, ১৩৪১, ভূমিকা, পৃ. ছয়)

(খ) কুঞ্জবিহাবীবে দয়া দেহ ধর্ম পদছায়া
মল্লভূমি পান্বায় বসতি ।

(সা. ২৬৭১, পু. পৃ. ৪৬)

কবি ও তাঁহার কাব্য আলোচনাকালে সমকালীন জীবন ও সাহিত্য চিন্তার পরিবেশটি অনুধাবনের নিমিত্ত রাজবংশের উত্থান-পতনের ইতিহাসটিও জানা প্রয়োজন । যেহেতু সাহিত্য বাজনীতির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল, সেইজন্য আমরা মল্লরাজবংশের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম ।

কবিচন্দ্রের কাব্যে মল্লভূমের উল্লেখ পাওয়া যায় । মধ্যযুগে পশ্চিম রাঢ়ের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন 'ভূম' নামে পরিচিত ছিল, যেমন— ব্রাহ্মণভূম, ভঞ্জভূম, শিখরভূম, ধলভূম এবং মল্লভূম প্রভৃতি । কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ছিলেন ব্রাহ্মণভূমের অধিবাসী আর কবিচন্দ্র ছিলেন মল্লভূমের । আধুনিক বাঁকুড়া জিলাও অনুরূপভাবে মল্লভূম নামে সুপরিচিত ছিল । প্রাচীনকালে পরেশনাথ পাহাড়ের সন্নিকটে হাজারীবাগ ও মানভূম জিলার অংশ বিশেষের নাম মল্লভূম ছিল বলিয়া জানা যায়[১] । খ্রীঃ ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুর রাজাদের জমিদারী মানভূম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । সেই সুবাদে এই ভূভাগের নাম মল্লভূম হইয়া থাকিতে পারে । অনেকের মতে মল্লদের দ্বাবা অধিকৃত ভূম মল্লভূম । একদা বাঁকুড়া জিলার বিষ্ণুপুর ও নেপালের প্রাচীন রাজবংশ মহাবীর্যশালী মল্লরাজবংশ নামে পরিচিত ছিল[২] । মাল উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল বলিয়াও ইহার নাম মল্লভূম হইয়া থাকিবে[৩]। আধুনিক গবেষকগণ এই মতই সমর্থন করেন । এই মল্লভূম বহুকাল কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল[৪] । সুতরাং ইহা একেবারে অর্বাচীন নাম নয় । আবাব ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী সীমারেখাটিও খুব স্পষ্ট নয় ।

মূলতঃ দ্বারকেশ্বর নদী বিধৌত এই মল্লভূম অঞ্চল উত্তরে দামোদর ও দক্ষিণে কংসাবতী নদী পরে মল্লরাজশক্তি সঙ্কুচিত হইলে শিলাবতী (শিলাই) নদীর তীরবর্তী ভূভাগ পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু এই মল্লভূমের সীমা চিবকাল এইরূপ ছিল না। রাজশক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার সীমারেখাও বহুদূর সম্প্রসাবিত হয়। সুবিখ্যাত গবেষক বেগলার ও কানিংহ্যাম সাহেব পাঞ্চেতে প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে অনুমান করেন যে, মল্লরাজত্ব পশ্চিমে প্রায় ছোটনাগপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 'শ্রী বীব হামীব' নামোল্লিখিত শিলালিপি দেখিয়া তাঁহারা এইরূপ ধারণা করেন[৫]।

মল্লবাজত্ব যে এক সময়ে উত্তবে সাঁওতালপবগণা হইতে দক্ষিণে মেদিনীপুর এবং পূর্বে অংশতঃ বর্ধমান জিলা হইতে পশ্চিমে ছোটনাগপুর (পাঞ্চেত) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সে কথার উল্লেখ স্যার ও' ম্যালীর প্রদত্ত বিবরণেও পাওযা যায ; যথা :—

"The country overwhich these Rajas ruled is called Mallabhum ; a term now used for the tract of country comprised in the thanas of Bankura (excluding the Chhatna out post), Onda, Bishnupur, Kotalpur and Indas. Originally, however, the term was applied to a more extensive tract of country. To the north it is believed to have stretched as far as the modern Damin - i - Koh in the Santal Parganas ; to the south it comprised part of Midnapore, and to the east part of Burdwan and inscriptions found at Panchet in the Manbhum district show that on the west it included part of Chotanagpur."[৮]

কিন্তু মল্লভূমের এই বর্ধিত সীমা একদিনে গডিয়া ওঠে নাই। সুবিখ্যাত ইতিহাসকার রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উল্লিখিত ষ্টারলিং বিপোর্ট History of Orissa, Vol-II, P. 23 এবং স্যার ও' ম্যালী বর্ণিত মল্ল রাজ্যেব এই সুবিশাল আয়তন ধাব হাম্বীর (মল্ল) ও বীর হাম্বীরের সময়কালের। অনুরূপ তথ্যও পাওয়া যায় সুপ্রসিদ্ধ গবেষক ওল্ডহ্যামের গ্রন্থে। তিনিও মনে করেন পশ্চিমে পাঞ্চেত হইতে উত্তরে আধুনিক দামিনী-ই-কো পর্যন্ত বিষ্ণুপুরের মাল অথবা বাগ্দীদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল :—

"Gopbhum, with part of the debateable land between it and Panchet now included in the modern Parganas Senpahari and Salimpur, was of course formerly in the great Mal or Bagdi Kingdom of Bishtupur, which stretched far into Birbhum and up to the modern Damin-i-Koh."[৭]

উপরে বর্ণিত তিন প্রধান গবেষকের গ্রন্থে আমবা মল্লভূমের যে সুবিশাল আয়তনের কথা জানিতে পাই তাহা খুব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। আর একটি বিবরণ হইতে জানিতে পারি

যে, বীর হাম্বীরের প্রপৌত্র দুর্জন সিংহের সময়ে এই বিশাল মল্লভূমের আয়তন যথেষ্ট হ্রাসপ্রাপ্ত হয় । ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় 'দেশাবলি বিবৃতি' অনুবাদ করিয়া যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তাহার অংশ বিশেষ এইরূপ :-

"দারিকেশী নদী পর্য্যন্ত মল্লভূমি ধর্ম্ম বর্জ্জিত । জঙ্গলে আবৃত বিষ্ণুপুরীর রাজগণ বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ । বীরসিংহ মহারাজা তথায় প্রস্তর মন্দির ও দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন । তাঁহার বংশীয় দুর্জ্জন সিংহ বিষ্ণুপুর নগরী স্থাপন করেন । রাজধানীর দুই যোজন দক্ষিণে শিরাবতীর নিকট বক দ্বীপের সীমা .... রাজধানীর তিন যোজন পূর্ব্বে খাটুল গ্রাম পর্য্যন্ত পূর্ব্বসীমা । ...."[৮]

গোপাল সিংহের রাজত্বকালে পর্যটক জগমোহনের উক্ত বিবৃতি অনুযায়ী দুর্জন সিংহের সময়ে মল্লরাজ্যের সীমা, উত্তরে দ্বারকেশ্বর (দারিকেশী) নদী হইতে দক্ষিণে শিলাবতী (শিরাবতী) নদীর তীরবর্তী বগড়ী (বকদ্বীপ) পরগণা পর্যন্ত এবং পূর্বে খাটুল গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । এই বিবৃতিটিতে একটি ভুল সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছে । পর্যটক, দুর্জন সিংহের সময়ে 'বিষ্ণুপুর নগরী' স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু মল্লরাজাগণ বিষ্ণুপুরে বহুকাল হইতেই রাজত্ব করিয়া আসিতেছিলেন । আর ঐ 'নগরী' স্থাপিত হইয়াছিল দুর্জন সিংহের বহুকাল পূর্বেই । ইহাতে পশ্চিম সীমাটি খুব সুস্পষ্ট না হইলেও ছাতনা রাজধানীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে ।

এতক্ষণ পর্যন্ত মল্লরাজ্যের যে সীমানার উল্লেখ করা হইল তাহা বহুদূর প্রসারিত হইলেও উহার কোনও নির্দিষ্ট সীমারেখা কোথাও অঙ্কিত অবস্থায় পাওয়া যায় না । উপরে বর্ণিত সীমানার পরেও মল্লরাজ্যের বহু ভাঙ্গাগড়ার কাজ চলিতে থাকে । ফলে এই ভূভাগের বিস্তীর্ণ অংশ রাজা দুর্জন সিংহের পরেও বিষ্ণুপুর জমিদারীর বাহিরে চলিয়া যায় । সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ সার্ভেয়ার মেজর রেণেল অঙ্কিত এই রাজ্যের একটি মানচিত্র পাওয়া যায় । তিনি এদেশে আগমনের প্রায় দুই বৎসর পরে বঙ্গের পশ্চিমাংশের যে মানচিত্র প্রস্তুত করেন তাহাতে মল্লভূমের ('Mul boom') বা বিষ্ণুপুর জমিদারীর সীমা প্রদত্ত হইয়াছে, —

উত্তরে দামোদর নদ হইতে দক্ষিণে শিলাবতী (শিলাই) নদী এবং পূর্বে বর্ধমানের পশ্চিম সীমা হইতে বিষ্ণুপুরের পশ্চিমে অবস্থিত ছাতনা, আমিনাগুড় ও বরাহভূমের পূর্বসীমা পর্যন্ত[৯] ।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি সদা সর্বদা রাজনৈতিক বেড়াজাল মানিয়া চলেনা, তথাপি বহু প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান আমরা রাজনীতির উত্থান-পতনের উপর নির্ভর করিয়া লাভ করি । মল্লভূমের সাহিত্য সংস্কৃতি আলোচনার জন্যই মল্লরাজ্যের হ্রাস-বৃদ্ধির গুরুত্ব আমাদের নিকট অপরিসীম । খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী মল্লরাজবংশের ইতিহাস

প্রধানতঃ কিংবদন্তী আশ্রিত। স্যার উইলিয়াম হান্টার রাজপণ্ডিতের মুখে শ্রবণ করিয়া রাজবংশের যে দীর্ঘ বিবরণ[১০] দিয়াছেন, সেই বিবৃতি অনুযায়ী মল্লরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনাথ সিং।

উইলিয়াম হান্টার এই মল্লরাজাকে স্থানীয় অধিবাসীর রাজা অর্থাৎ বাগ্দীরাজা ('king of the Bagdis') নামে অভিহিত করিয়াছেন। স্যার ওল্ডহামের অভিমত, মাল উপজাতির রাজা বলিয়াই বিষ্ণুপুরের রাজারা 'মল্লরাজা'[১১]।

এই প্রসঙ্গে ডঃ রমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন — "................all go to prove that the Rajas of Bissenpur are Kshatriyas, because of their long independence and their past history, but not by descent."[১২]

মল্লরাজারা বীরযোদ্ধা ছিলেন। সেই সুবাদেই তাঁহারা ক্ষত্রিয় পরিচয়ের অধিকারী, ক্ষত্রিয় বংশজাত বলিয়া ক্ষত্রিয় নয়।

এখনও অনেকে মল্লরাজাদের ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়া মনে করেন[১৩]। কিন্তু বিশেষ পর্যবেক্ষণ হইতে আমাদের উপর্যুক্ত গবেষকদের ধারণাই যথাযথ বলিয়া মনে হয়।

মল্লরাজবংশের ধারবাহিক ইতিহাস কোনও সমকালীন ইতিবৃত্ত গ্রন্থে পাওয়া যায় না, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষে সম্রাট আকবর যখন দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময় কিছু কিছু সমসাময়িক গ্রন্থে মল্লরাজাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার পূর্বের প্রায় নয়শত বৎসরের (খ্রীঃ ৭ম-১৬শ) ইতিহাসের জন্য আমাদের নির্ভর করিতে হয় মল্লরাজপরিবারের নানা পারিবারিক বিবরণ ও নব নির্মিত বংশপঞ্জীর উপর। স্যার উইলিয়াম হান্টার লিখিয়াছেন, — "..................the history of the kings of Bishnupur, written by Raja Gopal Singh, was found in the Bankura Collectorate."[১৪]

আমরা অভয়পদ মল্লিক মহাশয়ের (History of Bishnupur Raj ; 1921 A.D., P-129-130) গ্রন্থেও এই বংশ বিবরণটি পাইযাছি। এই সকল বিবরণ হইতে জানা যায় যে, আদিমল্ল (৬৯৪ খ্রীঃ) পদমপুরের রাজার সহায়তায় লাউগ্রামে মল্লরাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর জয়মল্ল (৭০৯ খ্রীঃ) পিতৃসিংহাসন দখল করেন। তিনিই নাকি প্রদ্যুম্ন পুর বা পদমপুর হইতে মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুরে প্রতিষ্ঠিত করেন। আবার অনেকে ১৯তম রাজা জগতমল্লকে এই নগরীর এবং মৃন্ময়ী মন্দিরের (৩০৩ মল্লাব্দ, ৪০৪ সাল, ৯৯৭ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠাতা মনে করেন। সেই সূত্রে মল্লদেশের সুপ্রসিদ্ধ ইন্দ্রধ্বজ পূজা এবং মল্লাদ সনের প্রবর্তক জয়মল্লকেই মনে করা হয়। ইহার পর যে সকল নৃপতির নাম পাওয়া যায় তাঁহাদের সম্পর্কে অল্পবিস্তর রাজ্যবিস্তার, মন্দির নির্মাণ ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। শাল পিয়ালের ঘন অরণ্যে ঘেরা সুদৃঢ় প্রস্তর বেষ্টিত দুর্গের মাঝে মল্লাবনীর

অধীশ্বরেরা যে সুদীর্ঘকাল স্বাধীনভাবে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য পরিচালনা করিয়াছেন তাহা কম গৌরবের কথা নহে। তাঁহারা নামে মাত্র মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া স্বেচ্ছামত রাজস্ব দান করিতেন।

বিষ্ণুপুর রাজবংশ সুদীর্ঘকালের কল্পলোক হইতে সহসা ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হয় ধাড়ি মল্ল বা ধার হাম্বীরের রাজত্বকালে[১৫]। উইলিয়াম হান্টারের মতে তিনি ৪৮ সংখ্যক কিন্তু স্যার ও' ম্যালীর মতে ৪৯ সংখ্যক নৃপতি। ধার হাম্বীরের পারবশ্যের উল্লেখ পাই স্যার ও' ম্যালীর গ্রন্থে। তাঁহার মতে ধার হাম্বীরের সময় হইতেই বিষ্ণুপুর রাজবংশের ইতিহাস নির্ভর যোগ্যতার দাবী করিতে পাবে। এই সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করেন তাহা এইরূপ :—"With the reign of the 49th Raja, Dhar Hambir, who is said to have flourished in 993 B.S. (1586 A.D.), we hear for the first time of the acknowledgement ofthe suzerainty, of the Muhammadan Viceroys of Bengal, to whom this prince paid an annual tribute of Rs.1,07,000."[১৬]

এই ধার হাম্বীর সর্বপ্রথম বাংলার নবাবকে একলক্ষ সাত হাজার টাকা কর দান করেন। তখনও খুব সম্ভব এই রাজস্ব দান প্রথা ছিল স্বেচ্ছাকৃত। কেননা অভয় পদ মল্লিক মহাশয়ের গ্রন্থে পাওয়া যায় এই সময় পর্যন্ত মল্লরাজারা নিয়মিত কর দিতেন না এবং তাঁহারা বাংলার নবাবের মিত্ররূপে পরিগণিত হইতেন[১৭]।

বঙ্গের সীমান্ত প্রদেশের স্বাধীন হিন্দুরাজারা বাহিরের শক্তিশালী রাজাদের নিকট পরাভূত হইলে সামান্য উপঢৌকন বা কিঞ্চিৎ নজর পেস্কোস অথবা সামান্য করদান করিয়া অব্যাহতি পাইতেন। সুবা বাঙ্গলায় তৎকালে বিষ্ণুপুর, চন্দ্রকোণা, পঞ্চকোট প্রভৃতি স্থানে যে সকল জমিদার ছিলেন তাঁহাদের জমিদারীকে সরকার, পেস্কোসের অন্তর্ভুক্ত করেন। ইহার উল্লেখ দেখা যায় জেমস্ গ্র্যান্টের পঞ্চম রিপোর্টে। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত মল্লরাজারা যে অনিয়মিত করদান করিয়া নিজেরা স্বাধীনভাবে রাজত্ব পরিচালনা করিয়াছেন জেমস্ গ্র্যান্টের লিখিত বিবরণ হইতেও তাহা প্রমাণিত হয়।[১৮]

পারিবারিক বংশাবলী হইতে জানা যায় ধার হাম্বীরের রাজত্বকাল ১৫৩৯-১৫৮৬ খ্রীঃ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আমরা 'আকবরনামা' গ্রন্থে বিষ্ণুপুরের জমিদার এক হামীরের উল্লেখ পাই। আকবরের সেনাপতি মানসিংহ উড়িষ্যা অভিযান কালে জাহানাবাদে ; বর্তমান আবামবাগ নামে পরিচিত স্থানে, ঝাড়খণ্ড হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে ঘাঁটী প্রস্তুত করেন। রায়পুরের নিকট আফগান সেনাপতি কতলু খাঁ লোহানীও ঘাঁটী প্রস্তুত করিলে উভয় সেনাদলের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সেই সময় বিষ্ণুপুরের জমিদার 'হামীর', মানসিংহের পুত্র জগৎ সিংহকে গোপনে যুদ্ধ শিবির হইতে উদ্ধার করিয়া নিজ রাজধানীতে আনয়ন

করেন । 'আকবরনামা'য় 'হামীরের উল্লেখ এইরূপ, —
"Hamir brought away that infatuated young man and took him to his quarters at Bishanpur."[১১] বিপদকালে পুত্রের প্রাণ রক্ষা করায় মানসিংহ সম্ভবতঃ এই হামীরের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন । ইহার ফলস্বরূপ এই মল্লরাজাগণ মোগলদের সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হন । দশদিন পর কতলু খাঁ নিহত হইলে মানসিংহ বিহারে প্রত্যাবর্তন করেন । কিন্তু এই 'হামীর' প্রকৃতপক্ষে কে, সে সম্পর্কেও মতভেদ দেখা যায় । স্যার যদুনাথ সরকার মনে করেন এই ঘটনা এপ্রিল মাসের ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে ঘটে এবং এই 'হামীর', মল্লবংশের সুপ্রসিদ্ধ নৃপতি বীর হাম্বীর[১৭]।
স্যার ও' ম্যালীর মতেও এই 'হামীর' আসলে বীর হাম্বীর যিনি মোগলদের সাহায্য করায় আফগানদের নিকট নিদারুণরূপে ক্ষতিগ্রস্থ হন (১৫৯১ খ্রীঃ)[১১]।
জগৎসিংহকে যিনি যুদ্ধ শিবির হইতে রক্ষা করেন তিনি ধার হাম্বীর না বীর হাম্বীর, — সে সম্পর্কে বীর হাম্বীরের মতটিই অধিক জোরালো দেখা যায় । কেননা 'আকবরনামায়' লিখিত আছে যে, এই যুদ্ধ আকবরের রাজত্বলাভের ৩৫তম বর্ষে ঘটে । ধার হাম্বীর যদি মোগলদের সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, তাহার রাজত্বকাল ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল । অথচ ধার হাম্বীরের পরবর্তী নৃপতি বীর হাম্বীরের রাজত্বকালের সূচনা বংশ বিবরণ অনুযায়ী ১৫৮৭ খ্রীঃ । খুব সম্ভব উইলিয়ম হান্টার এইজন্য বীর হাম্বীরকেই প্রথম করদাতা মনে করেন ।

বীর হাম্বীর অথবা হাম্বীর সিংহ (আঃ ১৫৯১-১৬১৬ খ্রীঃ):— ধার হাম্বীরের পরবর্তী নৃপতি বীর হাম্বীরের রাজত্বকাল, স্যার উইলিয়াম হান্টারের মতানুযায়ী ২৬ বৎসর এবং রাজ্য প্রাপ্তির কাল ৮৮১ বিষ্ণুপুরী সন[১১]। অবশ্য বংশ বিবরণ অনুযায়ী তাঁহার রাজত্বলাভের কাল ৮৯৩ মল্ল সন (১৫৮৭-১৬১৯ খ্রীঃ)। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত পাঞ্চেতে প্রাপ্ত শিলালিপিতে 'শ্রীবীর হামীর' নামের উল্লেখ দেখিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, ইঁনি সম্ভবতঃ মল্লরাজ বীর হাম্বীর, যাঁহার রাজত্ব পাঞ্চেত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল[২৩]। বিষ্ণুপুরের অন্তবর্তী ধরাপাট গ্রামের শ্যামচাঁদ মন্দিরের লিপিকাল ১৫২৫ শক (১৬০৩ খ্রীঃ)। এই শিলালিপিটি খুব সম্ভব বীর হাম্বীরকে উদ্দেশ্য করিয়া পরে লিখিত হইয়াছে। বীর হাম্বীর কখনও 'সিংহ' পদবী গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা, জানা যায় না । বীর হাম্বীর খুব সম্ভব এখানে 'বীর সিং' বা 'হাম্বীর সিংহ' নামে লিখিত হইয়াছেন। মানিকলাল সিংহ মহাশয় মনে করেন, মল্লরাজারা 'মল্ল' এবং 'সিংহ' দুইটি পদবীই মাঝে মাঝে ব্যবহার করিতেন । ইহার প্রমাণস্বরূপ তিনি বলেন, "বীর হাম্বীরের পিতামহ বীর মল্ল এবং বীর সিংহ নামেও অভিহিত হইতেন।" আর ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও নাকি "বীর হাম্বীরকেই 'Hamir Singh of Vishnupur' নামে অভিহিত করিয়াছেন"।[২৪]

জাহাঙ্গীবেব বাজত্বকালে মোগলদের দ্বিতীয় যুদ্ধাভিযান ঘটে ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে, বীরভূম, পাঞ্চেত এবং হিজলীর উপর অধিকাব লাভেব প্রচেষ্টায় । বীব হাম্বীর তখন পাঞ্চেতের (পঞ্চকোট) জমিদার । ইসলাম খান বাংলার সুবাদাব পদে নিযুক্ত হইয়া শেখ কামালকে উক্ত যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রেরণ করেন । মির্জা নাথানের 'বাহারিস্থান-ই-ঘায়েবি' গ্রন্থে এই যুদ্ধে বীর হাম্বীর কিরূপে মোগল বাহিনীর নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন তাহার উল্লেখ আছে[১৫] ।

সামগ্রিকভাবে দেখা যায় যে, অনিয়মিত কব দানের ফলেই মোগলেরা এই যুদ্ধাভিযান করে । বীব হাম্বীর পূর্বকৃত কর্মেব জন্য যথেষ্ট অনুতপ্ত হইয়া মোগল আনুগত্য স্বীকার করেন । এই যুদ্ধ সম্পর্কে স্যার যদুনাথ সরকার মনে করেন যে, তখন বীর হাম্বীর ছিলেন বীরভূমের জমিদার[১৬] । কিন্তু অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্টতঃ তাহা অস্বীকার করেন[১৭] । দারণী পাহাড় সম্ভবতঃ পাঞ্চেতে (আধুনিক পুরুলিয়া) অবস্থিত । উহার ভগ্নদুর্গের দুই সিংহদ্বারে 'শ্রী বীর হামীরের' নামাঙ্কিত প্রস্তর ফলকে বঙ্গাক্ষরে সংবত ১৬৫৭ অথবা ১৬৫৯ লিখিত আছে, যাহা ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের সমার্থক[১৮] । অতএব বীর হাম্বীর তখন পাঞ্চেতেরও জমিদার । তিনি তখন এক সুবিশাল সেনাদলের নিয়ন্তা ছিলেন । সুবৃহৎ কামান দলমর্দনটি ইহার উদাহরণ । বস্তুতঃ বীর হাম্বীর ছিলেন অত্যন্ত সাহসী এবং কৌশলী নৃপতি । তাঁহার সামরিক শক্তিও ছিল অনন্যসাধারণ । "Bir Hambir had been a brave soldier who organised a military system on a feudal basis and had greatly improved the fortifications of Vishnupur ; he had Cannons placed on the walls of the ramparts and largely increased the numerical strength of the army"[29]. অরণ্য সঙ্কুল পাহাড় ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত মল্লভূমের মল্লেরা সর্বত্র অতি সন্তর্পণে শত্রুর উপর অতর্কিতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কৌশলে বিজয়ী হইতেন ।

কিন্তু বীর হাম্বীরের জীবনে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায় কয়েকটি বৈষ্ণব গ্রন্থে । নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' (সপ্তমতরঙ্গ) এবং বলরাম দাস বা নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস' (১৩শ বিলাস) গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ যখন বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে আসিতেছিলেন সেই সময় বীর হাম্বীর কর্তৃক বিষ্ণুপুরের নিকট অরণ্য মধ্যে গাডীভর্তি পুথি লুঠ হয়, পরে শ্রীনিবাসের সঙ্গে পরিচয় লাভের পর অনুতপ্ত চিত্তে রাজা আচার্যদেবের নিকট সপরিবারে দীক্ষা গ্রহণ করেন । 'ভক্তিরত্নাকর'-এ বীর হাম্বীরকেই গ্রন্থ অপহাবক বলিয়া লিখিত হইয়াছে[৩০] ।
রাজা বীর হাম্বীরের নিকট শ্রীনিবাস কর্তৃক গ্রন্থ চুরিব প্রসঙ্গ বর্ণনা 'প্রেমবিলাস' কাব্যেও পাওয়া যায়[৩১] ।

কিন্তু 'ভক্তিরত্নাকর' কিংবা 'প্রেমবিলাস' কাব্যে বহু পরস্পরবিরুদ্ধ কথা আছে, তাহা দ্বারা শ্রীনিবাসের আবির্ভাবকাল এবং বিষ্ণুপুর আগমনের সঠিক যাত্রাপথের নির্দেশ মেলে না। উক্ত গ্রন্থ দুইটিতেই বৃন্দাবন হইতে আগত শ্রীনিবাসের গ্রন্থ চুরির প্রসঙ্গ আছে, অথচ অন্যান্য গ্রন্থে এই গ্রন্থ চুরির প্রসঙ্গ ভিন্নভাবে পাওয়া যায়। শ্রীনিবাসের শিষ্য কর্ণপুর কবিরাজের "শ্রীনিবাসগুণলেশসূচক" (৮ম শ্লোঃ) গ্রন্থে এই গ্রন্থচুরির কথা পাওয়া যায় শ্রীনিবাসের পুরুষোত্তম যাত্রাকালে, কিন্তু তাহাতে গ্রন্থ অপহারকরূপে বীর হাম্বীরের নাম পাওয়া যায় না। এই জন্য ডঃ বাসন্তী চৌধুরী মনে করেন, "বৃন্দাবন হইতে কাটোয়ার নিকটবর্তী যাজিগ্রামে আসিতে হইলে পথে বিষ্ণুপুর পড়িতে পাবে না। কিন্তু কাটোয়া হইতে পুরী যাইবার পথে বিষ্ণুপুর পড়ে। এই সাধারণ ভৌগোলিক তথ্য অনুসারেও কর্ণপুর কবিরাজের বর্ণনা নরহরির অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য"।[৩২] যদুনন্দন দাসের 'কর্ণানন্দ' এবং মনোহর দাসের 'অনুরাগবল্লী' গ্রন্থেও বীর হাম্বীব কর্তৃক গ্রন্থ চুরির উল্লেখ নাই। কাজেই শ্রীনিবাস প্রথমবার বৃন্দাবন হইতে গৌড় আগমনকালে বিষ্ণুপুরে যান নাই। এই সম্পর্কে 'অনুরাগবল্লী'তেও পাওয়া যায় যে, শ্রীনিবাস দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিবার পর বীর হাম্বীর তাঁহার নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ কবেন[৩৩]।

যাহাই হউক, শ্রীনিবাস বীর হাম্বীরের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া 'ভাগবত' অথবা 'ভ্রমরগীতা' পাঠ হইতে দেখেন। গ্রন্থপাঠকালে পাঠকের ভ্রমপ্রমাদ দূব করিয়া তিনি তথায় বৃন্দাবনের গোস্বামীদিগের ধারা প্রবর্তন করেন। তাঁহার মহিমান্বিত জীবনের প্রভাবে রাজা বীর হাম্বীর এতই মুগ্ধ হন যে, সপরিবারে তিনি আচার্যদেবের নিকট বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। রাজঅন্তঃপুর হইতে মল্লভূমের দীনতম প্রজা পর্যন্ত বহু গুণগ্রাহী ব্যক্তি শ্রীনিবাসের শিষ্যত্ব লাভ করিয়া ধন্য হন। মল্লভূমের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ইহা এক যুগান্তকারী ঘটনা। শুধু ধর্ম বা দর্শনেই নহে, ইহার ফলে সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে এক নবচেতনা সঞ্চারিত হয়। মল্লভূম অচিরেই বাংলাদেশের সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম পীঠস্থানে পরিণত হয়। বিষ্ণুপুরে গুরুদেবের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বীর হাম্বীরই বিষ্ণুপুর সন্নিহিত গোপালপুরের রাঘব চক্রবর্তীর কন্যা গৌরাঙ্গপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে শ্রীনিবাসের দ্বিতীয়বার বিবাহ দান করেন। তবে এই দ্বিতীয় বিবাহের সঠিক তারিখ জানা যায় নাই। অনেকের ধারণা সুপ্রসিদ্ধ নগর দেবতা মদনমোহনের পূজার্চনা বীর হাম্বীরের কাল হইতেই শুরু হয়। তবে বীর হাম্বীরের ভণিতায় প্রাপ্ত পদগুলি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবতা কালাচাঁদের নামেই উৎসর্গীকৃত। বিষ্ণুপুরের পিরামিড আকৃতিবিশিষ্ট অপূর্ব রাসমঞ্চটি বীর হাম্বীর (আঃ ১৬০০ খ্রীঃ) নির্মাণ করান। মল্লরাজত্বে একটি নূতন বর্ষ গণনা পদ্ধতির প্রচলন ছিল, তাহা 'মল্লাব্দ' (বিষ্ণুপুরী সন) নামে পরিচিত। এই নূতন অব্দটি মল্লভূমের সাংস্কৃতিক বিপ্লবেরই ইঙ্গিতবাহী। মল্লভূমেব ধর্মীয় পরিবর্তন ও কৃষ্টিমূলক ভাবনাব বিকাশ বীর হাম্বীরের

কালেই ঘটিয়াছে, অতএব অনেকের মতে তিনিই এই নব পদ্ধতির উদ্ভাবক। খুব স্বল্প ক্ষেত্রেই মল্লাব্দের সঙ্গে বঙ্গাব্দ লেখার নিদর্শন মেলে। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মল্লনৃপতি চৈতন্য সিংহ কর্তৃক নির্মিত রাধাশ্যাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ফলকে ১০৬৪ মল্লাব্দ এবং ১৬৮০ শকাব্দ পাশাপাশি লিখিত আছে। ইহা দ্বারা এখন মল্লাব্দ যে বঙ্গাব্দ হইতে ১০১ বৎসর কম, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে। যাহাই হউক, স্যার ও' ম্যালী এবং অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে বীর হাম্বীরের রাজত্বকাল ১৫৯১-১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত।

বিষ্ণুপুরের সুপ্রসিদ্ধ মল্লেশ্বর মন্দিবটি ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে বীর সিং কর্তৃক নির্মিত। কিন্তু এই বীব সিং কে, সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। বহুদিন পর্যন্ত বীর হাম্বীরকেই মল্লেশ্বর মন্দিরেব প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া মনে করা হইত। কিন্তু এখন বীর হাম্বীরের পুত্র ধাড়ি হাম্বীরই প্রকৃতপক্ষে 'বীর সিং (১ম) বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। মাণিকলাল সিংহ মহাশয় স্পষ্টভাবে সন তারিখের কথা উল্লেখ না করিলেও বীর হাম্বীরের পর ধাড়ি হাম্বীরের রাজত্ব লাভের কথা বলিয়াছেন, — "মল্লরাজাদের বংশলতা দেখিয়া জানা যায় যে, বীর হাম্বীরের পর তাঁহার প্রথম পুত্র ধাড়ি হাম্বীর এবং তৎপরে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রঘুনাথ সিংহ (১ম) মল্লরাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন[৬৪]। মল্লরাজারা বিভিন্ন উপাধি ব্যবহার করিতেন বলিয়া মনে হয়। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন,---"বীর হাম্বীর"-এর মত 'ধাড়ি হাম্বীর'ও নাম নহে, পদ-উপাধি। পদ মহা সেনাপতির। মানে যিনি ধাড়িতে অর্থাৎ আক্রমণে, যুদ্ধে আমীর (প্রধান)[৬৫]।" সুতরাং ধাড়ি হাম্বীবই 'বীর সিং' বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অমিয কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, মল্লেশ্বর মন্দির যিনি নির্মাণ করেন তিনি বীর সিং (১ম), তবে তাঁহার পিতার নাম লিখিত না থাকায় তিনি যে বীর হাম্বীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সে সম্পর্কে তিনি সংশয় প্রকাশ করেন[৬৬]।

ধাড়ি হাম্বীরই বীর সিং (১ম) কি না তিনি অবশ্য সে কথাও বলেন নাই। যাহাই হউক, বীর হাম্বীরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ধাডি হাম্বীর বা ধাড়ি মল্ল (২য়)। শ্রী জীব গোস্বামী তাঁহার নাম রাখেন শ্রী গোপাল দাস ('ভক্তিবত্নাকর', ১৪ তরঙ্গ/২৫-২৬)। ধাড়ি হাম্বীর বা ধাড়ি মল্ল (২য়) ছয় বৎসর রাজত্ব কবিয়া অকালে পরলোক গমন করেন (আঃ ১৬২০-১৬২৬ খ্রীঃ)। ধাড়ি হাম্বীরের পুত্র বিকল্যঙ্গ হওয়ায় তাহার পর বীর হাম্বীরের অপর পুত্র রঘুনাথ সিংহ (১ম) মল্ল সিংহাসনে আবোহণ করেন।

রঘুনাথ সিংহ (১ম) (আঃ ১৬২৬-১৬৫৬ খ্রীঃ) :—

অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে বঘুনাথ সিংহের (১ম) রাজত্বকাল ১৬৪৩-১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দ। আর বংশ পত্রানুযায়ী তাঁহাব রাজত্বলাভের পরিসীমা ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দ এবং মন্দিরের শিলালিপিতে তাঁহার নাম পাওয়া যায় ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ

হইতে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত বীরসিংহ গ্রামের (পাত্রসায়ের. থানা) বৃন্দাবন চন্দ্র মন্দিরটি রঘুনাথ সিংহের প্রথম মন্দির শিলালিপি এবং মহিষীর নামে প্রথম মন্দির ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত বিক্রমপুর (ওঁদা বা ওন্দা থানা) গ্রামে অবস্থিত। শ্যামরায় ও জোড়বাংলা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলক হইতে জানা যায় যে, তিনি বীর হাম্বীরের পুত্র। বিষ্ণুপুরের এই অপরূপ মন্দির দুইটি তাঁহারই সময়ে নির্মিত হয় এবং এই মন্দিরগুলি রঘুনাথ সিংহের (১ম) নামেই প্রতিষ্ঠিত। ইহাদের সময়কাল যথাক্রমে শ্যামরায় ১৬৪৩ খ্রীঃ, জোড়বাংলা ১৬৫৫ খ্রীঃ এবং কালাচাঁদ ১৬৫৬ খ্রীঃ। এই শ্যামরায় এবং জোড়বাংলা মন্দিরের দ্বিতীয় শিলালিপিতে রঘুনাথ সিংহের সঙ্গে যুবরাজ বীর সিংহের নামও পাওয়া যায়[৬৭]।

রঘুনাথ সিংহের (১ম) পট্টমহিষীর নামে তিনটি মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়, — ওন্দা থানার বিক্রমপুর গ্রামে (১৬৫৯ খ্রীঃ), বিষ্ণুপুরের খড়বাংলায় (১৬৫৯ খ্রীঃ) এবং বৈতল গ্রামের শ্যামচাঁদ মন্দিরের (১৬৬০ খ্রীঃ)। শেষ মন্দির দুইটিব প্রতিষ্ঠাফলকের দ্বিতীয়টিতে "রঘুনাথ মহিষী" এবং "বিরসিং জননী" লিখিত আছে। কাজেই এই দুইটি মন্দির রঘুনাথ সিংহ (১ম) নির্মাণ করিয়াছিলেন কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে।

রঘুনাথ সিংহের (১ম) সময় হইতেই ক্ষত্রিয় 'সিংহ' উপাধিটি মল্লরাজারা নিয়মিত ব্যবহার করিতে শুরু করেন। এই সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে যে, তৎকালীন নবাবের এক দুরন্ত অশ্বকে বশ করায় এবং অসীম সাহসিক কাজ করায় নবাব প্রীতিবশতঃ তাঁহাকে 'সিংহ' উপাধি দান করেন। এই বিষয়ে মাণিকলাল সিংহ মহাশয়ের মত এই যে :—
"...................... মল্লরাজ পরিবারের সঙ্গে মানসিংহ এবং তৎপুত্র জগৎ সিংহের মিত্রতা হয়। সহজাত আকর্ষণ বশেই ইহার পরই বীর হাম্বীরেব পুত্র রঘুনাথ মল্ল আপনাকে 'সিংহ' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

প্রাচীন এবং মধ্যযুগে রাজা মহারাজা নবাব বাদশাহগণ সিংহাসন আরোহণের পর আপনাদের নাম এবং পদবীর পরিবর্তন করিতেন। রঘুনাথ সিংহ হইতে দুর্জন সিংহ পর্যন্ত মল্লরাজাদের শুধুমাত্র সিংহ পদবীই বলবৎ রহিয়াছে। কিন্তু দুর্জনসিংহের পুত্র রঘুনাথ সিংহ (২য়) নিজ পদবীর শেষে "দেব" শব্দটি যুক্ত করিয়া সিংহদেব পদবীতে ভূষিত হইয়াছেন। পদবীর শেষে এইভাবে 'দেব' শব্দটি যুক্ত হওয়ার পশ্চাতেও একাধিক কিংবদন্তী রচিত হইয়াছে"[৬৮]। সুতরাং 'সিংহ' উপাধিটি মল্লরাজাদের শৌর্যবীর্যের পরিচায়ক। শুধু বীরত্বলাভেই রঘুনাথ সিংহের (১ম) একমাত্র পরিচয় নয় সুশাসক এবং স্থাপত্যানুরাগী রূপেও তিনি মল্লভূমে সুনাম অর্জন করেন। টেরাকোটার শ্রেষ্ঠতম দেবালয়গুলি তাহার নিদর্শন।

বীর সিংহ (২য়) — (আঃ ১৬৫৬-১৬৮২ খ্রীঃ)।

প্রথম রঘুনাথ সিংহের পর তৎপুত্র বীর সিংহ (২য়) মল্লরাজ সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। বংশপত্রানুসারে তাঁহার রাজ্যকাল ১৬৫৬-১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া জানা যায়। বিষ্ণুপুরের লালজী মন্দিরটিতে (১৬৫৮ খ্রীঃ) বীর সিংহের নামে প্রথম শিলালিপি। একচূড় বিশিষ্ট চালা-মন্দির-স্থাপত্যের ইহা এক সুন্দর নিদর্শন। ওন্দা থানার অন্তর্গত বিক্রমপুরের এক শিখর মন্দির (১৬৫৯ খ্রীঃ) বিষ্ণুপুরের অন্তর্গত তেজপালের একচালা রাধাকৃষ্ণ মন্দির (১৬৭১ খ্রীঃ) এবং তালডাংরা থানার অন্তর্গত সাব্রাকোণের একচালা রামকৃষ্ণ মন্দির (১৬৭৬ খ্রীঃ) ও মুনিনগরে রাধাকৃষ্ণ মন্দিরটি তাঁহারই নির্মিত। রণিয়াড়ার মদনমোহন মন্দিরটি (১৬৭০ খ্রীঃ) তিনি নির্মাণ করান। বিষ্ণুপুরের সুপ্রসিদ্ধ মদনগোপাল মন্দির (১৬৬৫ খ্রীঃ) এবং মুরলীমনোহর মন্দিরের (১৬৬৫ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠাফলকে বীর সিংহের (২য়) মহিষী চূড়ামণির নাম উৎকীর্ণ আছে। মদন গোপাল মন্দিরটি ল্যাটেরাইট পাথরে নির্মিত মল্লভূমের পঞ্চরত্ন দেবালয়গুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ[৩৯]।

মল্লনৃপতিদের মধ্যে তিনিই সুদীর্ঘকাল রাজ্য পরিচালনা করেন। শোনা যায়, তিনি অতিশয় প্রজাবৎসল নৃপতি ছিলেন। বিষ্ণুপুরের জলকষ্ট দূর করিবার জন্য তিনি লালবাঁধ, গাঁতাত বাঁধ (বীর বাঁধ), যমুনা বাঁধ, কালিন্দী বাঁধ, শ্যাম বাঁধ, পোকা বাঁধ (বীর বাঁধ) এবং চৌকান বাঁধ নামে সাতটি বিশাল জলাশয় খনন করান। কৃষ্ণ বাঁধটি কৃষ্ণ সিংহ খনন করাইয়াছিলেন বলিয়া অনেকে ধারণা করেন। বর্ষার জলই এই জলাশয়গুলির একমাত্র ভরসা। অধিকাংশ বাঁধই এখন প্রায় নিমজ্জিত। বিষ্ণুপুরের সুদৃঢ় দুর্গটির নির্মাতা বীর হাম্বীর অথবা বীর সিংহ (২য়) যিনিই হউন, পুনঃপুনঃ শত্রুর আক্রমণ হইতে এই দুর্গই বিষ্ণুপুরবাসীকে রক্ষা করিয়াছে। বীর সিংহ আবার হৃদয়হীন রাজা নামেও নিন্দিত হন। "তিনি তাঁহার ভ্রাতা মাধব সিংহকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। অপর ভ্রাতা ফতে সিংহ পালাইয়া যাইয়া রায়পুরে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপিত করেন। বীর সিংহ তাঁহার তিন পুত্রকেও হত্যার আদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু দুই পুত্র হত্যার পর জল্লাদের দয়াগুণে জ্যেষ্ঠপুত্র নিষ্কৃতি পান[৪০]।" আবার এইরূপও শোনা যায় যে, তিনি স্বীয় পুত্রদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাহাদের চারিদিকে প্রাচীর গাঁথিয়া হত্যা করেন। রক্ষা পায় শুধু দুর্জন সিংহ। বৃদ্ধকালে তিনিই নাকি আবার এক ব্রাহ্মণ বালকের মৃত্যুর কারণ হওয়ায় অনুশোচনায় আত্মহত্যা করেন। এইরূপ বহু কিংবদন্তী এই নরপতির সম্পর্কে প্রচলিত আছে। অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে বীর সিংহ (২য়) ১৬৫৬-১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব পরিচালনা করেন[৪১]।

দুর্জন সিংহ (আঃ ১৬৮২-১৬৯৪ খ্রীঃ) :—

বীর সিংহের (২য়) পর রাজত্ব লাভ করেন তাঁহার পুত্র দুর্জন সিংহ। বংশপত্রানুযায়ী তাঁহার রাজত্বকাল ১৬৮২-১৭০২ খ্রীষ্টাব্দ। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে গড়বেতার রাধাবল্লভ মন্দিরটি (বগড়ী পরগণা) তাঁহারই নির্মিত। তাঁহার রাজত্বকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিষ্ণুপুরের নগর-ঈশ্বর মদনমোহন মন্দিরের (১৬৯৪ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠা। এই দেবদেউলটি টেরাকোটা শিল্পের এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। তিনি খুব সম্ভব সাহিত্যানুরাগী এবং রণপটু ছিলেন। তাঁহার সম্পর্কে রামচরণ চক্রবর্তী মহাশয় লিখিয়াছেন 'মহাবলবান অস্ত্রশাস্ত্রেতে কুশল।”[৪২]

খুব সম্ভব দুর্জন সিংহের সমসাময়িককালে প্রতিবেশী রাজ্য চেতুয়া বা চেতোয়া-বরদার অধিপতি শোভা সিংহ উড়িষ্যার আফগান সর্দার রহিম খানের সঙ্গে মিলিত হইয়া বর্ধমান রাজ্য আক্রমণ করেন (১৬৯৫-৯৬ খ্রীঃ)।[৪৩] এই যুদ্ধে দুর্জন সিংহের পক্ষ হইতে পুত্র রঘুনাথ সিংহ (২য়) মোগলদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিক নিখিল নাথ রায় লিখিয়াছেন[৪৪]। কিন্তু কোনও ইংরাজ ঐতিহাসিকদের গ্রন্থে এই কথার সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই যে, রঘুনাথ সিংহ (২য়) কিংবা দুর্জন সিংহ উক্ত যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। বংশপত্রানুযায়ী রাজা দুর্জন সিংহের রাজত্বকাল ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পাওয়া যায়। কিন্তু জেমস্ গ্র্যান্টের পঞ্চম রিপোর্টে দেখা যায়, ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে দুর্জন সিংহের নাম সর্বপ্রথম খালসা জমিদার রূপে উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইহার পর গোপাল সিংহের নাম (১১৩৫ হইতে ১১৫০ ফসলী সন; অর্থাৎ ১৭৩০-১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) পাওয়া যায়। অথচ এই দুই রাজার মধ্যবর্তী সময়ে রঘুনাথ সিংহ (২য়) বর্তমান ছিলেন। তাঁহার নামের উল্লেখ উক্ত রিপোর্টে না থাকায় সংশয় জাগে, তবে তিনি কি উক্ত খালসা জমিদার নামে পরিচিত ছিলেন না? বংশপত্রানুযায়ী রঘুনাথ সিংহ (২য়) ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব লাভ করেন। অথচ, গ্র্যান্টের মতে দুর্জন সিংহই ঐ সময়ে বিষ্ণুপুর, বগড়ী ও উড়িষ্যার অন্তবর্তী রায়পুরের জমিদার ছিলেন[৪৫]। এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ উল্লেখ হইতে রঘুনাথের (২য়) সময়কাল সম্পর্কে একটা অনিশ্চিত ধারণা জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক।

স্যার ও' ম্যালী[৪৬] এবং অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়েই দুর্জন সিংহের মন্দির নির্মাণকাল ও গ্র্যান্টের বিবরণ, এই দুই যুক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে মনে করেন, দুর্জন সিংহের কাল ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এবং রঘুনাথ সিংহের (২য়) রাজত্বকালের সময়সীমা ১৬৯৪ এবং ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষ্কার লিখিয়াছেন যে, "................. ....Raghunath Singh II who, apparently, Occupied the Malla throne between 1694 and 1730 A.D."[৪৭]

অর্থাৎ অমিয়বাবু, গ্র্যান্টের উল্লিখিত ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দুর্জন সিংহের রাজত্বকাল পরিব্যাপ্ত ছিল বলিয়া কোথাও স্বীকার করেন নাই।

আবার রঘুনাথ সিংহের (২য়) যুদ্ধ-বিজয় সম্পর্কে মানিকলাল সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন :-

"বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বিষ্ণুপুর শাখার পুঁথিশালায় সংগৃহীত ও সংরক্ষিত সাহিত্য দর্পণের টীকার একখানি পুথির মলাট পত্রে লিখিত আছে, 'যে বর্ষে মল্লমহীপতি রঘুনাথ সিংহ সসৈন্যে বরদা নামে খ্যাত রাজ্য আক্রমণ করেন সেই বর্ষে এই টীকার পুঁথিটি রচিত হইয়াছে।' সাহিত্য দর্পণের টীকার রচনাকাল 'অক্ষি পক্ষ বস চন্দ্র' অর্থাৎ ১৬২৩ শকাব্দ। তাই বলা যায় যে, মল্লমহীপতি রঘুনাথ সিংহ (২য়) ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে শোভা সিংহের রাজ্য চেতোয়া - বরদা আক্রমণ ও জয় করেন।"[৪৮]

উপরে বর্ণিত বিবরণ সমূহের মাধ্যমে দুর্জন সিংহ ও গোপাল সিংহের রাজত্বের সময়সীমা সম্পর্কে বিভিন্ন মত পর্যালোচনা করিয়া রঘুনাথ সিংহের (২য়) রাজত্বকাল সম্পর্কে স্থির অভিমত গ্রহণই আমাদের উদ্দেশ্য। যদি চেতোয়া - বরদার যুদ্ধের সঙ্গে রঘুনাথ সিংহ (২য়) ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকেন এবং তৎকালে তিনি রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার রাজত্বকাল ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ধরিতে হইবে। অথচ গ্র্যান্টের উক্ত রিপোর্টে দুর্জন সিংহের নাম ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পাওয়া যায়। তবে কি, রঘুনাথ সিংহ (২য়) এই সময় বৃদ্ধ পিতার নামেই রাজ্যের সকল কার্য পরিচালনা করিতেন ? এই বিষয়ে অপর কোনও উল্লেখযোগ্য তথ্য না পাওয়ায় উপরে উল্লিখিত অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতানুযায়ী দুর্জন সিংহের মদনমোহন মন্দির প্রতিষ্ঠার (১৬৯৪ খ্রীঃ) পর ও চেতোয়া - বরদার যুদ্ধের সময় হইতে এবং বংশপত্রানুযায়ী গোপাল সিংহের (১ম) রাজত্ব লাভের (১৭১২ খ্রীঃ) পূর্ব পর্যন্ত রঘুনাথ সিংহের (২য়) সময়কাল বলিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি।

রঘুনাথ সিংহ (২য়) (আঃ ১৬৯৬-১৭১২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে) :-

বংশপত্রানুযায়ী রঘুনাথ সিংহের (২য়) রাজত্বকাল ১৭০২-১৭১২ খ্রীঃ। ইতিহাসের সূত্র ধরিয়া অনুমান করিলে তাঁহার রাজত্বকালের পরিসীমা দাঁড়ায় ১৬৯৬-১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ। অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ১৬৯৪ খ্রীঃ এবং ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রঘুনাথ সিংহের (২য়) রাজত্বকাল পরিব্যাপ্ত ছিল[৪৯]।

পূর্বে বর্ণিত কাহিনীর ক্ষীণ সূত্র অনুযায়ী বলা যায় যে, ১৬৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে চেতোয়া-বরদার জমিদার শোভা সিংহ, আফগান সর্দার রহিমখানের সহায়তায় বর্ধমানের রাজা

কিষেণরামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন। ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শোভা সিংহের মৃত্যু ঘটিলে আফগান সর্দার রহিম খান দীর্ঘদিন এই বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। খুব সম্ভব এই সময়ে বিষ্ণুপুরের রাজা রঘুনাথ সিংহ (২য়) মোগলদের সঙ্গে বর্ধমানের রাজার মিলিত পক্ষে যোগদান করিয়া নিজ সামরিক শক্তি নিযুক্ত করেন। ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের রিপোর্টে।[৫০]

চেতোয়া-বরদার যুদ্ধ (১৬৯৫-১৬৯৬ খ্রীঃ) সম্পর্কে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক চালর্স স্টুয়ার্টের গ্রন্থে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে বিষ্ণুপুরের কোনও জমিদারের নাম স্বতন্ত্ররূপে উল্লিখিত হয় নাই। তবে চেতোয়া-বরদার এই বিদ্রোহে রাজমহল হইতে মেদিনীপুর পর্যন্ত বঙ্গের সমস্ত পশ্চিমাঞ্চল যে মোগল বনাম আফগান যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহার সমর্থন মেলে :-

''By this time all the country on the west side of the river, from Rajemahel to Midnapore, was in possession of the rebels ; no measures had yet been adopted to check their progress.''[৫১]

সুপ্রসিদ্ধ এই আফগান বিদ্রোহে বর্ধমান হইতে রাজমহল এই পশ্চিম গাঙ্গেয় ভূভাগের মধ্যে বিষ্ণুপুর অবস্থিত থাকায় সে অঞ্চলেও বহু ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। খুব সম্ভব এই সময়ে, অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে রাজা রঘুনাথ সিংহের (২য়) অধীনে এক বিশাল মিলিটারী শক্তি বাংলার মুসলমান নবাবের পক্ষে নিযুক্ত হইয়া আফগান বিদ্রোহ দূরীকরণে সমর্থ হয়[৫২]। এই ঘটনার পর ১৭০৭-১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে অরণ্যসঙ্কুল দুর্গম অঞ্চল হেতু নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ, বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের এই দুই জমিদারকে, সরাসরি মুর্শিদাবাদে উপস্থিত না হইয়া দূত মারফৎ রাজস্ব পাঠাইবার সুবিধা দান করেন[৫৩]।

যাহাই হউক, চেতোয়া-বরদার বিদ্রোহের এই ঐতিহাসিক সূত্রের সঙ্গে রাজা রঘুনাথ সিংহ (২য়) যে জড়িত ছিলেন সে সম্পর্কে কিছু কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে। তিনি নাকি এই সময়ে শোভা সিংহের কন্যা চন্দ্রপ্রভাকে বিবাহ করেন এবং মৃত রহিম খানের অনিন্দ্যসুন্দরী বেগম লালবাঈকেও তাঁহার সঙ্গে লইয়া আসেন[৫৪]। লালবাঈয়ের শিশুপুত্রের জন্মদিন অথবা অন্নপ্রাশন উপলক্ষে তাহারই অনুরোধে যবনীআসক্ত রাজা রঘুনাথ সমগ্র রাজ্যের প্রজাকে বাধ্যতামূলক মুসলমানপৃষ্ঠ অন্নগ্রহণের জন্য ভোজনতলায় উপস্থিত হইতে আদেশ দেন। জাতিচ্যুত হইবার আশঙ্কায় শঙ্কিত প্রজাগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলে রাণী চন্দ্রপ্রভা এবং রাজভ্রাতা গোপাল সিংহ কৌশলে রাজা রঘুনাথ সিংহের জীবনাবসান ঘটান। লালবাঈকে (শিশুপুত্র সমেত) লালবাঁধের জলে বলপূর্বক ডোবাইয়া মারা হয়[৫৫]। তবে রাজার মৃত্যু সম্পর্কে একাধিক কিংবদন্তী শোনা যায়। রঘুনাথের মৃত্যুর পর স্বামীর চিতায় রাণী চন্দ্রপ্রভা মৃত্যুবরণ করিলে তিনি 'পতিঘাতিনী সতী' নামে অভিহিত হন[৫৬]।

বাহিরের জগতে রঘুনাথ সিংহ (২য়) বিধর্মী বলিয়া পরিগণিত হইলেও তিনি একাধিক হিন্দু দেবতার প্রতিষ্ঠা ও দেব মন্দির নির্মাণ করাইয়াছেন। কৃষ্ণবাঁধের দক্ষিণে গোপালজিউ মন্দির (১৭১০ খ্রীঃ) এবং বিষ্ণুপুর গড়ের অভ্যন্তরে লক্ষ্মীনারায়ণ ও বলরাম মন্দির তাঁহারই কীর্তি। এখন শেষ দুইটি মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত। শুধু কৃষ্ণবাঁধের নিকট পাটপুরের ল্যাটেরাইট পাথরের এক রত্ন মন্দিরটি টিঁকিয়া আছে। তবে প্রস্তর ফলকটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে[৫৭]। বিষ্ণুপুরের বিশালাক্ষীর ছবিটিও ("golden picture of Bishalkshyee") নাকি রঘুনাথ সিংহ (২য়) চেতোয়া-বরদা অভিযানকালে অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে সংগ্রহ করিয়া আনেন[৫৮]।

মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহের (২য়) আমলে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতকলা সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। তাঁহার সময় হইতে খুব সম্ভব বিষ্ণুপুরে ধ্রুপদ রাগিনীর এক বিশেষ ধারার প্রচলন ঘটে। উহা 'বিষ্ণুপুর ঘরানা' নামে খ্যাত। ইহার প্রচলন ঠিক কোন সময় হইতে হয়, তাহা জানা না গেলেও, অনেকে মনে করেন রঘুনাথ সিংহ (২য়) দিল্লী হইতে তানসেনের উত্তরপুরুষ বাহাদুব সেনকে (শাহ বাহাদুর) উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে অসাধারণ দক্ষতার জন্য, বিষ্ণুপুর রাজসভায় আনয়ন করেন। খুব সম্ভব তখন হইতেই বিষ্ণুপুরে ধ্রুপদ সঙ্গীতের সূত্রপাত ঘটে। পারিবারিক বংশাবলী হইতে তানসেনের বংশধর বিলাসখান এবং বাহাদুরখানের বিষ্ণুপুর আগমনের সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা রঘুনাথ সিংহের (২য়) সময় কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিতরূপে কিছু জানা যায় না[৫৯]।

দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের রাজত্বকাল পর্যন্ত মল্লশক্তি উন্নতমানের ছিল। সমসাময়িককালের ইতিহাস হইতে যে সকল বিবরণ পাওয়া যায় তাহা দ্বারা উহাই প্রমাণিত হয়। এই সময় পর্যন্ত বহিঃস্থ শক্তির প্রভাবমুক্ত নিভৃত মল্লভূম প্রবল পরাক্রান্ত রাজাদের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। নামেমাত্র মোগল রাজশক্তির অধীনে থাকিয়া স্বাধীনভাবেই তাঁহারা রাজ্য পরিচালনা করিয়াছেন। একমাত্র বাৎসরিক রাজস্ব আদায়ের বাধ্যবাধকতা ভিন্ন মল্লভূমের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় মোগলেরা কখনই হস্তক্ষেপ করেন নাই[৬০]।
খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত মল্লশক্তি এতই সুদৃঢ় ছিল যে, প্রতিবেশী বর্ধমান রাজা কীর্তিচন্দ্রের আক্রমণে কোনও ক্ষতি সাধিত হয় নাই। কিন্তু ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে, খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে মল্ল সৌভাগ্যরবি অস্তাচলগামী হন। একদিকে বর্গীর আক্রমণ ও অপরদিকে বর্ধমানরাজের শক্তিবৃদ্ধি, এই দুই প্রবল শক্তির বিরোধিতা করার মত যথেষ্ট সাহসের অভাব দেখা দেয়। ডঃ রমেশচন্দ্র দত্তের মতে মল্লরাজত্বের পতনের মূলে উক্ত দুই কারণই দায়ী[৬১]।

গোপাল সিংহ (১ম) (আঃ১৭১২-১৭৪৮ খ্রীঃ) :-

রঘুনাথ সিংহের (২য়) মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা এবং দুর্জন সিংহের দ্বিতীয় পুত্র গোপাল সিংহ (১ম) রাজত্ব লাভ করেন। বংশপত্রানুসারে তাঁহার রাজত্ব লাভের কাল ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ। স্যার ও' ম্যালীর পরীক্ষিত সরকারী রেকর্ড অনুযায়ী গোপাল সিংহের রাজত্বকাল ১৭৩০-১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দ[৬১]। অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতানুযায়ী ১৭২০-১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গোপাল সিংহের (১ম) বাজত্বকাল বিস্তৃত ছিল[৬২]। স্যার উইলিয়াম হান্টারের মতে গোপাল সিংহের জন্ম হয় ৯৭৫ বিষ্ণুপুবী সনে এবং মৃত্যু হয় ১০৫৫ বিষ্ণুপুরী সনে (১৭৪৯ খ্রীঃ) এবং তিনি ৩৮ বৎসবকাল রাজত্ব পরিচালনা করেন। তুঙ্গভূমের রাজকন্যার সঙ্গে গোপাল সিংহের (১ম) বিবাহ হয়[৬৪]। মল্লরাজাদিগের পট্টমহিষীগণের নিজ নিজ নাম থাকিলেও তাঁহারা পট্টমহিষী হইবার পর পর্যায়ক্রমে শিরোমণি, চূড়ামণি ও ধ্বজামণি বলিয়া অভিহিত হইতেন। এই নিয়মানুযায়ী রঘুনাথ সিংহ (২য়) এবং গোপাল সিংহের (১ম) পট্টমহিষীর নাম 'শিরোমণি', কৃষ্ণ সিংহের পট্টমহিষীর নাম 'চূড়ামণি' এবং চৈতন্য সিংহের পট্টমহিষীর নাম 'ধ্বজামণি'।[৬৫] মাণিকলাল সিংহের লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, গোপাল সিংহ (১ম) লালবাঁধ গ্রুপের ছয়টি মন্দির নির্মাণ করান। তন্মধ্যে 'দোলগোবিন্দ' বা জোড় মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা (১৭২৬ খ্রীঃ) তিনি নিজে। এই জোড় বা জোড়া মন্দিবের ঠিক পূর্বে অবস্থিত রাধাগোবিন্দ মন্দিরটি তিনি তাঁহার পুত্র কৃষ্ণ সিংহের দ্বারা (১৭২৯ খ্রীঃ) এবং রাধামাধব মন্দিরটি কৃষ্ণ সিংহের মহিষী শ্রীলচূড়ামণির দ্বারা (১৭৩৭ খ্রীঃ) উৎসর্গ করান।[৬৬] ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে গোপাল সিংহ বিষ্ণুপুর কিল্লার অভ্যন্তরে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মন্দির নির্মাণ করেন। উক্ত মন্দিরই গড়ের মধ্যে ভাঙ্গা জোড়বাংলা মন্দির নামে পরিচিত।[৬৭] বিভিন্ন মন্দিরে বহু বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতাও এই গোপাল সিংহ (১ম)[৬৮]।

গোপাল সিংহের (১ম) রাজত্বকালে বর্ধমানেব রাজা কীর্তিচন্দ্র বিষ্ণুপুর রাজ্য আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে শোভা সিংহের ভ্রাতা হেমৎ সিংহ এবং চন্দ্রকোণার রাজা রঘুনাথ সিংহ বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহের পক্ষাবলম্বন করিয়া বর্ধমান রাজার বিরোধিতা করেন। কিন্তু প্রথম দুইজন কীর্তিচন্দ্রেব সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন, একমাত্র গোপাল সিংহ যুদ্ধে পবাস্ত হইয়াও স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থন হন। কথিত আছে, তিনি যত বড় না শাসক তাহা অপেক্ষা বড় একজন বৈষ্ণব ভক্ত। তিনি বিষ্ণুপুরবাসীর উপর এক আদেশ বলে প্রতি সন্ধ্যায় সকলকে নির্দিষ্ট সংখ্যক 'হরিনাম' জপ করিতে বাধ্য করেন। এই জুলুম "গোপাল সিংহের বেগার" নামে পরিচিত। তাঁহার রাজত্বকালে যে কয়টি বহিরাক্রমণ ঘটে তন্মধ্যে বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রেব আক্রমণে কোনও উল্লেখযোগ্য

পরিবর্তন ঘটে নাই। কিন্তু ভাস্কর রাওয়ের নেতৃত্বে (১৭৪২ খ্রীঃ) মারাঠা বাহিনীর আক্রমণে বিষ্ণুপুর জমিদারীর বহু ক্ষতি সাধিত হয়। এইজন্য নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ চৌথ আদায়কালে বাৎসরিক কর মকুব করিয়া ১,১১,৮০৩ টাকা নির্ধারিত করেন। পূর্বে উল্লিখিত জেমস্ গ্রান্টের বিবরণ হইতে আমরা তাহা জানিতে পাই। স্যার রবার্টসনের গ্রন্থেও মুর্শিদকুলী খাঁ ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরকে বর্ধমান চাকলার অন্তর্ভুক্ত করার পর পূর্বে যে রাজস্ব গৃহীত হইত তাহা হইতে এই সময়ে রাজস্ব কম করিয়া দেওয়ার কথা পাওয়া যায়[১১]। অপর আর একটি বিবরণে জানা যায় যে, ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে নবাব জাফরখান বিষ্ণুপুর জমিদারীকে বর্ধমান চাকলার অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাজস্ব আদায় করেন এবং তাহা ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঐ চাকলার অধীনে ছিল।

"In 1715, under the administration of Jafar Khan, it was reduced to the status of a Zamindari. It was at that time included within the Chakla of Burdwan, and was with that District ceded to the East India Company in 1760."[১২]

তবে ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে বর্গী বা মারাঠা আক্রমণে বিষ্ণুপুর রাজধানীর কোনও ক্ষতি সাধিত হয় নাই। কথিত আছে রাজা গোপাল সিংহ তখন সমবেত প্রজাকে হরিনাম সংকীর্তনের আদেশ দেন। তাহাতে নগরঈশ্বর মদনমোহন উপায়ান্তর না দেখিয়া দলমর্দন কামানের সাহায্যে স্বয়ং বর্গী বিতাড়ন করেন। গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ'-এ ইহার উল্লেখ আছে;

গোয়ালাভূঞি সেনভূঞি সব পোড়াইল।
চতুর্দিক পোড়াইয়া বিষ্ণুপুর আইল ॥
তবে বন বিষ্ণুপুর গোপাল রক্ষা করে।
অসাদ্য বর্গীর তবে কি করিতে পারে ॥
শহর লুটিতে বরগী তবে আইল ধাইয়া।
নইহাটি উদ্যানপুর কাটোঞা ডাহিনে থুইয়া ॥

(ক.বি. ১৭৮৪, ১ম কাণ্ড; পু.পৃ. ৪, ১৬৭২ শক, ১১৫৮ সাল)

এই সম্পর্কে রতন কবিরাজ লিখিয়াছেন —

ভাস্কর পণ্ডিত আইল বাঙ্গলায় আওয়াই হৈল
ফোজের নাহিক অনুমান।
পাসার চৌথ খুট্যা খায় (সব) মারহাট্যা বোলায়
শুনে সব রাজার তদ্বিয়ান ॥
পালায় বাজা শিখরভূঞা হাজার দুই ঘোড়া লৈয়া

এইরূপে ভুঞ্জের পালাবা ।

* * * * *

মল্লরাজার ধন কেবল প্রভু মদনমোহন
নজরে রাখেন পৃথিবীত।
ঠেকিলে প্রভুর ঠাঞি পারাবার পাতে নাঞি
রতন কবিরাজ বিরচিত ॥

(বি.সা.পু.পৃ. ৩ এবং ৬)

এই সকল ঐতিহাসিক ছড়া হইতেও গোপাল সিংহের সময়কার পরিচয় পাওয়া যায় । ঈশ্বর-বিশ্বাসী গোপাল সিংহের প্রশস্তি বর্ণনায় মল্লভূমের কবিরা মুখর । সুপ্রসিদ্ধ পর্যটক এ্যাবি র‍্যাণেলও মল্লভূম সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন[১১]।

বিষ্ণুপুরের তদানীন্তন শাসন ব্যবস্থা, প্রজাদের সুশৃঙ্খল জীবন, স্বাধীনতা ও সততা ভ্রমণকারীর নানা সুখ-সুবিধা এবং রাজ্যের আয়-ব্যয় প্রভৃতির সুদীর্ঘ বর্ণনার দ্বারা এক আদর্শ রাজ্যের চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন স্যার হলওয়েল । তাঁহার বর্ণনায় শান্ত নিস্তরঙ্গ ধর্মভীরু এক সমাজের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, যদি কোনও ব্যক্তি রাস্তায় কাহারও টাকার থলি বা মূল্যবান জিনিস পড়িয়া থাকিতে দেখে তখনই সে নিকটতম চৌকিতে গিয়া খবর দেয় । রাজ-কর্মচারী ঢেঁড়া পিটাইয়া প্রকৃত মালিককে তাহা ফেরৎ লইয়া যাইতে বলেন । এইরূপ সত্যনিষ্ঠাই ছিল বিষ্ণুপুরবাসীব প্রধান গুণ[১২]।

মল্লরাজারা সকলেই অল্প-বিস্তর সাহিত্যানুরাগী ছিলেন, গোপাল সিংহের (১ম) নাম তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে । তাঁহার বাজত্বকালে বহু সভাকবির আবির্ভাব ঘটে । মল্লভূম সাহিত্য সংস্কৃতির তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয় । গোপাল সিংহের (১ম) পুত্র কৃষ্ণসিংহ রাজা হইয়াছিলেন কিনা জানা যায় না, তবে গোপালের পর তাঁহার পৌত্র চৈতন্য সিংহ রাজত্ব লাভ করেন ।

চৈতন্য সিংহ (আঃ ১৭৪৮-১৮০২ খ্রীঃ) :-

চৈতন্য সিংহ ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে (১৬৮০ শকাব্দে) বিষ্ণুপুরের সুপ্রসিদ্ধ রাধাশ্যাম মন্দিরটি নির্মাণ করান । ল্যাটেরাইট পাথরে নির্মিত মন্দিরের সামনে রামসীতা ও রাধাকৃষ্ণ মূর্তি অঙ্কিত আছে । বিষ্ণুপুরের অধিকাংশ দেব বিগ্রহ এখন এই মন্দিরে পূজিত হন । মল্লরাজাদের মধ্যে গোপাল সিংহ (১ম) এবং চৈতন্য সিংহই রাজ্যের সকল ব্রাহ্মণকে নিষ্কর জমি প্রদান করিয়াছিলেন । দৈবাৎ কোনও ব্রাহ্মণ এইরূপ সম্পত্তি লাভে বঞ্চিত হইলে তাঁহাকে পরিহাসপূর্বক 'অব্রাহ্মণ' বলা হইত । চৈতন্যসিংহ সাধন-ভজন এবং দান

ধ্যান লইয়াই থাকিতেন । রাজ্য পরিচালনা করিতেন প্রজাপীড়ক মন্ত্রী কমল বিশ্বাস, সংক্ষিপ্ত নাম 'ছত্রপতি' । চৈতন্য সিংহের রাজত্বকালে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় মারাঠাদের আক্রমণে মল্লভূমবাসীগণ একেবারে বিপর্যস্ত হইয়া পড়েন ।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিষ্ণুপুরের জমিদারী বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর বিভাগ অনুসারে বর্ধমান চাক্‌লার অন্তর্ভুক্ত ছিল । ঐ বৎসর রায়পুর থানা অর্থাৎ বিষ্ণুপুর জমিদারীর দক্ষিণাংশ বর্ধমান রাজার অধীনে যায়[৭৩]। অতঃপর জেমস্ গ্র্যান্টের বিবরণ অনুসারে দেখা যায়, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের নিকট হইতে বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করিলে বিষ্ণুপুর জমিদারী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এক্তিয়ারভুক্ত হয়[৭৪]। ইহার পর বিষ্ণুপুরের কিছু অংশ বীরভূম জিলার এবং পবে বর্ধমান জিলার অধীনে যায় । কিন্তু কোনও পরিবর্তনই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই । এই সময়ে, ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল, রঘুনাথপুর মহকুমার মফস্বল কোর্টের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিষ্ণুপুর উহার অধীনে আসে[৭৫]। কিন্তু উহার দেওয়ানী মামলা কলিকাতার আলিপুর কোর্টেই গৃহীত হইতে থাকে । ইহার উল্লেখ স্যার রবার্টসনের গ্রন্থে পাওয়া যায়[৭৬]।

কেবল মকদ্দমা-সংক্রান্ত বিষয়ের জন্যই বিষ্ণুপুর জমিদারী রঘুনাথপুর কোর্টের অধীন হয় । আর জিলাভিত্তিক পরিবর্তন ঘটে ইহার বহুকাল পরে । ১৮৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দে আধুনিক বাঁকুড়া জিলা গঠিত হইলে, বিষ্ণুপুর পরগণা ঐ জিলার অধীন হয় ।

চৈতন্য সিংহের রাজত্বকালে মল্লসিংহাসনের অধিকার দাবী করেন তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা দামোদর সিংহ (জামকুড়ি)। দামোদর সিংহ মুর্শিদাবাদের নবাবের সাহায্যে বিষ্ণুপুর অধিকারে সচেষ্ট হন । নবাব, চৈতন্য সিংহকে সিংহাসনচ্যুত করিলে সর্বস্বান্ত অবস্থায় তিনি মদনমোহনের বিগ্রহ লইয়া কলিকাতায় গমন করেন । বাগবাজাবের (কলিকাতার) ধনী গোকুল মিত্রের গৃহে মদনমোহনকে বন্ধক রাখিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন । ইংরাজ বণিকেব রাজদণ্ডই তখন চৈতন্য সিংহের প্রধান অবলম্বন । ব্রিটিশ আদালতের মধ্যস্থতায় চৈতন্য সিংহ কিছুকালের জন্য নিজের জমিদারী ফিরিয়া পান । কিন্তু বেশীদিন তাহা স্থায়ী হয় নাই । খাজনা দিতে না পারায়, গৃহবিবাদে এবং '৭৬-এর মন্বন্তরে দেশে দারুণ বিপর্যয় দেখা দিলে চৈতন্য সিংহ দিশাহারা হইয়া পড়েন । কোতলপুরের (বিষ্ণুপুর জমিদারী) কিছু অংশ বর্ধমানের রাজা তেজচাঁদ বাহাদুর অনধিকার ভোগ করিতে থাকায় তাঁহার সঙ্গেও দীর্ঘকাল ধরিয়া মকদ্দমা হইতে থাকে । বিষ্ণুপুর জমিদারীর বহু অংশ বর্ধমান রাজা একে একে ক্রয় করিয়া লন (১৭৯১-১৭৯৮ খ্রীঃ) । অবশেষে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে মাধব সিংহের রাজত্বে বিষ্ণুপুর জমিদারীর অবশিষ্টাংশ বর্ধমান রাজার নিকট প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় (২,১৫,০০০ টাকা) হইয়া যায়[৭৭]।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্য সিংহেব মৃত্যুর পর শূন্যপ্রায় রাজকোষের মালিক হন তাঁহার পৌত্র মাধব সিংহ। ইতিহাসেব ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়া ১১/১২ শত বৎসরের মল্ল সৌভাগ্যরবি চিবকালেব মত অস্তমিত হয়।

মল্ল সৌভাগ্য রবির অস্তমিতির সঙ্গে সঙ্গে মল্লভূমবাসীর প্রাণপ্রিয় দেবতা মদনমোহনও নির্বাসিত হন। মদনমোহনকে হারাইয়া বিষ্ণুপুরবাসীরা অশ্রুসজল নয়নে তাঁহার পুনরাগমনের জন্য দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতিচারণা কবিয়াছেন নানাভাবে। নানা গাথা, বন্দনা ও পালা রচিত হইয়াছে। কিন্তু যে যায়, সে কি আর ঘরে ফিরিয়া আসে ? তাঁহাব জন্য মল্লভূমের কবি জয়কৃষ্ণ দাস দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিযাছেন—

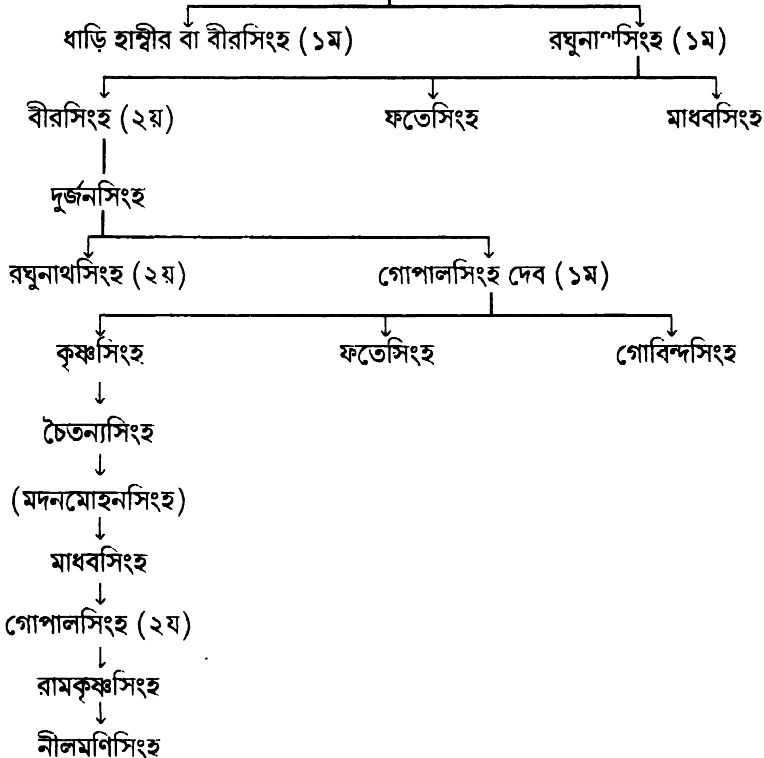
এতকালে ভাঙ্গিলে প্রভু সকল প্রেমের হাট।
তোমা বিনে শ্রীমন্দিরে লাগ্যাছে কপাট ॥
বাসদোল হয় নাই না আইসে আর যাত্রী।
কলিকাতায় কত প্রেমের বেড়ি দিলেক গোকুল মিত্রী ॥
যে দিনে শুনিব গঙ্গা পার্য্যাবে মদনমোহন।
বিষ্ণুপুরের লোক করিব নাম সংকীর্তন ॥
দযা কব্যা যে দিন আস্যা বসিবে আপন পাটে।
দেশের রাজা ঘরকে আইলে কামান দাগিব ঘাটে॥
কোথা বাজায় প্রজায় করে জয় জয়।
তোমাব চরণে জেন সভার মন রয় ॥
মন্দিবেতে আস্যা বৈস বাড়ুক উল্লাস।
জয়কৃষ্ণ দাস মাগে চরণের আশ ॥

(এ.জি. ৪৯৮৮ ; পু.প্. ১২)

মল্লরাজাদের বংশ তালিকা :-

১। আদি বা আদিত্য মল্ল। ৬৯৪ খ্রীঃ (রঘুনাথ সিংহ)	৮। শূর মল্ল।	১৬। বিরাট মল্ল।
	৯। কনক মল্ল।	১৭। মাধব মল্ল।
২। জয় মল্ল।	১০। কন্দর্প মল্ল।	১৮। দুর্গাদাস মল্ল।
৩। বেণু মল্ল।	১১। সনাতন মল্ল।	১৯। জগৎ মল্ল।
৪। কিনু মল্ল।	১২। খড়গ মল্ল।	২০। অনন্ত মল্ল।
৫। ইন্দ্র মল্ল।	১৩। দুর্জন মল্ল।	২১। রূপ মল্ল।
৬। কানু বা কাড় মল্ল।	১৪। যাদব মল্ল।	২২। সুন্দর মল্ল।
৭। ঝাব বা ঝাউ মল্ল।	১৫। জগন্নাথ মল্ল।	২৩। কুমুদ মল্ল।

২৪। কৃষ্ণ মল্ল।
২৫। রূপ মল্ল (২য়)।
২৬। প্রকাশ মল্ল।
২৭। প্রতাপ মল্ল।
২৮। সিন্দুর মল্ল।
২৯। সুখময় মল্ল।
৩০। বনমালী মল্ল।
৩১। যদু মল্ল।
৩২। জীবন মল্ল।
৩৩। রাম মল্ল।
৩৪। গোবিন্দ মল্ল।
৩৫। ভীম মল্ল।
৩৬। কত্তার বা কাটার মল্ল।
৩৭। পৃথ্বি মল্ল।
৩৮। তপঃমল্ল।
৩৯। দীনবন্ধু মল্ল।
৪০। কানু মল্ল (২য়)।
৪১। শূর মল্ল (২য়)।
৪২। শিবসিংহ মল্ল।
৪৩। মদন মল্ল।
৪৪। দুর্জন মল্ল (২য়)।
৪৫। উদয় মল্ল।
৪৬। চন্দ্র মল্ল।
৪৭। বীর মল্ল।
৪৮। ধাড়ি মল্ল।



পাদটীকা

১। Nunde Lal Dey : The Geographycal Dictionary of ancient and Mediaeval India, 3rd ed. 1971. PP ; 122-123

(Collected from Mc Crindle's Megasthenes and Arrian, PP. 63,139)

২। নগেন্দ্রনাথ বসু : বিশ্বকোষ, চতুর্দশ ভাগ, মৎস দ্বাদশী মিব্, পৃ. ২৪৪, ২৪৬, ২৪৮।

৩। W.B. Oldham : Some Historical and Ethnical Aspects of the Burdwan District. Calcutta. 1894. PP. 14, 17.

৪। যোগেশচন্দ্র বসু : মেদিনীপুরের ইতিহাস, প্রথম ভাগ, কলিকাতা, ১৩২৮। পৃ. ১১

৫। J. D. Begler and A. Cunningham : Archeological Survey of India Report in 1872-73. Vol. VIII., Delhi : Reprinted 1966. PP. 180, 205

৬। L.S.S. O'Malley : Bengal District Gazetters Bankura, Vol. XIV. ed-1908. P. 21.

৭। W.B. Oldham : Some Historical and Ethnical Aspects of the Burdwan District. Calcutta, 1894, P. 17.

৮। রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত : 'দেশাবলী বিবৃতি', ১০। বিষ্ণুপুর। সা.প.প. ১৩৫৫, ১ম-২য় সংখ্যা, পৃ. ১৯

৯। Major Rennell's Map, : "The provinces of Midnapore, Burdwan, Hoogly, Bissunpore and Panchete." 1767-74. (Survey of India 1774). ইহার বিষ্ণুপুর অংশের মানচিত্রটি গ্রন্থশেষে আছে।

১০। W.W. Hunter : The Annals of Rural Bengal, Vol-I, London. 1868. Appendix-E. PP. 439-446.

১১। W.B. Oldham : Some Historical and Ethnical Aspects of the Burdwan District, Calcutta, 1894, P. 11.

১২। R.C. Datta : 'The Aboriginal Element in the Population of Bengal' ; The Calcutta Review, Vol. LXXV, 1882. P. 243.

১৩। শশিভূষণ বিশ্বাস : 'মল্লভূমি', অক্ষয় কুমার মৈত্র সম্পাদিত — ঐতিহাসিক চিত্র ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১৩০৬, পৃ. ৭১

১৪। W.W. Hunter : Statistical account of Bengal. Vol. IV; First Reprinted in India 1973. P. 233.

১৫। ও'ম্যালী মনে করেন বীর হাম্বীরের পিতার নাম ধার হাম্বীর। বংশ বিবরণে আছে ধাড়ি মল্ল এবং 'বিশ্বকোষে' লিখিত হইয়াছে বাউ মল্ল।

১৬। L.S.S. O.Malley, : Bengal District Gazetteers Bankura. 1908. P. 25

১৭। A.P. Mallik : History of Bishnupur Raj, 1921. P. 25

১৮। Grant's Analysis ed. by W.K. Firming : "The Fifth Report from the select committee of the House of commons" 1812. Vol. II Calcutta 1917. Introduction and Bengal. Appendices. (33d). P. 184.

১৯। Abu-L-Fazl : The Akbarnama, translated by H. Beveridge, Vol. III. Calcutta 1939. ante. 580 ; P. 879

২০। Jadunath Sarkar : History of Bengal Vol. II, Dacca. 1948. Chap. XI- P. 208

২১। L.S.S. O'Malley : Bengal District Gazetteers Bankura, 1908. P. 25.

২২। W.W. Hunter : Annals of Rural Bengal, Vol-I, 1868. Appendix-E. PP. 445.
এবং
W.W. Hunter : A Statistical Account of Bengal. Vol. IV; First Reprinted in India 1973. P. 235.

২৩। J. D. Begler and A. Cunningham : Archeological Survey of India Report Vol. VIII., Delhi ; Reprinted 1966. PP. 180

২৪। মানিকলাল সিংহ : পশ্চিম রাঢ তথা বাঁকুডা সংস্কৃতি, ১ম সং, ১৩৮৪ সাল, পৃ. ১৫৭।

২৫। Mirza Nathan : Baharistan-I-Ghaybi. Tr. by Dr.M.I. Borah, Vol.-I, univertsity of Dacca. 1936. P. 19.

২৬। J.N. Sarkar : History of Bengal, Vol. II. 1948. PP. 250-51.

২৭। A.K. Banerji : West Bengal District Gazetteers, Bankura, 1968. PP. 94-95

২৮। J. D. Begler and A. Cunningham : Archeological Survey of India Report in 1872-73. Vol. VIII.,Reprinted 1966. PP. 180

২৯। J. N. Mitra (S.D.O. of Vishnupur) : The Ruins of Vishnupur, Vishnupur, Feb. 21st 1940. PP. 6-7

৩০। শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুব বা শ্রীল ঘনশ্যাম দাস : শ্রীশ্রী ভক্তিরত্নাকর, ১৯৪০। পৃ. ৩৪১-৪২

৩১। নিত্যানন্দ দাস বিরচিত : প্রেমবিলাস, ত্রয়োদশ বিলাস, ১৩২০ সাল, পৃ. ১০০

৩২। বাসন্তী চৌধুরী : বাংলাব বৈষ্ণব সমাজ সঙ্গীত ও সাহিত্য ; ১ম সং ১৯৬৮। পৃ. ২১৭

৩৩। মনোহর দাস : অনুবাগবল্লী, ৩য় সং, ৪৪৫ গৌরাব্দ, পৃ. ৪০-৪১

৩৪। মানিকলাল সিংহ : পশিচম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি। বিষ্ণুপুর। ১সং ১৩৮৪, পৃ. ৩৩০

৩৫। সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ২য় সং ১৯৬৫। পৃ. ৮৯ পাদটীকা।

৩৬। A.K. Banerji : West Bengal District Gazetteers Bankura 1968. PP. 96-97.

৩৭। শ্যামরায় মন্দিরের দ্বিতীয় শিলালিপির পাঠ এইরূপ :-
'শ্রীশ্রী শ্যামরায় / 'শ্রীশ্রী মহারাজা রঘুনাথ সিংহ / শ্রী বিরসিংহ যুবরাজ'।
অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাঁকুডা জেলার পুবাকীর্তি, ২য় সং ১৯৭৫. পৃ. ৯০.

৩৮। মানিকলাল সিংহ : 'মল্লরাজাদের পাবিবাবিক পরিচয়', বিশ্ববাণী পত্রিকা ৩৫শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৮০। পৃ. ২৯৫.

৩৯। এইসকল মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের West Bengal District Gazetteers Bankura 1968 এবং বাঁকুড়ার মন্দির (১৯৬৫) হইতে গৃহীত।

৪০। দীনেশ সেন : বৃহৎবঙ্গ, ২য় খণ্ড, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১১১৫। বীর সিংহ সম্পর্কে এইরূপ কিংবদন্তী অভয়পদ মল্লিক মহাশয়ের গ্রন্থেও পাওয়া যায়, —

A.P. Mallik : History of Bishnupur Raj. 1921. P.43

৪১। A.K. Banerjee : West Bengal District Gazetteers Bankura 1968. P. 98.

৪২। মানিকলাল সিংহ : পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি, ১ম সং, ১৩৮৪। পৃ. ৩৩৩

৪৩। Charles Stewart : The History of Bengal, from the first Mohammedan Invasion, Calcutta. 1910. P. 359

৪৪। নিখিল নাথ রায় : 'বিষ্ণুপুরের কথা', পঞ্চপুষ্প, আষাঢ় ১৩৩৭। পৃ. ৪১৯.

৪৫। J. Grants Analysis, W.K. Firminger, ed : The Fifth Report from the Select Committee on the Affairs of the East India Company, Vol. I, Bengal Presidency, London 1812. Madras. J. Higginbotham Mount Road 1866. (Mr. J. Grants view of the Revenues of Bengal) Zemindary Raje of Bishenpoor, Bengal. 1. PP. 462-463.

৪৬। L.S.S. O'Malley : Bengal District Gazetteers Bankura. 1908. P. 27

৪৭। A. K. Banerji : West Bengal District Gazetteers Bankura. 1968. P. 98

৪৮। মানিকলাল সিংহ : পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি, ১ম সং, ১৩৮৪ পৃ. ৩৩৪

৪৯। A. K. Banerji : West Bengal District Gazetteers Bankura. 1968. P. 98

৫০।	প্রাগুক্ত	: প্রাগুক্ত ; P. 98
৫১।	Charles Stewart	: The History of Bengal, Second Edition, Calcutta. 1910. P. 362
৫২।	A. K. Banerji	: West Bengal District Gazetteers Bankura. 1968. P. 98
৫৩।	Ghulam Husain Salim	: Riyazu-S-Salatin, tr. into Eng. from persian with notes, by Maulavi Abdus Salam. Calcutta. 1904. PP. 256-257
৫৪।	A.P. Mallik	: History of Bishnupur Raj. 1921. P.47
৫৫।	দীনেশ চন্দ্র সেন	: বৃহৎবঙ্গ, ২য় খণ্ড, ১৩৪২, পৃ. ১১১৬.
৫৬।	A.P. Mallik	: History of Bishnupur Raj. 1921. P.49
	এবং সুবোধ ঘোষ	: 'পতিঘাতিনী সতী', কিংবদন্তীর দেশে, ১৩৬১, পৃ. ১৩৮-১৫২
৫৭।	মানিকলাল সিংহ	: মল্লরাজাদের পারিবারিক পরিচয়, বিশ্ববানী, - শ্রাবণ ১৩৮০। ৩৫শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা। পৃ. ২৯৭
৫৮।	A.P. Mallik	. History of Bishnupur Raj. 1921. P.47
৫৯।	A. K. Banerji	: West Bengal District Gazetteers Bankura. 1968. P. 464-465
৬০।	A.P. Mallik	: History of Bishnupur Raj. 1921. P.47
৬১।	R.C. Datta	: 'The Aboriginal Element in the Population of Bengal' ; The Calcutta Review, Vol. LXXV, 1882. P.244-45
৬২।	L.S.S. O'Malley	: Bengal District Gazetteers Bankura. 1908. P. 28
৬৩।	A. K. Banerji	: West Bengal District Gazetteers Bankura. 1968. P. 99
৬৪।	W.W. Hunter	: Statistical account of Bengal District of Bankura, First Reprinted in India 1973. P. 235.
৬৫।	মানিকলাল সিংহ	: পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি, ১৩৪৮ সাল। পৃ. ১৫৯-১৬০
৬৬।	প্রাগুক্ত	: মল্লরাজাদের পারিবারিক পরিচয়, বিশ্ববানী, শ্রাবণ ১৩৮০। পৃ. ২৯৭-২৯৮

৬৭। প্রাগুক্ত : মল্লভূমের মল্লরাজা দেবতাদের আদি বৃত্তান্ত, কৌশিকী, ৪র্থ বর্ষ, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৮১। পৃ. ৪০

৬৮। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪১

৬৯। F.W. Robertson : Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Bankura 1917-1924, Calcutta, 1926. Chap V. P.28.

৭০। The Imperial Gazetteers of India Vol. VI. Argaon to Bardwan, Oxford. 1908. Bankura District, P. 385

৭১। Abbe Raynal : History of the East and West (1776). quoted in A.P. Mallik's History of Bishnupur Raj, 1921. PP. 131-133.

৭২। J.Z. Holwell : Interesting Historical Events, Part-I. London, second edition, (MDCC L XVI.) 1766. PP. 197-200.

৭৩। Rai Monmohan Chakravarti Bahadur : A History of the changes in the Jurisdictions of Districts in Bengal 1757-1915. Calcutta, 1916. Chp. IV. PP. 33-34

৭৪। James Grant's Analysis by W.K. Firminger. ed. : Fifth Report from the Select Committee on the Affairs of the East India Company Vol-I, Calcutta. 1916. Introduction : Chap.-VIII, PP. Clix-Clx.

৭৫। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত Appendix, P.CC L XXXVIII

৭৬। F.W. Robertson : Final Report on the Survey and Settlement Operation in the District of Bankura 1917-1924, Calcutta 1926. Chap. V. Pargana Bishnupur. P. 31

৭৭। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত P. 36-37

চতুর্থ অধ্যায়

।। শঙ্কর ও কবিচন্দ্র সমস্যা এবং কবিচন্দ্রের রামায়ণের পুথি নির্বাচনে সতর্কতা ।।

শঙ্কর সমস্যা ঃ

কবিচন্দ্র উপাধি বিশিষ্ট আমাদের আলোচ্য কবির নাম শঙ্কর চক্রবর্তী। কিন্তু তাঁহার কাব্যের খুব অল্প সংখ্যক পুথিতেই এই শঙ্কর নামটি পাওয়া যায়। অধিকাংশ পুথিতেই পাওয়া যায় কবিচন্দ্র উপাধির উল্লেখ। কিন্তু মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে একাধিক শঙ্কর এবং বহু কবিচন্দ্রের অস্তিত্ব বর্তমান। সকল কবির সম্পূর্ণ পরিচয় কিংবা আবির্ভাবকাল সম্পর্কে কোনও নির্ভরযোগ্য সূত্র পাওয়া যায় না। ফলে তাঁহাদের ব্যক্তিজীবন এবং রচনা সম্পর্কে নানা ভুল ধাবণার সৃষ্টি হয়। গবেষকদের মধ্যে নানা মতবিরোধের ফলস্বরূপ সাহিত্যের ইতিহাসেও দেখা দেয় নানা বিভ্রান্তি। এইরূপ বিভ্রান্তির ফলে শঙ্কর এবং কবিচন্দ্র সম্পর্কে যে জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছে তাহার নিরসন করাই এই অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য। প্রথমে শঙ্কর নামা কবিদের খুব সংক্ষিপ্ত আলোচনার শেষে নাম সম্পর্কিত প্রসঙ্গটি আলোচিত হইবে। অনুরূপভাবে কবিচন্দ্র উপাধি সম্পর্কেও আলোচনা করা হইবে। মধ্যযুগে রচিত বিভিন্ন পুথি ও মুদ্রিত পুস্তকে যে সকল শঙ্কর ও কবিচন্দ্রের রচনা পাওয়া যায় তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ কবিই খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। আর কেবল দুই চারিজন কবিই ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

গৌড়ীয় শঙ্কর রচিত 'তারা রহস্যবৃত্তি' (সা. ৩২-৩৫) এবং শঙ্করানন্দ রচিত 'রামতাপনীয়োপনিষদ' প্রভৃতি পুথি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ইহলেও খুব সম্ভব বাঙ্গালী কবির রচিত। এখন বাংলা সাহিত্যে যে সকল শঙ্কর নামক কবির সন্ধান পাওয়া যায়, তাঁহাদের বর্ণানুক্রমিক তালিকা প্রদত্ত হইল।

	কবির নাম		রচনার বিষয়
১।	কালী শঙ্কর	.....	শীতলামঙ্গল
২।	কিঙ্কর শঙ্কর	.....	লক্ষ্মীর চরিত্র ও লক্ষ্মীবিলাস
৩।	কিঙ্কর শঙ্কর	.....	পাষণ্ড মর্দন
৪।	দ্বিজ শঙ্কর	.....	গৌরলীলামৃত (সংস্কৃত ভাষায়)
৫।	ভবানী শঙ্কর দাস	.....	মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা
৬।	ভবানী শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সংক্ষেপে শঙ্কর বা রামশঙ্কর	.....	রামায়ণ
৭।	রামশঙ্কর দত্ত রায় (ভিষক্)	.....	রামায়ণ
৮।	রামশঙ্কর দেব	.....	অভয়া মঙ্গল

৯।	রাম শঙ্কর সেন	.....	সত্যনারায়ণ পাঁচালি
১০।	শঙ্কর	.....	পঞ্চানন মঙ্গল
১১।	শঙ্কর	.....	ষষ্ঠীমঙ্গল (রানীর বাজার)
১২।	শঙ্কর	.....	সত্যনারায়ণ পালা এবং ফেসারার মদনসুন্দরের পালা।
১৩।	শঙ্কর	.....	গণিতের আর্যা
১৪।	শঙ্কর আচার্য	.....	গুরুদক্ষিণা
১৫।	শঙ্কর আচার্য	.....	বিষ্ণুপদ তীর্থমালা ও সত্যপীর কথা
১৬।	শঙ্কর কিঙ্কর মিশ্র (কবিচন্দ্র)	.....	গৌরীমঙ্গল
১৭।	শঙ্কর চক্রবর্তী (কবিচন্দ্র)	.....	শিবমঙ্গল, অনাদিমঙ্গল, রামায়ণ, ভাগবতামৃত এবং মহাভারত।
১৮।	শঙ্কব দাস	.....	দোললীলা
১৯।	শঙ্কর দাস	.....	যমপ্রজাসংবাদ, যম উপাখ্যান এবং যমগীতা
২০।	শঙ্কর দেব	.....	শীতলামঙ্গল
২১।	শঙ্কর ব্রহ্মচারী	.....	গঙ্গাবন্দনার পদ
২২।	শঙ্কর ভট্ট	.....	নিমাই সন্ন্যাস
২৩।	শঙ্কর মিশ্র	.....	গীতগোবিন্দের টীকা- 'রসমঞ্জরী'
২৪।	শঙ্কর (রায়)	.....	বৈদ্যনাথ মঙ্গল
২৫।	শঙ্কর সেন	.....	নাড়ী প্রকাশ
২৬।	শিব শঙ্কর	.....	গুরুদক্ষিণা পালা
২৭।	শ্রী শঙ্কর	.....	চৈতন্য পরিকররূপে পরিচিত।

কালী শঙ্করের রচিত 'শীতলামঙ্গল' (ক.বি. ৬৬২৮, খণ্ডিত) পুথিটিতে 'কালী শঙ্কর' ভণিতা দুইবার এবং 'শ্রী কবি শঙ্কর' ভণিতা একবার পাওয়া যায়, তবে ইহা পানুয়া রামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার (বাঁকুড়া) হইতে প্রকাশিত 'শ্রীশ্রী শীতলামঙ্গল' (১৩৬৮) গ্রন্থখানির সঙ্গে মেলে না।

'লক্ষ্মী চরিত্র' (ক.বি ৩৭২০, ১-২৩, সম্পূর্ণ) এবং 'লক্ষ্মী বিলাস' (ক.বি. ৩৪৫৭, ১-১৬ পত্র) সম্পূর্ণ, ১২৬৯), রচয়িতা কিঙ্কব শঙ্কর নিজেকে দুইবার 'কিঙ্কর' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার 'পাষণ্ডমর্দন' (সা.প.প. ১৩২০, ৪র্থ, পৃ. ৩০৭-৮) রচয়িতা কিঙ্কর শঙ্করও নিজেকে 'কৃষ্ণের কিঙ্কর' বলিয়া পরিচয় দিযাছেন। উহাদের রচয়িতা একই ব্যক্তি হইতে পারেন।

দ্বিজ শঙ্কর সংস্কৃত ভাষায় একখানি 'শ্রীগৌরলীলামৃত' ১৭১১ শকাব্দে রচনা করিয়াছিলেন[১]।

চট্টগ্রামের অধিবাসী ভবানী শঙ্কর দাস রচনা করেন (১৭০১ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৭৯-৮০ খ্রীঃ) 'মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা'।[২] তৎসম এবং তদ্ভব শব্দ যোগে সন্ধি সৃষ্টি তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য।

তিলকচন্দ্র রাজার রাজত্বকালে সাগরদিয়ার কবি ভবানীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একখানা অধ্যাত্ম রামায়ণের ভাবানুবাদ রচনা করেন। তিনি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের (ক.বি. ৭৪) পুথিতে নিজের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত নাম 'শঙ্কর' বা 'রাম শঙ্কর'। খুব সম্ভব তাঁহার উপাধিও ছিল কবিচন্দ্র। তাঁহার রচিত একটি পুথিতে পাওয়া যায় :-

শুন কহে পার্বতী শুনহ বচন।
অযোধ্যাকাণ্ডের কথা কবিচন্দ্র কন ॥

(সা. ১৭১৫. পু.পৃ. ৪)

এই কবির সঙ্গেই শঙ্কর চক্রবর্তীর রচনা সম্পর্কে জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছে সর্বাধিক, তাহা পরে আলোচিত হইয়াছে।

ঢাকা জিলার মানিকগঞ্জ থানার বায়রা গ্রামের কবি রাম শঙ্কর দত্ত রায় (ভিষক্) ভরদ্বাজানুযায়ী বিবিধ পুরাণ এবং কৃত্তিবাসী ও অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণের সার সংগ্রহ করিয়া একখানি 'রামায়ণ' রচনা করেন। তিনি তথাকার বৈদ্যবংশে প্রায় ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন।[৩] ইঁহার সঙ্গে উপরে বর্ণিত ভবানী শঙ্করের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে রামশঙ্কর নামের জন্য। তবে তাহা কেবল আলোচনা ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ।

আগম শাস্ত্র এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণ অবলম্বনে রামশঙ্কর দেব রচনা করিয়াছেন 'অভয়ামঙ্গল' (এ.জি. ৪৩)। রামানন্দ যতী তাঁহাকে গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ দিয়াছেন। কবি ছিলেন হুগলী জিলার ধর্মদা গ্রামের অধিবাসী।

সত্যনারায়ণ পাঁচালির কবি রামশঙ্কর সেন ছিলেন সাতসইকা পরগণার সাহাপুর নিবাসী।[৪] 'পঞ্চানন মঙ্গল' নামক একটি পুথিতে 'শঙ্কর' ভণিতা ছাড়াও (বি.ভা. ১৪৯৮, পু.পৃ. ৩ক এবং ৮ক) পাওয়া যায় বল্লভ, দ্বিজরামেশ্বর এবং কঙ্কণের ভণিতা।

'ষষ্ঠী মঙ্গল' কাব্যখানি মেদিনীপুর জিলার ঘাটাল থানার অন্তর্গত রাণীর বাজারের কবি শঙ্কর কর্তৃক 'আদ্য বসু চন্দ্রকলা' অর্থাৎ ১৬৮১ শকাব্দে (১৭৫৯ খ্রীঃ) রচিত হয়।[৫]

শঙ্কর রচিত একটি 'সত্যনারায়ণ' পালা (ক.বি. ৩৪৯২, ১-১২ পত্র, সম্পূর্ণ, ১২১৮ সাল) এবং ফেসারার মদনসুন্দরের পালা (ক.বি. ৪৭০৫, ১-১৮ পত্র, খণ্ডিত) পাওয়া যায়। দুইটি পালাতেই "হুকুমপীরের কবি শঙ্করেতে কন" কথার উল্লেখ আছে। এইজন্য মনে হয়, উক্ত দুইটি পালার রচয়িতা কবি শঙ্কর একই ব্যক্তি. রচনা দুইটি কাব্যগুণে উৎকৃষ্ট।

শঙ্করের নামে 'গণিতেব আর্য' পাওয়া গেলেও ইহার বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

অপর শঙ্কর রচিত 'গুরুদক্ষিণা' পালাব কয়েকটি পুথি পাওয়া যায় (ক.বি. ৩৫২৪, ক.বি. ৫৩০০)। আবার 'শঙ্খাসুর বধগীত' (ক.বি. ৫৩০৪) পালাও এই গুরুদক্ষিণার বিষয়। এশিয়াটিক সোসাইটির দুইটি পুথিতে (এ.জি. ৪৮৯১ এবং এ.জি. ৫৩৮৭) শঙ্কর 'কুলচণ্ডা' নিবাসী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কুলচণ্ডা নিবাসী শঙ্করের এই 'গুরুদক্ষিণা' পালাটি যে কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী বিরচিত 'ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গল' গ্রন্থটিতে মুদ্রিত হইয়াছে, সে সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ডঃ সুকুমার সেন। তাঁহার মতে, "ভাগবতামৃতের সঙ্কলয়িতা যে 'গুরুদক্ষিণা', পালাটি কাব্যের মধ্যে ধরিয়াছেন তাহা শঙ্কর চক্রবর্তী কবিচন্দ্রের রচনা নয়। কুলচণ্ডা গ্রামবাসী শঙ্কর আচার্য ইহার রচয়িতা"।[৬] ইঁহার পদবী যে 'আচার্য' তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে একটি পুথিতে (সা.প.প. ১৩১০, ২য় সংখ্যা, পৃ. ১২৭)।

(ক) 'গুরুদক্ষিণা' পালার শঙ্কর আচার্য এবং 'বিষ্ণুপদতীর্থমালা' (সা.প.প. ১৩০৬, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৭১) ও 'সত্যপীব কথা' (সা.প.প. ১৩০৪, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৩৪১, ১০৬২ সনে লিপিকৃত) নামক এই দুইখানি পালার বচয়িতা শঙ্কর আচার্য একই ব্যক্তি কিনা বলা যায় না। পূর্বোক্ত বিষ্ণুপদতীর্থ মালা'র আর একখানা পুথির (ক.বি ১৩৫৫, খণ্ডিত) পাঠে এবং 'সত্যপীর কথার' দ্বিতীয় পুথিটির (ক.বি. ১৬৭৪) পাঠের মধ্যে মিল বর্তমান। এই পুথি দুইটিও (ক.বি. ১৩৫৫ এবং ক.বি. ১৬৭৪) শঙ্কর আচার্যের রচিত।

(খ) এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, শঙ্কর বচিত পূর্বোক্ত 'সত্যনারায়ণ' (ক.বি. ৩৪৯২) এবং 'ফেসারার মদনসুন্দরের পালা'য (ক.বি. ৪৭০৫) যে ভণিতা পাওয়া যায় ('হুকুম পীরের কবি শঙ্করেতে কন'), তাহা কিন্তু শঙ্কর আচার্যের কোনও পুথিতে পাওয়া যায় না।

সময়ের দিক হইতে শঙ্কর কিঙ্কর কবিচন্দ্র মিশ্র যিনি 'গৌরীমঙ্গল' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তিনিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম (১৪৯৭-৯৮ খ্রীঃ) কবি। এই 'গৌরীমঙ্গলে'র (বি.ভা. ১০২৮, ১-২১ পত্র, খণ্ডিত) সন্ধান দিয়াছেন ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল (পুঁথি পরিচয়, ৩য় খণ্ড)। কিন্তু তিনি তাঁহার আলোচনায় তিনজন কবিচন্দ্রকে এক করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা কবিচন্দ্র সমস্যায় বলা হইয়াছে। শঙ্কর কবিচন্দ্র মিশ্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে জানা যায় যে, মহাপ্রতাপশালী পঞ্চগৌড়ের নবাব হোসেন শাহের রাজত্বকালে ত্রিবেণী নদীর তীরবর্তী সপ্তগ্রামের বালাণ্ডা নামক স্থানে, যাহার দুই পার্শ্বে যমুনা ও সুরেশ্বরী নদী (সরস্বতী) প্রবাহিত, তথাকার গুণীসমাজে তিনি আহূত হন। তাঁহার কাব্যখানির নাম 'গৌরীমঙ্গল' হইলেও আসলে তাহা 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য।

শঙ্কর দাস (পাগল) ভণিতায় 'দোললীলা' নামক (ক.বি. ২৭৫৮, খণ্ডিত) একখানি ছোট আকারের পুথি পাওয়া যায়। 'দাস' বৈষ্ণবীয় বিনয়সূচক শব্দ হইলেও আমরা উক্ত পুথিতে 'পাগল' শব্দের উল্লেখ পাই নাই।

শঙ্কর দাসের ভণিতায় 'যম প্রজা সংবাদ'[৭], 'যম উপাখ্যান'[৮] এবং 'যম গীতা'[৯] নামক তিনটি পুথি পাওয়া যায়। এই তিন পুথির রচয়িতা একই শঙ্কর দাস হইতে পারেন। পাপ-পুণ্য সম্পর্কে সাধারণ লৌকিক মনোভাবের প্রকাশ এই পুথিগুলিতে প্রতিফলিত হইয়াছে।

শঙ্কর রচিত শীতলামঙ্গলের কয়েকটি পালা পাওয়া যায়। তাঁহার 'কৈলাস পূজা' পালায় (ক.বি. ৩৫০০, ১-১২ পত্র, সম্পূর্ণ, সাল ১২১৮ লিপিকাল) 'শঙ্কর' ব্যতীত কবির পদবীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। কালী শঙ্করেব 'শীতলা মঙ্গল'-এর কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই দুই কবির সঙ্গে পানুয়া রামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার (বাঁকুড়া) হইতে কবিচন্দ্রের নামে প্রকাশিত 'শ্রীশ্রী শীতলামঙ্গল'-এব (১৩৬৮ সাল) বিশেষ সাদৃশ্য পাওয়া যায় না।

ত্রিপুরা বসু একখানি 'শীতলামঙ্গলে'র সন্ধান দিয়াছেন, তাহার ভণিতায় 'কাতর শঙ্কব'-এর উল্লেখ আছে।[১০] আবাব মুদ্রিত গ্রন্থটিতেও 'কাতব শঙ্কর'-এর উল্লেখ দেখা যায়। ত্রিপুরা বসু কাতর শঙ্করের পদবী 'দেব' বলিয়া জানাইয়াছেন এবং তিনি মেদিনীপুর জিলার চেতুয়া পরগণার কলাইকুণ্ড গ্রামের অধিবাসী।[১১] অতএব 'কাতর শঙ্কর'-এর পরিচয় জানিবার পর উক্ত মুদ্রিত 'শ্রীশ্রী শীতলামঙ্গল' গ্রন্থটিকে এখন অনেকে কবিচন্দ্র শঙ্কব চক্রবর্তীর রচিত বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করেন। কেননা পানুয়া হইতে মুদ্রিত গ্রন্থটিতে কবিচন্দ্রের ভণিতা কিংবা নিবাসস্থলের নাম অথবা মল্লবাজাদের কাহারও নামের উল্লেখ নাই, যাহা কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর অন্যান্য রচনায় পাওয়া যায়। যদিও গ্রন্থটির ভূমিকায় বহু গুণী ব্যক্তির মন্তব্য সংযুক্ত হইয়াছে, তথাপি নানা কাবণে উহা কবিচন্দ্রের রচনা মনে কবিতে দ্বিধা জন্মে। যতদিন না শীতলামঙ্গলের সমস্ত পুথি আবিষ্কৃত হইতেছে ততদিন এই গ্রন্থটি সম্পর্কে সংশয় থাকিযাই যায়।

শঙ্কর ব্রহ্মচারীর ভণিতায় একখানা 'গঙ্গার বন্দনা' (বি.ভা. ৯৫৮, ১ম পত্র, ১২২৩ সালে লিপিকৃত) পাওয়া যায়। পুথিটির রচনায় বন্দনা বিষয় কিংবা কাব্যরস বিশেষ নাই। আবার শঙ্করের ভণিতায় এমন একখানি 'গঙ্গার বন্দনা' (সা. ৪০২, ১ পত্র) পাওয়া যায়, যাহা কবিকঙ্কণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কবিচন্দ্রের 'গঙ্গাবন্দনা'র অনুরূপ।

শঙ্কর ভট্টের 'নিমাই সন্ন্যাস' নামক পুথিটি পাওয়া গিয়াছে চট্টগ্রাম হইতে।[১২] শঙ্কব মিশ্রের 'রসমঞ্জরী' (গীতগোবিন্দের টীকা), শঙ্কর বাযের 'বৈদ্যনাথ মঙ্গল' (সা.প.প. ১৩৫৮, ৩-৪, পৃ. ৪৪) এবং শঙ্কর সেনের 'নাড়ী প্রকাশ' (সা.প.প. ১৩২০, ১ম, পৃ. ৭০-৭৩) নিতান্ত ক্ষুদ্র বচনা নয়।

শিবশঙ্করের 'গুরুদক্ষিণা' পালার সংবাদ দিয়াছেন ডঃ সুকুমার সেন ।[১৩]

'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে চৈতন্যদেবের সঙ্গে শ্রী শঙ্করের নাম উল্লেখ করিয়াছেন নরহরি দাস; যথা :-

'শ্রীশঙ্কর, শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই
নৃসিংহ, চৈতন্য, জীব পণ্ডিত কানাই'।

(ভক্তি, ১০ম তরঙ্গ, ৩৭৫)

ইঁনি কবি ছিলেন কিনা জানা যায় নাই ।

এই শঙ্কর নামক কবিদের সংক্ষিপ্ত আলোচনার শেষে আমাদের কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর সঙ্গে যে সকল শঙ্কর কবির মিশিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে তাঁহাদের প্রসঙ্গই আলোচিত হইবে । তাহা হইলে শঙ্কর সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব । যে সকল শঙ্করকে লইয়া বিভ্রান্তি উপস্থিত হইয়াছে তাঁহাদের নাম যথাক্রমে : (ক) অধ্যাত্ম রামায়ণের ভাবানুবাদক ভবানীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সংক্ষেপে শঙ্কর বা রামশঙ্কর,
(খ) 'লক্ষ্মীর চরিত্র' রচয়িতা শঙ্কর কিঙ্কর,
(গ) 'গুরুদক্ষিণা' পালার রচয়িতা কুলচণ্ডার শঙ্কর এবং
(ঘ) 'শীতলা মঙ্গল'-এর কবি 'কাতর শঙ্কর' বা শঙ্কর দেব ।

অধ্যাত্ম রামায়ণের কবি ভবানীশঙ্করের সঙ্গে শঙ্কর চক্রবর্তীর রচনার বিভ্রান্তিই এই শঙ্কর নামক কবিদের মধ্যে সর্বাধিক । এই ভ্রান্তির কারণ বিস্তারিতভাবে পরে বলা হইবে । এখানে সংক্ষেপে ইহা বলা যায় যে, পুথির লিপিকরগণ এবং সাহিত্যসমালোচকেরা এই কবিচন্দ্রের এবং ভবানীশঙ্করের নাম 'শঙ্কর' হওয়ার ফলে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছেন । এই ভ্রম যত না পুথির ক্ষেত্রে ঘটিয়াছে তাহা অপেক্ষা বেশী ঘটিয়াছে আলোচনার ক্ষেত্রে ।[১৪]

(ক) ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় অধিকাংশ সমালোচক মনে করেন কৃত্তিবাসী রামায়ণে যে 'তরণীসেন বধ' পালা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার প্রচারক কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী । আমাদের ধারণায় এই পালাটির প্রচারক তিনি নহেন । কেননা কবিচন্দ্রের ভণিতায় একখানিও তরণী সেন বধ পালা পাওয়া যায় নাই । ইহার পরেও তাঁহাকে উক্ত পালার প্রচারক বলা চলে কিনা তাহা বিচার্য ।
দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা সাগরদিয়ার ভবানীশঙ্করকে 'রামশঙ্কর' মনে করেন, তাঁহারা খুব ভুল করেন না । কেননা তাঁহার দুইটি পুথিতে উক্ত রামশঙ্কর নাম (ক.বি. ৭৪ এবং ক.বি. ১৯০) পাওয়া যায় ।[১৫] তবে সাগরদিয়ার ভবানীশঙ্কর বা রামশঙ্কর এবং ঢাকা জিলার মানিকগঞ্জ থানার বায়রা গ্রামের রামশঙ্কর দত্ত বায় (ভিষক্) এক ব্যক্তি নহেন । উভয়ের ভণিতা লিখিবার পদ্ধতিও ভিন্ন ধরনের । এই রামশঙ্কর ভিষক্বের ভণিতায় পাওয়া যায়

'অদ্ভুতআশ্চর্য' শব্দের উল্লেখ। এই কবির একখানা পুঁথিও আমাদের নির্বাচিত শঙ্কর চক্রবর্তীর রামায়ণের পুথিসমূহে ভ্রান্তির সৃষ্টি করে নাই। ভবানীশঙ্করের পুথির সঙ্গে কবিচন্দ্রের পুথির ও সাহিত্য সমালোচনার যে ভ্রান্তি দেখা দিয়াছে তাহা দূরীভূত করার উদ্দেশ্যেই ভবানীশঙ্করের ভণিতাসমূহ বিশদরূপে এই অধ্যায়ের শেষে আলোচিত হইয়াছে।

(খ) শঙ্কর কিঙ্করের 'লক্ষ্মীর চরিত্র' খানি সম্বন্ধেও কিছু সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। পণ্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় "ভাগবতামৃত শ্রীশ্রী গোবিন্দমঙ্গল" গ্রন্থের ভূমিকায় কবিচন্দ্রকে 'লক্ষ্মীর চরিত্র' নামক একখানি পুথির রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[১৬] কিন্তু এই বিষয়ে আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। আমরা পূর্বে কিঙ্কর বা কিঙ্কর শঙ্কর রচিত 'লক্ষ্মীর চরিত্র' পুথির কথা উল্লেখ করিযাছি। আবার ক্ষেপুতের কবি শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করও 'দেবী লক্ষ্মীর গীত' রচনা করিয়াছেন। আমাদের কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী কোথাও নিজেকে কিঙ্কর বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। এইহেতু কিঙ্কর ভণিতাযুক্ত পুথি কবিচন্দ্রের রচনা বলিয়া মনে হয় না। তবে রবীন্দ্রনাথ মাইতি লিখিয়াছেন, তাঁহার নিকট 'লক্ষ্মীব বনবাস' নামক কবিচন্দ্র রচিত একখানি পুথি আছে। এই কবিচন্দ্র কে, সে সম্পর্কে কোনও নির্দেশ তিনি দেন নাই।[১৭]

(গ) পণ্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত কবিচন্দ্রের 'ভাগবতামৃত শ্রীশ্রী গোবিন্দমঙ্গল (১৩৪১) গ্রন্থে যে 'গুরুদক্ষিণা' পালা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। উহার ভণিতা এইরূপ :-

"দুষ্কর্ম্মের পথি হৈয়া কুল করে নাশ।
শঙ্কর রচিল যার কুলচণ্ড বাস ॥" (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫)

এই ভণিতা হইতে বোঝা যায় যে, এই পালাটি কুলচণ্ডা নিবাসী শঙ্করের রচনা, কবিচন্দ্রের নহে। এই কুলচণ্ডা বর্ধমানের অন্তর্গত একটি গ্রামের নাম। আব এই 'গুরুদক্ষিণা' পালার শঙ্করের ভণিতা লিখিবার বিশেষ রীতি — 'এ ঘোর সাগবে পার কর দামোদর।' অতএব 'গুরুদক্ষিণা' পালার রচয়িতা কুলচণ্ডার শঙ্করকে, শঙ্কর চক্রবর্তীর সঙ্গে এক করিয়া ফেলা হইয়াছে। ডঃ সুকুমার সেন সে ভ্রান্তি দূর করিয়া দিয়াছেন, তাহাও পূর্বে বলা হইয়াছে।

(ঘ) পণ্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় চুয়াডাঙ্গাব গায়কদের নিকট হইতে একখানি 'শীতলামঙ্গল'-এর পুথি পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন। উহাতে শঙ্কর ভণিতা থাকায় তিনি উহা শঙ্কর চক্রবর্তীর রচনা মনে করিয়া পানুয়া রামকৃষ্ণ সাধাবণ পাঠাগার হইতে প্রকাশিত পুস্তকে ঐ মর্মে বিজ্ঞাপন প্রদান করেন।[১৮] এই 'শ্রীশ্রী শীতলামঙ্গল' গ্রন্থটিতে যে সকল ভণিতা পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে, 'শঙ্কর দ্বিজ' মাত্র একবার (পৃ. ৪) এবং 'কাতর শঙ্কর' ভণিতা সাতবার (পৃ. ২, ৭, ১৫, ১৯, ২৫, ২৯ এবং ৩০) উল্লিখিত হইযাছে। আবার 'শ্রীশঙ্কর' এবং 'শঙ্কর' ভণিতাও আছে কযেকবার। ত্রিপুরা বসু শঙ্কব

দেবেব 'বিরাট জাগরণ পালা' পুথির আলোচনা কবায় 'কাতর শঙ্কর' যে শঙ্কর দেবের (চেতুয়ার কলাইকুণ্ড) লিখিবার বিশেষ রীতি, তাহা জানা গিয়াছে। সন ১১৪৪ সালের ২৮শে আশ্বিন (১৭৩৮ খ্রীঃ) শঙ্করদেব দেবী শীতলার অনুগ্রহ লাভ করেন, ইহাতে শ্রীবসু মনে করেন ঐ সময়েই 'শীতলামঙ্গল' কাব্যখানি রচিত হইয়া থাকিবে।[১৯]

পণ্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায়ের সংগৃহীত 'শ্রীশ্রী শীতলামঙ্গল' গ্রন্থটির সঙ্গে ত্রিপুরা বসুর আলোচিত 'শীতলামঙ্গল'-এর কাহিনীর মিল আছে। শ্রীবসুর আলোচিত 'বিরাট পালা'র কাহিনীতে দেখা যায়, শীতলা মর্ত্যে নিজের পূজা প্রচার মানসে বৃদ্ধার বেশে বসন্তের ঝুড়ি লইয়া বিরাট রাজ্যে রাজা বীরসিংহের রাজধানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। রাজা বৃদ্ধাকে পূজা করিতে অস্বীকার করিলে শীতলা দেবী ইহার প্রতিশোধ লইতে রাজার একমাত্র পুত্রকে বসন্তরোগ কবলিত করান। ক্রমে রাজ্যে বসন্তরোগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পুত্রের মৃত্যুর পর রাজার চৈতন্য লাভ হয়। তিনি শীতলাদেবীর উপদেশমত বিরাট নগরে পূজা প্রচার করেন। অবশেষে রাজপুত্র সহ অন্যান্য মৃত ব্যক্তিগণ পুনরায় প্রাণ লাভ করেন। এইরূপে মর্ত্যে শীতলা পূজার প্রচলন হয়।[২০] মুদ্রিত 'শ্রীশ্রী শীতলা মঙ্গল' গ্রন্থটিব কাহিনীও এইরূপ। উহাতেও শীতলার দাসী রক্তাবতী এবং অনুচর জ্বরাসুরের পরামর্শে শীতলার বিরাট নগরে পূজা প্রচারের কথা বলা হইয়াছে।

মাখনবাবুর সংগৃহীত উক্ত 'শ্রীশ্রী শীতলামঙ্গল' কাব্যে যে 'গৌরাঙ্গ বন্দনা' যুক্ত হইয়াছে, তাহা কবিচন্দ্রের কৃষ্ণানুরক্তি বলিয়া মাখনবাবু মনে করিয়াছিলেন।[২১]

কিন্তু এই 'গৌরাঙ্গ বন্দনা'তে শঙ্কর নামের উল্লেখ নাই, অতএব উহা অন্য কাহারও রচনা হওয়াও সম্ভব। গ্রন্থটির ভূমিকায় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন বহু গুণী ব্যক্তি। ইহার কারণ সম্ভবতঃ উক্ত "শঙ্কর দ্বিজের নিবেদন" (পৃ. ৪) — ভণিতাটির উল্লেখ জন্য হইয়া থাকিবে। গ্রন্থটির অধিকাংশ ভণিতা 'কাতর শঙ্কর' থাকায় এবং কবিচন্দ্র ভণিতা কিংবা কোনও মল্লরাজার নাম অথবা কবির স্বগ্রামের নাম, পিতার নাম ইত্যাদি কবিচন্দ্রের এই সকল বিশেষ ভণিতা লিখিবার ধরন উক্ত 'শ্রীশ্রী শীতলা মঙ্গল' পুস্তিকাটিতে না থাকায়, উহা কবিচন্দ্রের রচনা বলিয়া নির্দ্বিধায় মানিয়া লওয়া যায় না। যাহাই হউক, এই 'শীতলামঙ্গল'-এর যত অধিক সংখ্যক পুথি প্রকাশিত হইবে ততই শঙ্কর সমস্যার নিরসন ঘটিবে।

কবিচন্দ্র সমস্যা :

মধ্যযুগের হস্তলিখিত বাংলা পুথির প্রায় এক তৃতীয়াংশ কবিচন্দ্রের পুথি নামে পরিচিত। বিপুল সংখ্যক এই পুথি নিশ্চয়ই কোনও একজন কবির রচনা নহে। এই কবিচন্দ্র নামের অন্তরালে সঠিক কতজন ব্যক্তি আত্মগোপন করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য ব্যাপার। পুথি পাঠকের নিকট কবিচন্দ্র তাই এক সমস্যা। এই সম্পর্কে

ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল মনে করেন, —"চণ্ডীদাস কৃত্তিবাসাদির মত কবিচন্দ্র নামটিও পুরানো বাংলা সাহিত্যে সমস্যা বিশেষ। ১৫ শতাব্দী হইতে এই নামের বা এই উপাধিযুক্ত বিভিন্ন গ্রন্থকারের লিখিত নানা গ্রন্থ আমাদের হাতে আসিয়াছে। কামতা কামরূপ হইতে আবা কান এবং বালাণ্ডা হইতে বনবিষ্ণুপুর অঞ্চলে কবিচন্দ্র ভণিতায় অসংখ্য পুঁথি মিলিতেছে।"[১২] 'কবিশেখর', 'কবিবল্লভ', 'কবিকঙ্কণ' প্রভৃতি উপাধির মতই 'কবিচন্দ্র'ও একটি গৌরবজনক উপাধি। মধ্যযুগে কোনও না কোনও ধনী ভূস্বামী বা রাজাদিগের পৃষ্ঠপোষকতায় অথবা কোনও মহান্ত সমাজ হইতে ব্যক্তি বিশেষ এই উপাধি লাভ করিতেন। আবার কখনও স্বেচ্ছায় কিংবা ছদ্মনামরূপেও ইহার ব্যবহার করিতে দেখা যায়। কবিচন্দ্র শব্দটিও এইরূপ নাম এবং উপাধি উভয়রূপে পাওয়া যায়। কেবল বাংলাদেশেই নহে, দুই একটি উদাহরণ হইতে মনে হয়, সমগ্র পূর্ব ভারতেই এই কবিচন্দ্র নামের প্রচলন ছিল। বাল্মীকি রামায়ণের এক অসমীয়া অনুবাদকের নাম কবিচন্দ্র মহান্ত।[১৩] আবার কবিচন্দ্র মৈথিল রচিত "শ্রীশ্রী লক্ষ্মীশ্বর বিলাস" নামক একটি সংস্কৃত-প্রাকৃত-গীত নাটকাদি সংগ্রহের পুস্তকে বিভিন্ন রাগ রাগিনীর উল্লেখ আছে। ইনি খুব সম্ভব মৈথিলি ভাষার কবি।[১৪] বঙ্গে চৈতন্য সমসাময়িক কাল হইতে এই কবিচন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

রূপগোস্বামীর 'পদ্যাবলী'তে (আঃ ১৫২৫-১৫৫০ খ্রীঃ) একজন কবিচন্দ্রের উল্লেখ আছে। 'রত্নাবলী'র রচয়িতা একজন কবিচন্দ্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন নগেন্দ্র নাথ বসু।[১৫] আবার বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের একটি সংস্কৃত অর্ধছিন্ন বৈষ্ণব বন্দনার পত্রে চৈতন্যদেবের পার্ষদরূপে এক মুকুন্দ কবিচন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য মুকুন্দ কবিচন্দ্রের কথা অন্যান্য বৈষ্ণব বন্দনায় পাওয়া যায় না।

নানা অনুসন্ধানের ফলে বাংলা সাহিত্যে যে কযজন কবিচন্দ্রের উল্লেখ পাইয়াছি তাঁহাদের বর্ণানুক্রমিক সূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই সূচীতে কবিদের নামের পার্শ্বে 'কবিচন্দ্র' উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে। আর যাঁহাদের নাম জানা যায় নাই তাঁহাদের কেবল 'কবিচন্দ্র' রূপে লিখিত হইয়াছে, যথা :—

	কবির নাম		পরিচয়/রচনার নাম
১-২	অনিরুদ্ধ ও তাঁহার অগ্রজ কবিচন্দ্র	-	মহাভারতের অনুবাদক।
৩.	অযোধ্যারাম রায় কবিচন্দ্র	-	সত্যনারায়ণ পাঁচালি।
•৪.	কবিচন্দ্র	-	চৌর পঞ্চাশিকা।
৫.	কবিচন্দ্র	-	'গোবিন্দ বিলাস' কাব্য (রামকৃষ্ণ দাসের পিতামহ)
৬.	কবিচন্দ্র	-	শ্যামানন্দ শিষ্য

	কবির নাম	পরিচয়/রচনার নাম
৭.	কবিচন্দ্র	রূপরামের গুরুর পিতার নাম।
৮.	কবিচন্দ্র	মাধব গুণাকরের পিতা।
৯.	কবিচন্দ্র	নরসিংহ চক্রবর্তীর পিতা।
১০.	কবিচন্দ্র ঠাকুর	গদাধর প্রভুর পরিবার।
১১.	কবিচন্দ্র দাস	গোরক্ষবিজয় রচয়িতা
১২.	কবিচন্দ্র দাস	রাধাকৃষ্ণ চৌতিশা, কৃষ্ণকালী এবং মুক্তাচাষ পালা।
১৩.	কবিচন্দ্র পণ্ডিত	মৌখিক কবিতার স্রষ্টা (যশোহর বারুইখালি নিবাসী)
১৪.	কবিচন্দ্র মিশ্র	'বার্ছলি' রচয়িতা এবং গঙ্গার বন্দনা।
১৫.	কবিচন্দ্র মিশ্র	দ্বিতীয় 'গৌরীমঙ্গল' রচয়িতা (পরমেশ্বর দাসের সভাসদ্)।
১৬.	কবিচন্দ্র মিশ্র	'একাদশী পাঁচালি' বা 'নারদীয় পুরাণ'
১৭.	কবীন্দ্র (কবিচন্দ্র) মধুসূদন চক্রবর্তী	'কালিকামঙ্গল'
১৮.	কৃষ্ণরাম দাস কবিচন্দ্র (কবিচন্দ্র কিনা সন্দেহ)	'কমলামঙ্গল'
১৯.	গোবিন্দ কবিচন্দ্র	দ্বিজ রামদেবের পিতা
২০.	চন্দ্রশেখর বা পণ্ডিত শেখর কবিচন্দ্র	কৃত্তিবাসী রামায়ণের সুন্দরাকাণ্ড রচয়িতা রূপে উল্লেখ।
২১.	জয়গোবিন্দ দাস কবিচন্দ্র	'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত' বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত।
২২.	দ্বিজ কবিচন্দ্র (শাজাদারায়ের বংশধর)	'জগতীমঙ্গল'।
২৩.	দ্বিজ কবিচন্দ্র	গুরুদক্ষিণা (সা. ১৯০০)
২৪.	দ্বিজ গদাধর কবিচন্দ্র	'জয়মঙ্গলচণ্ডী ব্রতকথা'
২৫.	নিধি কবিচন্দ্র	'কালিকামঙ্গল'
২৬.	নিধিরাম কবিচন্দ্র	'ধর্ম্মমঙ্গল'
২৭.	বনমালী কবিচন্দ্র	অদ্বৈতশাখাভুক্ত
২৮.	বৈদ্য কবিচন্দ্র	'গীতগোবিন্দ'-এর অনুবাদক কুচবিহারের কবি।

২৯	ভট্টাচার্য কবিচন্দ্র	-	চৈতন্যশাখাভুক্ত ।
৩০	ভবানীশঙ্কর কবিচন্দ্র	-	রামায়ণ
৩১	মানিকচন্দ্র দাস কবিচন্দ্র	-	'দণ্ডীপর্ব'
৩২.	মুকুন্দ মিশ্র কবিচন্দ্র	-	'বাশুলী মঙ্গল' বা 'বিশাললোচনীর গীত' ।
৩৩.	যদুনাথ কবিচন্দ্র	-	নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত ।
৩৪.	রামকৃষ্ণ দাস কবিচন্দ্র	-	'শিবায়ন'
৩৫.	রামজীবন বিদ্যাভূষণ কবিচন্দ্র	-	'মনসা মঙ্গল'
৩৬.	রামদাস কবিচন্দ্র	-	চৈতন্যশাখাভুক্ত
৩৭.	লক্ষ্মণ কবিচন্দ্র	-	রামায়ণ
৩৮.	লোচন (কবিচন্দ্র কিনা সন্দেহ)	-	'পদ'
৩৯	শঙ্কর কিঙ্কর মিশ্র কবিচন্দ্র	-	'গৌরী মঙ্গল' বা 'চণ্ডীর চরিত' ।
৪০	শঙ্কর চক্রবর্তী কবিচন্দ্র	-	মল্লরাজ সভাকবি এবং পাঁচখানি বৃহৎ কাব্য রচয়িতা ।

এই কবিচন্দ্র সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গেলে আমাদের আলোচনা অযথা দীর্ঘাকার হইবে ; এইহেতু অপ্রাসঙ্গিক কবিদের আলোচনা এই স্থলে বর্জন করিয়া কেবল যে কয়জন কবিচন্দ্রের সঙ্গে আমাদের কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর বিষয় যুক্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে তাঁহাদের প্রসঙ্গই আলোচিত হইবে ।

যেকালে এবং যে সাহিত্যে এতজন কবিচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটিয়াছে সেখানে ইঁহাদের আলোচনা প্রসঙ্গে কিছু ভুলভ্রান্তি হওয়া খুব স্বাভাবিক । কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর জীবন ও সাহিত্য আলোচনাকালে আমাদের এইরূপ কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, ফলে শঙ্কর ও কবিচন্দ্র নামের কবিদের বিষয়ে সম্যক্ পরিচয়ের পর আমরা সমস্যার কারণটি উদ্ঘাটনে সমর্থ হইয়াছি ।

প্রথমতঃ উল্লেখ করা যায় কবিচন্দ্রের আলোচনার প্রথম পথিকৃৎ ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ও পণ্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় উভয়েই কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর জীবনকাল চৈতন্য পরিকরদের সমসাময়িক বলিয়া উল্লেখ করায় পরবর্তীকালের কয়েকজন আলোচকও তাঁহাদের মতানুসরণ করিয়াছেন ।[১৬] চৈতন্য পরিকররূপে আমরা পাঁচজন কবিচন্দ্রের উল্লেখ পাই । ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ও পণ্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় এই পাঁচজন কবিচন্দ্রের মধ্যে কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীকে একজন রূপে অনুমান করিয়াছিলেন । অথচ এই পাঁচজন কবিচন্দ্রের মধ্যে চারিজন কবিরূপে পরিচিত ছিলেন না । এই দিক হইতেও শঙ্কর চক্রবর্তীকে চৈতন্য সমসাময়িক কবি বলা চলে না । এই পাঁচজন কবিচন্দ্রের মধ্যে প্রথম জন যদুনাথ

কবিচন্দ্র। তাঁহার সম্পর্কে বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন —

"রত্নগর্ভ আচার্য বিখ্যাত তার নাম।
প্রভুর পিতার সঙ্গী জন্ম এক গ্রাম ॥
তিন পুত্র তাঁর কৃষ্ণপদ মকরন্দ।
কৃষ্ণানন্দ, জীব, যদুনাথ — কবিচন্দ্র ॥"[২৭]

অর্থাৎ যদুনাথ কবিচন্দ্র শ্রীহট্টবাসী রত্নগর্ভ আচার্যের কনিষ্ঠ পুত্র। তবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন —

"মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র।
যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ ॥"[২৮]

ইঁনি নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত এবং চৈতন্যদেবের প্রায় সমসাময়িক কবি।

চৈতন্য শাখার দ্বিতীয় কবিচন্দ্রের নাম রামদাস কবিচন্দ্র। ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ ; —

"রামদাস কবিচন্দ্র শ্রীগোপাল দাস।
ভাগবতাচার্য্য ঠাকুর শারঙ্গ দাস ॥"[২৯]

চৈতন্য পরিকর তৃতীয় কবিচন্দ্রের নাম বনমালী কবিচন্দ্র। ইঁনি বিশেষভাবে অদ্বৈত শাখাভুক্ত ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন এইরূপে :—

"পুরুষোত্তম পণ্ডিত আর রঘুনাথ।
বনমালী কবিচন্দ্র আর বৈদ্যনাথ ॥"[৩০]

রামদাস কবিচন্দ্র এবং বনমালী কবিচন্দ্র সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে আর একজন কবিচন্দ্রের উল্লেখ আছে। তবে তাঁহার সম্পর্কেও কিছু জানা যায় যা না ; যথা :—

"কৃষ্ণদাস বৈদ্য আর পণ্ডিত শেখর।
কবিচন্দ্র আর কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠীধর ॥"[৩১]

'চৈতন্যসঙ্গীতা' গ্রন্থে একজন কবিচন্দ্র ভট্ট বা ভাট ব্রাহ্মণরূপে কথিত হইয়াছেন। ইঁনি খুব সম্ভব ৬৪ মহান্তের একজন। ইহার উল্লেখ এইরূপ :—

'গুণচূড়া প্রবোধানন্দ সরস্বতী (?)
বরাঙ্গনা কবিচন্দ্র ভাট্ মহামতী' ॥[৩২]

কবি কর্ণপুরের নামে প্রচলিত 'চৈতন্যগণোদ্দেশ দীপিকা'য় একজন চৈতন্যভক্তকে ইন্দিরাসখীর অবতার ও কবিচন্দ্র ঠাকুর বলা হইয়াছে। এই সকল কবিচন্দ্রের সম্পর্কে বিশেষ কিছু উল্লেখ না থাকায় ইঁহারা যে পানুয়া গ্রামের কবিচন্দ্র ছিলেন না এবং ইঁহাদের

কাহারও পদবী যে চক্রবর্তী ছিল না তাহা সুস্পষ্ট । অতএব ইঁহাদেব সঙ্গে কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীকে অহেতুক জটে আবদ্ধ করাব প্রশ্নই ওঠে না ।

দ্বিতীয়তঃ ডঃ সুকুমার সেন লিখিয়াছেন —"কবিচন্দ্র মল্লরাজাদের সভাকবির উপাধি বলিয়া মনে হয । কবিচন্দ্র ভণিতা থাকিলেই তাহা শঙ্কব চক্রবর্তীর বচনা মনে করিলে ভুল হইবে । এই ভুল করিয়াছেন কবিচন্দ্রেব ভাগবতামৃত গোবিন্দমঙ্গলের সঙ্কলয়িতা । বীরসিংহেব রাজ্যকালে (১৬৫৬-৮১) যে "দ্বিজ' কবিচন্দ্র শিবায়ন কাব্য রচনা কবিয়াছিলেন তিনি স্বতন্ত্র ব্যক্তি ।"[৩৩]

আবার ঐ গ্রন্থেই তিনি বলিয়াছেন, "বিষ্ণুপুবেব মল্লরাজা বীরসিংহের রাজ্যকালে (১৬৫৬-৮২) কবিচন্দ্র নামের বা উপাধির এক কবি 'শিবাযন' কাব্য রচনা কবিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়" ।[৩৪] অর্থাৎ শঙ্কর চক্রবর্তীই যে উক্ত কাব্য বচনা করিয়াছিলেন সে সম্পর্কে ডঃ সেনের সন্দেহ ছিল যথেষ্ট ।

তৃতীয়তঃ 'গৌরীমঙ্গল' বচয়িতা শঙ্কব কিঙ্কব কবিচন্দ্র মিশ্রেব উল্লেখ শঙ্কর সমস্যায় করা হইয়াছে ।

ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল 'পুঁথি পরিচয' (৩য খন্ড) গ্রন্থে 'গৌরীমঙ্গল' কাব্য রচযিতা শঙ্কর কিঙ্কব কবিচন্দ্র মিশ্র এবং চট্টগ্রামে বচিত মঘীসনের উল্লেখযুক্ত "গৌরীমঙ্গল" কাব্যের দ্বিতীয় কবিচন্দ্র মিশ্রকে এক ব্যক্তি মনে করিয়াছেন এবং ইঁহাকে মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবিচন্দ্র মিশ্র বলিয়াছেন । অর্থাৎ তিনি তিনজন কবিচন্দ্র মিশ্রকে এক করিয়া ফেলিয়াছেন ।[৩৫] অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় এই তিনটি ভ্রান্ত ধারণাই খণ্ডন করিয়াছেন । তাঁহাব মতে, প্রথম 'গৌরীমঙ্গল'কার কবিচন্দ্র মিশ্র বালাণ্ডার গুণীসমাজের অনুরোধে হোসেন শাহেব রাজত্বকালে তাঁহার কাব্য বচনা করেন (১৪৯৭-৯৮ খ্রীঃ) । দ্বিতীয় জন পরমেশ্বর দাসের অনুরোধে 'গৌরীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন । এই পুথিটি ববেন্দ্র রিসার্চ মিউজিযামে (রাজশাহী, বাংলাদেশ) বক্ষিত আছে । আর ডঃ মণ্ডল যে অযোধ্যারাম কবিচন্দ্র মিশ্রকে এই শঙ্কর কিঙ্কর মিশ্রেব সঙ্গে অভিন্ন মনে করিয়াছেন, তিনি মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, প্রায় শতাব্দী কালেব পববর্তী কবি ।[৩৬]

চতুর্থতঃ 'শিশুবোধকে' যে 'দাতাকর্ণ' পালাটি পাওয়া যায তাহা কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীব রচনা । কিন্তু এতদিন অনেকেব ধাবণা ছিল যে, উহা মুকুন্দ মিশ্রেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অযোধ্যারাম কবিচন্দ্র মিশ্রেব লিখিত । 'দাতাকর্ণ'-এব পুথিসমূহে দ্বিজ কবিচন্দ্রের ভণিতা পাওয়া যায় । এই বিষয়ে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন — "শিশুবোধকে যে 'অযোধ্যারাম'কৃত 'দাতাকর্ণ' পাওযা যায়, সেই অযোধ্যারামই কবিকঙ্কণেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কেহ কেহ অনুমান করেন । আমাদেব ধারণা কবিচন্দ্রের নাম ছিল নিধিরাম।"[৩৭] কিন্তু

দেখা যায়, অযোধ্যারাম অথবা নিধিরাম কবিচন্দ্র এই পালাটির রচয়িতা নহেন। শিশুবোধকে মুদ্রিত এই 'দাতাকর্ণ'[৩৮] পালাটির সঙ্গে কবিচন্দ্রের ভণিতাযুক্ত প্রাচীন পুথির (সা. ২৪৮১, লিপিকাল ১০৮৩ সন) পাঠে মিল থাকায় এবং কাহিনী সম্পূর্ণ এক হওয়ায় উক্ত পালাটি যে কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীরই রচনা তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

পঞ্চমতঃ সর্বাধিক জটিলতা দেখা যায়, কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী ও কবিচন্দ্র দাসের সঙ্গে। উভয় কবিই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পালা রচনা করিয়াছেন। যেহেতু 'দাস' শব্দ বৈষ্ণবীয় বিনয়সূচক ভণিতার অন্তর্গত বলিয়া মনে করা হয়, সেইহেতু কবিচন্দ্রের সঙ্গে 'দাস' শব্দ যুক্ত করিয়া শঙ্কর চক্রবর্তীই 'কবিচন্দ্র দাস' ভণিতা দিয়াছেন বলিয়া অনেকের অনুমান। পণ্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত কবিচন্দ্রের "ভাগবতামৃত শ্রীশ্রী গোবিন্দ মঙ্গল" (১৩৪১) গ্রন্থে 'মুক্তাচাষ' ও 'কৃষ্ণকালী' উপাখ্যান নামক দুইটি পালায় কবিচন্দ্র দাসের ভণিতা পাওয়া যায়। ইহা হইতে বোঝা যায় যে, কবিচন্দ্র দাসকে মাখনবাবু খুব সম্ভব কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী বলিয়া মনে করিয়াছেন। যেমন মনে করিয়াছেন কুলচণ্ডা নিবাসী 'গুরুদক্ষিণা' পালার রচয়িতা শঙ্কর আচার্যকে। উভয় ক্ষেত্রেই মাখনবাবুর অনুমান ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। 'রাধাকৃষ্ণ চৌতিশা' নামক একটি পুথিতে শ্রী কবিচন্দ্র দাস ভণিতা পাওয়া যায় ; যথা :—

"শ্রী কবিচন্দ্র দাসে বলে এই চৌতিশা।
পড়িলে সকল মনে হইবে ভরসা।।"[৩৯]

এমনও হইতে পারে, এই 'রাধাকৃষ্ণ চৌতিশা'র কবি এবং 'মুক্তাচাষ' ও 'কৃষ্ণকালী' উপাখ্যানের কবিচন্দ্র দাস একই ব্যক্তি। কেননা কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর রচিত পালায় 'দাস' ভণিতা পাওয়া যায় না। আবার আর একটি 'রাধার চৌতিশা' নামক পুথিতে 'কবিচন্দ্র দাস'-এর পরিবর্তে আছে 'শ্রী মদন দাস'-এর উল্লেখ ; যথা :—

"কহে শ্রীমদন দাসে আনন্দির সুতে।
রাধাকৃষ্ণ গুণ গাএ শমন তরিতে।।"[৪০]

তবে কবিচন্দ্র দাসের নাম শ্রীমদন দাস কিনা এবং উভয় পুথি একই কবির রচিত কি না তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

ষষ্ঠতঃ পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র ত্রিবেদী তাঁহার রচিত 'গৌরীমঙ্গল' কাব্যে লিখিয়াছেন, —"কবিচন্দ্র চোর কবি ভাষায় হইল।।"[৪১]

এই কবিচন্দ্রের নাম জানা যায় নাই। সংস্কৃত 'চৌর পঞ্চাশৎ' কাব্যের রচয়িতার নাম বিহ্লন, আবার মধ্যযুগে কবি কাশীশ্বর রচিত একখানি পুথিতে চোর চক্রবর্তীর কাহিনী (ক.বি. ৩২১৫) পাওয়া যায়, তাহাতেও 'কবিচন্দ্রে'র উল্লেখ নাই। অতএব রাজা পৃথ্বীচন্দ্র এই কবিচন্দ্র বলিতে কাহাকে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।

সপ্তমতঃ অযোধ্যারাম[৪২], নিধিরাম[৪৩] এবং কবিচন্দ্র[৪৪] এই তিন নামে 'গঙ্গার বন্দনা' পাওয়া যায় । তিনটির রচনাই মূলতঃ এক । ইহাদের মধ্যে প্রাচীন পুথিটিতে (১১৪৭ সাল) অযোধ্যারাম নাম থাকায় খুব সম্ভব তিনিই এই বন্দনাটির রচয়িতা । তবে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন 'নিধিরাম' নাম গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন ('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সং, ১৩৫৬ । পৃ. ২৪৪) এবং ডঃ সুকুমার সেন স্পষ্টভাবে কিছু না বলিয়া নাম দুইটি উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র ।[৪৫] অযোধ্যারাম ভণিতাযুক্ত পুথিতে 'হৃদয়মিশ্রের সুত কবিচন্দ্র গুণযুত'— কথার উল্লেখ আছে । কাজেই ইঁনি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবিচন্দ্র মিশ্র বলিয়া অনুমান । এই কবিচন্দ্র মিশ্রই খুব সম্ভব 'বার্চ্ছলি' নামক (ক.বি. ১৩৯০, ১০৬৮ লিপিকাল) কাব্যের রচয়িতা । কেননা উক্ত পুথিতেও কবিচন্দ্রের এবং কবিকঙ্কণের নাম একত্রে পাওয়া যায় । তবে 'একাদশী ব্রতকথা' (বি.ভা. ৮২১, ১২৪৮ লিপিকাল) পুথির রচয়িতা কবিচন্দ্র মিশ্র ভিন্ন ব্যক্তি । উহাতে 'হৃদয় মিশ্রের' বা 'কবিকঙ্কণের' উল্লেখ পাওয়া যায় না । কবিচন্দ্র মিশ্রের রচিত 'একাদশী ব্রতকথা' নামে অপর পুথিটি (সা.প.প. ১৩০৬, পৃ. ৫০) মল্লভূমে লিপিকৃত ।

অষ্টমতঃ জয়গোবিন্দ দাস কবিচন্দ্র রচিত "শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত" (বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত, ১৭৬৪ শকাব্দে রচিত) গ্রন্থের আখ্যাপত্রে কেবল 'কবিচন্দ্র' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু গ্রন্থের কোথাও 'কবিচন্দ্র' কথার উল্লেখ নাই । আবার একটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের 'সুন্দরাকাণ্ড' কবিচন্দ্রের নামে ভূমিকায় লিখিত হইলেও চন্দ্রশেখর বা পণ্ডিতশেখর কবিচন্দ্রের নাম উক্ত গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায় নাই । অতএব উক্ত দুই গ্রন্থ 'কবিচন্দ্রের' নামে প্রচারিত হইলেও তাহা শঙ্কর চক্রবর্তীর রচনার সঙ্গে কোনও বিরোধ সৃষ্টি করে নাই ।

অন্যান্য কবিচন্দ্রের সঙ্গে শঙ্কর চক্রবর্তীর রচনার কোনও জটিলতা না দেখা দেওয়ায় উহাদের সম্পর্কে অনবশ্যক আলোচনা হইতে বিরত থাকাই শ্রেয় বলিয়া মনে হইয়াছে । আলোচনার ক্ষেত্র ছাড়াও পুথির ক্ষেত্রেও কিছু জটিলতা দেখা যায় । নিধিরাম গাঙ্গুলী কবিচন্দ্র (সা.চি. ৩৯৪, খণ্ডিত) একখানি 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য রচনা করিয়াছেন । উহার মধ্যে পাওয়া যায় --

অনাদিমঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় । (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৪২ক)

এই 'দ্বিজকবিচন্দ্র' ভণিতা ব্যতীত অন্যান্য ভণিতা নিধিরাম গাঙ্গুলীর । কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীও 'অনাদিমঙ্গল' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন । তাঁহার সঙ্গে নিধিরাম গাঙ্গুলীর রচনা মিশিয়া গিয়াছে কিনা বলা যায় না ।

কবীন্দ্র মধুসূদন চক্রবর্তীর 'কালিকামঙ্গলে'র (বিদ্যাসুন্দর কাহিনী) পুথিতে (ক.বি. ৬২৬১, খণ্ডিত) পাওয়া যায় নিধি কবিচন্দ্রের উল্লেখ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৪০ক) । মনে

হয়, অন্য দুইটি পুথিতেও (ক.বি. ৫১৮৩ এবং সা. ২৩৮৩) এই কবিব রচনা মিশিয়া গিয়াছে। অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় এডুকেশন গেজেটে (চৈত্র, ১২৭৯) কবিচন্দ্রেব 'কা... কামঙ্গল' ছাপাইবেন বলিয়া যে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, ...র মুদ্রিত রূপ আর পাওয়া যায় নাই।

মল্লভূমে কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী ছিলেন সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি। এইহেতু তাঁহাব রচনায় যেমন অন্যান্য কবি ও গায়কের ভণিতা পাওয়া যায়, তেমনি অন্য কবির রচনাতেও এই কবিচন্দ্র নামের পবিচয় মেলে। কবিচন্দ্রের ভণিতায় একটি বারমাস্যার পুথিতে (বি.ভা. ৬০৯, ১টি পত্র) লোচনেব ভণিতাও পাওয়া যায়। লোচন ও কবিচন্দ্র ভণিতা একই ব্যক্তির বলিয়া মনে হয় না। দ্বিজ কবিচন্দ্রের 'অক্রূরাগমন' (বি.ভা. ৪৫২৫) পুথিটিতে 'ঘনশ্যামদাস', 'কবিচন্দ্র' ও 'বিদ্যাপতি'র ভণিতা পাওয়া যায়। 'কোকিল সংবাদ' (বি.ভা. ৮৬১) নামক পুথিটিতে কবিচন্দ্র ও 'শ্রীকবি শঙ্কর' ভণিতা ছাড়াও পাওয়া যায় 'শ্রী হরিশঙ্কর দ্বিজ' ভণিতা। কবিচন্দ্রের নামে 'ছড়া' ও 'বারমাস্যা' তিনিই রচনা করিয়াছেন কিনা তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। কবিচন্দ্র শঙ্কব চক্রবর্তীর 'মর্ছধরা' পালাটিতে (সা. ৪১২) কবিকঙ্কণের উল্লেখ দেখা যায়। এইহেতু বহুদিন অনেকের ধারণা ছিল, উহার রচয়িতা কবিচন্দ্র নহেন। কিন্তু এখন সে ভ্রান্তি দূর হওয়ায় শঙ্কর চক্রবর্তীর রচনার মূল্যায়ন করা সহজতর হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ আর একটি অসুবিধা দেখা দিয়াছে কবিচন্দ্র ভণিতায় 'যোগাদ্যাবন্দনা'র পুথি সম্পর্কে। তবে আশা করা যায়, গবেষকদিগের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের ফলে মল্লরাজ সভাকবি কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর জীবন ও সাধনা সকলের নিকট অচিবে সম্যক্ পরিচিত হইয়া উঠিবে।

কবিচন্দ্রের রামায়ণের পুথি নির্বাচনে সতর্কতা :—

কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর সাহিত্য কীর্তির পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য প্রচুর অনুসন্ধান আবশ্যক। শঙ্কর অথবা কবিচন্দ্র নাম থাকিলেই যেমন বলা যায় না তিনি কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী তেমনি পুথি নির্বাচনের সময়েও ঐরূপ সমস্যা দেখা যায়। আমরা ভবানীশঙ্কর এবং লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়েব রামায়ণের কিছু পুথিতে কবিচন্দ্র নাম পাইয়াছি। আবার 'কবিচন্দ্র' ভণিতায় দুই একটি রামায়ণের পুথি আছে যাহা কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীব রচনা নহে। যে সকল কারণে কবিচন্দ্রের পুথি নির্বাচনে বিঘ্ন সৃষ্টি হইযাছে তাহা অপসারণ করিতে পারিলে মেঘান্তরাল হইতে চন্দ্রমা প্রকাশের ন্যায় কবিচন্দ্রের কাব্যখানিও সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে এবং আশা করা যায়, শঙ্কর ও কবিচন্দ্র সমস্যার মত কবিচন্দ্রের রামায়ণের পুথি সম্পর্কিত সমস্যারও সমাধান ঘটিবে। অবশ্য প্রথমে শঙ্কব সমস্যায় যাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাই বিস্তারিতভাবে এখানে বর্ণিত হইল।

সমস্যার কাবণ :—

(ক) বাংলা রামায়ণকার শঙ্কর চক্রবর্তী এবং ভবানীশঙ্কব বন্দ্যোপাধ্যাযেব মধ্যে 'শঙ্কব' নামেব বিভ্রান্তি।

(খ) ক.বি. ৭৩ ও ক.বি. ৭৪ নং পুথি দুইটি ভবানীশঙ্করের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডেরই দুই অংশ হওয়া সত্ত্বেও ক.বি. ৭৩ নং পুথিটিকে ভ্রমবশতঃ কবিচন্দ্রের (শঙ্কব চক্রবর্তী) বচনা বলিযা বিনা বিচারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(গ) শঙ্কর ভণিতায় 'মহীরাবণবধ' ও 'তরণীসেন বধ' পালাকে কবিচন্দ্রের পুথি মনে করার সিদ্ধান্ত।

(ঘ) দ্বিজ লক্ষ্মণ কবিচন্দ্রের দুই একটি পুথিতে কবিচন্দ্র ভণিতা থাকায তাহা কবিচন্দ্র শঙ্কব চক্রবর্তীব রচনা মনে করার বিভ্রান্তি।

সমস্যাব কাবণ যেখানে সুস্পষ্ট সমাধানের পথও সেখানে অবধারিত। বামশঙ্কর ভিষক্‌ের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহার কোনও পুথি কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীব পুথির সঙ্গে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে নাই। যে শঙ্করের রচনা মাঝে মাঝে শঙ্কর চক্রবর্তীব রামায়ণের সঙ্গে সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে তিনি ভবানীশঙ্কব বন্দ্যোপাধ্যায়, সংক্ষেপে শঙ্কর। এই সমস্যার মূল উদ্ঘাটনের জন্য ভবানীশঙ্করের দুইটি পুথিব ভণিতা বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। তাহা হইলে এই কবির বচনা কবিচন্দ্রের সঙ্গে মিশিয়া সমস্যাব সৃষ্টি করিবে না। এইহেতু প্রথমে অরণ্য কাণ্ডের পুথিটি আলোচনা করা হইল কেননা উহাতে 'রামশঙ্কর' এবং 'শঙ্কর' এই দুইটি ভণিতাই পাওয়া যায়।

(ক) অধ্যাত্ম বামায়ণের অন্তর্গত অরণ্যকাণ্ডের পুথিটি শঙ্কর বিরচিত। তিনি দুইবার নিজের নাম "শ্রীরাম শঙ্কর" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র.পু.পৃ. ১৪ক এবং ১৬ক)। এই শঙ্কর দ্বিজের ভণিতা লিখিবার বিশেষ রীতি — "বন্দিয়া জানকীনাথ শ্রীশঙ্করে গান"। এখন এই অরণ্যকাণ্ডের (ক.বি. ১৯০) পুথিটির সঙ্গে 'ভবানী শঙ্কর' ভণিতা যুক্ত কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডেব (ক.বি. ৭৪) পুথিটি তুলনা করিলে কয়েকটি বিষয়ে মিল পাওয়া যাইবে, আর এই দুইটি পুথিই যে একই কবির রচনা তাহাও সুস্পষ্ট হইবে।

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের (ক.বি. ৭৪) পুথিটির বিভিন্ন পত্রের ভণিতা পূর্বে বর্ণিত 'অরণ্যকাণ্ডের' (ক.বি. ১৯০) ভণিতার অনুরূপ। ইহার পর কবি দুইবার নিজের পরিচয় দিয়াছেন। এই পরিচয়লিপি হইতে জানা যায় তিনি বিজয়রামের পুত্র ভবানীশঙ্কর ;

বন্দ বিজয়রাম সুত ভবানীশঙ্কর।
রচিল্যা রামের লীলা ভাবি রঘুবর ॥ (ক.বি. ৭৪. পু.পৃ. ১২)

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে 'শঙ্করের অগ্রজ ভবানী' ।[৪৬] কিন্তু উপরের ভণিতাটি হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, ভবানীশঙ্কর একই ব্যক্তির নাম এবং তিনিই আবার নিজেকে 'শ্রীরামশঙ্কর' নামে পরিচয় দিয়াছেন,

শ্রীযুত তিলকচন্দ্র ক্ষেত্রি বর্ণ ধর্ম ।
শ্রী রামশঙ্কর কহে তস্য দেশে জন্ম ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১৪)

একটি পুথির মধ্যেই যখন ভবানীশঙ্কর, রামশঙ্কর ও বিশেষ ভণিতার রীতি "বন্দিয়া ইত্যাদি ...." এই তিনটি তথ্য পাওয়া যায়, তখন স্বভাবতঃই মনে হয় উক্ত দুই নাম আসলে একই কবির । আর এই কারণে আলোচিত পুথি দুইটিও একই কবির রচনা, কারণ উভয় পুথিতেই ভণিতার রীতি এক । এই কবির সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন লিখিয়াছেন, "ভবানীশঙ্কর বাঁড়ুজ্জের লেখা কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের এবং আরও কোন কোন পালার পুথি মিলিয়াছে । ইঁহারা ছিলেন পাঁচ ভাই । পিতা রাম (বা বিজয়রাম), পিতামহ গোবিন্দ । রামশঙ্করের লেখা অরণ্যকাণ্ডের পুথি মিলিয়াছে । পূর্বোক্ত তরণীসেন যুদ্ধ ও মহীরাবণবধ পালা ইঁহারই রামকথা নিবন্ধের অংশ বলিয়া মনে হয় । ভণিতায় "শঙ্কর"ও আছে ।"[৪৭]

অতএব ভবানীশঙ্করের অপর নাম রামশঙ্কর সংক্ষেপে শঙ্কর । এই শঙ্কর নামটি শঙ্কর চক্রবর্তীর সঙ্গে এবং রামশঙ্কর নামটি রামশঙ্কর ভিষকের সঙ্গে বহু আলোচনায় অভিন্নরূপে গৃহীত হইয়াছে ।[৪৮] সেকথা শঙ্কর সমস্যায় উল্লেখ করা হইয়াছে ।

(খ) একটি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের (ক.বি. ৭৩ নং) পুথিতে শঙ্করের ভণিতা থাকায় অনেকে ইহাকে কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই পুথিটিকে নিখুঁতভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, উহা আসলে অপর আর একটি কিষ্কিন্ধ্যাণ্ডের (ক.বি. ৭৪নং) পুথিরই একখানি বিচ্ছিন্ন পত্র মাত্র, যাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুথির তালিকায় (১৯২৬ খ্রীঃ) দুই ভিন্ন সংখ্যায় পরিগণিত হইয়াছে । উভয় পুথির আকারগত এবং রচনাগত মিলও আছে ।

একটি পুথির সমাপ্তি ও অপরটির আরম্ভের মধ্যে কাহিনীগত এবং পুথি দুইটির আকারগত মিল থাকায় আমাদের ধারণা পুথি দুইটি একই কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের দুই অংশ । উহার রচয়িতা ভবানীশঙ্কর সংক্ষেপে শঙ্কর নামে পরিচিত । তাঁহার ভণিতা দিবার বিশেষ রীতিটির উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও এই খণ্ডিত পুথিটিকে (ক.বি. ৭৩ নং) কবিচন্দ্রের পুথি (শঙ্কর চক্রবর্তীর) বলিয়া অনেকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন ।

(গ) 'মহীরাবণ বধ' ও 'তরণীসেন বধ' পালার পুথিতেও শঙ্কর নামের ভণিতা পাওয়া যায় । এইহেতু অনেকে এই শঙ্করকে, কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী বলিয়া মনে করেন । তাঁহাদের

মতে এই পালাগুলি কৃত্তিবাসী রামায়ণে কবিচন্দ্র হইতেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে।[৪২] তবে এই সম্পর্কে কোনও পুথির কথা তাঁহারা উল্লেখ করেন না। এইজন্য 'শঙ্কর' ভণিতাযুক্ত পুথিগুলিকে বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে। 'মহীরাবণবধ' পালাব (সা. ২৬৯২ নং, লিপিকাল ১১৯১ সাল) একখানি সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া যায়, যাহাব প্রত্যেক ভণিতাই 'শঙ্করে'র এবং "বন্দিয়া জানকীনাথ শ্রীশঙ্করে গায়" (পু.পৃ. ৭ক, ৯ক এবং ১০ নং), — এই বিশেষ ছত্রের উল্লেখ আছে। অতএব এই পালাটি ভবানীশঙ্কর বা শঙ্করের রচনা, উহাকে কবিচন্দ্রের রচনা বলা যায় না।

অনুরূপভাবে শঙ্করের 'তরণীসেন বধ' পালার সমস্ত পুথি পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, উহাদের মধ্যেও "বন্দিয়া জানকীনাথ শ্রীশঙ্করে গায়", — ভবানীশঙ্করের ভণিতার এই বিশেষ রীতির উল্লেখ আছে।[৫০] দুইটি অখণ্ডিত 'তরণীসেন বধ' পালার (বি.ভা. ৭০১ এবং ক.বি. ১৭৮) সঙ্গে অন্যান্য খণ্ডিত পুথিগুলির প্রতি ছত্রে ছত্রে মিল। অতএব এই পুথিগুলিকেও কবিচন্দ্রের পুথি বলা চলে না। শঙ্কর ব্যতীত 'তরণীসেন বধ' পালার কিছু পুথি পাওয়া যায় কৃত্তিবাসের ও দ্বিজ লক্ষ্মণের ভণিতায়। কিন্তু কবিচন্দ্রের ভণিতায় একটি পুথিও পাওয়া যায় নাই। শঙ্কর বিরচিত পুথিগুলিকে তো আর কবিচন্দ্রের (শঙ্কর চক্রবর্তী) রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। যে 'তরণীসেন বধ' পালার রচয়িতা হিসাবে একদা কবিচন্দ্রের সাহিত্যিক মর্যাদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাঁহার অন্ততঃ একখানা পত্রও পাওয়া গেল না কেন? অতএব স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, তবে 'তরণীসেন বধ' পালাব প্রচারক কে? তরণীর বৈষ্ণবীয় মহাসমরের উদ্ভাবক হিসাবে যে কবিচন্দ্রকে এতকাল জয়মাল্য পবান হইয়াছে, সে কোন শঙ্কর বা কোন কবিচন্দ্র?

তরণীর মাথা পড়ে রাম পদতলে।
কাটামুণ্ড সঘনেতে রাম রাম বলে॥

(ক.বি. ১৭৮, পু.পৃ. ১২ক)

পণ্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় কথিত এই "বিষ্ণুভক্তির পুষ্পচন্দনমাখা কবিতা শেফালিকা কাহার"?[৫১] — তাহা যথার্থই জানিতে ইচ্ছা করে। কোন কবির বিজয়মাল্য কাহার গলায় পরান হইয়াছে? যে কবিচন্দ্রের (শঙ্কর চক্রবর্তী) অভিনব রচনার জন্য 'অঙ্গদ রায়বার' পুথির বিপুলতা আমাদের বিস্মিত করে সেই কবির ভণিতায় অপর অভিনব পালার (তরণীসেন বধ) (?) পুথিই বা বিরল কেন? তবে কি ভবানীশঙ্করের পূর্ববর্তী কবি কবিচন্দ্র (শঙ্কর চক্রবর্তী) এই পালাটি রচনাই করেন নাই? শঙ্কর ভণিতাযুক্ত এই পালার পুথি সংখ্যার স্বল্পতা এবং সমস্ত পুথি বঙ্গাব্দ ১২০৭ সাল হইতে ১২৪৯ সালের মধ্যে লিপিকৃত হওয়ায় এইরূপ সংশয় জাগে। ভবানীশঙ্কর অথবা শঙ্কর, যিনি কবিচন্দ্র শঙ্কব চক্রবর্তীর সামান্য পরবর্তীকালের কবি, তবে তিনিই কি এই পালাব প্রচারক?

(ঘ) আমবা কবিচন্দ্রের ভণিতাযুক্ত বামায়ণের পুথিসমূহকে সাধারণতঃ শঙ্কর চক্রবর্তীব রচনা বলিযাই জানি, কিন্তু দুই একটি পুথিতে এই ধারণার ব্যতিক্রম দেখা যায়। একটি 'যযাতি রাজাব উপাখ্যান' (ক.বি. ৬৮৫ নং) পালায 'কবিচন্দ্র' ভণিতা, 'পান্নায় নিবাসী' এবং 'ভাগবতামৃত'-এব উল্লেখ আছে ; যথা :— 'দ্বিজ কবিচন্দ্র গান পান্নায় নিবাসী' (পু.পৃ. ৫ক)। ইহা হইতে মনে হইতে পারে, পুথিটি বোধহয় কবিচন্দ্র শঙ্কব চক্রবর্তীর বচনা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কবিচন্দ্রেব 'নরমেধযজ্ঞ' (সা.চি. ১৩২) পালার সঙ্গে এই পুথিটির কোনও মিল নাই। অপরপক্ষে দ্বিজ লক্ষ্মণেব রচিত 'যযাতি রাজার উপাখ্যান (ক.বি. ৬৮৬ নং) নামক অপর পুথিটির সঙ্গে উপবিউক্ত পুথিটির শেষ পত্র ব্যতীত অন্যান্য পত্রের প্রতি ছত্রে মিল বহিয়াছে। আব 'দ্বিজ কবিচন্দ্র গান পান্নায নিবাসী' — 'ছত্রেব পবিবর্তে দ্বিতীয় পুথিটিতে পাওয়া যায় "দ্বিজ কবিচন্দ্র গান পালা অভিলাষি"। কাজেই উপবে বর্ণিত পুথিটিতে 'ভাগবত'-এর উল্লেখ, 'পান্নায় নিবাসী' এবং 'কবিচন্দ্র' ভণিতা থাকা সত্ত্বেও উহাকে কবিচন্দ্র শঙ্কব চক্রবর্তীব রচনা বলা চলে না। এইরূপ লিপিপ্রমাদ কবিচন্দ্রেব পুথি নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি কবে। দ্বিজ লক্ষ্মণেব ভণিতাযুক্ত দ্বিতীয পুথিটি (ক.বি. ৬৮৬) আমাদের এই জটিলতাব হাত হইতে পরিত্রাণ কবিযাছে।

আবার অনেকস্থলে কবির নাম বর্জনপূর্বক পুথির তালিকায় কেবল 'কবিচন্দ্র' লেখার জন্যও কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি করে ; যেমন 'বালিব পিণ্ডদান (সা. ১৭৬৪ নং) দ্বিজ লক্ষ্মণের রচনা এবং অযোধ্যাকাণ্ডেব (ক.বি. ৪০ নং, ১০-৩২ পত্র) পুথিটি ভবানীশঙ্করের রচিত। কিন্তু এই নাম দুইটি পুথির তালিকায পাওয়া যায় না। ক.বি. ৭৩ নং কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডেব পুথিটির কথা পূর্বে বলা হইযাছে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি পুথিতে কবিচন্দ্রের ভণিতাই নাই, অথচ পুথির তালিকায় তাহা কবিচন্দ্রের নামে লিখিত হইয়াছে। আমাদেব পুথির সূচীর পাদটীকায় ঐ সকল পুথির উল্লেখ কবা হইয়াছে।

বাংলা রামায়ণেব কবি কবিচন্দ্র, শঙ্কর এবং দ্বিজ লক্ষ্মণের পুথি আলোচনা করিয়া আমরা যে তথ্য পাই তাহা এইরূপ :—

(ক) শঙ্কর চক্রবর্তীর পুথিতে কবিচন্দ্র, দ্বিজ কবিচন্দ্র, কবিচন্দ্র দ্বিজ এবং কবিচন্দ্র চক্রবর্তী ভণিতা পাওয়া যায়।

(খ) কবিচন্দ্রের রামায়ণের পুথিতে 'শঙ্কব' ভণিতা পাওয়া যায় নাই।

(গ) শঙ্করের ভণিতায় যতগুলি বাংলা রামায়ণেব পুথি আমবা পাইয়াছি সবই ভবানীশঙ্করের রচনা।

(ঘ) ভবানীশঙ্কর বা শঙ্করের এবং দ্বিজ লক্ষ্মণের কযেকটি রামায়ণের পুথিতে 'কবিচন্দ্র' ভণিতাও পাওয়া যায়।

পাদটীকা

১। হরিদাস দাস কর্তৃক সঙ্কলিত : শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, ২য়-৪র্থ খণ্ড। ১ম সং ৪৭১ চৈতন্যাব্দ ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৫৯।

২। ভবানীশঙ্কর দাস বিরচিত : মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা ১৩২৩ সাল। পৃ. ১৮১
বাজচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত

৩। বা.প্রা.পু.বি. ১ম খণ্ড-২য় সংখ্যা, পৃ. ১১০

৪। সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ২য় সং ১৯৬৫। পৃ. ৪৫২-৫৩।

৫। আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ৫ম সং, ১৯৭০। পৃ. ৮১৩-৮১৪।

৬। সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ২য় সং, ১৯৬৫। পৃ. ৩৫৯

৭। বা.প্রা.পু.বি. ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ২৫৩-৫৪।

৮। সা, প.প. ১৩০৪, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৩৩২।

৯। ক.বি. ৬১৯০, ১-৭ পত্র, সম্পূর্ণ, ১২০০ সাল।

১০। ত্রিপুবা বসু : 'মঙ্গলকাব্যের অনালোচিত.অধ্যায়ঃ নবাবিষ্কৃত কবি ও কাব্য - শঙ্করের শীতলামঙ্গল'। সা.প.প. ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, ১৩৮৪। পৃ১০-৩৮

১১। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত পৃ. ১২

১২। বা.প্রা.পু.বি. ১ম খণ্ড - ১ম সংখ্যা, সা.প.প. অতিরিক্ত সংখ্যা ১৩০৯. পৃ. ২৬-২৭

১৩। সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ২য় সং ১৯৬৫। পৃ. ৩৬৯ পাদটীকা।

১৪। অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু, কবিচন্দ্রের আলোচনাকালে 'কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে'র পুথি হইতে যে উদ্ধৃতি তুলিয়া দিয়াছেন তাহা ভবানীশঙ্করের রচনা, কবিচন্দ্রের নহে।
মণীন্দ্রমোহন বসু : বাঙ্গলা সাহিত্য, ২য় খন্ড ১৯৪৭ সাল। পৃ. ১৪৭
ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মত শিবরতন মিত্রও লিখিয়াছেন, "কবিচন্দ্রের শঙ্কর নামক একজন বন্ধু ছিলেন, দুইবন্ধু একত্র কয়েকখানি গ্রন্থও লিখিয়াছেন।" বলাবাহুল্য এই মন্তব্যটি ভিত্তিহীন।
শিববতন মিত্র সঙ্কলিত : বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক ১৩৩৮। পৃ. ৫৪।

১৫। এইরূপ একটি উদাহরণ :-
ভবানীশঙ্কর ও রামশঙ্কর যে একই ব্যক্তি তাহা স্বীকার এবং অস্বীকার একই সময়ে করিতে দেখা যায় নিম্নোক্ত গ্রন্থটিতে ; যথা :-
"চতুর্থজন রামশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। শঙ্কর কবিচন্দ্রের মতো রামশঙ্করও অধ্যাত্ম রামায়ণ লিখেছেন বলে কেউ কেউ দুটি রামায়ণের পুঁথিকে এক করে দেখেছেন। রামশঙ্করকে কেউ কেউ সাগরদিয়ার ভবানীশঙ্করের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছেন। যাইহোক ভণিতায় রামশঙ্কর লিখেছেন 'বন্দিয়া জানকীনাথ শ্রীশঙ্কর গায়।"
চিত্রাদেব সম্পাদিত : শঙ্কর কবিচন্দ্র রচিত 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ', ১ম প্রকাশ, ১৩৮৬। ভূমিকা-পৃ. xi-xii

১৬। মাখনলাল মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত — ভাগবতামৃত শ্রীশ্রী গোবিন্দমঙ্গল, ১ম সং ১৩৪১ সাল। ভূমিকা-পৃ.এক আনা

১৭। রবীন্দ্রনাথ মাইতি — চৈতন্য পরিকর, ১৯৬২ সাল, কবিচন্দ্র প্রবন্ধ-পৃ. ৭৩২।

১৮। মাখনলাল মুখোপাধ্যায় সংগৃহীত এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত — শ্রীশ্রী শীতলামঙ্গল, ১ম সং, ১৩৬৮ সাল। পানুয়া রামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার কর্তৃক প্রকাশিত। ভূমিকা-পৃ. তিন আনা

১৯। ত্রিপুরা বসু — মঙ্গলকাব্যের অনালোচিত অধ্যায় ঃ নবাবিষ্কৃত কবি ও কাব্য — শঙ্করের শীতলামঙ্গল। সা.প.প., ৩য়-৪র্থ সংখ্যা ১৩৮৪ সাল। পৃ. ১৪

২০। প্রাগুক্ত — প্রাগুক্ত পৃ. ১৪-১৫।

২১। মাখনলাল মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত — ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গল, ১ম সং ১৩৪১ সাল। ভূমিকা

২২। পঞ্চানন মণ্ডল — পুঁথি পরিচয়, ৩য় খণ্ড, ১ম সং ১৩৬৯। ভূমিকা, পৃ. ১০।

২৩। কবিচন্দ্র মোহান্ত, বিদ্যাভূষণ (অসমীয়া ভাষায় অনূদিত) : বাল্মীকি রামায়ণ (মূলানুগত) বালকাণ্ড, ১সং ১৯৬২। গুরহাটী, আসাম।

২৪। এ.সো. H.119 : দারভাঙ্গা প্রেসে কৃষ্ণধন মজুমদার দ্বারা মুদ্রিত, ১৮১০ শক।

২৫। নগেন্দ্রনাথ বসু : বিশ্বকোষ (ক-কার্য্য, ৩য় খণ্ড) পৃ. ৩৩৯।

২৬। অমূল্যধন রায়ভট্ট মহাশয় 'মহাভারত' রচয়িতা কবিচন্দ্রকে বৈষ্ণবভক্ত কবিচন্দ্র ঠাকুর, শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য এবং ৬৪ মহান্তের একজন বলিয়া অনুমান

করিয়াছেন। তাঁহার মতে, "কবিচন্দ্র বলিলেই একমাত্র এই ঠাকুর কবিচন্দ্রকেই বুঝাইত।"

অমূল্যধন রায়ভট্ট : 'শ্রীল ঠাকুর কবিচন্দ্র ভট্ট', ভক্তি, আশ্বিন ও কার্তিক ১৩৩১। পৃ. ৩১ পাদটীকা

২৭। বৃন্দাবন দাস : শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড, ১ম অঃ ৪র্থ সং শ্রীগৌরাঙ্গাব্দ ৪৪০। পৃ. ১২৪।

২৮। কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিত্যানন্দ গোস্বামী সম্পাদিত : শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা, ১১শ পরিচ্ছেদ, ৩য় সং, চৈতন্যাব্দ ৪৪১। পৃ. ৫৩।

২৯। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত, দশম পরিচ্ছেদ পৃ. ৫১

৩০। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত, আদি। দ্বাদশ পরিচ্ছেদ পৃ. ৫৬

৩১। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত, আদি। দশম, পৃ. ৫১

৩২। সীতানাথ রায় দ্বারা সম্পাদিত : চৈতন্য সঙ্গীতা, গরাণ হাটা হইতে প্রকাশিত। পৃ. ১৬

৩৩। সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ২য় সং, ১৯৬৫। পৃ. ৩৫৭ পাদটীকা।

৩৪। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬।

৩৫। পঞ্চানন মণ্ডল : বিশ্বভারতী পুঁথি পরিচয়, ৩য় খণ্ড, ১ম সং, ১৩৬৯, ভূমিকা পৃ. ৬-১০ এবং পৃ. ৪৮-৪৯।

৩৬। সুখময় মুখোপাধ্যায় : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম। ১ম প্রকাশ, ১৯৪৭। পৃ. ১২-১৩।

৩৭। দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সং, ১৩৫৬ সাল। পৃ. ২৪৪

৩৮। বেণীমাধব ভট্টাচার্য সঙ্কলিত : শিশুবোধক, (আখ্যাপত্র ছিন্ন) দাতাকর্ণ, পৃ. ৭২

৩৯। ব.সা.প.প. ১৩০৯, অতিরিক্ত সংখ্যা, পৃ. ১৬।

৪০। বা.প্রা.পু.বি. ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃ. ২১।

৪১। পৃথ্বীচন্দ্র বিরচিত, বিমান-বিহারী মজুমদার সম্পাদিত : গৌরীমঙ্গল, ১৯৭১, পৃ. ৫১১

৪২। সা.প.প. ১৩০৫, পৃ. ৭২, ১১৪৭ লিপিকাল

৪৩। ক.বি. ১৪৯৩, ১-৪ পত্র, ১২১২ লিপিকাল।

৪৪। এ.জি. ৫৩৬৭, ১-৩ পত্র, সম্পূর্ণ, তারিখহীন।

৪৫। সুকুমাব সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস, ১ম খণ্ড , অপরার্ধ, ২য় সং, ১৯৬৫ । পৃ. ৪৩৭ ।

৪৬। D.C. Sen : The Bengali Ramayanas, 1920. P. 213-214

৪৭। সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ২য় সং, ১৯৬৫ । পৃ. ৪০৯ ।

৪৮। "রামায়ণের কবি শঙ্কর (ভবানীশঙ্কর) বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন । তিনি শুধু রামায়ণই অনুবাদ করিয়া যান নাই, মহাভারত এবং ভাগবতেরও অংশবিশেষ অনুবাদ করিয়াছিলেন । মধ্যযুগেব আরও অনেক কবির ন্যায় শঙ্করেবও উপাধি ছিল কবিচন্দ্র" । নিম্নোক্ত গ্রন্থেব এই উদ্ধৃতিটিতেও ভবানীশঙ্কব এবং কবিচন্দ্র অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন ।

তমোনাশ দাশগুপ্ত : প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম সং, ১৯৫১ । পৃ. ২৭৩ ।

৪৯। "..........................কৃত্তিবাসী রামায়ণে কবিচন্দ্রের বহুতর রচনা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । অঙ্গদের বায়বার, তরণীসেন বধ প্রভৃতি মূল রামায়ণ বহির্ভূত যে সকল পালা কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত দেখা যায়, সে সমস্তই কবিচন্দ্রের লেখনী প্রসূত ।"

নগেন্দ্রনাথ বসু : বিশ্বকোষ, বস্ত্র-বিবাহ, পৃ. ৮৮

৫০। শঙ্করের 'তরণীসেনবধ' পালার কিছু পুথির সংখ্যা প্রদত্ত হইল । যথা - ক.বি. ১৭৮ ও ৬০১৫ নং । বি.ভা. ৭০১, ৪৮১৩ এবং ৬৩২৩ নং । সাহিত্য পবিষৎ পত্রিকা এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়েব এই পালাব পুথিগুলিও শঙ্কর ভণিতায় লিখিত ।

৫১। মাখনলাল মুখোপাধ্যায় : কবিচন্দ্র ও বিষ্ণুপুবী রামায়ণের ভূমিকা, ফাল্গুনী, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭ সাল, পৃ. ৩৬৫ ।

পঞ্চম অধ্যায়

।। কবিচন্দ্রের রচনার পরিচয় ।।

মধ্যযুগে যে সকল কবি ভক্তিমূলক কাব্য রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ কবিযাছেন কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। যে কোনও পুথিঘরের বিপুল সংখ্যক পুথিই কবিচন্দ্রের অনন্য সাধাবণ লোকপ্রিয়তাব নিদর্শন। সাহিত্যেব প্রায় প্রতিটি শাখায় বিষয়-বৈচিত্র্যের সঙ্গে প্রতিভার সুচারু সমন্বয় সাধিত কবিয়া তিনি বহু সংখ্যক পালা বচনা করিয়াছেন। এই পালার সংখ্যা যে কত, তাহাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কেননা, কবিচন্দ্র ও শঙ্কর নাম লিপিকরদের হাতে যেরূপ সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। এখনও তাঁহার নামাঙ্কিত নিত্য নূতন পালা আবিষ্কৃত হইতেছে এবং লিপিকরেরা একের কাহিনী অন্যের নাম দিয়া চালাইয়াছেন ; এইজন্য এখনও কবিচন্দ্রের রচনা সম্পর্কে একেবারে নির্ভুল সিদ্ধান্তে আসা যায় না। তাঁহার রচিত মহাভাবতের কিছু সংখ্যক পুথিতে পর্ব বিভাগ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত রচনাই পালাকারে পাওয়া যায়। তাঁহার অখণ্ডিত কাব্য কোনও সংগ্রহশালায় আমবা পাই নাই। তবে ইহাও ঠিক যে, আমাদের দৃষ্ট সংগ্রহশালার পুথি ব্যতীত আরও বহু বচনাই হয়তো কালের করাল গ্রাসে বিনষ্ট হইয়াছে এবং তাহা উদ্ধার করাও হয়তো আর সম্ভব নহে। কবিচন্দ্রের কৃষ্ণমাহাত্ম্য-বিষয়ক পালাগুলিকে একত্র করিয়া কবিচন্দ্রেব দৌহিত্রবংশীয় পণ্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় 'ভাগবতামৃত শ্রীশ্রী গোবিন্দমঙ্গল' ১৩৪১ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি মুদ্রণের পরেও দেখা যায় কবিচন্দ্রের নামে উক্ত বিষযেব অনেক পালাই উহার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। আবার যাহা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহারও সমস্তই কবিচন্দ্রের রচনা নহে। তাঁহাব রচিত 'শিবমঙ্গল', 'অনাদিমঙ্গল' ও 'রামায়ণ'-এব সমস্ত পুথিই পালাকারে পাওয়া যায়। 'শিবমঙ্গল' ও 'অনাদিমঙ্গল'-এর সমস্ত পালা এখনও সংগৃহীত না হইলেও এই দুইটি কাব্য যে তিনি সম্পূর্ণ রচনা করিয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। বিভিন্ন পুথিশালার পুথিসমূহকে কাহিনীগতভাবে ক্রমান্বযে সজ্জিত করিলে পাঁচখানি বৃহৎ কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় ; যথা :-

১। শিবমঙ্গল ২। অনাদিমঙ্গল ৩। রামায়ণ
৪। ভাগবতামৃত শ্রীশ্রী গোবিন্দমঙ্গল এবং ৫। মহাভারত

এই পাঁচখানি বৃহৎ কাব্য ব্যতীত এমন কিছু পালা আছে যাহাদেব বিষয় ঠিক কোনও বৃহৎ কাব্যেব অন্তর্গত কিনা তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। এইহেতু উহাদের স্বতন্ত্র রচনারূপে পরে আলোচিত হইয়াছে।

১। শিবমঙ্গল :-

কবিচন্দ্রের 'শিবমঙ্গল' বা শিবায়ন কাব্যখানি মল্লরাজা বীর সিংহের রাজত্বকালে (আঃ ১৬৫৬-৮২ খ্রীঃ) রাঢ়ে প্রচলিত শিবায়ন কাব্যসমূহের মধ্যে অন্যতম সার্থক রচনা। কবিচন্দ্রের প্রথম জীবনে রচিত এই কাব্যটির পালাসমূহের বিলুপ্তিজনিত অভাব এবং পরবর্তী কবি রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যের ব্যাপক প্রচারের ফলে কবিচন্দ্রের এই কাব্যখানির তত সমাদর ঘটে নাই। কিন্তু ইহার যে কয়খানা পালা পাওয়া গিয়াছে তাহার দ্বারা কাব্যখানির গুণাগুণ বিচার করিয়া মনে হয় তিনি লৌকিক শিব কাহিনীর প্রথম এবং সর্বোৎকৃষ্ট শিল্পী। ডঃ সুকুমার সেন এই কাব্যখানি কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর রচিত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে, "কবিচন্দ্র মল্লরাজাদের সভাকবির উপাধি বলিয়া মনে হয়। কবিচন্দ্র ভণিতা থাকিলেই তাহা শঙ্কর চক্রবর্তীর রচনা মনে করিলে ভুল হইবে। এই ভুল করিয়াছেন কবিচন্দ্রের ভাগবতামৃত গোবিন্দমঙ্গলের সঙ্কলয়িতা। বীর সিংহের রাজ্যকালে (১৬৫৬-৮১) যে দ্বিজ কবিচন্দ্র শিবায়ন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তিনি স্বতন্ত্র ব্যক্তি"।[১] 'মর্ছধরা' পালার (সা. ৪১২) একটি পুথিতে কয়েকবার 'কবিকঙ্কণ' এবং 'কবিচন্দ্র' ভণিতা থাকায় ডঃ সেন খুব সম্ভব এইরূপ মন্তব্য করিয়া থাকিবেন। কিন্তু অপর দুইখানি শিবমঙ্গলের পালায় 'কবিচন্দ্র' এবং 'শঙ্কর' ভণিতা পাওয়া যায়। আবার 'মর্ছধরা' পালাটিতেও 'কবিচন্দ্র' এবং 'শঙ্কর' নামের উল্লেখ আছে। এই বিষয়ে মঙ্গলকাব্য আলোচনার পথপ্রদর্শক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় সর্বপ্রথম এই পালাটিকে কবিচন্দ্রের রচনা হিসাবে অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে, "দ্বিজ শঙ্কর,কবিচন্দ্রের শিবমঙ্গল কাব্যে 'মৎস্য ধরা পালা' ও 'শঙ্খপরা পালা' নামক যে দুইটি পরিচ্ছেদ আছে, তাহা এই কাব্যের বৈশিষ্ট্য। উভয় অংশই পুরাণ বহির্ভূত লৌকিক বিষয় মাত্র। কিন্তু তিনি তাহা নিজের কাব্যের মধ্যে গ্রহণ করিয়া ইহার একটি লৌকিক আবেদন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শিবমঙ্গলের পরবর্তী কবিগণ তাঁহার এই ধারা অনুসরণ করিয়া বহুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছেন।"[২] ইহার পর ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী 'রামেশ্বর রচনাবলী' গ্রন্থটির সম্পাদনাকালে ডঃ ভট্টাচার্যের মতকেই সমর্থন করিয়া গ্রন্থের পাদটীকায় ড. ভট্টাচার্য্যের গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন।[৩] ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যয়ও 'মর্ছধরা' পালার 'কবিকঙ্কণ' ভণিতাকে 'লিপিকর প্রমাদ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন:— "শঙ্করের 'মর্ছধরা পালা' নামক শিবায়নের এক পালার পুথিতে শ্রী কবিকঙ্কণ শ্রীকবি শঙ্কর, সুকবি শঙ্কর, দ্বিজ কবিচন্দ্র প্রভৃতি ভণিতা পাওয়া যায়। কবি কোনো কোনো ভণিতায় শুধু কবিচন্দ্র ব্যবহার করিয়াছেন। লিপিকর প্রমাদে তাহা হইয়াছে কবিকঙ্কণ'।"[৪]

যাহাই হউক কৈলাসবাসী দেবদেবীকে কবিচন্দ্র যেভাবে মর্ত্যের ধূলি ধূসরিত মানুষের মত রঙ্গ ব্যঙ্গের পাত্র-পাত্রী করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে শিবভক্তকবি রূপে মনে

করিতে ইতস্ততঃ বোধ হয়। অবশ্য মধ্যযুগে প্রচলিত 'মনসামঙ্গল' এবং 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের শিব ও চণ্ডীর আচার আচরণই কবিচন্দ্রের কাব্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। সেই যুগের পক্ষে এইরূপ চিন্তা ভক্তি-ধর্মের অন্তরায় নহে। তথাপি কবিচন্দ্র কৃষিজীবি ভোলামহেশ্বরকে যথাসম্ভব পরিমার্জিত করিয়াই চিত্রিত করিয়াছেন।

শিবমঙ্গলের যে কয়খানা পালা পাওয়া যায় তাহাদের নাম যথাক্রমে এইরূপ ঃ-

(ক) গৌরীমঙ্গল - (বি.ভা. ২০২, ৩নং পত্র, খণ্ডিত, দৈ. ৩৩ x প্র. ১২.৫ সে.মি.)

(খ) মর্ছধারা পালা -(সা ৪১২, ১-২৯ পত্র, সম্পূর্ণ ১২৩৭ সাল, দৈ. ৩৪.৫ x প্র. ১১.৫ সে.মি., পং - ৯।)

(গ) হরগৌরী সংবাদ - (ক.বি. ২২৮৬, ২-৪ পত্র, খণ্ডিত, দৈ. ৩৩.২ x প্র. ১২ সে.মি., পং -১১)

(ঘ) মহামায়ার শঙ্খপরা - (বি.রি.মি. ৫৬৭, ক্রমিক সং ৩, খণ্ডিত)

'গৌরীমঙ্গল' পালার মূল প্রসঙ্গ শিবগৌরীর বিবাহের পূর্বে গৌরীর তপস্যায় সন্তুষ্ট কৈলাসবাসী শিব আসিয়াছেন দেবীকে বর দিতে ।.গৌবী শিবকে চিনিতে না পারায় মৃত্যুঞ্জয় সহসা সদাশিবের বেশ ধারণ করিয়া গৌরীর সম্মুখে আবির্ভূত হন । তপস্যায় মলিনা গৌরী তখন শিবের নিকট বর প্রার্থনা করেন ।

ইহার পর পুথি খন্ডিত । এই পুথির নামকরণ বিশ্বভারতীর বাংলা পুথির তালিকায় এইরূপই পাওয়া যায় । কবিচন্দ্র ইহার কি নাম দিয়াছিলেন তাহা জানা যায় নাই । এই পালাটির পরে নিশ্চয়ই গৌরীর বিবাহ ও কৈলাস প্রসঙ্গ আছে ।

'মর্ছধরা পালাটি'-র আরম্ভ গৌরীর স্বপ্নদর্শনে । সরস কৌতুকপূর্ণ উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং কপট মান অভিমানের রসে সিক্ত চারিটি রসোজ্জ্বল চরিত্রের সমাবেশে পালাটি গার্হস্থ্য জীবনের এক নিপুণ আলেখ্য ! এই রঙ্গব্যঙ্গমুখর দাম্পত্য জীবন পরিচালনায় চণ্ডীর স্বপক্ষে পদ্মা এবং শিবের পক্ষে ভাগিনেয় ভীম ছিলেন সহযোগী । ছয়মাস পূর্বে চণ্ডীর গঞ্জনায় উত্যক্ত শিব চাষের নিমিত্ত কৈলাস পরিত্যাগ পূর্বক মর্ত্যে আগমন করেন । অতএব দীর্ঘদিনের অদর্শনে চণ্ডিকা দেবীও উতলা হইয়া ওঠেন । কিরূপে পশুপতিকে শীঘ্র তিনি গৃহে ফিরাইবেন তাহার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন । এমন সময়ে পদ্মাই দেবীকে বলিয়া দেন কি কবিলে শূলপাণি গৃহে ফিরিবেন ।

ধান্য ভ্রমে মর্ছ গিয়া ধর নারায়ণী ।
রূপ দেখি মূরছিত হব শূলপাণি ।।
মাণিক অঙ্গুরি তুমি আনিবে হরিযা ।
তবে সে আসিবে শিব কেদাব ছাড়িয়া ।। (প্রাগুক্ত, পু.প্. ১)

পদ্মার উপদেশমত বাগ্দিনী বেশ ধাবণ করিয়া হাতে 'ঘুনসিজাল' সহ 'ইসাদের বাড়ি'

লইয়া ভগবতী তেঁতুলতলাতে উপস্থিত হন। গৌরীর কটুবচন সহ্য করিতে না পারিয়া শিব সংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, কাজেই তিনি যে সহজে গৃহে ফিরিবেন না তাহা অবধারিত। ভবানী কামাখ্যার বশীকরণ মন্ত্র পড়িতে পড়িতে শিবের ধানক্ষেতে গিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু ফসল নষ্ট করিতে মায়া জন্মে। শিবের অনুচর ভীমের সঙ্গে ভবানীর বাক্‌বিতণ্ডার পর শিব ধানক্ষেতে উপস্থিত হইলে সেখানে বাগ্দিনীকে দর্শন করেন। তখন পদ্মার পরামর্শে গৌরী মদনকে স্মরণ করিতে থাকেন। মদনশরে আহত শিব হতচেতন হইলে গৌরী মুখে জল সিঞ্চন করিয়া শিবের চেতনা সঞ্চার করেন। গৌরীর রূপে মুগ্ধ শিব স্ত্রীর নাম সাদৃশ্যে বাগ্দিনীর সঙ্গে সই সম্পর্ক স্থাপন করিয়া ফেলেন। তিনি সই-এর জন্য মাছ পর্যন্ত ধরিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বাগ্দিনীর কথার ছলনায় নিগৃহীত হইবার ভয়ে সদাশিব সেখান হইতে পলায়ন পূর্বক ধান্যক্ষেত্রে আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করেন, তথাপি সচতুরা বাগ্দিনীর নিকট শিব ধরা পড়িয়া যান। অবশেষে বাগ্দিনীর প্রস্তাবমত শিব তাহাকে নিজের হাতের মাণিক-অঙ্গুরীটি প্রদান করিয়া বিব্রতভাবে ছিলেন। মনে ভয় ছিল, না জানি কি করে 'হেমন্ত ঝিয়ারি'। গৌরী তখন শিবের ভোজের নিমিত্ত নানা জাতের মৎস্য ধরিতে থাকেন। তাহাতে গ্রাম-বাংলার কবির কাব্যে মৎস্য রন্ধন প্রণালীর এবং মৎস্যের গুণ ও স্বাদুতার দীর্ঘ বর্ণনা আসিয়া পড়ায় উক্ত রসনা-লোভন বর্ণনাটি মৎস্য প্রিয় বাঙালীর ভোজ্য তালিকার একটি সুন্দর দৃষ্টান্তরূপে পরিগণিত হইতে পারে; যথা :-

ডাড়িকা সমান মর্ছ নাহিক ভূতনাথে।
চিঙ্গুড়ি রান্ধিতে চাই বার্তকীর সাথে॥
এলিচি ফেলিএ যদি দেই এক মুঠা।
আলুকোচ দিলে তবে সব হয় মিঠা॥ (পু.পৃ. ২২)

কিংবা -

পুঁটি মর্ছ চর্চড়ি করিতে যদি পাই।
মনে করি সারাদিন বসে বসে খাই॥
তেঁতুলের রস দিয়া যদি রান্ধে পাঁকাল।
মুখে মিঠা বড় সুখ অধিক রসাল॥
কৈ মর্ছের ঝোল মিঠা যদি করে ভাজা।
তার আগে সব মিথ্যা ব্যঞ্জনের রাজা॥
প্রবীণ গড়ুই যদি পোড়াইতে পাই।
সুপ হেন ব্যঞ্জনের মুখে দেই ছাই॥
জাম্বিরের রস পালে কোন ছার সুধা।

সেরেকের অন্ন খায় যার মন্দ ক্ষুধা ।।
চেঙ্গ জিয়াল মৰ্ছ রোগীর পথ্য হয় ।
নিরক্তির রক্ত হয় শুন মৃত্যুঞ্জয় ।।
মুদ্গার মর্ছের ঝোল পীযূষ সমান ।
সুখাদয় লোকের হয় কেবল প্রাণ ।।
চেঙ্গড়া মর্ছেতে হয় সভাকার লোভ ।
শাস্ত্রের বিচার নয় যেবা করে ভোগ ।।
প্রবীণ বোদানি মর্ছ বড় হিতকারী ।
এক মুখে গুণ আমি কি কহিতে পারি ।।
চিথল মর্ছের ঝোল খায় নিতি নিতি।
দেহের কালিয়া ঘুচে হয় স্বর্ণ জ্যোতি ।।
শৌল মর্ছ রান্ধে যদি অম্বলের সাথে ।
অরুচির রুচি হয় শুন ভূতনাথে ।।

(প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ২২-২৩)

এইরূপে রুই, কাতলা, মৃগাল প্রভৃতি বাঙ্গালীর অতি প্রিয় মৎস্যের আস্বাদের কথাও বর্ণিত হইয়াছে । মৎস্য আহারের প্রতিই কবির উৎসাহ সর্বাপেক্ষা বেশি দেখা যায় । মৎস্যের এই জাতীয় দীর্ঘ বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে সত্যিই দুর্লভ । আবার যাঁহারা নিরামিষাশী তাঁহাদের উদ্দেশ্যে গৌরীর মুখে ভোজন-রসিক বাঙালী কবি ধিক্কার বাণী শোনাইয়াছেন। সাত্ত্বিকাহারীদিগের প্রতি মৎস্যভুক্ বাঙালী জাতির প্রতিনিধিরূপে কবিচন্দ্রের এই সরস উক্তিটি যেমনই কৌতুকপ্রদ তেমনি যথার্থ ।

অবশেষে হিমালয়ের মানুষদের নিকট মৎস্য প্রেরণের ছল করিয়া গৌরী প্রস্থান করেন । বাগ্দিনীর মোহে উদ্ভ্রান্ত শিবকে ভীম গৃহে ফিরিয়া যাইবার পরামর্শ দেয়। উভয়ে কৈলাসে প্রত্যাগত হইলে গৌরীর বাক্যবাণে জর্জরিত হইয়া বাগ্দিনীর প্রসঙ্গ শিব ও ভীম উভয়েই অস্বীকার করেন । গৌরীদেবী অন্তরের জ্বালায় মাণিক-অঙ্গুরী প্রদর্শন করিলে ভীম রণে ভঙ্গ দেয় আর শিব লজ্জিতভাবে স্ত্রীর নিকট পূর্বকৃত কর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন । গৌরীর অনুযোগের হাত এড়াইতে শিবের মাত্র একটি বাক্যই যথেষ্ট —"তোমা বিনে কেহ মোরে ভুলাইতে নারে।" তারপর —

আনন্দিত হরগৌরী রহিলা কৈলাসে ।
মর্ছধরা পালা সাঙ্গ কবিচন্দ্র ভাষে ।।

তৎকালীন কুলীন বৃদ্ধ স্বামী ও নবীনা স্ত্রীর পারস্পরিক দ্বন্দ্বময় চিত্রের মতই হরগৌরীর এই লৌকিক কাহিনীটি সত্যই উপভোগ্য। পুরাণ-বহির্ভূত এই পালাটির মধ্যে গ্রাম্য শব্দের

ব্যাপক ব্যবহারের ফলে রচনার সহজ, সরল ও অকৃত্রিম ভাব আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। কবিচন্দ্রকে অনুসরণ করিলেও রামেশ্বর তাঁহার শিবায়ন কাব্যের 'মর্ছধরা'য় এতদূর অকৃত্রিমতা রক্ষা করিতে পারেন নাই।

'হরগৌরী সংবাদ' পালায় গৌরীর শাঁখা পরিবার বাসনাই প্রধান বিষয়। শিব গৌরীর এই সামান্য আকাঙ্ক্ষাটি পূর্ণ করেন নাই, তাই অভিমানবশতঃ গৌরী কৈলাস ত্যাগপূর্বক পিত্রালয়ে গমন করেন। পথে শিব মায়াছলে 'হাউমূর্তি' (বাঘ) ধরিয়া পথ অবরোধ করিলে মহামায়া তাহাকে বাহন মনে করিয়া লম্ফ প্রদানপূর্বক চাপিয়া বসিতে যান। সদাশিব মায়া ত্যাগ করিয়া কৈলাসে প্রস্থানপূর্বক নারদকে সমস্ত কাহিনী বলেন। গৌরী আসিয়া মাতা মেনকার নিকট সকল দুঃখের কথা জানাইলে রাণী 'নথ' ভাঙ্গিয়া 'নাকচনা', 'খাড়ু', 'কনকের চুড়ি', ফুলপাতা অঙ্কিত 'টাড়' এবং 'মুকুতা সোনার গহনা'ও গড়াইতে দেন। কিন্তু গৌরীর আসল সাধটি তাহাতে পূর্ণ না হওয়ায় মনে হইতে থাকে, —"শঙ্খ বিনে বেশ মিছা ইন্দ্রের কামিনী।" মা-মেনকা চিন্তায় পড়েন, কেননা গিরিরাজের অনুপস্থিতিতে এবং ভাঙ্গড় জামাইয়ের ভয়ে তিনি কন্যাকে শঙ্খ পরাইতে সাহসী হন নাই। গৌরী পূর্ব প্রতিজ্ঞার কথা নিবেদন করিয়া বলেন, —"রাখহ আমার পণ ঘুচাহ কলঙ্ক"। অবশেষে দাসীরা শাঁখারি বেশধারী শিবকে ডাকিয়া গৃহে লইয়া আসিলে তখন শাঁখারি লক্ষ তঙ্কা মূল্যের শাঁখা গৌরীর সম্মুখে তুলিয়া ধরেন —

নৌতন হিঙ্গুলের রঙ করে ঢল ঢল।
প্রবাল মুকুতা চুনী করে ঝলমল ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৪)

ইহাব পর পুথি খণ্ডিত। অবশেষে 'মহামায়ার শঙ্খ পরা' পালায় দেখা যায় জগজ্জননীকে শিব শাঁখারি বেশে আসিয়া শঙ্খ পরাইতেছেন।

দ্বিজ কবিচন্দ্র গান ভাবি ত্রিলোচন।
হরগৌরী যারে কৃপা কৈল দুইজন ॥

এই ভণিতাটি উভয় পুথিতেই পাওয়া যায়।

এই কাব্যের আর কোনও পালা আমরা পাই নাই। একমাত্র 'মর্ছধরা' পালাটির সামান্য দুই চারিটি উক্তি ভিন্ন অন্যত্র কোথায়ও অশালীন কথার পরিচয় পাওয়া যায় না।

কবিচন্দ্রের পরবর্তী কবি রামেশ্বরের 'শিবায়ন' খানি সুবৃহৎ রচনা। তিনি বিভিন্ন পুরাণের অনুসরণে শিবমহিমা কীর্তিন করিয়াছেন। রামেশ্বর মুখ্যতঃ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের আদর্শকেই রূপায়িত করেন। তাহাতে হর-পাবতীর কোন্দল অংশ বর্ণিত হইলেও দাবিদ্র পীড়িত বাঙ্গালী সমাজের করুণ মধুর সজীব চিত্রের প্রতিফলন ঘটিয়াছে। কবি রামেশ্বর সম্পর্কে ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী লিখিয়াছেন, "..................মঙ্গলকাব্যের যুগে এবং

ধারায় কবি রামেশ্বরের শিবায়ন রচিত হইলেও ইহাকে ঠিক মঙ্গলকাব্যের শ্রেণীতে স্থান দেওয়া যায় না।" ইহার কারণ প্রসঙ্গে তিনি কবি রামেশ্বরের কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাবের সুদূরপ্রসারী গভীরতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। রামেশ্বরের শিব আসক্তিহীন, উদার এবং করুণাময়। তুলনায় কবিচন্দ্রের শিব লৌকিক এবং অনেক বেশি বাস্তব ও রসোচ্ছল।

২। অনাদিমঙ্গল :-

'শিবমঙ্গল' রচনার পর কবিচন্দ্র রঘুনাথ সিংহের (২য়) রাজত্বকালে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যের দুই চারি বৎসরে এই কাব্যখানি রচনা করেন। 'অনাদিমঙ্গল' (সা. ২৬৭১, লেখা অস্পষ্ট, খণ্ডিত) কবি প্রদত্ত নাম। পুথিটির বহুস্থলে কবির ভণিতা এবং পরিচয় পাওয়া যায় ; যথা :-

শ্রীকবি শঙ্কর কয় দূর কর তব ভয়
তোমা বিনে অন্তে নাই গতি।
কুঞ্জ বিহারীর দয়া দেহ ধর্ম পদছায়া
মল্লভূমি পাম্বায় বসতি ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৪৬)

শ্রীকবি শঙ্কর ধর্মের কিঙ্কর
পাঁচালি প্রবন্ধে ভাষে।
রাজা রঘুনাথ ভুবনে বিখ্যাত
নিবাস তাহার দেশে ॥ (প্রাগুক্ত, পু. পৃ. ৬১)

দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় অনাদির বরে।
হরির (কৃপায় যায়) পাপ যার দূরে ॥ (প্রাগুক্ত, পু. পৃ. ৮০ক)

ইহা ভিন্ন আরও কিছু (৩৩ক, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৯, ৪৪, ৪৮, ৭১, ৭২, ৭৪, ৭৬, ৭৭, ৭৯ পৃ.) ভণিতা আছে। এই একটি পুথি ভিন্ন ইহার আর কোনও পালা আমরা পাই নাই। ডঃ সুকুমার সেন লিখিয়াছেন — "শঙ্কর চক্রবর্তী 'কবিচন্দ্র' যিনি একটি বড় কৃষ্ণলীলা কাব্য ও অনেকগুলি ছোটখাট নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়, তাঁহার রচিত একটি ছোট 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে"।[৮] তবে তিনি কবিচন্দ্রের পুথি সম্পর্কে পাদটীকায় যে পুথির সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা কবিচন্দ্রের 'অনাদিমঙ্গল'-এর পুথি কিংবা নিধিরাম গাঙ্গুলীর 'ধর্মমঙ্গল'-এরও পুথি নহে। খুব সম্ভব উহা মুদ্রণ প্রমাদ।

রাঢ়ের জাতীয় কাব্য ধর্মমঙ্গল। ধর্ম এবং শিব রাঢ়ের লৌকিক দেবতা। কবিচন্দ্রও এই ধর্ম এবং শিবের সমন্বিত রূপটিকেই 'অনাদিমঙ্গল'-এ স্থান দিয়াছেন। ধর্মঠাকুরকে

লইয়া রাঢ়ের কবিরা কত রূপের চিন্তা করিয়াছেন কিন্তু কবিচন্দ্র এই সকল ধারণাকে পরিহার করিয়া এক অনাদ্যের অথবা ধর্ম নিরঞ্জনের কথাই বলিয়াছেন। তবে এই কাব্যের অপর কোনও পালা না পাওয়ায় এই সম্পর্কে খুব বেশীদূর অগ্রসর হওয়া সঙ্গত নহে।

লাউসেন এই কাব্যের প্রধান চরিত্র। তিনি কালু বীরের হাতে 'ময়না'র দায়িত্বভার দিয়া পশ্চিমোদয়ের উদ্দেশ্যে হাকণ্ডে যাত্রা করেন। এদিকে লখ্যাডোমনী ভাটের পরামর্শে উৎকোচ গ্রহণকারী কালুকে তীব্র ভাষায় জর্জরিত করে। তাহার বীরত্বেরও পরিচয় পাওয়া যায়। যখন ইন্দামেট সমগ্র পুরীকে অবচেতন করিয়া রাখে তখন লখ্যা একাকিনী নয় লক্ষ সেনার সঙ্গে অসীম সাহসে যুদ্ধ করিতে থাকে। তাহার চিরন্তনী নারী প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় পরে। লখ্যা ডোমনীই এই কাব্যের উৎকৃষ্টতম চরিত্র। মল্লভূমের অপর কবি নিধিরাম গাঙ্গুলী (কবিচন্দ্র) লিখিয়াছেন আদ্য ঢেকুর কাহিনী (সা.চি. ৩৯৪, বিচ্ছিন্ন পত্র, খণ্ডিত পুথি)। ইহাতে ধর্ম নিরঞ্জনের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। উল্লুক তাহার বাহন। ইহাতে ময়নার কাহিনী, রঞ্জাবতীর পুত্রলাভ, লখ্যার প্রসঙ্গ, শুকসারি পক্ষীর প্রসঙ্গ, বাটুর পুষ্পচয়ন, কলির মাহাত্ম্য প্রভৃতি পাওয়া যায়। নিধিরামের আরও দুই একটি পুথি পাওয়া যায়। কিন্তু পুথি খণ্ডিত হওয়ায় কাহিনী সম্পূর্ণ উদ্ধার করা যায় না। তবে তিনিও কবিচন্দ্রের কাব্যের মতই ধর্ম ঠাকুর সম্পর্কে কোনও নূতন ধারণা সৃষ্টি করেন নাই।

৩। রামায়ণ :-

কবিচন্দ্রের তৃতীয় এবং সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কাব্য 'রামায়ণ'। এই কাব্যখানির 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' নাম গ্রহণের প্রেক্ষাপটে আছে অতিমাত্রায় জনপ্রিয়তা। বহুল প্রচারিত এই কাব্যখানি রাজা রঘুনাথ সিংহের (২য়) রাজত্বকালে (আঃ খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে) রচিত হয়। কবিচন্দ্র বাল্মীকি-রামায়ণ, 'শ্রীমদ্ভাগবত' (নবম স্কন্ধ, দশম অধ্যায়) এবং 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' অবলম্বনে সংক্ষেপে এই 'রামায়ণ' কাব্য রচনা করেন। উক্ত তিনটি গ্রন্থের উল্লেখ কবি বহুবার করিয়াছেন। কিন্তু মধ্যযুগে বহু প্রচলিত 'অদ্ভুত রামায়ণ'-এর প্রভাবকে তিনি সর্বতোভাবে পরিহার করিয়াছেন, সম্ভবতঃ এইজন্য কোথাও অদ্ভুত রামায়ণের নামোল্লেখ করেন নাই।

কাব্যখানির যে কয়খানা পালা পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে উত্তরাকাণ্ডের অন্তর্গত একখানি পালাও পাওয়া যায় নাই। মুদ্রিত "বিষ্ণুপুরী রামায়ণ"-এও (১৩৮৬ বঙ্গাব্দ) উত্তরাকাণ্ড প্রদত্ত হয় নাই। কবিচন্দ্র উহা রচনা করিয়াছিলেন কিনা তাহার কোনও আভাস পর্যন্ত পাওয়া যায় না। এই সম্পর্কে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রথমতঃ বাল্মীকির রচিত 'রামায়ণ' সম্পর্কে আধুনিক গবেষকগণ অনুমান করেন যে, 'উত্তরকাণ্ড' বাল্মীকি-

রচিত নহে, ইহা খুব সম্ভব পরবর্তীকালের সংযোজন। যুদ্ধকাণ্ডের শেষে 'রামায়ণ-মাহাত্ম্য' সংযোজনকে তাঁহারা প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করেন।[১] কিন্তু এই সমীক্ষার কথা গ্রাম্য কবি কবিচন্দ্রের পক্ষে অন্ততঃ সেই যুগে জানিবার কথা নহে। দ্বিতীয়তঃ বলা যায় যে, 'মহাভারত'-এ (ব্যাস প্রণীত) বনপর্বে রাম-কথা অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে সীতার নির্বাসন এবং পাতাল প্রবেশ নাই। তৃতীয়তঃ 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এ উত্তরকাণ্ড সন্নিবেশিত হইলেও 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এ নবম স্কন্ধের দশম অধ্যায়ে বর্ণিত রাম-জন্ম হইতে অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত কাহিনী পাওয়া যায় এবং একাদশ অধ্যায়ে সীতার বনবাস প্রসঙ্গ খুব সংক্ষিপ্ত।

চতুর্থতঃ ভাষা রামায়ণে রাম-কথা যদৃচ্ছা বর্ণিত হইয়াছে। ইহার উদাহরণ হিন্দী কবি তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস'। উহাতেও সীতার নির্বাসন এবং পাতালপ্রবেশ পাওয়া যায় না। এই সকল কারণে মনে হয়, কবিচন্দ্র রামায়ণের কাহিনী নির্বাচনের জন্য মহাভারতের রাম-কথা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের দশম অধ্যাকেই গুরুত্ব দিয়াছেন, ফলে রাম-জন্ম হইতে সিংহাসন প্রাপ্তি পর্যন্ত মূল রাম-কথার কাঠামোর উপর ভিত্তি করিয়া তিনি কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং সীতার বনবাস ও লবকুশের কাহিনী বর্জন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কবি সীতা নির্বাসনের করুণ-রসাশ্রিত কাহিনী শ্রোতাদিগের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া তাঁহাদের মনকে ভারাক্রান্ত করিতে বোধহয় ইচ্ছুক ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণের মত শ্রীরামচন্দ্রও কবির নিকট আদর্শ পুরুষ। রামচন্দ্রের দেবত্ব সে যুগের সকল কবির রাম-কথায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। কবিচন্দ্রের কাব্যে এই দৈবীভাবের প্রকাশ ঘটিলেও কোথাও তাহা আবেগের আতিশয্যে পর্যবসতি হয় নাই। অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও ছায়া সীতার কল্পনা একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। আবার রামচন্দ্র কখনও নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। তথাপি সর্বত্র তিনি নররূপী নারায়ণ, প্রভু এবং দূর্বাদলশ্যামরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের তটস্থভাবের মত কবিচন্দ্রও রামচন্দ্রের ঈশ্বরত্ব বর্ণনায় সর্বদা সংযম রক্ষা করিয়াছেন। পালাগুলি সংক্ষিপ্ত এবং বাহুল্যবর্জিত। ইহা কবিচন্দ্রের রচনার একটি অন্যতম লক্ষণ। তবে কিছু লোকশ্রুতি এবং দুই একটি অতি ক্ষুদ্র কাহিনী সংযোজন করিয়া তিনি আপন রচনার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছেন। কাব্যসুষমা ও ছন্দলালিত্যে কবিচন্দ্রের 'রামায়ণ' খানি অপর সকল রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৪। 'ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গল'

পণ্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গাব্দ ১৩৪১ সালে কবিচন্দ্রের 'ভাগবতামৃত শ্রীশ্রী গোবিন্দমঙ্গল' গ্রন্থখানি কলিকাতা এজেন্সির আই.ডি.প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থখানিতে সম্পাদক মাখনবাবু কবিচন্দ্রের রচিত বিভিন্ন কৃষ্ণকথার পালাকে 'ভাগবত'-এর স্কন্ধানুসারে সজ্জিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। উহাতে দশম স্কন্ধের অন্তর্গত পালার সংখ্যাই অধিক। কবি রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার বহুল বর্ণনার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মধুর রূপটিই তুলিয়া ধরিয়াছেন।

এই কাব্যখানির রচনাকাল সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কাহারও মতে কাব্যখানি রচিত হয় দুর্জন সিংহের রাজত্বকালে। আবার কেহ কেহ সংশয় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, গোপাল সিংহের (১ম) রাজত্বে ইহা রচিত হইয়াছিল। এই সংশয়ের কারণ, ইহার কোনও পালাতেই কোনও মল্লরাজার নাম পাওয়া যায় না। 'প্রহ্লাদ চরিত্রের' অন্তর্গত মদনমোহন বন্দনায় বিষ্ণুপুরের সুপ্রসিদ্ধ মদনমোহন মন্দিরের উল্লেখ আছে। এই মদনমোহনের সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন রাজা দুর্জন সিংহদেব (১৬৯৪ খ্রীঃ)। আবার গোপাল সিংহদেব (১ম) রাজত্বলাভ করেন ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে। মনে হয় এই দুই রাজার রাজত্বকালের মধ্যে (১৬৯৪-১৭১২ খ্রীঃ) ভাগবতের অধিকাংশ পালা রচিত হয়। আমরা বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের একটি 'রাসপঞ্চাধ্যায়' পালার পুথিতে ১০১৮ সনের (মল্লাব্দ) উল্লেখ পাইয়াছি ; যথা :-

এই উপাখ্যান জেবা গায় গাওয়ায় শুনে।
রাসলীলা গোবিন্দের গোপীদের সনে ॥
সর্বপাপ মুক্ত হয়া চাপএ বিমানে।
কুল নাঞা জায় সেই বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥
সেবিআ ব্যাসের পদ কবিচন্দ্র গায়।
রাস পঞ্চাধ্যায় কথা সঙ্খেপেতে সায় ॥

ইতি সন ১০১৮, ২৬ জ্যৈষ্ঠ।

এই ১০১৮ সন (মল্লাব্দ) ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দের সমার্থক। খুব সম্ভব এই সময়ে কিংবা উহার অল্প কিছু পূর্বে ইহার মূল পালাটি রচিত হইয়াছিল। আমাদের দৃষ্ট কবিচন্দ্রের সকল পুথির মধ্যে সময়ের দিক হইতে এই পুথিটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু লিখিয়াছেন, "কবিচন্দ্র আবশ্যক মত ভাগবতের প্রধান প্রধান ঘটনা অবলম্বনে পালার আকারে গোবিন্দমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ভাগবতের ভাবানুবাদ মাত্র।"[৮] কবিচন্দ্র নিজেও লিখিয়াছেন —

দশমে ব্যাসের উক্তি মনেতে করিয়া যুক্তি
কবিচন্দ্র চক্রবর্তী গায়। (সা. ১৭৪১, পু.পৃ. ৫)

ব্যাসদেব রচিত ভাগবতের আদর্শে কবি এই কাব্যখানি রচনা করেন। তবে সর্বত্র ভাগবতের অনুসরণ পাওয়া যায় না। তাঁহার "ভাগবতামৃত শ্রীশ্রী গোবিন্দমঙ্গল' গ্রন্থে 'কণ্বমুনির

পারণ' পালায় পাওয়া যায় ভবিষ্যপুরাণের (ঐ. পৃ. ১১৮) এবং 'পারিজাত হরণ' পালায় আছে হরিবংশের (ঐ. পৃ. ৩৪৫) উল্লেখ। আবার পালাগুলিতে 'ভাগবত', 'গোবিন্দমঙ্গল' এবং 'কৃষ্ণমঙ্গল' নাম পাওয়া গেলেও এইগুলি ঠিক অনুবাদ নয়। এইহেতু ইহাদের অনুবাদের পর্যায়ে ফেলাও চলে না। তবে মধ্যযুগে ভাবানুবাদকেও অনুবাদই মনে করা হইত। এইরূপ ভাগবতানূদিত যেসকল পালা গ্রন্থখানিতে স্থান লাভ করিয়াছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল ; যথা :-

পরীক্ষিতের ব্রহ্ম শাপ (১ম স্কন্ধ), ধ্রুবচরিত্র ও দক্ষযজ্ঞ (৪র্থ স্কন্ধ), জড়ভরতোপাখ্যান (৫ম স্কন্ধ), অজামীল উদ্ধার ও চিত্রকেতুর উপাখ্যান (৬ষ্ঠ স্কন্ধ), প্রহ্লাদ চরিত্র (৭ম স্কন্ধ) সমুদ্র মন্থন ও বলিবামনোপাখ্যান (৮ম স্কন্ধ) ; অম্বরীষ উপাখ্যান (৯ম স্কন্ধ)। ইহার পর দশম স্কন্ধের অন্তর্গত পালার বিষয় বহু পাওয়া যায়, তবে উহাদের মধ্যে এমন অনেক পালা আছে যাহা মূল 'ভাগবত'-এ নাই। যাহাই হউক, এই স্কন্ধের বিষয়গুলির নাম যথাক্রমে — জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব, পুতনামোক্ষণ, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্ত্তবধ, মুখব্যাদানে ব্রহ্মাণ্ডদর্শন, নামকরণ, গোপীগুহারী ও মৃদ্‌ভক্ষণ লীলা, দধিমন্থন, যমলার্জ্জুন ভঞ্জন, কণ্বমুনির পারণা, ফলভোজন ও কিরাতিনী উদ্ধার, গোষ্ঠযাত্রা, লুকালুকী খেলা, রাখালরাজা খেলা, হা ডু ডু ডু ও গেঁড়ুখেলা ও বকাসুরবধ, ব্রহ্মমোহন, ধেনুকবধ, কালীয়দমন ও দাবাগ্নি মোক্ষণ, প্রলম্ববধ, বস্ত্রহরণ, বিপ্র পত্নীর অন্নভোজন, গোবর্দ্ধন ধারণ, নন্দবিমোক্ষণ, গেড়ুচুরী, মূষিক মার্জার লীলা, কলঙ্কভঞ্জন, লাবণ্যলীলা কাহিনী, গোষ্ঠবিহার, মুক্তাচাষ, কৃষ্ণকালী উপাখ্যান, কোকিল সংবাদ, বংশীশিক্ষা, রাসলীলা, অক্রূর আগমন, কংসবধ, কারামোচন, নন্দবিদায়, গুরুদক্ষিণা (শঙ্করআচার্য), উদ্ধব সংবাদ, কপাল চরিত্র, কাঠুরিয়া ভক্ত কাহিনী, রুক্মিণী হরণ, দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ, রুক্মাঙ্গদ রাজার একাদশী, ঊষাহরণ, বাণযুদ্ধ, দিবারাস, দাতাকর্ণ, পারিজাত হরণ, সত্যভামার পুণ্যকব্রত, সুদামার দারিদ্র্যভঞ্জন, প্রভাসমিলন (১০ম স্কন্ধ) এবং কপোতকপোতী সংবাদ ও কৃষ্ণলীলাবসান (১১শ স্কন্ধ)।

ইহাদের মধ্যে গোপীগুহারী, দধিমন্থন, কণ্বমুনির পারণা, ফলভোজন ও কিরাতিনী উদ্ধার, লুকালুকী খেলা রাখালরাজ খেলা, হা ডু ডু ডু ও গেঁড়ুখেলা, গেড়ুচুরী মুষিক মার্জার লীলা, কলঙ্কভঞ্জন, লাবণ্যলীলা, মুক্তাচাষ, কৃষ্ণকালী, কোকিল সংবাদ, বংশীশিক্ষা, কপালচরিত্র, কাঠুরিয়া ভক্তকাহিনী, দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ, রুক্মাঙ্গদ রাজার একাদশী, দাতাকর্ণ, পারিজাত হরণ এবং সত্যভামার পুণ্যকব্রত বিষয় মূল ভাগবতান্তর্গত নহে।

এই পালাসমূহের মধ্যে পারিজাতহরণ' ও 'সত্যভামার পুণ্যকব্রত', — 'হরিবংশ'-এর,

'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' ও 'দাতাকর্ণ — 'মহাভারত'-এর বিষয়, 'কণ্বমুনির পারণা' — 'ভবিষ্যপুরাণ' এবং অন্যান্য কিছু পালা খুব সম্ভব কবিচন্দ্র রচিত 'রাধিকামঙ্গল'-এর অন্তর্ভুক্ত। এই নামে দুই একখানি পুথিও পাওয়া যায়।

অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসুর মতে, —"মুষিক মার্জার লীলা" ও 'কলঙ্কভঞ্জন' প্রভৃতি পালার ভণিতায় 'রাধিকা মঙ্গল'-এর উল্লেখ রহিয়াছে। আমাদের মনে হয় ভাগবতাতিরিক্ত এই সকল পালাব সমষ্টিতে রাধিকা মঙ্গল নামে এক স্বতন্ত্র গ্রন্থ বচিত হইয়াছিল। তাহাই মুদ্রিত গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে।"[১]

অধ্যাপক বসুর কথার সমর্থনে বলা যায় যে 'কণ্বমুনির পারণ' পালায়ও 'রাধিকামঙ্গল' (বি.ভা. ৮০৬ পু.পৃ. ৭ক) কথার উল্লেখ আছে এবং কবিচন্দ্রের অধিকাংশ পালার ভণিতায় 'গোবিন্দমঙ্গল' 'ভাগবতামৃত' ও 'কৃষ্ণমঙ্গল' কথাটির উল্লেখও পাওয়া যায়।

'উদ্ধব সংবাদ' (বি.ভা. ২৬৫১, ১টি পত্র) নামক একটি পুথির ভণিতায় পাওয়া যায় :-

পথশ্রমে উদ্ধব রহিলা শয়নে।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্র ভণে॥

অতএব "ভাগবতামৃত" বা "গোবিন্দমঙ্গলে"র ন্যায় 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' ও "শ্রীকৃষ্ণচরিত" (বি.ভা. ৫৮৩০, পু.পৃ. ৩) নামে কবিচন্দ্রের দুই একখানি পুথির নাম সাদৃশ্যবশতঃ কবিকল্পিত কয়েকখানি পালার নাম 'রাধিকামঙ্গল' দেওয়াও বিচিত্র নহে। কবিচন্দ্রের নব 'ভাগবতামৃত' খানি এই 'কৃষ্ণমঙ্গল' ও 'রাধিকামঙ্গল'-এর সমষ্টিসম্ভূত কিনা কে জানে? তবে মুদ্রিত 'ভাগবতামৃত শ্রীশ্রী গোবিন্দমঙ্গল'-এর দুই একখানি পালা কবিচন্দ্রের রচনা নয়; যেমন 'গুরুদক্ষিণা' পালাটি কুলচণ্ডা নিবাসী শঙ্করের এবং 'কৃষ্ণকালী' ও 'মুক্তাচাষ' পালা কবিচন্দ্র দাসের রচনা। আবার মুদ্রিত গ্রন্থে স্থান লাভ করে নাই এমন কয়েকখানি পালার সন্ধান আমরা পাইয়াছি; যথা :-

১। নরকবর্ণনা (বি.ভা. ৪৫২০)
২। মহাব্রতের পালা (হেমেন্দ্র সংগ্রহ, ৪৩১ নং)
৩। গোপিকামোহন (মোক্ষদা সংগ্রহ)
৪। গজেন্দ্রমোক্ষণ (কানাইলাল মুখোপাধ্যায়ের গৃহে রক্ষিত, পানুয়া)
৫। পূর্ণরাস (ব.রি.মি ৬৩০/১৫, ১-৭ পত্র, স. ১২৩১ সাল)।

৫। মহাভারত :-

মল্লরাজ গোপাল সিংহের (১ম) আদেশে কবিচন্দ্র জীবন-সায়াহ্নে 'মহাভারত' খানা রচনা

করেন। ব্যাস-রচিত মূল সংস্কৃত 'মহাভারত'-এর অনুসরণে অতি সংক্ষেপে এই কাব্যখানি বিন্যস্ত। কাশীরাম দাসের মহাভারতের অনুসরণ তাঁহার কাব্যে বিশেষ পাওয়া যায় না। মূল কুরুপাণ্ডব কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্যে তিনি যথাসম্ভব বিস্তারিত বিষয়সমূহ পরিহার করিয়াছেন। মূল কাহিনীর মধ্যে মধ্যে দুই একটি নীতি উপদেশমূলক কাহিনীও পাওয়া যায়। কবিচন্দ্রের মহাভারতের কিছু পুথি 'পর্ব' এবং কতক 'পালা' রূপে অনুলিখিত। ইহার কাহিনী বিষয়ানুসারে সজ্জিত করিলে এইরূপ দাঁড়ায় :

১। আদি পর্ব : সা. ২২৪৭, ১-৫ পত্র, স. ১০৮৩ সন.। দৈ. ৩৪ X প্র. ১১.৫ সে.মি. পং-১৬।

২। সভা পর্ব : দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ - ক.বি. ৬৪৭, ২-১৯ পত্র, খণ্ডিত, ১০৮৪ সন। দৈ. ২৫ X প্র. ৮ সে.মি. পং-৬।

৩। বন পর্ব : সা. ২২৪৬, ১-৩ পত্র, খণ্ডিত। দৈ. ৩৪.৫ X প্র.৩২ সে.মি. পং.১২।

৪। বিরাট পর্ব : খুব সম্ভব কুন্তীর শিবপূজা পালা এই পর্বের প্রথমে যুক্ত করা হইয়াছিল।

৫। উদ্‌যোগ পর্ব : এই পর্বের অন্তর্গত দুইটি পালা পাওয়া যায়, একটি 'কুন্তীর বাণ ভিক্ষা' (সা.চি. ৩৫০) অপরটি 'দাতাকর্ণ পালা' (সা. ২৪৮১)।

৬। ভীষ্ম পর্ব : 'শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদ' (সা. ১৫৪৪) পালা এই পর্বের অন্তর্গত মনে হয়।

৭। দ্রোণ পর্ব : সা.প.প. ১৩০৪ সাল, ৪র্থ সংখ্যা, ৩৩০ পৃ. খণ্ডিত। অপর পালাব নাম অভিমন্যুবধ (সা.চি. ২৭, ১-৮ পত্র)

৮। কর্ণ পর্ব : সা. ২২৪৫, ৭-১০ পত্র, খণ্ডিত, ১০৮৩ সন। দৈ. ৩৩.৫ X প্র. ১১.৫ সে.মি. পং-১৫।

৯। শল্য পর্ব : সা.২২৪৪, ১-৫ পত্র, স, বামভাগে মুষিক দষ্ট, ১০৮৩ সন। দৈ. ৩৩ X প্র. ১১.৫ সে.মি., পং-১৩।

১০। গদা পর্ব : সা.প.প. ১৩০৪ সাল, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৩৩১, ১০৮২ সনে লিপিকৃত।

১১। স্বপ্ন পর্ব (?) : ক.বি. ৫৭২৫, ১, ৫, ৭, ১৭, ১৯ পত্র, খণ্ডিত

উপরে উল্লিখিত পর্বসমূহের অন্তর্গত কিছু কাহিনী পালাকারে পাওয়া যায়। তবে ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ পালাই মূল 'মহাভারত'-এর অন্তর্ভুক্ত নয় ; যথা :-

১। সাবিত্রী উপাখ্যান (বন পর্ব) : বি.ভা. ৪৫২৪, ১-৩, পত্র, খণ্ডিত দৈ. ৩২ X প্র.১১ সে.মি. পং- ১০/১২।

২।	*কুন্তীর শিবপূজা*	*: বি.ভা. ১৪২৮, ৫ পত্র, খণ্ডিত। দৈ ৩২X প্র. ১১ সে.মি.*
৩।	দুর্বাসার পারণ	: ক.বি. ৮৯৩, ১-৪ পত্র, স, ১১৯৩ সাল।
৪।	অর্জুনের গৌরব-ভঞ্জন বা	: সা.চি. ৩৪৯, ১-৯ পত্র, স, লিপিকাল নাই।
	অর্জুনের বাঁধ বাঁধা অথবা	: সা. ১৭২৫, ১-৬ পত্র, স, কীটদষ্ট। দৈ. ২৮ X প্র. ১১ সে.মি., পং-৯, ১১০১ সন।
	অর্জুনের দর্পচূর্ণ	: সা.চি. ১৬৯, ১-৭ পত্র, স, ১২৩৪ সাল।
৫।	দ্রৌপদীর দর্পচূর্ণ	: ক.বি. ৬৫২, ১-৪ পত্র, স. লিপিকাল নাই।
৬।	কুন্তীর বাণ ভিক্ষা	: সা.চি. ৩৫০, ১-১৫ পত্র, স. ১২১০ সাল।
৭।	দাতাকর্ণের পালা	: সা. ২৪৮১, ১-৭ পত্র, স, ১০৮৩ সন। দৈ. ৩৪X প্র. ১২ সে.মি., পং-১০।
৮।	শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদ	: সা. ১৫৪৪, ১-৫ পত্র, স. ১২৩৬ সাল।
৯।	উঞ্ছবৃত্তি পালা	: ক.বি. ৮৯১, ১-৭ পত্র, স, ১০৬১ সন। দৈ. ৩৩ X প্র. ১১ সে.মি., পং-১০/১১।
১০।	অভিমন্যুবধ পালা	: সা.চি. ২৭, ১-৮ পত্র, স.

এই পালা সমূহের মধ্যে "সাবিত্রী উপাখ্যান" "দুর্বাসার পারণ" "শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদ" এবং "অভিমন্যু বধ" পালা ব্যতীত অন্যান্য পালা মূল মহাভারতের কাহিনী নয়। তবে কবিচন্দ্র তাঁহার মহাভারতে এই সকল পালাকে এক একটি পর্বের অন্তর্গত করিয়াই রচনা করিয়াছেন মনে হয়। খুবসম্ভব কাহিনীর আকর্ষণে ইহারা মহাভারতের প্রসঙ্গ বর্জিত হইয়া স্বতন্ত্র পালার আকারে অনুলিখিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বনপর্বের অন্তর্গত 'অর্জুনের গৌরবভঞ্জন', 'অর্জুনের বাঁধ বাঁধা' এবং 'অর্জুনের দর্পচূর্ণ' এই তিনটি পালার বিষয়বস্তু এক। 'কুন্তীর বাণভিক্ষা' এবং 'দাতাকর্ণ পালা' উদ্‌যোগ পর্বের, 'শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদ' ভীষ্ম পর্বের ও 'উঞ্ছবৃত্তি পালা' অশ্বমেধ পর্বের অংশ। 'কুন্তীর শিব পূজা' পাণ্ডবদের বনবাস হইতে প্রত্যাবর্তনের পরের কাহিনী। যাহাই হউক, কবিচন্দ্রের মহাভারতের সকল পর্ব আমাদের হস্তগত না হইলেও এই কাব্যখানি কবি সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। মহাভারতের অধিকাংশ পুথিতে কবিচন্দ্রের পরিচয় এবং মল্লরাজ গোপাল সিংহের উল্লেখ পুনঃপুনঃ লিখিত হইয়াছে, এইহেতু এই পুথিসমূহের রচয়িতা সম্পর্কে সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই।

কাহিনী বিশ্লেষণ :

আদিপর্ব — কবিচন্দ্র মহাভারতের কথায় সৌতি শৌনকাদি মুনির প্রসঙ্গ দ্বারা সূত্র গাঁথিয়াছেন। আদিপর্বে শান্তনু-গঙ্গার বিবাহ, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, চিত্রাঙ্গদকে রাজ্য দান এবং সমরে মৃত্যু কাহিনী সংক্ষিপ্ত। ভীষ্ম কর্তৃক কাশীরাজের তিন কন্যা অম্বা, অম্বিকা এবং অম্বালিকা হরণ, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বিচিত্রবীর্যে দান এবং অম্বার প্রত্যাবর্তনের পর ভীষ্মকে বিবাহের অনুরোধ, ভীষ্ম ও পরশুরামের যুদ্ধ, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম, ধৃতরাষ্ট্রকে হস্তিনার পাটে রাখিয়া পাণ্ডুকে রাজ্যভার অর্পণ, পাণ্ডুকে ব্রহ্মশাপ দান, পঞ্চপাণ্ডবের জন্ম ও পাণ্ডুর মৃত্যুতে মাদ্রীর মৃত্যুবরণ মূলানুগ। দুর্যোধন ও দ্রোণাচার্যের জন্ম এবং একলব্যের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। কর্ণের নিন্দায় দুর্যোধনের ক্রোধ, দ্রুপদকে ধরিয়া আনিবাব জন্য শিষ্যদের প্রতি দ্রোণাচার্যের আদেশ, জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ ও কৃষ্ণের কৃপায় পাণ্ডবদের প্রাণরক্ষা, — এইখানে আদিপর্ব সমাপ্ত।

সভাপর্ব — 'দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ' বা 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' পালা সভা পর্বের অন্তর্ভুক্ত। 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' পালায় প্রথমে মহাভারতের বিষয়, পরের অংশে কবিচন্দ্রের স্বরচিত শশক-সিংহ-শৃগাল কথা এবং ব্রাহ্মণ শান্তিকর্ণ-ব্যাঘ্র-শৃগাল নামক দুইটি নীতি উপদেশমূলক কাহিনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সভা মধ্যে দুর্যোধন দ্রৌপদীকে অপমান করিলে কৃষ্ণনাম স্মরণ করিয়া দ্রৌপদী অব্যাহতি পান। ইহার পর কবিচন্দ্র একটি নূতন দৈবীকৃত কাহিনী সংযোজন করিয়াছেন। দ্রৌপদীকে অপমান করার ফলে দুর্যোধনের গৃহে অগ্নি সংযোজিত হয়। পুরস্ত্রীদিগের ভীত অবস্থা দর্শনে সভাস্থ সকলে লজ্জিত ও বিমর্ষ হইয়া পড়েন। এই অংশে কবিচন্দ্রের কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

বন পর্ব — সশিষ্য দুর্বাসামুনির পারণ কাহিনী এই পর্বের বিষয়। ইহার বিষয়, কৃষ্ণের কৃপায় দুর্বাসা মুনির আতিথ্য রক্ষার পর মুনি কর্তৃক যাজ্ঞসেনী সহ পাণ্ডবদের বরদান। 'অর্জুনের দর্পচূর্ণ' পালা বন পর্বের অন্তর্গত। এই পালাটিতে কবিচন্দ্র সুকৌশলে রামভক্ত হনূমান ও কৃষ্ণভক্ত অর্জুনের দ্বন্দ্ব এবং সাগর-বন্ধন ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অর্জুনের মান বক্ষা করিয়াছেন। ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় মৃগয়া করিতে বাহির হইয়া পথে হনূমানের দর্শন লাভ করেন। তাহার মুখ কেন পোড়া, অর্জুন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে হনূমান জানায়, শ্রীরামের কার্যের জন্য তাঁহার মুখ ঐরূপ হইয়াছে। অর্জুন হনূমানকে গাছ পাথর দ্বারা সাগর বন্ধনের জন্য ধিক্কার করেন। তিনি হইলে শরজালেই সাগর বাঁধিয়া দিতেন। তাহাতে হনূমান জানায় যদি তিনি ঐরূপ কার্য করিতে সক্ষম হন তবে হনূমান তাঁহার দাস হইবে নচেৎ সে তাঁহাকে একটি চড় দিবে। শরজালে সাগর বন্ধনের পর হনূমান দশযোজন শরীর বিস্তারপূর্বক সেতু পরীক্ষার্থে উঠিয়া বসিলে অর্জুন ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে

থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের আহ্বানে তখন বাঁধের তলায় কূর্মরূপে মাথা পাতিয়া দিলে হনুমানের ভারে শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে রুধির নির্গত হইতে থাকে। সেই রুধিরে সমুদ্রের জল রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। তাহা দেখিয়া হনূমান বাঁধের উপর হইতে নামিয়া আসিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহার নিকট রঘুনাথের বেশে এবং অর্জুনের নিকট গদাধর মূর্তিতে দর্শন দেন। অতঃপর উভয় বীর আপন ভুল বুঝিতে পারিয়া স্ব স্ব ইষ্টদেবতার চরণে পতিত হন। রামায়েত এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মিলন এই কাহিনীটির মাধ্যমে সূচিত হইয়াছে মনে হয়। 'সাবিত্রী উপাখ্যান' পালাটি সংক্ষিপ্ত এবং এই পর্বের অন্তর্গত।

উদ্‌যোগ পর্ব :-

'কুন্তীর বাণ ভিক্ষা' এবং 'দাতাকর্ণ পালা' খুব সম্ভব উদ্‌যোগ পর্বের অন্তর্গত বিষয়। 'দাতাকর্ণ' পালাটি মূল 'মহাভারত'-এর কাহিনী নয়। 'কুন্তীর বাণ ভিক্ষা' কাহিনীটিও কর্ণকুন্তী সাক্ষাৎলাভের উপরে ভিত্তি করিয়া রচিত। কৃষ্ণের আদেশে কুন্তীদেবী কর্ণের নিকট নিজ পরিচয় দান করেন, উদ্দেশ্য কর্ণের শিবপ্রদত্ত পঞ্চবাণ ভিক্ষা করিয়া আনা। কিন্তু মাতৃস্নেহের বশে কুন্তীর তখন পুত্র কর্ণের প্রতি মায়া জন্মে। তিনি পুত্রকে অঞ্জলি ভরিয়া দুগ্ধ দান করিয়া তাহা পান করিতে বলেন। এই দুগ্ধ দান সম্পর্কিত অংশ কবিচন্দ্রের সম্পূর্ণ নিজস্ব। কুন্তীদেবী কর্ণকে তাঁহার যে স্তন্য-দুগ্ধ দিয়াছিলেন কৃষ্ণ ভীত হইয়া তাহাতে ঐশ্বরিক মায়ায় কৃমিকীট উৎপন্ন করেন, কেননা উহা পান করিলে কর্ণ অপরাজেয় হইবেন। কর্ণ ঘৃণায় সে দুগ্ধ পান না করিয়া কুন্তীর অলক্ষ্যে তাহা ফেলিয়া দেন। কুন্তী কর্ণকে পাণ্ডব পক্ষে আহ্বান করিলে কর্ণ তাহাতে সম্মত হন নাই। অবশেষে জননীর প্রার্থনায় তিনি নিজের মৃত্যুবাণ কুন্তীদেবীর হস্তে সমর্পণ করেন। কুন্তীর বাণভিক্ষা প্রসঙ্গটি যে 'মহাভারত'-এর আখ্যান তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে কাহিনীটি ঈষৎ পরিবর্তিতাকারে পরিবেশিত হইয়াছে।

'দাতাকর্ণ পালা'র একটি পুথিতে পাওয়া যায় —

বৈশম্পায়ন মুনি উদ্যোগ পর্বে কয়।
মহাভারতের কথা শুন জন্মেঞ্জয় ॥ (সা. ২৪৮১, পু. পৃ. ১)

এই উল্লেখ হইতে মনে হয় মূল মহাভারতের উদ্‌যোগ পর্বের কৃষ্ণ-কর্ণ সাক্ষাতের উপর ভিত্তি করিয়া এই পালাটি রচিত। অবশ্য পালাটিতে 'গোবিন্দমঙ্গল'-এর (ঐ. পু.পৃ. ৫) উল্লেখ আছে এবং পণ্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় 'দাতাকর্ণ পালা'কে 'ভাগবতামৃত শ্রীশ্রী গোবিন্দমঙ্গল'এর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এই কাহিনীটি মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত বিশ্বামিত্র-তনয় শিবিরাজের দানশীলতা পরীক্ষার অনুরূপ। ব্রাহ্মণের আহারের নিমিত্ত শিবিরাজ আপন পুত্রকে হত্যা করিয়া তাহার মাংস রন্ধন করিয়া দেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে

প্রথমে ঐ মাংস ভক্ষণ করিতে বলিলে তিনি বিষণ্ন মনে আহারে প্রবৃত্ত হন। অতঃপর তিনি সম্মুখে আপন পুত্রকে অক্ষত দেহে দণ্ডায়মান দেখিতে পান। কবিচন্দ্র খুব সম্ভব মহাভারতের এই কাহিনীকেই 'দাতাকর্ণ পালা'য় রূপায়িত করিয়াছেন। ইহাতেও দেখা যায় কৃষ্ণ ব্রাহ্মণবেশে কর্ণের দানশীলতার পরীক্ষা করেন। তিনি আহারের নিমিত্ত কর্ণকে তাঁহার পুত্র বৃষকেতুর মাংস করাত দ্বারা কাটিয়া রন্ধন করিয়া দিতে বলিলে, কর্ণ এবং তাঁহার পত্নী পদ্মাবতী ব্রাহ্মণের সে ইচ্ছা পূরণ করেন। তবে পদ্মাবতী পুত্রের মুণ্ড লুকাইয়া রাখিলে ব্রাহ্মণ তাহা জানিতে পারিয়া ঐ মুণ্ড দ্বারা অম্বল রাঁধিয়া দিতে বলেন। অবশেষে কৃষ্ণের কৃপায় উভয়ে আপন পুত্রকে পুনরায় লাভ করেন। কর্ণের কৃষ্ণভক্তি ও দানশীলতায় মুগ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণরূপে কর্ণকে আশীর্বাদ করেন এবং তাঁহাকে 'দাতাকর্ণ' নাম প্রদান করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন।

ভীষ্ম পর্ব সংক্ষিপ্তভাবে রচিত। ইহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনটি যুক্ত হইয়াছে।

দ্রোণপর্বটি খুব সংক্ষিপ্ত এবং মূলানুগ রচনা। তবে 'অভিমুন্যবধ' পালাকারে পাওয়া যায়।

কর্ণ পর্বও সংক্ষিপ্ত এবং মূলানুগ। ইন্দ্র কর্তৃক কর্ণের কবচকুণ্ডল ভিক্ষা গ্রহণের পর হংস-কাক উপাখ্যান যুক্ত হইয়াছে। কর্ণপুত্র বৃষকেতুর সঙ্গে ভীমের এবং কর্ণ ও পাণ্ডবদের যুদ্ধই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত। কর্ণের মৃত্যুতে ধৃতরাষ্ট্র ও কৌরবদিগের ক্ষোভের পর পর্ব সমাপ্ত। যুদ্ধের রণদামামা এই পর্বটির মধ্যে ঝঙ্কৃত হইয়াছে।

শল্যপর্ব যুদ্ধের বিবরণে পূর্ণ। নকুল ও চিত্রসেনের যুদ্ধে চিত্রসেনের পতন ও মৃত্যু, শৈল-যুধিষ্ঠির যুদ্ধ, শৈলের পতন, শকুনির পরাজয় ও মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনা মূলানুগ। ইহা মূলতঃ যুদ্ধের বজ্রনির্ঘোষে পূর্ণ।

গদাপর্ব খুব সংক্ষিপ্ত তবে মূলানুগ বলা চলে না।

কবিচন্দ্রের অন্যান্য পর্ব যেমন বিরাট, ভীষ্ম, সৌপ্তিক, ঐষিক, স্ত্রী, শান্তি, অশ্বমেধ, আশ্রমবাসিক, মৌষল, মহাপ্রস্থান, স্বর্গারোহণপর্ব এবং 'ভারত সাবিত্রী' পালা খুব সংক্ষিপ্ত এবং মূলানুগ।[১৩]

কবিচন্দ্র যে গোপালসিংহের আদেশে এই সংক্ষিপ্ত 'মহাভারত' খানি রচনা করিয়াছেন, সে কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। 'সাবিত্রী উপাখ্যান' পালার একটি পুথিতে গোপাল সিংহের আদেশের পরিবর্তে কেবল রাজার নামটি পাওয়া যায়, তাহাও আবার 'গোপালকৃষ্ণ' রূপে উল্লিখিত হইয়াছে ; যথা :-

"মহারাজা গোপাল কৃষ্ণ কৃষ্ণনামে মত্ত ভৃঙ্গ
মল্লবংশে দেশে গজপতি।

যাঁর দেশে করি ধাম দ্বিজ কবিচন্দ্র নাম
পালা ত্রাণে (?) করিয়া বসতি ।।"[১১]

মল্লরাজা গোপাল সিংহ (১ম) কৃষ্ণভক্ত ছিলেন কিন্তু তিনি কখনও 'গোপাল কৃষ্ণ' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন কিনা জানিনা। শেষ ছত্রটির পাঠও খুব সম্ভব "পান্থা গ্রামে করিয়া বসতি" হইবে। যাহাই হউক, মহাভারতের অন্তর্গত এই সকল পর্ব ও পালা ব্যতীত অতিরিক্ত আরও কয়েকটি পালা পাওয়া যায়, অবশ্য উহারাও খুব সম্ভব কোনও না কোনও পর্বেরই অন্তর্ভুক্ত। এইরূপ কয়েকটি পালা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

১। কুন্তীর শিবপূজা :-

পালাটি খুব সম্ভব বিরাট পর্বের অন্তর্গত, কেননা ঘটনাটি কবিচন্দ্র কুন্তীর বনবাসের পরবর্তী কাহিনীরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। কুন্তীর পূর্ব প্রতিষ্ঠিত একটি শিবমন্দিরে গান্ধারী ও কুন্তীর উভয়ের পূজার অগ্রাধিকার সম্পর্কে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইলে সদাশিব বাধ্য হইয়া তাঁহাদের বিবাদে হস্তক্ষেপ করেন। শিব উভয়ের উদ্দেশ্যে বলেন যে, পরদিন প্রভাতে দশদণ্ডের মধ্যে একশত সুবর্ণ চাঁপা দ্বাবা প্রথমে যিনি প্রার্থনা জানাইবেন, তিনি তাঁহারই পূজা গ্রহণ করিবেন। পরদিন প্রভাতে কুন্তী পুত্র অর্জুনের নিকট শত স্বর্ণচাঁপা আনিয়া দিতে বলিলে অর্জুন শিবমন্দিরে ফুল আছে বলিয়া জানান। অর্জুনের শরে বরুণের উদ্যান হইতে রাশি রাশি সুবর্ণ চাঁপা শিবের মস্তকে বর্ষিত হয়। শিব তাহাতে কুন্তীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলেন। আর গান্ধারী স্বীয় পুত্র দুর্যোধনের আদেশে স্বর্ণকারদের নির্মিত একশত সুবর্ণ চাঁপা লইয়া দশদণ্ডের মধ্যে শিবপূজা করিতে আসিয়া দেখেন কুন্তী রাশি রাশি স্বর্ণ চাঁপা দ্বারা পূর্বেই পূজা সমাপ্ত করিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। মনে হয় ইহা কাশীরাম দাসের মহাভারতের (বিরাট পর্ব) অনুসরণে রচিত।

২। দ্রৌপদীর দর্পচূর্ণ :-

সতীত্বের গর্বে গরবিনী দ্রৌপদী অর্জুনকে সন্দীপন মুনির আশ্রমের আম্রবৃক্ষ হইতে একটি আম আনিয়া দিতে বলেন। অর্জুন তাহাই করিলে, মুনিশাপ যাহাতে কার্যকরী না হয় তাহার ভয়ে পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কৃষ্ণ তাহাতে বলেন, দ্রৌপদী ও পাণ্ডবদের সত্যভাষণের ফলেই আমটি পুনরায় বৃক্ষের ডালে সংযুক্ত হইবে। সকলেই আপন আপন মনোবাসনা শ্রীকৃষ্ণের নিকট জ্ঞাপন করেন, কিন্তু দ্রৌপদীর কথায় ফল মাটিতে পড়িয়া যায়। ইহাতে সকলে দ্রৌপদীকে কঠোর ভর্ৎসনা করিলে তখন তিনি জানান, কর্ণও যদি পাণ্ডবদের একজন হইতেন তাহা হইলে তাঁহার সর্বগুণবান ছয় স্বামী

হইতে পারিত। এই নিদারুণ সত্যভাষণের পর আম বৃক্ষসংলগ্ন হয়। ভীম গদাহাতে দ্রৌপদীকে বধ করিতে গেলে শ্রীকৃষ্ণ জানান কর্ণও পাণ্ডব ভ্রাতাদের অন্যতম, অতএব দ্রৌপদীর সতীত্বে সন্দিগ্ধ হইবার কোনোও কারণ নাই। কবিচন্দ্র এই কাহিনীটি খুব সম্ভব লোকশ্রুতি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। এই পালাটিও কাশীরাম দাসের মহাভারতে (বন পর্ব) পাওয়া যায়।

৩। **উঞ্ছবৃত্তি পালা :-**

শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ বেশে অতিথি-সেবাপরায়ণ উঞ্ছবৃত্তি নামক এক ব্রাহ্মণকে তাঁহার অতিথি সেবাপরায়ণতার পরীক্ষা করিতে যান। ব্রাহ্মণের সেবায় ও মহত্ত্বে রমানাথ প্রকৃতই সন্তুষ্ট হন। সেই সময় ব্রাহ্মণের কুটিরে অবস্থানরত এক অভিশপ্ত নকুলের গাত্রে শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট অন্ন-কণিকার স্পর্শলাভ ঘটে। তাহাতে নকুলের অর্ধাঙ্গ স্বর্ণকান্তি ধারণ করে। নকুল তাহা অবলোকন করিয়া উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের গৃহে নারায়ণের শুভাগমন ঘটিয়াছে বলিয়া জানায়। অতঃপর ব্রাহ্মণ এবং নকুল উভয়ে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ভিক্ষা করিয়া মুক্তি লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ মাহাত্ম্য বর্ণনাই এই পালাটির প্রধান বিষয়। ইহাও কাশীরাম দাসের মহাভারতের অনুসরণে রচিত বলিয়া মনে হয়।

৪। **শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদ :-**

ইহাতে অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন ও বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব এবং নাম মহিমার কথা ঘোষিত হইয়াছে। মূল মহাভারতের ভীষ্মপর্বের গীতা অংশে এই কাহিনী পাওয়া যায়।

কবিচন্দ্র সংক্ষেপে মূল সংস্কৃত 'মহাভারত'কে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিলেও লোকরঞ্জনের উদ্দেশ্যে কয়েকটি নীতি উপদেশমূলক ও লোকপ্রচলিত আখ্যান গ্রহণ করিয়া তাঁহার শেষ জীবনের এই কাব্যখানিকে কিছু নূতনত্ব দান করিয়াছিলেন। কবিচন্দ্রের পূর্ববর্তী কবি সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, নিত্যানন্দ ঘোষ এবং কাশীরাম দাসের কাব্য যেমন বৃহৎ তেমনি নীতি আখ্যানে পূর্ণ। কবিচন্দ্রও আখ্যান সংযোজনে পূর্বসূরীদিগের পথের অনুবর্তন করিয়াছেন। আবার মূল মহাভারতের বহু উল্লেখযোগ্য উপকাহিনী তিনি বর্জন করিয়াছেন। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার আখ্যান, কচ-দেবযানী-যযাতি-শর্মিষ্ঠা আখ্যান, কার্তিক জন্মোপাখ্যান এবং রামোপাখ্যান প্রভৃতি মূল মহাভারতের বহু জনপ্রিয় কাহিনী তিনি তাঁহার কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। খুব সম্ভব মূল কুরু পাণ্ডব কাহিনীর প্রতিই কবিচন্দ্রের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। এইহেতু কাহিনী নির্বাচনে তিনি নিজের অভিমতকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। ইহার কারণ হিসাবে বলা যায় যে, এই কাব্যটিকেও কবিচন্দ্র মূলতঃ লোকশিক্ষার জন্যই রচনা

করিয়াছিলেন। তৎকালীন যুগে এইসকল কাব্য জনসাধারণের মধ্যে পঠিত গীত হইত। কাজেই সেখানে কোমল হৃদয়বৃত্তি বা প্রণয় মহিমা সমধিক আদৃত ছিল না। খুব সম্ভব এই কারণেই প্রণয়মূলক প্রসঙ্গ তিনি পরিহার করিয়াছিলেন। তিনি যে কাহিনী নির্বাচনে চিরাচরিত প্রথাকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত তাঁহার 'রামায়ণ'। উহাতে উত্তরাকাণ্ড যুক্ত না হওয়ায় এই দুই অনুবাদ কাব্যের মধ্যে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কবিচন্দ্র বৈষ্ণবভক্ত কবি, এইহেতু শ্রীরামচন্দ্রের দেবত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যকেই তিনি জীবনের গোধূলি বেলায় যথাসম্ভব কাব্যে উদ্‌ঘোষিত করিয়াছেন। উহারই প্রয়োজনে ছোট ছোট নীতিকথামূলক কাহিনী কাব্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। কবিচন্দ্র ব্যাসের আদেশে কাব্য রচনা করিলেও সূক্ষ্মভাবে ঈশ্বর মহিমাই ব্যক্ত করিয়াছেন, আর যাহা এইভাবের পরিপন্থী তাহা কাব্যে প্রবেশাধিকার পায় নাই।

এই বৃহৎ পাঁচখানি কাব্য ব্যতীত আরও বহু পালা কবিচন্দ্রের নামে পাওয়া যায়। তবে ঐ পালা সমূহ উক্ত পাঁচটি বৃহৎ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, না স্বতন্ত্র বিষয় সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আবার ঐ সকল পালা কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর কি না সে বিষয়ে সন্দেহ জাগাও স্বাভাবিক। কাজেই পূর্ববর্তী সমালোচকদের মন্তব্যও যথা সম্ভব উল্লেখ করিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল; যথা :-

৬। মশার কবিতা :-

এই পালার দুইখানি পুথি (ক.বি. ৪৯৩০, ১-৩ পত্র, স, ১২২৩ সাল এবং ক.বি. ৪৯৩১, ১-২ পত্র, স. লিপিকাল নাই) পাওয়া যায়। দুইটিই সম্পূর্ণ পুথি। এই রচনাটি সরল ব্যঙ্গাত্মক রচনার অন্তর্ভুক্ত। ইহার বাচনভঙ্গী অনেকটা ঈশ্বর গুপ্তের মত। তবে উহা যে ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বের রচনা এবং কবিচন্দ্র শঙ্করের রচনা সে সম্পর্কে সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি যে পুথির উপর মন্তব্য করিয়াছেন তাহা আমাদের দৃষ্ট পুথির পূর্বে অনুলিখিত। তাঁহার মতে, "মশার কবিতাটি ঈশ্বর গুপ্তের ধরনে লেখা সরস ব্যঙ্গ কবিতা। ইহার অনুলিখন কাল ১১০২ ও ১২০৫ এই দুই সনের দ্বারাই নির্দিষ্ট হইয়াছে। বোধহয় লিপিকার বর্তমান পুঁথি ১২০৫ সালে নকল করিবার আদর্শ পুঁথির তারিখ যে ১১০২ ইহাই নির্দেশ করিয়াছেন। পরবর্তী তারিখ লইলেও ইহা ঈশ্বর গুপ্তের বহু পূর্বের কবিতা। 'অঙ্গদের রায়বার' ও 'কুম্ভকর্ণের রায়বার'-এ কবিচন্দ্র শংকর যেরূপ ব্যঙ্গ রচনা নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তীক্ষ্ম উত্তর প্রত্যুত্তর গ্রন্থনে যেরূপ সিদ্ধ হস্ততার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে 'মশার কবিতা' তাঁহার বলিয়া স্বীকার করিতে বাধা নাই"।[১১]

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অভিমত দ্বারা পালাটি কবিচন্দ্রের বলিয়া সিদ্ধান্তে আসা যায়। রামেশ্বরের 'শিবায়ন' কাব্যে মশার প্রসঙ্গ আছে। কবিচন্দ্র তাঁহার শিবমঙ্গলের মধ্যে এই পালাটি যুক্ত করিয়াছিলেন কি না তাহা বোঝা যায় না। তাহা না হইলেও রচনাটির নিপুণ বাস্তব অভিজ্ঞতা কম আকর্ষণীয় নয়। তৎকালে পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা মশক দংশনে নানাভাবে পীড়িত হইতেন। সেই অভিজ্ঞতা হইতেই কবি স্বতোৎসারিতভাবে এই পালাটি রচনা করিয়াছেন। মশার কামড়ে যে ভয়ানক করাল ব্যাধি ধীরে ধীরে গ্রাস করিতে থাকে কবিচন্দ্র তাহারও আভাস দিয়াছেন। ম্যালেরিয়া নামক ব্যাধিটির নামোল্লেখ না থাকিলেও মশক দংশনজনিত রোগ হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় খুব সম্ভব গ্রাম বাংলার মানুষের তখনও অজানা ছিল। তাই কবিচন্দ্র অবশেষে লিখিয়াছেন :-

মশা হইল যমদূত জিনিতে না পারে পুত
নিদানে বিধানে গঙ্গাস্নান ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় ডানী মোলে মশা হয়
শাস্ত্রে শুন্যাছি বহু ঠাঞি।
ডাইনের মন্ত্র কত ঔষধ আছে শত শত
মশার উপায় কিছু নাই ॥ (ক.বি. ৪৯৩১, পু.পৃ. ২)

৭। **জীবিতবাহন রাজার উপাখ্যান :-**

কবিচন্দ্র শঙ্করের এই পালাটির মাত্র একখানি পুথি পাওয়া যায়। (ক.বি. ৮৯০, ১-১৮ পত্র, সম্পূর্ণ, দৈ. ৩৪ X প্র. ১১ সে.মি. পং ১০/১২, লিপিকাল হীন)। পুথিটিতে দুইবার দ্বিজ কবিচন্দ্র এবং অধিকাংশ 'শ্রীকবিশঙ্কর' ভণিতা আছে, তাহাতে মনে হয় পালাটি কবির প্রথম জীবনের রচনা। একটি মাত্র ভণিতা শ্রী কবিকঙ্কণের, ইহা খুব সম্ভব লিপিপ্রমাদ। কবিচন্দ্র প্রতিটি ভণিতাতেই শিবের পদে প্রণতি নিবেদন করিয়াছেন। আবার জীবিতবাহন রাজাও শিবভক্ত রূপে পরিচিত। এই পালাটির সঙ্গে কবিচন্দ্রের 'শিবমঙ্গল' কাব্যের যোগ ছিল কি না বলা যায় না। তবে এই পালাটি সম্পর্কে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, "এই জীবিতবাহন জীমূতবাহনের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়।"[১৩] কবিচন্দ্রের কাব্যে পাওয়া যায় জীবিতবাহন রাজার এক অলৌকিক কাহিনী কিন্তু অন্যান্য কবিদের পালায় পাই জীমূতবাহনের ব্রতকথা। এই প্রসঙ্গে মধুসূদনের 'জীতাষ্টমী ব্রতকথা' (ক.বি. ৩৫৫০), এবং দ্বিজ শম্ভুরাম ও পণ্ডিত প্রভুরামের 'জীমূত মঙ্গল জাগরণ পালা' (ক.বি. ৬১০৪) নামক পুথি দুইটি উল্লেখযোগ্য।

শ্রীহর্ষের 'নাগানন্দ' নাটক, সোমদেবের 'কথাসরিৎ সাগর', ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎ কথা মঞ্জরী' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থেও জীমূতবাহন রাজার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে 'ধর্মমঙ্গলে' জীমূত রাজার কাহিনী যুক্ত হইতে দেখা যায়। কিন্তু এইসকল জীমূতবাহন রাজার কাহিনীর সঙ্গে কবিচন্দ্রের জীমূতবাহন বা 'জীবিতবাহন উপাখ্যান'-এর কোনও মিল নাই। 'মহাভারত'-এর বনপর্বে শিবিরাজার আত্মোৎসর্গের মত কবিচন্দ্র এই পালাটি রচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কাহিনী এইরূপ :-

বৈকুণ্ঠে সকল দেবতা একবার আপন আপন ভক্তদের গুণকাহিনী বর্ণনা করিতে থাকেন তন্মধ্যে শিব জানান তাঁহার অন্যান্য ভক্তদের মধ্যে একমাত্র জীবিতবাহনই সর্বাপেক্ষা বড় দাতা।

ধর্ম, এই কথা শ্রবণ করিয়া শিবভক্ত জীবিতবাহন কেমন দাতা তাহা পরীক্ষা করিতে একরূপ ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি ইন্দ্রকে নির্দেশ দেন ঘুঘু পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া জীবিতবাহনের কোলে আশ্রয় লইতে। আর ধর্মঠাকুর নিজে সয়চান বা শয়তানের (শ্যেনপক্ষীর) বেশ ধারণ করেন। রাজা নিশ্চয়ই আশ্রিতকে রক্ষা করিবেন আর সেই সুযোগে সয়চান বেশে ধর্মঠাকুর রাজার মাংস ভিক্ষা করিবেন। তাহাতেই রাজার দানশীলতার পরীক্ষা হইবে। জীবিতবাহন সাধারণ রাজা নহেন। তিনি অযোধ্যার নৃপতি, যাঁহার রাজসভায় নিত্য ষড়দর্শন, পুরাণ, আগম নিগম, বেদ, সাহিত্য এবং জ্যোতিষ ইত্যাদির ব্যাখ্যা ও পাঠ হয়। পাপ পুণ্য বোধ সম্পর্কেও রাজা যথেষ্ট সজাগ। তিনি কোনও এক পুণ্যাত্মা দানশীল রাজার কাহিনী শ্রবণ করিতেছিলেন। সেই রাজা বহু দান করিলেও এক হরিণকে আশ্রয় দান না করার অপরাধে হরিণের গায়ে যত লোম ছিল ততকাল তাঁহার নরক লাভ ঘটে। আবার দুইজন জাতিস্মর ব্যক্তি গঙ্গাস্নানে যাত্রা করিতেছিলেন, পথে এক ভুজঙ্গ তাঁহাদের গ্রাস করিলে গঙ্গানাম স্মরণ করায় তাঁহাদের স্বর্গলাভ হয়। রাজা যখন এইসব কাহিনী শ্রবণ করিতেছিলেন তখন ঘুঘুপক্ষী রাজার কোলে আশ্রয় ভিক্ষা করেন। জীবিতবাহন ধর্মশীল, কাজেই তিনি আপন বস্ত্রাঞ্চলে ঘুঘুকে আশ্রয় দান করেন। সয়চান সমস্ত লক্ষ্য করিয়া ঠিক সেই মুহূর্তে তাহার ভক্ষ্যদ্রব্য ঘুঘুকে রাজার নিকট প্রার্থনা করিয়া বসেন। রাজা আশ্রিতকে দিতে অস্বীকার করিলে ধূর্ত সয়চান রাজার পণ্ডিতদের দ্বারা কয়েকটি প্রহেলিকার কূটজাল নির্ণয় করিতে বলেন। কবিচন্দ্রের অন্য কোনও রচনায় এইরূপ প্রহেলিকার সন্ধান পাওয়া যায় না। এই হেঁয়ালিগুলি পল্লী অঞ্চলে বরযাত্রীদের ঠকাইবার জন্য খুব প্রচলিত ছিল। সেইজন্য এই কূট প্রশ্নগুলির নাম ছিল কালিদাসের হেঁয়ালি। মধ্যযুগের জনমানসে বহু প্রচলিত এই সকল সমস্যাপূরণ কবিচন্দ্রের মনকেও নাড়া দিয়াছিল।

একে একে রাজা সকল প্রহেলিকার সমাধান করিলে সয়চান রাজার জ্ঞানের প্রশংসা করেন। কিন্তু তাহার আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ায় পুনরায় ঘুঘুকে প্রার্থনা করেন। রাজা আশ্রিত ঘুঘুর পরিবর্তে অপর যে কোনও বস্তু দান করিতে আগ্রহী হন। অবশেষে রাজার বহু নিবেদনের পর সয়চান আপন অভিসন্ধি ব্যক্ত করেন :—-

যদি রাজার স্ত্রী-পুত্র হাসিমুখে ঘুঘুর সমান ওজনের মাংস রাজার দেহ হইতে কাটিয়া দিতে স্বীকৃত হয় তবেই সয়চান ঘুঘুর মাংসের লোভ ত্যাগ করিতে পারে। এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া রাজা স্বস্তি লাভ করিলেও রাণীরা কেহই আনন্দিত মনে রাজার দেহের মাংস কাটিয়া দিতে প্রস্তুত হন নাই। অবশেষে সোমদত্তের কন্যা দুর্ভগা নামক রাজার এক রাণী স্বামীকে ধর্মকার্যে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাবে সম্মত হন। স্ত্রীর সাহায্যে রাজার ধর্ম রক্ষা হইবে এই আশায় সন্তুষ্ট মহারাজ কুল পুরোহিত আসাই পণ্ডিতকে ডাকিয়া ষোড়শ উপচারে শিবপূজা করিতে বলেন। রাজা নানাভাবে ভূতনাথের স্তুতি আরম্ভ করিলে তিনি ভক্তের বিপদে অতিশয় উতলা হইয়া আকাশ হইতে সমস্ত অবলোকন করিতে থাকেন। আসাই পণ্ডিতও বলেন —"না দিয় সয়চানে ঘুঘু কহিলাঙ তোমায়।" নারদ এই সময়ে শিবকে স্থিরভাবে থাকিতে বলেন। সয়চান রাজার মাংস কাটিবার জন্য তাগাদা দিতে আরম্ভ করিলে পুত্র সঙ্গে রাজরাণী রাজার দেহ হইতে করাত দ্বারা দক্ষিণ উরুর মাংস কাটিয়া তারপর একে একে ঘুঘুর সমান ওজনের মাংস কাটিতে থাকেন। রাজার শ্বাস মাত্র বাকী ছিল। দেবতার মায়ায় ঘুঘুর দেহের ওজন বৃদ্ধি পাইতে শুরু করে। রাণী ও পুত্র দুঃখ করিতে থাকেন, কেননা রাজার দেহের মাংস কাটিয়াও তাঁহারা কিছুতেই ঘুঘুর সমান ওজনের মাংস করিতে পারেন নাই। পুত্র কিরূপে পিতার মাথা কাটিবেন ? তাই তিনি দুঃখে নিজের তনু কাটিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। দেবতার মায়ায় ঘুঘুর শরীরের ওজন বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া অযোধ্যাবাসী সকলেই রোদন করিতে আরম্ভ করেন। যাহাই হউক, রাণী ও পুত্র রাজার মাথা কাটিবার জন্য কণ্ঠে করাত বসাইয়া ভূতনাথকে ডাকিতে আরম্ভ করিলে ধর্ম কৃপা করেন।

মহেশ ভাবিয়া দুঁহে মাথে টান দিতে।
কৃপার ঠাকুর ধর্ম ধরিলেন হাথে ॥ (পু.পৃ. ১৭)

রাজা মূর্ছিত হইয়া পড়িলে নিরঞ্জন ঠাকুর রাজাকে কোলে তুলিয়া লন। রাজা দেবতাদের কৃপায় পূর্বদেহ ফিরিয়া পাইলে শচীপতি ও ধর্ম ঠাকুর রাজাব প্রশংসা করিতে থাকেন। শিব এতক্ষণ ভক্তের সঙ্কটে সমস্ত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। অবশেষে যথাসময়ে ভক্তকে তিনি আপনার স্থানে লইয়া যাইবেন বলিয়া আশ্বাস দিলে তিন দেবতাই অন্তর্হিত হইয়া যান।

৮। শিবিরাজার উপাখ্যান :-

এই পালাটি 'জীবিতবাহন রাজার উপাখ্যান'-এর অনুরূপ কাহিনী হইলেও খুব সংক্ষিপ্তভাবে ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে (ক.বি. ৮৯৬, ২-৭ পত্র, খণ্ডিত, ১২৪৭ সাল। দৈ. ৩৪ X প্র. ১২ সে.মি. পং ৯)।

এখানেও শিবিরাজা শিবভক্ত, তবে তিনি কৃষ্ণ নামও জপ করেন। ইহাতেও ইন্দ্র এবং ধর্মের পরীক্ষার কথা আছে।

এই পালাটি 'জীবিতবাহন রাজার উপাখ্যান'-এর মত জটিল নয়। ইহাতেও সয়চান প্রথমে শিবি রাজার নিকট আশ্রিত ঘুঘু পক্ষীর মাংস খাইবার বাসনা ব্যক্ত করেন। রাজা বহু ধন রত্ন দিতে চাহিলে সয়চান তাহা লইতে অস্বীকার করেন। অবশেষে ঘুঘুর পরিবর্তে রাজার মাংস ভিক্ষা করেন। রাজা রাণীদের নিকট মাংস কাটিয়া রাজাকে ধর্ম পথে ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে বলেন। এক ধর্মশীলা রাণী রাজার কথানুসারে করাত ধরিয়া মাংস কাটিয়া দিতে আগ্রহী হইলে রাজা, রাণীর ধর্মশীলতায় মুগ্ধ হন।
করাত ধরিয়া রাণী ও পুত্র রাজার মাংস কাটিতে থাকেন, তথাপি ঘুঘু পক্ষীর সমান ওজনের মাংস না হওয়ায় অবশেষে —

গোবিন্দে ডাকিয়া দোঁহে করাত দিল মাথে।
হেনকালে কৃষ্ণ ধরে দুজনার হাথে ।। (পু.পৃ. ৬)

এইস্থলে শিবের পরিবর্তে কৃষ্ণকে স্মরণ করিতে দেখা যায়। রাজা কৃষ্ণের পদতলে লোটাইয়া পড়েন। অবশেষে শিব সন্ন্যাসীর বেশে আসিয়া রাজাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। 'জীবিতবাহন রাজার উপাখ্যান'ই খুব সম্ভব পরবর্তীকালে 'শিবি রাজার উপাখ্যান' পালায় পরিণত হইয়াছে। এই পুথিটিতে সর্বত্র 'শিব রাজা' লিখিত হইয়াছে, মনে হয় উহা লিপি প্রমাদ।

৯। কপিলা মঙ্গল :-

'কপিলামঙ্গল'-এর প্রচুর পুথি পাওয়া যায়। আমাদের নির্বাচিত পুথিটির বিবরণ প্রদত্ত হইল — ক.বি. ৮৭০, ১-৮ পত্র, সম্পূর্ণ, ১০৮২ সন, দৈ. ৩৪ X প্র. ১২ সে.মি., পং ১০। ইহা একটি ব্রতকথা জাতীয় পালা। 'মঙ্গল' কাব্যের বৈশিষ্ট্য ইহাতে রক্ষিত হয় নাই। পালাটির প্রারম্ভের অংশ বিশেষ হইতেই এইরূপ ধারণা জন্মে।

দেবতারা কপিলাকে মর্ত্যে যাইতে বলিলে সে কান্দিতে থাকে। কপিলার কাতর ক্রন্দনে শিব বিচলিত হন। তিনি কপিলাকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন, মানুষের নির্যাতনের ভয়ে যদি সে মর্ত্যে না যায়, তবে দেবগণের পূজা এবং যজ্ঞ ঘৃত বিনা সম্ভব হইবে না।

তাহার মলমূত্রে অবনী পবিত্র হইবে এবং যে জন মনেও অন্ততঃ ভক্তি করিবে তাহার সমৃদ্ধিলাভ ঘটিবে।

এইভাবে কাহিনীর সূচনা হইতে শেষ পর্যন্ত গো-মাহাত্ম্য কথা প্রচারিত। ইহার কাহিনী 'ভাগবত' অথবা মঙ্গলকাব্যের অনুসারী নহে। ইহাতে যে দেবতার উল্লেখ আছে তিনি শিব। গো-পূজা-উৎসব মানভূম ও পুরুলিয়া অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে। কবিচন্দ্র খুব সম্ভব এইরূপ কোনও ব্রত অনুষ্ঠান দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। স্বর্গের কামধেনুর কথা ভাগবতে পাওয়া যায়। সেই কামধেনুকেই দেবতাদের প্রয়োজনে মর্ত্যে আসিতে হইল। সুপ্রাচীনকাল হইতেই হিন্দুসমাজে গরুকে গো-মাতা রূপে সম্মান করার বিধি প্রচলিত আছে। তাহারই প্রকাশ এই পালাটিতে বর্তমান। 'মনসামঙ্গল'-এর কোনও কোনও রচনায় কপিলার কাহিনী পাওয়া যায়। কবিচন্দ্রের কাহিনীতে কপিলার মাহাত্ম্য বর্ণনার উদ্দেশ্যে একটি আখ্যান যুক্ত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় মথুরা নগরে হরিহর গোপ এবং তাহার স্ত্রী লীলাবতী গোয়ালিনীর গৃহে বৈশাখ মাসের বৃহস্পতিবারের শুভ তিথিতে কপিলা প্রবেশ করে। উভয়ের সেবায় কপিলার দিন স্বচ্ছন্দে কাটিতে থাকে। তথায় একে একে কপিলার ছয় কন্যা ও এক পুত্র (নাম মনোরথ) জন্মগ্রহণ করে। পুত্র মনোরথ যখন মাত্র তিনদিনের হইয়াছে, সেই সময় কপিলা ছয় কন্যা সহ একদিন গহন কাননে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে চরিতে যায়। ঘাস খাইতে প্রায় তিন প্রহর বেলা শেষ হয়। অবশেষে কপিলা সম্মুখে দেখে এক ভয়ঙ্কর মূর্তির বাঘ দণ্ডায়মান। কপিলা কিছুক্ষণের জন্য বিচলিত হইয়া পড়ে। কপিলার ছয় কন্যা কপিলাকে ফেলিয়া পলায়ন করে। কপিলা তখন বাঘকে নানা উপদেশ দিয়া অহিংসা ধর্ম পালন করিতে বলে।

কপিলার দীর্ঘ বক্তৃতায় বাঘ আশ্চর্যান্বিত হয়। অবশেষে তিনদিনের শিশু পুত্রকে একবার দেখিয়া পুনরায় পরের দিন সে বাঘের নিকট ফিরিয়া আসিবে বলিয়া সেদিনের মত নিষ্কৃতি লাভ করে। পূর্বে প্রতিশ্রুতি মত কপিলা পরের দিন বাঘের নিকট যাইতে উদ্যত হইলে পুত্র মনোরথও জননীর অনুগমন করে। বাঘ উভয়কে একসঙ্গে দেখিয়া ইহাও একপ্রকার কৌশল বলিয়া বুঝিতে পারে। বাঘ ও কপিলার বহু বাক্-বিতণ্ডার পর বাঘ সহসা কপিলাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে, মনোরথ তৎক্ষণাৎ বাঘেব উপর লাফাইয়া পড়িয়া মাতাকে রক্ষা করে। এমন সময় দৈববাণী শুনিয়া বাঘ আপন ভুল বুঝিতে পারে।

পালাটি সরস কৌতুকপূর্ণ সন্দেহ নাই। কবিচন্দ্রের 'কপিলামঙ্গল'-এর অপর একটি পুথির (ক.বি. ৮৭২) শেষে পাওয়া যায়, — "বাঘ মনোরথ পালা কবিচন্দ্র ভণে"। তাহাতে দেখা যায় নারদই বাঘের মূর্তি ধরিয়া কপিলাকে ছলনা করেন। পুথিটি ১১৭২ সালে লিপিকৃত।

১০। কাপাসের পালা :-

দ্বিজ কবিচন্দ্র বিরচিত 'কাপাসের পালা' পুথিটি অতি সংক্ষিপ্ত রচনা (সা. ৪২৫, ১-২ পত্র, সম্পূর্ণ, ১২৬৭ সাল, দৈ. ২২ X প্র. ৪ সে.মি., পং ৯, সুন্দর হস্তলিপি)। পালাটিতে বাংলার কার্পাস উৎপাদনে গৃহী, চাষী, দোকানদার প্রভৃতি সমাজের সকলস্তরের মানুষের মনের আনন্দ প্রকাশিত হইয়াছে। যেসকল সাধারণ বিষয়ের প্রতি প্রাকৃতজনের দৃষ্টি সহসা আকৃষ্ট হয় না, কবিমন সেই সকল প্রতিদিনের তুচ্ছ, অবহেলিত বিষয়গুলির চিত্রই আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। রচনাটির শিল্প কুশলতা 'মশার কবিতার' মত উৎকৃষ্ট না হইলেও প্রশংসনীয়। কার্পাস দ্বারা বস্ত্র উৎপাদনে জনসাধারণের মনের আনন্দোল্লাসই কবিতাটির মূল বিষয়।

কবিতাটির প্রথমাংশে বাজারে কার্পাস কেনাবেচার কথাও প্রকাশিত। অবশেষে দানের মাহাত্ম্য ব্যক্ত হইয়াছে। কৃষ্ণও তাঁহার গুরুর জন্য কার্পাস ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছেন। ভোজ্য বস্তুর মত নূতন বস্ত্রও মানুষের নিকট পরম প্রীতিকর। ইহা কোনও উৎসব উপলক্ষে রচিত হইয়াছিল কি না তাহা সঠিক বলা যায় না।

১১। বারমাসী ছড়া :-

একটি চারিভাঁজ করা বৃহৎ পত্রে লোচন দাস ও কবিচন্দ্রের ভণিতায় দুইটি ছড়া পাওয়া যায়। চারিভাঁজ করা এই পত্রটির (বি.ভা. ৬০৯, দৈ. ৩০ X প্র. ১১ সে.মি.) প্রথমে দুই পংক্তি সংস্কৃত শ্লোক, পরের পৃষ্ঠায় কবিচন্দ্রের ছড়াটি পাওয়া যায়। ছড়াটি সুন্দর এক ভোজ্য তালিকার দৃষ্টান্ত ; যথা :-

চৈত্র মাসে বেল মিঠা খেঞাছিলেন রাম।
বৈশাখেতে শসা মিঠা সৌল মাছে আম ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে আম্র মিঠা আষাঢ়ে কাঁঠাল।
শ্রাবণ মাসে খৈ দৈ ভাদ্রে পাকা তাল ॥
আশ্বিনেতে কাগিজ মিঠা কার্তিকেতে তেঁতুল।
অঘ্রান মাসে অন্ন মিঠা চিঙড়া মাছের ঝোল ॥
পৌষ মাসে ঘৃত ঘোল আর পূর পিঠা।
আর গরম খেঁচড়ি ভাল খাইতে লাগে মিঠা ॥
মাঘ মাসে খাত্যে ভাল কটু তৈলে শিম।
ফাল্গুনে দ্বিগুণ মিঠা বার্তাকুতে নিম ॥
মাসেতে লিখিত দ্রব্য করিবে ভক্ষন।
কবিচন্দ্র কহে তবে পাবে আস্বাদন ॥

'শিবমঙ্গল' কাব্যে কবিচন্দ্র যে ভোজন রসিক চিত্তের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার সঙ্গে ইহার বেশ মিল আছে। পাঁচ পংক্তির সুন্দর হস্তলিপি বিশিষ্ট এই একটি মাত্র বারবাসী ছড়া কবিচন্দ্রের রচিত বলিয়াই মনে হয়। ইহার পরের ভাঁজ করা অংশে লোচনের ছড়া। উহা হাল্কা কালা কালিতে লিখিত। ইহার পরের অংশে আবার তিনটি ছত্রে কবিচন্দ্রের নামের উল্লেখ দেখা যায়।

১২। কলিকালের ছড়া :-

এই ছড়াটিও কবিচন্দ্রের ভণিতায় (বি.ভা. ৪৬২, ১টি পত্র, দৈ. ৩২× প্র. ৬ সে.মি. দুইভাঁজ করা তুলট কাগজ, পং ৪) পাওয়া যায়। ছড়াটিতে কাহারও কপট ভক্তির প্রতি যেন কটাক্ষপাত করা হইয়াছে।

কবিচন্দ্র নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবভক্ত-ব্রাহ্মণ। কাজেই ভক্তির নামে কোনও প্রকার ছলনার আশ্রয় তাঁহার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নহে। যদি দ্বিজ কবিচন্দ্র প্রকৃতই এই ছড়াটির রচয়িতা হন, তাহা হইলে বলিতে হয় লোক দেখান মিথ্যা-ভক্তিকে তিনি অন্তরে যথার্থই ঘৃণা করিয়াছেন।

১৩। বিভিন্ন বন্দনা :-

(ক) মদনমোহন বন্দনা :- কবিচন্দ্রের ভণিতায় কয়েকটি বন্দনা পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে 'মদনমোহন বন্দনা'টি উল্লেখযোগ্য। কবিচন্দ্রের এই বন্দনাটি স্বতন্ত্র কোনও রচনা বলিয়া মনে হয়না। পন্ডিত মাখন লাল মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কবিচন্দ্রের "ভাগবতামৃত শ্রীশ্রী গোবিন্দমঙ্গল" (১৩৪১ সাল) গ্রন্থে 'সর্বদেবদেবী বন্দনা'র (পৃ. ৩) মধ্যে মদনমোহন বন্দনাটিও পাওয়া যায়। একটি মাত্র পুথিতে ইহা 'মদনমোহন বন্দনা' (বি.ভা. ১১৪৮, ১ পত্র) নামে স্বতন্ত্রভাবে লিখিত হইলেও আমাদের জ্ঞাত অন্যান্য পুথিতে ইহা কবিচন্দ্রের ভাগবতের অন্তর্গত বিষয়ের সঙ্গে যুক্তভাবে পাওয়া যায়। মল্লরাজা বীর সিংহ বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী রণিয়াড়া গ্রামে এক মদনমোহনের মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন (১৬৭২ খ্রীঃ)। কিন্তু কবিচন্দ্রের পুথিতে সুস্পষ্টরূপে বিষ্ণুপুরে অবস্থিত মল্লবংশের ইষ্টদেবতা মদনমোহনের কথা বলা হইয়াছে, যাঁহার মন্দির মল্লরাজা দুর্জন সিংহ কর্তৃক ১০০০ মল্লাব্দে (১৬৯৪ খ্রীঃ) নির্মিত হইয়াছিল। বিস্তারিত আলোচনার জন্যই কবিচন্দ্রের এই 'মদনমোহন বন্দনা'টিকে এখানে স্বতন্ত্ররূপে উল্লেখ করা হইল। একটি 'প্রহ্লাদ চরিত্র পালায়' (বি.ভা. ৫৭৬৩, ৩-৪ পত্র, খণ্ডিত) একই পত্রের প্রথমে মদনমোহনের ও অভিরাম গোস্বামীর প্রসঙ্গ (পৃ. ৪ক) এবং তৎপরে প্রহ্লাদ ও হিরণ্যকশিপুর কাহিনী লিখিত আছে। আবার উক্ত পত্রের শেষে ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের উল্লেখ এইরূপ :-

ভাগবতামৃত দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় ।
সপ্তম স্কন্ধের কথা সুধারসময় ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৪)

অনুরূপভাবে আর একটি 'মদনমোহন বন্দনা' কবিচন্দ্রের 'প্রহ্লাদ চরিত্র পালায়' (বি.সা. ৪৩৫, ১-২, ৬-৮, ১০ পত্র, খণ্ডিত) একত্রে পাওয়া যায় । মদনমোহনের প্রসঙ্গ যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহা এইরূপ :-

পূর্বেতে আছিলা প্রভু ব্রাহ্মণের ঘরে ।
মল্লবংশে কৃপা করি আইলা বিষ্ণুপুরে ॥
নবরত্ন দিল রাজা দিব্য অট্টালিকা ।
গোবিন্দ বামেতে শোভে শ্রীমতি রাধিকা ॥
সম্মুখে বলাঞা দিল কীর্ত্তনের মেলা ।
জীবন মচ্ছব সদা বৈষ্ণবের খেলা ।
চূড়াতে ময়ূরপুচ্ছ উড়ে মন্দবায় ।
মনোহর মূর্তি দেখি সভে মরি যায় ।
বিষ্ণুপুরে মদনমোহন থাকিব যাবৎ ।
মল্লবংশে কদাচিৎ না হবে আপদ ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১)

ইহাতে 'দিব্য অট্টালিকা' এবং 'বিষ্ণুপুর' কথার উল্লেখ থাকায় উহা যে দুর্জন সিংহের নির্মিত মদনমোহন মন্দিরের মদনমোহনকে বলা হইযাছে এবং তিনি যে রণিয়াড়া গ্রামের মদনমোহন নহেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় । আবার এই দ্বিতীয় পুথিটিতেও ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের উল্লেখ আছে ; যথা :-

ভাগবতামৃত দ্বিজ কবিচন্দ্র গান ।
সপ্তম স্কন্ধের কথা সুধার সমান ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ২)

তৃতীয় আর একটি পুথিতেও মদনমোহনের বন্দনা কবিচন্দ্রের 'কপিলা মঙ্গল পালা'র (ব.রি.মি. ৪৭৪/৪৭ নং) দ্বিতীয় পত্রে পাওয়া যায় । এই তিনটি দৃষ্টান্ত হইতে আমাদের মনে হয়, কবিচন্দ্র 'মদনমোহনের বন্দনা' তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কাব্য 'ভাগবত'-এর অন্তর্গত কবিয়াই রচনা করিয়াছিলেন । আর উহা বিষ্ণুপুরে মদনমোহনের মন্দির নির্মাণের পরে রচিত হইয়াছিল ।

অনেকে অনুমান করেন, মল্লরাজা রঘুনাথ সিংহের (২য়) রাজত্বকালে মদনমোহনের রথ নির্মিত হয, এই রথ উপলক্ষে কবিচন্দ্রেব 'মদনমোহন বন্দনা' রচিত হইয়া থাকিবে । এই সম্পর্কে একটু আলোচনা প্রযোজন । কবিচন্দ্রের পরবর্তীকালের কবি জয়কৃষ্ণ দাস তাঁহার 'মদনমোহন বন্দনায়' মল্লরাজা 'বুড়া রঘুনাথ সিংহে'র সময়ে রথ-টান ও রথেব মূর্তি দর্শন উপলক্ষে লোকাবর্ণের চাপে এক বৃদ্ধা নারীর পা ভাঙ্গিয়া

যাওয়ায় রথেব গতি বন্ধ হইয়া যায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা সমস্ত ঘটনা জানিতে পাবিয়া ঐ বৃদ্ধা নারীকে চতুর্দোলে তুলিয়া মদনমোহনের মূর্তি দর্শন করাইলে তবেই মদনমোহনের কৃপায় রথের চাকা পুনরায় সঞ্চালিত হয় (এ.জি. ৪৯৮৮, ১-১২ পত্র, ১২২৬ সালে লিপিকৃত)।

জয়কৃষ্ণ দাস মদনমোহনের রথের প্রসঙ্গ স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কবিচন্দ্রের কোনও পুথিতে মদনমোহনের বন্দনা প্রসঙ্গে রথের কথা উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। রথের পরিবর্তে কবিচন্দ্রের রচনায় বীর সিংহ মহারাজা মদনমোহনের চতুর্দিকে ইটের প্রাচীর নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ আছে (ব.রি.মি. ৪৭৪/৪৭ নং, পু.পৃ. ২)। আবার একটি পুথিতে পাওয়া যায় রাজা রঘুনাথ সিংহের উল্লেখ ; (বি.ভা. ১১৪৮, পু.পৃ. ১)।

যাহাই হউক, কবিচন্দ্র 'মদনমোহনের বন্দনা' স্বতন্ত্রভাবে মদনমোহনের রথ নির্মাণ উপলক্ষে রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা কোনও প্রমাণ পাই নাই। এইহেতু আমাদের পক্ষে ইহা বলা সম্ভব নহে যে উক্ত বন্দনাটি কোনও অনুষ্ঠান উপলক্ষে রচিত।

ডঃ সুকুমার সেন লিখিয়াছেন, — "স্থানীয় দেবদেবীর বন্দনা ও মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কবিতা পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর লেখা হইয়াছিল। এই ধরনের যেসব ছোট ছোট কবিতা পাওয়া গিয়াছে তাহার সবগুলি স্বাধীন রচনা নয়। সেগুলি বৃহত্তর কাব্যের বন্দনা পালার অংশ মাত্র"[১৪] এই প্রসঙ্গে তিনি 'যোগাদ্যাদেবীর বন্দনা', 'রাজবল্লভীর বন্দনা' এবং 'মদনমোহন বন্দনা' প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিষয়ে ডঃ সেন মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের মতের মিল দেখা যায়।

(খ) যোগাদ্যা বন্দনা :-

কবিচন্দ্রের নামাঙ্কিত দুইখানি 'যোগাদ্যা বন্দনা'র পুথি পাওয়া যায় (ক.বি. ৬৪০১, ১-৭ পত্র, সম্পূর্ণ, ১২৫২ সাল, দৈ. ২৩ × প্র. ৮ সে.মি. পং ৬ এবং বি.সা.পুথি, ১-৭ পত্র, ১২৭৪ সাল, দৈ. ২৬ × প্র. ৯ সে.মি. পং ৮)।

কবিচন্দ্রের অন্যান্য পালার সঙ্গে এই পালাটির ভাবগত এবং রচনাগত সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। এইহেতু মনে হয় না কবিচন্দ্র স্বয়ং উক্ত পালা রচনা কবিয়াছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন লিখিয়াছেন, "উত্তররাঢ়ের পুরাতন দেবীপীঠ ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা দেবীর বন্দনা পাওয়া গিয়াছে কৃত্তিবাসের, 'দ্বিজ' দয়ারামের, পরমানন্দ দাসের ও 'দ্বিজ' বাঞ্ছারামেব ভণিতায়"[১৫] হয়তো উহাদের কাহারও রচিত বন্দনাটি পরে কবিচন্দ্রের ভণিতায় অনুলিখিত হইয়া থাকিবে। বন্দনাটির প্রথমে 'রামায়ণ'-এর প্রসঙ্গ। লঙ্কায় রাবণ রাজার ঘরে তিনি 'উগ্রচণ্ডা' রূপে রাবণের পূজাগ্রহণ ও পরে পাতালে মহীরাবণের ঘরে অবস্থান

করিতেছিলেন। তথা হইতে হনূমান মহীকে বধ করিয়া রাম লক্ষ্মণসহ দেবীকে উদ্ধার করিয়া আনেন। বিশ্বকর্মা, দেবীর উদ্দেশ্যে এক অক্ষয় দেউল নির্মাণ করিয়া দিবার পর দেবী তথায় আপনার পূজা গ্রহণের নিমিত্ত স্বপ্নে রাজা হরিদত্তকে দর্শন দেন। রাজা আপন পুত্র এবং সাত কন্যাকে (বি.সা. পুথিতে পুত্রের উল্লেখ নাই) বলিদানের পর দেবী ক্ষীরগ্রামের ঘরে ঘরে এই বলিদান পালাকারে গ্রহণ করিতে থাকেন। অবশেষে এক ব্রাহ্মণের পালা আসিলে তিনি একমাত্র পুত্র ও স্ত্রীকে লইয়া রাক্ষসী যোগাদ্যার হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্য দেশত্যাগ করিবার কালে দেবী পথে তাঁহাকে আশ্বাস দেন যে বলি ছাড়াই তিনি পূজা গ্রহণ করিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ অম্বিকা মূর্তিতে দেবীর দর্শন পাইতে চাহিলে তিনি দশভূজা মহিষমর্দিনী হইয়া কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী এবং সরস্বতীসহ ব্রাহ্মণকে দর্শন দান করেন। ব্রাহ্মণ দেবীর প্রতি ভক্তিবশতঃ পুনরায় গৃহে ফিরিয়া গেলে দেবী এক শাঁখারীর নিকট হইতে পাঁচ তঙ্কা মূল্যের শাঁখা (শঙ্খ) পরিধান করিয়া উক্ত পূজারী ব্রাহ্মণের কন্যা পরিচয়ে তাঁহার নিকট হইতে শাঁখারীকে ঐ মূল্য গ্রহণ করিতে বলেন। ব্রাহ্মণ শাঁখারীর নিকট আপন কন্যার বিবরণ শুনিয়া বিস্মিতভাবে তাঁহাকে দর্শনের জন্য কাতর প্রার্থনা করিতে থাকেন। দেবী তখন জলাশয় হইতে শঙ্খপরা দুই বাহু তুলিয়া ব্রাহ্মণকে দর্শন করান। কাহিনী এইখানে সমাপ্ত।

এই ক্ষীরগ্রাম খুব সম্ভব বর্ধমান জিলায় অবস্থিত। এই পুরাতন কাহিনীটি অবলম্বনে মহিলা কবি তরু দত্ত ইংরাজীতে 'যোগাদ্যার কথা' এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তরু দত্তের এই বিখ্যাত কবিতা অবলম্বনে 'মণিমঞ্জুষা' গ্রন্থের 'যোগাদ্যা' কবিতা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।[১৬] কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত 'যোগাদ্যা বন্দনা'র (ক.বি. ৩৬৮৪) সঙ্গে কবিচন্দ্রের ভণিতায় উক্ত কাহিনীর মধ্যে পার্থক্য বিশেষ নাই। মনে হয় একটি রচনাই দুই কবির ভণিতায় লিখিত হইয়াছে।

(গ) রাজবল্লভীর বন্দনা :-

কবিচন্দ্রের নামে প্রচলিত অপর বন্দনার নাম 'রাজবল্লভীর বন্দনা' (সা. ২৮৭৬)। এই বন্দনাটিও 'যোগাদ্যা বন্দনা'র মত। রাজবল্লভী দেবী প্রথমে 'বলিগ্রাহী' ছিলেন, পরে তিনি রাজকন্যার পরিচয়ে শাঁখারীর নিকট শাঁখা পরিধান করেন এবং উহার জন্য পাঁচ তঙ্কা মূল্য রাজবলহাটের রাজা ও রাণীর নিকট হইতে শাঁখারীকে গ্রহণ করিতে বলেন। রাজা ও রাণী রাজবল্লভীর মন্দিরে আসিয়া দেখেন দেবী শঙ্খ পরিহিতা। এই দেবী বিশাললোচনী নামেও পরিচিত। এই বন্দনাটিও কবিচন্দ্র রচনা করিয়াছিলেন কিনা তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

১৪। **পুরাণ প্রসঙ্গ :-**

কবিচন্দ্রের কয়েকটি পুথিতে পাওয়া যায় 'ভবিষ্যপুরাণ' এবং 'আগম পুরাণ'-এর উল্লেখ ; যেমন, 'কোকিল সংবাদ' (বি.ভা. ৮৬১, ১-৯, খণ্ডিত, দৈ. ৩৪ X প্রা. ১৪ সে.মি., পং ১০) নামক একটি পুথিতে পাওয়া যায় —

ভবিষ্য পুরাণ মত উজর ভকতি কত
দ্বিজ কবিচন্দ্র রসভাষে ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ২)

'শিবরামের যুদ্ধ' (বি.ভা. ৬১১১) পালাতে 'ভবিষ্য পুরাণ'-এর উল্লেখ আছে : —
'ভবিষ্য পুবাণ দ্বিজ কবিচন্দ্রের রচন ।'
'নরমেধ যজ্ঞ' পালায় (বি.ভা. ৬১৯১) পাওয়া যায় আগম পুরাণের কথা : —
'আগম পুরাণ কথা কহিতে লাগিল ।'
'কণ্বমুনির পারণ' (বি.ভা. ৮০৬) পালায় পাওয়া যায় — 'গোবিন্দ চরণে রত, ভবিষ্য পুরাণ মত বাল্যলীলা গাইল শঙ্কর' । (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৫)
কবিচন্দ্রের মুদ্রিত 'ভাগবতামৃত' গ্রন্থেও এই পালাটিকে 'ভবিষ্য পুরাণ' বলা হইয়াছে :—
'ভবিষ্য পুরাণ দ্বিজ কবিচন্দ্র ভণে' (প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮)

১৫। **অন্যান্য প্রসঙ্গ :-**

(ক) দণ্ডীপর্ব

কবিচন্দ্রের নামাঙ্কিত একটি দণ্ডীপর্বের পুথি বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে (ব.রি.মি. সং ৪০৯, ক্রম সং ২৮৯, ১-৪০ পত্র, শরৎকুমার রায় সংগ্রহ) রক্ষিত আছে বলিয়া জানা যায় । উহার ভণিতাংশে লিপি প্রমাদ ঘটা অসম্ভব নহে । দণ্ডীপর্বের পুথিগুলি কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর রচিত কিনা সন্দেহ ; যথা :-

"শোলোক ছন্দে রচিলেন মহামুনি ব্যাস ।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে শ্রীকৃষ্ণের দাস ।"

এই ভণিতাটিব সঙ্গে বিশ্বভারতীতে রক্ষিত কবিচন্দ্র মানিকচন্দ্রের 'দণ্ডীপর্বে'র (বি.ভা. ৬৩১৮, ২-৪৪ পত্র, খণ্ডিত) ভণিতা মিলাইলে পার্থক্যটি ধরা পড়িবে ; যথা :-

শ্লোকছন্দে কহিলেন মহামুনি ব্যাস ।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে মানিকচন্দ্র দাস ॥
ইতি দণ্ডীপর্ব সমাপ্ত (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৪৪)

মনে হয 'মানিকচন্দ্র দাস'ই পূর্বোক্ত পুথিটিতে লিপি প্রমাদে 'শ্রীকৃষ্ণের দাসে' পরিণত হইয়াছেন । পুথি দুইটির পত্র সংখ্যা প্রায় সমান । কবিচন্দ্রের রচিত কোনও একটিমাত্র পর্বেব এত বড় আকার পাওয়াও যায় না । কবিচন্দ্র নিজেকে 'শ্রীকৃষ্ণেব দাস' এইরূপ

আক্ষরিক উল্লেখ ভণিতার শেষে কোথাও করিয়াছেন বলিয়া পাওয়া যায় নাই । তবে কাব্যের মধ্যে নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের অনুচররূপে বর্ণনা করিয়াছেন ।

(খ) সন্ন্যাস খণ্ড :-

ইহাও কবিচন্দ্রের নামাঙ্কিত একটি চৈতন্য বন্দনার পুথি (বি.ভা. ৮১৯) । তবে কবিচন্দ্র চৈতন্যদেবের প্রসঙ্গে কোনও পালা রচনা করিয়াছিলেন কিনা আমরা জানি না । চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস যাত্রার পূর্বে শচীমাতার বেদনাই এই রচনাটির মূল বিষয় । ইহা নিতান্ত ক্ষুদ্র রচনা ।

(গ) হরিবংশ :-

পণ্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং কবিচন্দ্রের রচিত 'ভাগবতামৃত শ্রীশ্রী গোবিন্দমঙ্গল' (১৩৪১ সাল) নামক গ্রন্থে 'পারিজাত হরণ' এবং 'পুণ্যকব্রত' নামক দুইটি পালার ভণিতায় 'হরিবংশ'-এর উল্লেখ আছে ; (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫, ৩৪৬ ও ৩৪৯) এই 'পাবিজাত হরণ' প্রসঙ্গ কবি বিদ্যাপতিব 'পারিজাত হরণ'-এর অনুরূপ । কবিচন্দ্রের রচনারূপে পরিচিত সমস্ত বড় কাব্য ও অন্যান্য পালার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে । তবে 'দানখণ্ড'টি কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর রচিত কিনা তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না ।

(ঘ) কবিচন্দ্রের ভণিতায় একটি দানখণ্ডের পুথির উল্লেখ পাওয়া যায় (ব.রি.মি. ৯৬৩/২৬ নং) । উহার কিছু অংশ উদ্ধৃত হইল ;

"শ্রীনন্দ নন্দন তুমি, কানাই ভাগিনা ।
পসরা আনিয়া দেহ, তবে যাবে জানা ।।
বস্ত্র অলঙ্কার যত গেছিল ভাসিয়া ।
সব পালা একত্রেতে, গোবিন্দের দয়া ।।
যে যার (ব)স্ত্র সবে বাছিয়া পরিল ।
যেমন আছিলা গোপী, তেমনি হইল ।।
তখন জানিল গোপী পূর্ব্ব বিবরণ ।
পূর্ণব্রহ্ম অবতার শ্রীনন্দ নন্দন ....।"
..........দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় (সরস বচন) ।।৭।।"

ইতি দানখণ্ড সমাপ্ত ।

(পৃ.পৃ. ৬-৭, ব.রি.মি. ৯৬৩/২৬ নং,
বাংলা পুথির তালিকা, ১৯৫৬, পৃ.৪৯)

ইহা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' বিষয় কিনা ঠিক বোঝা যায় না । এই 'দানখণ্ড'টি সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা না থাকায় ইহার বিষয়ে অতিরিক্ত কোনও সংবাদ প্রদান করা সম্ভব হইল না । কবিচন্দ্রের রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করিলাম ।

পাদটীকা

১। সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ২য় সং, ১৯৬৫। পৃ. ৩৫৭, পাদটীকা।

২। আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস ৩য় সং, ১৯৫৮ (১৩৬৪ সাল)। পৃ. ১৩৯

৩। পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত : রামেশ্বর রচনাবলী, ১ম সং, ১৯৬৪। পৃ. ২৪৭ পাদটীকা।

৪। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড (১ম সং ১৯৬৬) পৃ. ২১৮ পাদটীকা।

৫। পঞ্চানন চক্রবর্তী : রামেশ্বর রচনাবলী, ১ম সং, ১৩৭১ সাল। পৃ. ২৪০

৬। সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ, ২য় সং, ১৯৬৫। পৃ. ১৯২

৭। রাজশেখর বসু কর্তৃক সারানুবাদ : বাল্মীকি রামায়ণ, ৭ম মুদ্রণ ১৩৮৩, ভূমিকা পৃ.দশ

৮। মণীন্দ্রমোহন বসু : বাঙ্গালা সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৪৭সাল, পৃ. ২২৯

৯। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত পৃ. ২৩৩

১০। উপরে উল্লিখিত পর্বসমূহের সংবাদ পাওয়া যায় নিম্নোক্ত গ্রন্থটিতে।
চিত্রা দেব সম্পাদিত : শঙ্কর কবিচন্দ্রের মহাভারত, ১ম প্রকাশ ১৩৮৯ সাল। ভূমিকা ও সম্পাদিত অংশ।

১১। এই উদ্ধৃতিটি বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম বাংলা পুথির তালিকায় (১৯৫৬ খ্রীঃ) ২২ নং পৃষ্ঠার পাদটীকায় উল্লিখিত হইয়াছে।

১২। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'প্রাচীন পুথি সংগ্রহ', 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে' ১ম সং ১৩৬৯, পৃ. ১১৩

১৩। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী : বাংলায় জীমূতবাহনের কাহিনী, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, ১৩৬৭ সাল। পৃ. ১৬৭

১৪। সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ, ২য় সং, ১৯৬৫। পৃ. ৫২৩

১৫। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত পৃ. ৫২৩

১৬। পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত : রামেশ্বর রচনাবলী, ১ম সং, ১৯৬৪। পৃ. ৫৬৬ পাদটীকা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

।। 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ'-এর উৎস বিচার ।।

কবিচন্দ্রের রামায়ণখানির উৎস কোনও একটি নির্দিষ্ট গ্রন্থ মাত্র নহে। দূরবনাগত ফুলের সৌরভ যেমন নির্দিষ্ট কোনও একটি ফুলের নহে, তাহা যেমন কাননে প্রস্ফুটিত ফুলরাশির মিলিত সুবাস, কবিচন্দ্রের কাব্যখানিও তেমনি বিভিন্ন সূত্র হইতে আহরিত কুসুম মালিকাবিশেষ। তিনি কবিগুরু বাল্মীকিকে যেমন বন্দনা করিয়াছেন তেমনি ব্যাসদেবকেও প্রণতি জানাইয়াছেন। কবিচন্দ্র এই সংক্ষিপ্ত 'রামলীলা' বা 'রামমঙ্গল' নামক কাব্যখানিতে কাহিনীর সূত্র বাল্মীকি 'রামায়ণ', 'শ্রীমদ্ভাগবত', 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' এবং বিভিন্ন পুরাণ ও লৌকিক কাহিনী হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কবি 'ভাগবত' এবং 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এর কথাই উল্লেখ করিয়াছেন সর্বাধিক। উপরন্তু 'ভাগবতামৃত' শব্দের উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, উহার অন্তর্গত নবম স্কন্ধের দশম অধ্যায়ই যে কবির রচনার প্রাসঙ্গিক বিষয় তাহাও স্মরণ করাইতে বিস্মৃত হন নাই। এমনকি যেসকল পালায় 'ভাগবত'-এর আদর্শের অনুসরণ নাই তাহাতেও 'ভাগবতামৃত' কথার উল্লেখ এবং ব্যাসদেবের প্রতি প্রণতি নিবেদিত হইতে দেখা যায়। লক্ষ্য করিবার মত বিষয়, কবিচন্দ্র 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' খানি রচনার প্রায় সমকালে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গল' কাব্যের বিভিন্ন পালা রচনা করেন। তাহার প্রভাব এই কাব্যটিতেও বর্তমান। আভাসে তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন 'ভাগবতামৃত' এবং 'গোবিন্দমঙ্গল' শব্দ প্রয়োগে। আবার বাল্মীকিমুনির রাম নাম জপ করার প্রসঙ্গ কবি 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, ভণিতায় তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় ;

দ্বিজ কবিচন্দ্র আধ্যাত্মিক মত গায়।
অযোধ্যাকাণ্ডেতে লেখা ষষ্ঠ অধ্যায় ।।

(রঘুনাথের বনবাস, পু.পৃ. ২২)

অতএব 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এ বর্ণিত রাম-কথার সংক্ষিপ্তরূপ কবিচন্দ্রের কাব্যরচনার মূল প্রেরণা হইলেও উহাই একমাত্র উপজীব্য নহে। বিভিন্ন পালায় বর্ণিত বিভিন্ন সূত্রের উল্লেখ হইতে মনে হয় কবিচন্দ্রের কাব্যখানির উৎস কোনও নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ নহে, উহা তৎকালীন বঙ্গদেশে প্রচলিত বিভিন্ন সূত্রাশ্রয়ী রাম-কথার এক সংক্ষিপ্ত রূপ।
এই অধ্যায়ে উৎসসমূহের প্রসঙ্গ ক্রমান্বয়ে আলোচিত হইল।

বাল্মীকি 'রামায়ণ'-এর প্রভাব :

বাল্মীকি 'রামায়ণ'-এর আদর্শে রচিত দুইখানি পালা পাওয়া যায়, 'সূর্যবংশ কথা' ও 'নরমেধ যজ্ঞ' পালা। এই পালা দুইটির নাম বিভিন্ন, কিন্তু উহাদের মূল বিষয় এক।

'সূর্যবংশ কথা'-য় বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র বিরোধ ও শুনঃশেফ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে আর 'নরমেধ যজ্ঞ' পালায় কেবল শুনঃশেফ কাহিনীটিই বিস্তৃতাকারে পাওয়া যায়।

শুনঃশেফ কাহিনীর আভাস 'ঋগ্বেদে' (১/২৪) আছে। সেখানে শুনঃশেফকে বলিদানের প্রসঙ্গ স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হয় নাই।[১]

'ঋগ্বেদ' প্রসঙ্গই 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'[২] (৩৩শ সঃ, ১-৬ খণ্ড) ও 'বাশিষ্ঠ ধর্মসূত্র'-এ (১৭/২৩১) পাওয়া যায়। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-এ ও 'বাশিষ্ঠ ধর্মসূত্র'-এ শুনঃশেফের যে কাহিনী বিস্তৃতাকারে পাওয়া যায় 'রামায়ণ'-এ তাহা গৃহীত হয় নাই। 'ঐতরেয় বাহ্মণ'-এর কাহিনী 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এও (নবম স্কন্ধেব সপ্তম অধ্যায়ে) গৃহীত হইয়াছে এবং নবম স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যাযে শুনঃশেফ মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।[৩] কিন্তু একমাত্র বাল্মীকি 'রামায়ণ'-এ বর্ণিত কাহিনী ব্যতীত এই সকল কাহিনীর সঙ্গে কবিচন্দ্রের 'সূর্যবংশ কথা' এবং 'নরমেধ যজ্ঞ পালার মিল নাই।

বাল্মীকি 'রামায়ণ'-এ আদিকাণ্ডেব ৫১ সর্গ হইতে ৬৫ সর্গ পর্যন্ত বশিষ্ঠাশ্রমে বিশ্বামিত্রের নিমন্ত্রণ গ্রহণ, কামধেনু শবলা হরণ, অম্বরীষ রাজার যজ্ঞীয় পশুহরণ, শুনঃশেফ কাহিনী এবং বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বলাভ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। 'রামায়ণ'-এ শুনঃশেফ কাহিনীর সঙ্গে হরিশ্চন্দ্র রাজার প্রসঙ্গ জড়িত নহে। অম্বরীষ রাজার যজ্ঞীয় পশু অপহৃত হওয়ায় রাজা বহুদূর হইতে শুনঃশেফ নামক বালককে যজ্ঞে আহুতি প্রদানার্থে ক্রয় করিয়া আনেন (৬১-৬২ সর্গ), পরে বিশ্বামিত্রের পরামর্শমত ঈশ্বরের কৃপায় বালক মুক্তি লাভ করে। বাল্মীকি রামায়ণে পাঁচটি সর্গে (বালকাণ্ড ৬১-৬৫ সর্গ) পরিব্যাপ্ত এই আখ্যানের প্রধানতঃ দুইটি অংশ : প্রথমটি শুনঃশেফ কাহিনী, দ্বিতীয়টি বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভ। কবিচন্দ্রের 'সূর্যবংশ কথা'-য় বাল্মীকি রামায়ণের প্রভাব থাকিলেও কাহিনী কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে। উহাতে বিশ্বমিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভ (১-৫ পত্র) কাহিনী প্রথমে এবং শুনঃশেফ কাহিনী (৫-৭পত্র) তাহার পরে পাওয়া যায়।

এই 'সূর্যবংশকথা'র অনুরূপ কাহিনী পাওয়া যায় 'নরমেধ যজ্ঞ' পালায়। দুইটিই কবিচন্দ্রের রচনা। প্রথমটিতে বিশ্বামিত্র ও শুনঃশেফ কাহিনী আর দ্বিতীয় পুথিটিতে শুধু শুনঃশেফ কাহিনী বিস্তৃতাকারে পাওয়া যায়। বিশ্বামিত্রের তপস্যা এবং ব্রাহ্মণত্ব লাভের কাহিনী উহাতে বর্জিত হইয়াছে। এই উভয় পুথির ভণিতা এবং কাহিনীতে এমনকি শেষ পত্রে প্রায় সম্পূর্ণ মিল থাকায় পুথি দুইটি কবিচন্দ্রের রচনা বলিয়াই মনে হয়।

এই দুইটি পুথিতেই দেখা যায়, কবিচন্দ্র বাল্মীকি রামায়ণের শুনঃশেফ কাহিনীকেই গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর বিশ্বামিত্র মুনিব যে কাহিনী বাল্মীকি রামায়ণে পাওয়া যায় তাহাতেও কিছু কিছু পরিবর্তন নজরে পড়ে।

মূল রামায়ণে (বালকাণ্ড ৬৩ সর্গ) বিশ্বামিত্র মুনি মেনকার সঙ্গে দশ বৎসর বসবাস করার পর চিত্ত জয় হেতু মেনকাকে মধুর বাক্যে বিদায় দিয়াছিলেন । কিন্তু কবিচন্দ্রের 'সূর্যবংশকথা'য় দেখা যায়, মেনকার স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা প্রদান করিলে সে নিজেই বিশ্বামিত্রের সঙ্গে সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় ।

আবার দেখা যায় মূল রামায়ণে (বালকাণ্ড ৬৪ সর্গ) দেবরাজ ইন্দ্র রম্ভাকে দ্বিতীয়বার বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করিতে প্রেরণ করেন । ইন্দ্র নিজে কোকিল হইয়া কুহুরব করিতে থাকেন । কবিচন্দ্রের কাব্যে রম্ভার পরিবর্তে মেনকা এবং ইন্দ্রের কোকিল হওয়ার পরিবর্তে সরস্বতীর কোকিল হইয়া মধুর স্বরে ধ্বনি করায় ভূপতির ধ্যান ভঙ্গ হয় । কিন্তু ইহার পর আর ভূপতি ভোলেন নাই, বিদ্যাধরীকে তিনি প্রস্তরময়ী করিয়া রাখেন । বিদ্যাধরী কাঁদিয়া ভূপের নিকট পরিত্রাণ পাইতে চাহিলে তিনি উত্তরে বলেন, রাম অবতার হইয়া আসিলে এবং অর্জুনের অশ্বমেধ যজ্ঞের স্পর্শে তাহার মুক্তি ঘটিবে ।
এই স্থলে ত্রেতা যুগের রাম এবং দ্বাপর যুগের অর্জুনের কথা একই কালে উল্লেখ করা হইয়াছে । ইহাও কবির নিজস্ব চিন্তাভাবনার ফল । কবিচন্দ্রের 'সূর্যবংশ কথা'য় বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে তৃতীয় আর একটি প্রভেদ দেখা যায় কাহিনীর প্রসঙ্গ বর্ণনায় । বাল্মীকি রামায়ণে এই শুনঃশেফ ও বিশ্বামিত্রের কাহিনী গৌতমপুত্র শতানন্দ রাম, লক্ষ্মণ এবং রাজা জনককে শ্রবণ করান । আর কবিচন্দ্র শুরু করিয়াছেন, "বৈশম্পায়ন কহে শুনে জন্মেঞ্জয়" কথার দ্বারা । 'পুরাণ' ও 'ভাগবত'-এর কাহিনী উক্ত প্রকারে শুরু হইয়া থাকে । কবিচন্দ্র রামায়ণের প্রসঙ্গও 'ভাগবত'-এর মত করিয়াই শুরু করিয়াছেন । পালাটির মধ্যে মধ্যে 'আদিকাণ্ড' 'আদি পর্ব' এবং 'পুরাণসঙ্গীত' শব্দের উল্লেখ কি কবিচন্দ্রের উল্লেখ, না লিপিকরের হস্তাবলেপের ফল, ঠিক বোঝা যায় না ; যথা :-

বিশ্বামিত্র মহারাজা একলা রহিল ।
কামধেনু বশিষ্ঠের সাক্ষাতে আইল ।।
আদি পর্বে সুধারস বাল্মীকির কথা ।
কবিচন্দ্র দ্বিজ গায় পুরাণ সঙ্গীত ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৩ক)

পুরাণের প্রভাব :

কবিচন্দ্র 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ'-এ পুরাণের উল্লেখ বহুস্থলে করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'হবিশ্চন্দ্র উপাখ্যান' এবং 'গয়াশ্রাদ্ধ' নামক এই দুইখানি পালাই সম্পূর্ণভাবে পুবাণের অনুসরণে রচিত ।
'হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান' পালা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বাংলা পুথির তালিকায় কবিচন্দ্রের মহাভারতের বিষয়রূপে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে । বাল্মীকি রামায়ণে হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী

সবিস্তারে পাওয়া যায় না। তথাপি তিনি সূর্যবংশীয় নৃপতি, অযোধ্যার রাজা, এইহেতু বাংলা রামায়ণে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অসুবিধা নাই। এতদ্ভিন্ন বাংলা রাম-কথার আদর্শস্থল কৃত্তিবাসী রামায়ণের সমস্ত মুদ্রিত গ্রন্থেই এই হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই উপাখ্যানটি গৃহীত হওয়ায় কবিচন্দ্রের কাব্যেও তাহা অন্তর্নির্বিষ্ট করা হইল।
'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' (৩৩শ অঃ/১-৬ খণ্ড) ও 'বাশিষ্ঠ ধর্মসূত্র'-এ (১৭ অঃ/২৩১) শুনঃশেফ কাহিনীর সঙ্গে হরিশ্চন্দ্র রাজার পুত্র প্রাপ্তির কাহিনী বিজড়িত। 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর নবম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়েও উক্ত কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। উহাতে পাওয়া যায়, — বিশ্বামিত্র মুনি রাজসূয় যজ্ঞ করাইয়া তাহার দক্ষিণা ছলে হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্ব অপহরণপূর্বক যাতনা দেন। তৎশ্রবণে মহর্ষি বশিষ্ঠ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিশ্বামিত্র সন্নিধানে গিয়া আড়ি পক্ষী হওয়ার এবং বিশ্বামিত্রও বশিষ্ঠকে বক পক্ষী হওয়ার অভিশাপ দেন। কিন্তু 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর এই কাহিনী বাংলা রামায়ণে প্রচলিত হয় নাই।
বাংলা রামায়ণে বিশেষতঃ কবিচন্দ্রের রামায়ণে হরিশ্চন্দ্রের যে উপাখ্যান প্রচলিত তাহা 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ'-এর (পূর্ব খণ্ড, অষ্টম অধ্যায়) অন্তর্গত পক্ষীগণের নিকট জৈমিনি মুনি কর্তৃক বর্ণিত দাতা হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী।
'কূর্মপুরাণ'-এ (২১অঃ) হরিশ্চন্দ্র ও রামের বংশবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।[৫] 'দেবী পুরাণ'-এর (১১৬ অঃ) মাণ্ডব্য মুনি পঞ্চ মাতৃকার নিকট হরিশ্চন্দ্রকে রক্ষার জন্য প্রার্থনা করেন।[৬] 'স্কন্দ পুরাণ'-এর নাগরখণ্ডে (৪৮ শ অঃ) হরিশ্চন্দ্রের পুত্র লাভার্থে উমা মহেশ্বরের আরাধনা আছে। কিন্তু এই সকল পুরাণের সঙ্গে কবিচন্দ্রের 'হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান'-এর মিল নাই। 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ'-এর বিস্তৃত কাহিনীই কবিচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় জৈমিনি পক্ষীদের নিকট হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী শ্রবণ করেন। 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ'-এর কাহিনী এইরূপ :-
মহারাজা হরিশ্চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞ করিলে বিশ্বামিত্র মুনি সেই যজ্ঞের নিমিত্ত দক্ষিণা দিয়া মুনিকে সন্তুষ্ট করিতে বলেন। এই দানের জন্য সময় নির্দিষ্ট ছিল মাত্র একমাস। ঐ সময়ের মধ্যে মহারাজাকে প্রতিজ্ঞা পালন করিতে বলা হয়। নচেৎ মৃত্যুতেও তাঁহার শান্তি হইবে না। কেননা প্রতিশ্রুত অর্থ সময় মত দিতে না পারিলে রাজা ঋণ পাশে আবদ্ধ হইয়া মহাপাপে লিপ্ত হইবেন। কিন্তু সত্যরক্ষার্থে পত্নী ও পুত্রকে বিক্রয় করিয়াও মহারাজা মুনিবরের নিমিত্ত সম্পূর্ণ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তখন বিশ্বামিত্র মুনি নিজেই হরিশ্চন্দ্রকে বারাণসীর মহাশ্মশানের এক চণ্ডালের হাতে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া অর্বুদ সুবর্ণ লাভ করেন।[৮]

কবিচন্দ্রের কাহিনীর আরম্ভ কিন্তু ভিন্নভাবে। কৌশিক মুনির বাগান দুই বিদ্যাধরী কর্তৃক ছত্রভঙ্গ হইলে মুনিশাপে তাহাদের হাত গাছের ডালে সংযুক্ত হইয়া থাকে। উহাদের

চিৎকার যন্ত্রণা রাজা হরিশ্চন্দ্রের কর্ণগোচর হইলে তিনি গাছের ডাল হইতে তাহাদের হস্ত মুক্ত করিয়া দেন। কৌশিক মুনি তাহা জানিতে পারিয়া হরিশ্চন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ওঠেন। মহারাজা তাহাকে নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া যে যাহা রাজার নিকট অভিলাষ করে তিনি তাহাকে তাহা দিয়া থাকেন বলিয়া জানান। এই কথার প্রত্যুত্তরে কৌশিক মুনি হরিশ্চন্দ্রের নিকট অযোধ্যার রাজ্যপাট চাহিয়া বসেন। রাজা তাহা দিতে স্বীকৃত হইলে মুনি দানের দক্ষিণাস্বরূপ শতকোটি সুবর্ণমুদ্রা দাবী করেন। রাজ্য তো পূর্বেই সমর্পিত হইয়াছে। তাই দক্ষিণা দিবার মত কিছু অবশিষ্ট না থাকায় স্ত্রী পুত্রকে সওদাগরের নিকট বন্ধক রাখিয়া হরিশ্চন্দ্র রাজা নিজে ডোমের কার্য করিতে থাকেন।

ইহার পর 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ'-এ শ্মশান বর্ণনা আছে। কবিচন্দ্রের কাব্যে তাহা অনুপস্থিত। তবে রাণীর স্বপ্নদর্শন, রোহিতের সর্পাঘাতে মৃত্যু, বার বৎসর অতিক্রমের পর হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে শ্মশানে মৃতপুত্র সহ রাণীর সাক্ষাৎ, ধর্মের কৃপায় রোহিতের জীবন লাভ ও হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গগমন প্রভৃতি প্রসঙ্গ কবিচন্দ্রের কাব্যে সামান্য পরিবর্তিত হইলেও মূলতঃ উভয় কাহিনী একরূপ। কবিচন্দ্রের পালায় শ্মশানে রাণীর পরিচয় লাভের পূর্বে হরিশ্চন্দ্রের গালাগালি অংশ 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ'-এ পাওয়া যায় না। আর ধর্মের কৃপা লাভের পরিবর্তে কবিচন্দ্রের কাব্যে বিষ্ণুর কৃপা লাভের কথা আছে। ইহার পর 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ'-এ 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর মত আড়ি-বক-যুদ্ধ প্রসঙ্গ থাকিলেও কবিচন্দ্রের কাব্যে এই যুদ্ধ-কাহিনী বর্জিত হইয়াছে।

এই পালাটি গ্রহণ করার মূলে খুব সম্ভব ত্যাগের আদর্শই কবিমনে কাজ করিয়া থাকিবে। হরিশ্চন্দ্রের মত ত্যাগী ও দাতার কাহিনী দুর্লভ। তিনি নিজের অপেক্ষা প্রিয়তর স্ত্রীকে পুত্রসহ সত্যরক্ষার্থে ঘৃণ্য দাসীবৃত্তির কার্য করাইয়াছেন। তাঁহারাও উক্ত কর্ম বিধিনির্দিষ্ট মনে করিয়া নীরবে মাথা পাতিয়া লইয়াছেন। ত্যাগের এহেন আদর্শ ইতিহাসে বিরল। রামচন্দ্র চৌদ্দ বৎসর বনবাস গ্রহণ করেন পিতৃসত্য পালনের জন্য। রাজা হরিশ্চন্দ্র বার বৎসর চণ্ডালত্ব গ্রহণ করেন সত্য রক্ষার জন্যই। বাংলার কবিদিগের ধর্মীয় সাহিত্য রচনার মূলে যে সকল প্রেরণা কার্যকরী হইয়াছে তাহাদের উদ্দেশ্য একটিই, তাহা ত্যাগ, সত্য ও ক্ষমার আদর্শকে সর্বজন সমক্ষে প্রকাশ করা। কৃত্তিবাস হইতে এই আদর্শ চলিয়া আসিতেছে। সম্ভবতঃ কবিচন্দ্র এইজন্যই এই পালাটিকে রচনা করিয়া থাকিবেন। আমরা সকল দিক বিবেচনার পর এই পালাটিকে 'রামায়ণ' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি।

রাঢ়ে বহু 'ধর্মমঙ্গল'-এর পালায় হরিশ্চন্দ্রের নাম পাওয়া যায়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় লিখিয়াছেন — "ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে হরিশ্চন্দ্রের পালা নামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে। লাউসেন যেমন নিজের দেহ নয় খণ্ড করিয়া কাটিয়া ধর্মের পূজা

করিয়াছিলেন, এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাজা হরিশ্চন্দ্রও তেমনই ধর্মের আদেশে নিজের পুত্রকে বলিদান দিয়াছিলেন। লাউসেনের কাহিনী ধর্ম সাহিত্যে প্রবেশ করিবার পূর্বে রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীই তাহাতে কীর্তিত হইত বলিয়া মনে হয়। কারণ, প্রাচীনতম ধর্ম সাহিত্যেও এই লাউসেনের কাহিনী নাই, হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীই আছে।"[২]
ডঃ সুকুমার সেন হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী সম্পর্কে লিখিয়াছেন, — "ধর্মঠাকুরেব আনুষ্ঠানিক পূজার বিষয়ে যে সবচেয়ে পুরানো গল্পটি পাই, হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী, তাহাতে একাদশী ব্রতের ছাপ পড়িয়াছে। কিন্তু গল্পটি খুব পুরাতন। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যে হবিশ্চন্দ্র-রোহিতাশ্ব-শুনঃশেফ আখ্যান আছে তাহাতেই ইহার মূল পাওয়া যায়। সে আখ্যান রাজসূয় অশ্বমেধ প্রভৃতি কোন কোন যজ্ঞকাণ্ডে গীত হইত"।[১০]
'ঐতরেয ব্রাহ্মণ'-এ রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীর কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। কবিচন্দ্র এই পালাটিকে যেরূপে গ্রথিত করিয়াছেন তাহাতে এই প্রাচীনতর প্রসঙ্গটিব সম্পর্ক নাই। ধর্মমঙ্গলের সঙ্গেও এই পালাটির কোনও সম্পর্ক পাওয়া যায় না।

গয়াশ্রাদ্ধ পালা :-

কবিচন্দ্রের রচিত 'গয়া শ্রাদ্ধ' পালার বিষয়বস্তুর সঙ্গে মূল রামাযণেব মিল খুব সামান্য। মূল রামায়ণে শুধু গয়ায় পিণ্ডদান প্রসঙ্গ আছে তাহাও আবার খুব সংক্ষিপ্ত, যথা :-

"শ্রূয়তে ধীমতা তাত শ্রুতির্গীতা যশস্বিনা।
গয়েন যজমানেন গয়েষ্বেব পিতৃন্ প্রতি ॥১১॥
পুন্নাম্নো নরকাদ্যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ পিতৃন্ য পাতি সর্ব্বতঃ ॥ ১২ ॥
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা গুণবন্তো বহুশ্রুতাঃ।
তেষাং বৈ সমবেতানামপি কশ্চিদ্ গয়াং ব্রজেৎ ॥"১৩॥

—— "ভাই। ইহা শুনিতে পাওয়া যায় যে, গয়া প্রদেশে গয়-নামক কোন বুদ্ধিমান্ যশস্বী যাজ্ঞিক, পিতৃলোকের প্রীতিকামনায় এই শ্রুতি গান করিয়াছেন যে — যেহেতু সন্তান 'পুৎ' নামক নরক হইতে পিতাকে ত্রাণ করে এবং ইষ্ট ও পূর্ত্ত কর্ম্ম দ্বাবা পিতাকে স্বর্গলোকে প্রেবণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করে, সেই জন্য পুত্র এই নামে উক্ত হয়। এইজন্যই লোকে বিবিধ বিদ্যা ও গুণশালী বহু পুত্র কামনা করিয়া থাকে যে, তাহাদিগের সকলের মধ্যে কোন না কোন পুত্র গয়ায় যাইবে।' রঘুনন্দন। রাজর্ষিরা সকলেই এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন, অতএব নরবর। তুমি পিতাকে নরক হইতে পরিত্রাণ কর।"[১১]

(অযোধ্যাকাণ্ড / ১০৭ অঃ/পৃ. ৩৮১)

'গরুড়পুরাণ'-এ (পূর্বখণ্ড, ৮২ অধ্যায়) গয়ামাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। 'স্কন্দ পুরাণ'-এও (নাগর খণ্ড, ২০৫ অধ্যায়) গয়াশ্রাদ্ধ-ফল-মাহাত্ম্য লিখিত আছে।
'পদ্মপুরাণ'-এ (স্বর্গখণ্ডম, ১৯ অধ্যায়) নারদ রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট সকল তীর্থ মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। তখন তিনি গয়া-মাহাত্ম্যও বলেন।[১২]
'মহাভারত'-এ (দ্রোণ পর্ব/৬৪ তম অঃ) এবং 'হরিবংশ'-এ (১০ম অঃ) গয়া-মাহাত্ম্য লিখিত আছে।
বাংলা সাহিত্যে 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে মহাপ্রভুর গয়া দর্শন ও শ্রাদ্ধকর্মের কথা বর্ণিত হইয়াছে ; যথা :-

"শাস্ত্র বিধি মত শ্রাদ্ধ কর্ম্মাদি করিয়া।
যাত্রা করি চলিলা অনেক শিষ্য লৈয়া ॥১১॥
জননীর আজ্ঞা লই মহা-হর্ষ-মনে।
চলিলেন মহাপ্রভু গয়া দরশনে ॥ ১২ ॥
সর্ব্বদেশ গ্রাম করি পুণ্য তীর্থময়।
শ্রীচরণ হৈল গয়া দেখিতে বিজয় ॥"১৩॥[১৩]

অতএব 'রামায়ণ' 'মহাভারত' হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত গয়ায় পিণ্ডদান প্রথা হিন্দুসমাজে প্রচলিত আছে। কিন্তু কবিচন্দ্র 'গয়াশ্রাদ্ধ' পালায় যে কাহিনী অবলম্বন করিয়াছেন তাহা উক্ত গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না। তিনি যে কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন তাহা লৌকিক হইলেও 'শিবপুরাণ'-এর অন্তর্গত কাহিনী অবলম্বনে রচিত। উহার ভাবানুবাদ সংক্ষেপে এইরূপ :-

গয়ায় দশরথ নিজে সীতাদেবীকে পিণ্ড প্রদান করিতে বলেন নাই। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের ফিরিতে বিলম্ব ঘটায় রাক্ষসী বেলা উপস্থিত হইবে ভাবিয়া সীতাদেবী পিণ্ড দিতে গেলে অদৃশ্যভাবে দশরথ তাহা গ্রহণ করেন। পিণ্ডদান বিষয়ে রামচন্দ্রেব বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য দশরথের আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া সীতাদেবী ফল্গু নদী, ধেনু, অগ্নি ও কেতকীকে সাক্ষ্য দিতে বলেন।
সীতাদেবীর কথায় অবিশ্বাসবশতঃ রামচন্দ্র পিতৃগণকে আবাহন করিয়া শ্রাদ্ধ করিতে তৎপর হইলে সূর্যমণ্ডল হইতে বক্ষমাণ বাক্য নির্গত হয় — "হে বৎস! কি জন্য পুনরায় আহ্বান করিতেছ ? জানকী আমাদিগের তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন।" রামচন্দ্র তাহা গ্রাহ্য না করিয়া শ্রাদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে তিনবাব এইরূপ আকাশ বাণী শ্রবণ করেন। তখন উভয় ভ্রাতা সীতার প্রতি "জয়" "জীব" এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়া কহিলেন, "আমরা ধন্য হইলাম যে, আমাদিগের কুলের ঈদৃশী পবিত্রা-বধূ।" পাকান্ন ভোজন করিবার পর, শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলেন, "ভ্রাতঃ! ইহারা সাক্ষী থাকিয়াও কি দুষ্টবৎ আচরণই করিল।" এমন সময়ে জানকী তাহাদিগকে অভিশাপ দেন।[১৪]

(৩০ অঃ/২২ ৩৪ শ্লোক/পৃ. ১১৫-১১৬)

'শিবপুরাণ'-এর কাহিনী কবিচন্দ্রের কাব্যে একটু পরিবর্তিতাকাবে পাওয়া যায়। কবিচন্দ্রেব পালায় দশরথ নিজেই স্বর্গ যাইতে বিলম্ব ঘটায় পুত্রবধূ সীতাদেবীব নিকট পিণ্ড প্রার্থনা করেন। রামচন্দ্রের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য দশরথ সীতাদেবীর নিকট পঞ্চ সাক্ষী রাখিয়া যান। এই পঞ্চজন যথাক্রমে ফল্গুনদী, বটবৃক্ষ, তুলসী, ব্রাহ্মণ এবং জ্ঞানবান কাক। 'গয়াশ্রাদ্ধ' পালার উল্লেখ এইরূপ ;

দশরথ বলে সাক্ষী রহিল পঞ্চজন।
ফল্গুনদী বটবৃক্ষ তুলসী ব্রাহ্মণ ॥
কাক বৃক্ষে বস্যা আছে অতি জ্ঞানবান।
সাক্ষী রহিল মাতা এই পঞ্চজন ॥
কৃপা করি দেহ মাগো তবে কিছু বালি।
আমার হাতেতে দেহ ফল্গু নদীর বালি ॥
এত শুনি জানকী ভাসিল অশ্রুজলে।
কান্দিতে কান্দিতে গেলা ফল্গুনদীর (কুলে) ॥
তিন মুষ্টি বালি নিল্যা করিয়া আঁচলে।
শীঘ্র গতি আল্য সীতা বটবৃক্ষ তলে ॥
ব্রাহ্মণ বলেন মন্ত্র সীতার সাক্ষাতে।
জানকী দিলেন বালি নৃপতির হাথে।
শুভক্ষণে মহারাজা করিল ভোজন।
রথে চাপি দশরথ করিল গমন ॥

(গয়াশ্রাদ্ধ পালা, পু.পৃ. ৩-৪ক)

সাক্ষ্য দান ব্যাপারে কবিচন্দ্র, 'শিবপুরাণ'-এর ফল্গুনদীকে গ্রহণ করিলেও অপর তিনজন ধেনু, অগ্নি ও কেতকীর স্থলে বটবৃক্ষ, তুলসী, ব্রাহ্মণ ও জ্ঞানবান কাক এই চারিজনকে গ্রহণ করাব মধ্যে বাঙ্গালী সংস্কার কার্যকরী হইয়াছে। একমাত্র বটবৃক্ষই সত্য সাক্ষ্যদান করে। অপর সকলের মিথ্যা সাক্ষ্য দানের অভিযোগে সীতাদেবী সকলকে অভিশাপ প্রদান করেন।

'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর প্রভাব

কবিচন্দ্রের রামায়ণের যে সকল স্থলে 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর প্রভাব পাওয়া যায় এখানে উদ্ধৃতি সহকারে তাহা আলোচিত হইল।[১১] 'রঘুনাথের বনবাস' পালাব বামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক অংশ 'শ্রীমদ্ভাগবত' হইতে গৃহীত। প্রথমে 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এব শ্লোক ও অনুবাদ উল্লেখ করিযা পরে কবিচন্দ্রের প্রাসঙ্গিক অংশ প্রদত্ত হইয়াছে। 'শ্রীমদ্ভাগবত'-

এর (নবম স্কন্ধ/দশম অধ্যায়ে) প্রথম তিনটি শ্লোকের ভাবানুবাদ কবিচন্দ্রের একটি অনুচ্ছেদের মধ্যেই পাওয়া যায় ; যথা:-

এক । "খট্টাঙ্গাদ্দীর্ঘবাহুশ্চ রঘুস্তস্মাৎ পৃথুশ্রবাঃ।
অজস্ততো মহারাজ স্তস্মাদ্দশরথোঽভবৎ ।।
তস্যাপি ভগবানেব সাক্ষাদ্ব্রহ্মময়ো হরিঃ ।
অংশাংশেন চতুর্ধাগাৎ পুত্রত্বং প্রার্থিতঃ সুরৈঃ ।।
রামলক্ষ্মণভরতশত্রুঘ্না ইতি সংজ্ঞয়া ।।"১।।

—— "শুকদেব কহিলেন, খট্টাঙ্গ রাজার পুত্র দীর্ঘবাহু, তাঁহা হইতে মহাযশস্বী রঘুর জন্ম হয় । ঐ রঘুর তনয় মহাযশাঃ অজ । হে মহারাজ ! ঐ অজ হইতে মহাত্মা দশরথ জন্মগ্রহণ কবেন ।ব্রহ্মময় হরি সাক্ষাৎ ভগবান্ দেবগণের প্রার্থনায় রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন এই চারি নামে চারি অংশে বিভক্ত হইয়া যাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন ।।"১।।

দুই । 'তস্যানুচরিতং রাজন্নৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ।
শ্রুতং হি বর্ণিতং ভূরি ত্বয়া সীতাপতের্মুহুঃ" ।।২।।

—— "হে রাজন, বাল্মীকি প্রভৃতি তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ সীতাপতি ঐ রামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন, তাহা যদিও তোমার বারংবার শ্রুত হইয়াছে তথাপি সংক্ষেপে বলিতেছি অবধান কর"।।২।।

তিন । "গুর্ব্বর্থে ত্যক্তরাজ্যো ব্যচবদনুবনং পদ্মপদ্ভ্যাং প্রিয়ায়াঃ
পাণিস্পর্শাক্ষমাভ্যাং মৃজিতপথরুজো যো হরীন্দ্রানুজাভ্যাম্ ।
বৈরূপাৎ শূর্পণখ্যাঃ প্রিয়বিরহরুষা রোপিত ভ্রূ বিজৃম্ভ-
ত্রস্তাব্ধির্বদ্ধসেতুঃ খলদবদহনঃ কোশলেন্দ্রোঽবতান্নঃ" ।।৩।।

—— "যিনি পিতৃসত্য পালনার্থ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়ার হস্ত দ্বারাও যাহা স্পর্শ করিতে ক্ষমতা ছিল না, তাদৃশ পদ্মবৎ সুকুমার পদদ্বয়ে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, বানরেন্দ্র হনূমান্ অথবা সুগ্রীব এবং অনুজ লক্ষ্মণ যাঁহার পথ শ্রান্তি অপনয়ন করিয়া দিতেন, শূর্পণখার কর্ণ নাসিকা ছেদন করিয়া বৈরূপ্য করাতে সে রাবণের নিকট গিয়া লোভ দর্শাইলে রাবণ আসিয়া যাঁহার প্রেয়সী সীতাকে অপহবণ করিয়া লইয়া যায়, প্রিয়াবিরহ জন্য রোষে যদীয় ভ্রূ বিজৃম্ভণে সমুদ্র সন্ত্রস্ত হয় । অনন্তর তাহার বিজ্ঞাপনে যিনি সেতুবন্ধন করিয়া রাবণাদি খলগণ রূপ গহণের দাবানল হন্, সেই কোশলেন্দ্র শ্রীরামচন্দ্র আমাদিগকে রক্ষা করুন"।।৩।।

'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর এই তিনটি শ্লোকের কবিচন্দ্র কৃত রামায়ণের মিল এইরূপ :-

খট্টাঙ্গ রাজার পুত্র দীর্ঘবাহু হল্য ।
দীর্ঘবাহুর তনয় দিলীপ জন্মিল ।।

দিলীপের সুত অজ অসীম মহত্ত্ব
অজের তনয় তবে হৈল দশরথ
তাঁর পুত্র ভগবান ব্রহ্মময় হরি।
অংশাঅংশে জন্মিল রামরূপের মাধুরী
জ্যেষ্ঠ সুত রঘুনাথ অপর ভরত
লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন হৈল দুঁহে গুণযুত
চারিপুত্র দেখি রাজা আনন্দিত মন।
প্রাণতুল্য দশরথের রাজীবলোচন ॥
শুক কহে নিবেদিয়ে শুন মহারাজন।
বাল্মীকে রামের লীলা বর্ণি পুনর্বার ॥
রামনামে দ্রবে চিত্ত বা (স) না আমার।
পিতৃবাক্য রামচন্দ্র শুনিঞা শ্রবণে।
পদ্ম জিনি পাদপদ্মে ভ্রমিলা গহনে ॥
সীতার কমলহাথ বাজে যাঁর পায়।
হেন পদ পথে পথে ভূষিত ধূলায় ॥
প্রভু রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব দুঁহে সাথে।
পদরজ সৃজিত করিলা রঘুনাথে ॥
শূর্পণখা সনে সীতা বিভাব কৈল।
প্রিয়ার বিরহে গুপ্ত সমুদ্র বান্ধিল ॥
রাবণ রাজাকে রাম জেন দাবানল।
ভকতে করুন রক্ষা ভকতবৎসল ॥
রামের চরিত্র রাজা সং (ক্ষে)পেতে শুন।
রামলীলা সুধারস কহি পুনঃপুনঃ ॥

(রঘুনাথের বনবাস, পু.পৃ. ১)

উপরে বর্ণিত 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর নবমস্কন্ধের দশম অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকের সঙ্গে কবিচন্দ্রের 'রঘুনাথের বনবাস' পালার প্রথম পত্রের মিল একেবারে যথাযথ। কিন্তু এই পত্রের দুইটি ছত্রে কবিচন্দ্র 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর অর্থের অনুরূপ না করিয়া তাঁহার রচনাতে কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন, তাহাতে অর্থ ক্ষুণ্ন হইলেও কাব্যোচিত রস সৃষ্টি হইয়াছে ; যথা :-

"সীতার কমলহাথ বাজে যাঁর পায়।
হেন পদ পথে পথে ভূষিত ধূলায়"। (রঘুনাথের বনবাস, পু.পৃ.১)

'শ্রীমদ্ভাগবত'-এ আছে :-

"গুর্ব্বর্থে ত্যক্তরাজ্যো ব্যচরদনুবনং পদ্মপদ্ভ্যাং প্রিয়ায়াঃ
পাণিস্পর্শাক্ষমাভ্যাং মৃজিতপথরুজো যো হরীন্দ্রানুজাভ্যাম্" ।।৩।।

এই তৃতীয় শ্লোকের প্রথমার্ধের অনুবাদ ও টীকার সঙ্গে কবিচন্দ্রের রচনার মিল পাওয়া যায় না। উহার অনুবাদটি এইরূপ :- "যিনি পিতৃসত্য পালনার্থ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়ার হস্ত দ্বারাও যাহা স্পর্শ করিতে ক্ষমতা ছিল না, তাদৃশ পদ্মবৎ সুকুমার পদদ্বয়ে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন।"[১৬]

অতএব কবিচন্দ্র উপর্যুক্ত ছত্রদুইটি পরিবর্তিত করিয়া যে কাব্যোচিত রসদান করিয়াছেন উহাই এই ছত্র দুইটির বৈশিষ্ট্য। ইহার পরের অংশে 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর শ্লোক দুইটি এইরূপ:-

এক। "বিশ্বামিত্রাধ্বরে যেন মারীচাদ্যা নিশাচরাঃ।
পশ্যতো লক্ষ্মণস্যৈব হতা নৈর্ঋত পুঙ্গবাঃ" ।।৪।।

—— "সেই রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে মারীচাদি প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগকে একাকী নিহত করিয়াছিলেন, লক্ষ্মণ নিকটে থাকিয়া দেখিতেছিলেন, তাঁহারও অপেক্ষা করেন নাই" ।।৪।।

দুই। "যো লোক বীরসমিতৌ ধনুরৈশমুগ্রং সীতাস্বয়ম্বর গৃহে ত্রিশতোপনীতং।
আদায় বালগজলীল ইবেক্ষুযষ্টিং সজ্জীকৃতং নৃপ বিকৃষ্য বভঞ্জ মধ্যে" ।।৫।।

—— "তিনি সীতার স্বয়ম্বর গৃহে বীরপুরুষসমূহের সমাজমধ্যে মহাদেবের ধনু ইক্ষুদণ্ডবৎ গ্রহণ করিয়া জ্যারোপণানন্তর আকর্ষণ ও মধ্যভাগে ভগ্ন করেন। হে মহারাজ ! সেই ধনু অতিশয় গুরুতর ছিল, তিন শত বাহকে তাহা আনয়ন করিয়া দেয়। পরন্তু রামচন্দ্রের লীলা বালগজ তুল্য অদ্ভুত, অতএব তিনি অবলীলাক্রমে তাহাও ভাঙ্গিয়া ফেলেন" ।।৫।।

উপরে উল্লিখিত 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর[১৭] (৯ম স্কন্ধ/১০ম অঃ/৪-৫ শ্লোঃ) অনুরূপ ব্যাখ্যা কবিচন্দ্রের কাব্যেও পাওয়া যায় ;

বাল্যে বিশ্বামিত্রে যজ্ঞ করিল রক্ষণ।
তাড়কা মারীচ আদি করিল নিধন ।।
যে রাম ধনুক অগ্রে স্বয়ম্বর ঘরে।
তিন শত লোকে ধনু তুলিবারে নারে ।।
এমন ধনুক রাম ধরে বাম হাথে।
গজশিশু শুণ্ডে যেন ইক্ষুযষ্টিতে ।।
চাড়া দিয়া আটঙ্কার মারিয়া দিল টান।

মধ্যে ভাঙ্গা ধনুক করিল দুইখান ।।
গজশিশু ইক্ষুদণ্ড ভাঙ্গিল যেমন ।
রামচন্দ্র হরধনু ভাঙ্গিল তেমন ।।
জয়শব্দ সাধুবাদ করে মুনিগণে ।
রাম দেখি বিস্ময় ভাবেন সভে মনে ।।
দশরথ আদি করি জনক আনাইল ।
সমাদরে মহারাজা রামে সীতা দিল ।।
পথে পরশুরামের দর্প করি রাম চূর ।
অযোধ্যায় আল্যা সুখে দয়ার ঠাকুর ।।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহেন রামের কথা ।
ব্যাস উক্তি শুক পরীক্ষিৎ রসগাথা ।।

(রঘুনাথের বনবাস, পু.পৃ. ১-২ক)

রঘুনাথের বনবাস পালার প্রথম দুই পত্র পাঠ করিয়া মনে হয় কবি 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এ বর্ণিত বাম-কথার ভাবানুবাদই করিয়াছেন। 'গজশিশু', ''ইক্ষুদণ্ড'' ইত্যাদি শব্দও উপরের ৫ম শ্লোক হইতে সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হইয়াছে। ভণিতার শেষে 'ব্যাস উক্তি' ও 'শুক পরীক্ষিৎ' কথা 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর বর্ণনাকেই স্মরণ করায়। উপরের দুইটি পত্রের সঙ্গে 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর সাদৃশ্য হেতু, বলা যায় কবিচন্দ্র 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর অনুসরণে ''রামলীলা'' কাব্যটির রচনা শুরু করেন। কিন্তু 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এ যে রাম-কথা আছে তাহা খুবই সংক্ষিপ্ত, রামায়ণের সারাংশই তাহাতে গৃহীত হইয়াছে। কবিচন্দ্র রাম-কথার এই সারাংশকেই গ্রহণ করিয়া স্বীয় অভিপ্রেতমত স্থানে স্থানে পরিবর্তন করিয়াছেন।

'রঘুনাথের বনবাস' পালার আরম্ভ যে 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর প্রভাবে রচিত তাহা উক্ত দুই পত্রের সাদৃশ্যেই প্রমাণিত হয়। শুধু রচনাগত মিলই নয়, কবিচন্দ্র বহুবার বিভিন্ন পালায় 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর 'নবম স্কন্ধের' 'দশম অধ্যায়'-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

অতঃপর 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এর কাহিনী অনুসরণ করিলেও কবিচন্দ্রের এই কাব্যটিতে 'শ্রীমদ্‌ভাগবত'-এর প্রভাবই অন্তঃশীলা ফল্গুর ন্যায় প্রবাহিত। 'সীতাহরণ' পালাটিও 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর ভাবাদর্শে রচিত। তবে এই পালাটিতেও কবিচন্দ্র কিছু কিছু পরিবর্তন ও দুইটি ভাগবত বহির্ভূত কাহিনী সংযোজন করিয়াছেন।

'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর নবম স্কন্ধের দশম অধ্যায়ে (২৯-৩৯ শ্লোঃ) শ্রীবামচন্দ্রের রাজ্য প্রাপ্তিতে দেশে ব্যাধি, জরা, শোক, দুঃখ ভয় অথবা ক্লান্তির অবসান আব ভাবজ্ঞা সীতাদেবী কর্তৃক আনুগত্য ও শীলতা দ্বারা রামচন্দ্রের চিত্তহরণে কাহিনী সমাপ্ত। কবিচন্দ্র সংক্ষেপে

শ্রীমদ্ভাগবতের এই গম্ভীর উদাত্ত ভাবকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার 'রঘুনাথের দেশাগমন' পালা রচনা করিয়াছেন । ইহাব পর একাদশ অধ্যায়ে অনুজদিগের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যায় বাস, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ও সীতার বনবাস সংক্ষেপে বর্ণিত হইলেও এই সম্পর্কে কবিচন্দ্রের রচিত কোনও পালার সন্ধান পাওয়া যায় নাই ।

'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এর প্রভাব

'রামচন্দ্রের বনবাস' পালায় দশরথ কর্তৃক কৈকেয়ীকে বরদান প্রসঙ্গ হইতে অধ্যাত্ম রামায়ণের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়, তবে অমিল অংশ খুব সামান্য । কবিচন্দ্রের রামায়ণের সঙ্গে পার্থক্য বিচারের জন্য অধ্যাত্ম রামায়ণের কয়েকটি শ্লোক ও অনুবাদ ক্রমান্বয়ে উদ্ধৃত হইল ।[১৮]

"পুরাদেবাসুরযুদ্ধে রাজা দশরথঃ স্বয়ম্ ।
ইন্দ্রেণ যাচিতো ধন্বী সহায়ার্থং মহারথঃ ।।৬৬।।
জগাম সেনয়া সার্দ্ধং ত্বয়া সহ শুভাননে ।
যুদ্ধং প্রকুর্ব্বতস্তস্য রাক্ষসৈঃ সহ ধন্বিনঃ ।।৬৭।।
তদাক্ষকীলো ন্যপতচ্ছিন্নস্তস্য ন বেদ সঃ ।
ত্বন্তু হস্তং সমাবেশ্য কীলরন্ধ্রেঽতিধৈর্য্যতঃ ।।৬৮।।
স্থিতবত্যসিতাপাঙ্গী পতিপ্রাণপরীপ্সয়া ।
ততো হত্বাসুরান্ সর্ব্বান্ দদর্শ ত্বামরিন্দমঃ।।৬৯।।
আশ্চর্য্যং পরমং লেভে ত্বামালিঙ্গ্য মুদান্বিতঃ।
বৃণীষ্ব যৎ তে মানসি বাঞ্ছিতং বরদোঽস্ম্যহম্
ববদ্বয়ং বৃণীষ্ব ত্বমেবং রাজাবদৎ স্বয়ম্" ।।৭০।।

—— হে শুভাননে ! পূর্বকালে দেবাসুর সংগ্রামে ইন্দ্র, ধনুর্দ্ধর মহারথ স্বয়ং রাজা দশরথকে সাহায্য করিতে প্রার্থনা করেন ; তাহাতে তিনি সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে ও তোমাকে লইয়া যুদ্ধে গমন করেন ; ধনুর্দ্ধব বাজা রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, ইত্যবসরে, তদীয় রথের অক্ষকীল ছিন্ন হইয়া নিপতিত হয়, তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই ; তুমি কিন্তু সে সময়ে স্বামীর জীবন রক্ষার্থ কীলচ্ছিদ্রে হস্ত প্রবেশ করাইয়া অতি ধীরভাবে অবস্থিত ছিলে, তোমার নয়ন প্রান্তে স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণতা পর্য্যন্ত অপগত হয় নাই । অনন্তর সেই শত্রুসূদন রাজা সমস্ত অসুরদিগকে সংহাব করিয়া তোমাকে সেইরূপে অবস্থিত থাকিতে দেখিলেন । তাঁহার অতীব আশ্চর্য্য বোধ হইল, রাজা সহর্ষে তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া আপন হইতেই বলিতে লাগিলেন, যাহা তোমার মনের অভিলাষ তাহাই প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে বর দিতেছি ; — দুইটি বর প্রার্থনা কব ।"

(অযোধ্যাকাণ্ড/২য় অঃ/৬০-৭০ শ্লো/পৃ. ৪৬)

অর্থাৎ রথের কীল রন্ধ্রে হস্ত প্রবেশ করিয়া রাজা দশরথের জীবন রক্ষা কবিলে তিনি কৈকেয়ীকে বর দিতে চান কিন্তু রাণী তখন বর দুইটি গচ্ছিত রাখেন। কবিচন্দ্রের কাব্যে কৈকেয়ী কর্তৃক যুদ্ধক্ষেত্রে দশরথের জীবনরক্ষা করার প্রসঙ্গ নাই, পরিবর্তে নানা মহৌষধি দ্বারা ব্রণের যন্ত্রনা নিরাময় করার উল্লেখ পাওয়া যায়।

(অমিল অংশ) পূর্বে দেবাসুর যুদ্ধে দশরথ গেল।
সম্বরে বধিয়া রাজা ইন্দ্রে রাজ্য দিল ॥
অঙ্গুলে হইল ব্রণ রাজা পীড়া পান।
নানা মহৌষধি দিয়া কৈলে পরিত্রাণ ॥
বেদনার জ্বালা বড় কব্যাছিলে বেতে।
রজপূঁজ ফাটিয়া পড়িল ব্রণ হত্যে ॥
তুষ্ট হয়্যা বর দুই দিয়াছে তোমারে।
রাখ্যাছ সে দুটি বর কোন কার্যের তরে ॥
সেই দুই বর আজি তুমি মাগ্যা লহ।
ভরতে রাজত্ব রামে বনবাস দেহ ॥

(রঘুনাথের বনবাস, পু.পৃ. ৪-৫ক)

দাসী মন্থরা কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া কৈকেয়ী যে ভাষায় তাহাকে প্রশংসিত করিয়াছিলেন তাহা উভয় কাব্যে প্রায় একরূপ। অধ্যাত্ম রামায়ণে এইরূপ :-

"স্বয়ং ত্বাং বুদ্ধিসম্পন্নাং ন জাতে বক্রসুন্দরি।
ভরতো যদি রাজা মে ভবিষ্যতি সুতঃ প্রিয়ঃ ॥৭৭॥
গ্রামান্ শতং প্রদাস্যামি মম ত্বং প্রাণবল্লভা" ॥৭৮॥

——"বলি, বক্রসুন্দরি! তোমাকে ত এরূপ বুদ্ধিমতী বলিয়া জানিতাম না; যদি আমার প্রিয় পুত্র ভরত রাজা হয়, তাহা হইলে তোমাকে একশত গ্রাম প্রদান করিব; তুমি আমার প্রাণের মত প্রিয়।" (অযোধ্যা কাণ্ড /২য় অঃ/৭৭-৭৮ শ্লো/পৃ. ৪৬-৪৭)

এই বর্ণনার সঙ্গে কবিচন্দ্রের রচনার মিল আছে।

(মিল) কৈকেয়ী বলেন কুব্জা কোথা বুদ্ধি পালি।
উপায় বলিয়া মোর প্রাণ দান দিলি॥
★ ★ ★ ★ ★
ভরত রাজত্ব পাল্যে রাম গেলে বনে।
অমূল্য রতন দিব আছে মোর মনে ॥
একশত গ্রাম দিব পদক প্রবাল।
পুরটের কাঁঠী হীরা মণি কন্ঠমাল ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৫ক)

কাজেই উভয় কাব্যেই বাণী মন্থরাকে একই ভাষায় পুরস্কৃত করেন। আবার ক্রোধাগারে রাজা দশবথের কৈকেয়ীকে সান্ত্বনাদানের ভাষাও উভয়কাব্যে এক। অধ্যাত্ম রামায়ণেব উল্লেখ এইরূপ :-

"ব্রূহি কং ধনিনং কুর্য্যাং দরিদ্রংতে প্রিয়ঙ্করম্।
ধনিনং ক্ষণমাত্রেণ নির্ধনঞ্চ তবাহিতম্ ।।১২
ব্রূহি কং বা বধিষ্যামি বধার্হো বা বিমোক্ষ্যতে।
কিমত্র বহুনোক্তেন প্রাণান্ দাস্যামি তে প্রিয়ে ।।১৩।।
মম প্রাণাৎ প্রিয়তরো রামো রাজীবলোচনঃ ।।
তস্যোপরি শপে ব্রূহি ত্বদ্ধিতং তৎ করোম্যহম্" ।।১৪।।

(অযোধ্যাকাণ্ড/৩য় অঃ/১২-১৪ শ্লো/পৃ.৪৮)

—— "বল ; তোমার প্রিয়কারী কোন্ দরিদ্রকে ধনী করিব ; বা তোমার অপকারী কোন্ ধনীকে ক্ষণমাত্রে নির্দ্ধন করিব। বল ; কাহাকেও বধ করিব — না কোন বধ্য ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া দিব ? প্রিয়ে ! এ বিষয়ে অধিক আর কি বলিব ? আমার প্রাণ তোমার হস্তে দিতে পাবি (ইচ্ছা করিলে আমাকে বধ করিতে বা জীবিত রাখিতে পার) ; কমললোচন রাম আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর ; সেই রামের উপর শপথ করিতেছি তোমার কোন হিতকার্য্য করিতে হইবে বল, আমি তাহা করিতেছি।"

(অযোধ্যাকাণ্ড/৩য় অঃ/১২-১৪ শ্লোঃ/পৃ. ৪৮)

কবিচন্দ্রের কাব্যে রাজা দশরথ অনুরূপভাবে অভিমানিনী রাণীকে শান্ত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

(মিল) কেবল তোমার বশ মোর মন জান।
তথাপি আমারে তুমি দুঃখ দেহ কেন ।।
ধনিনে দরিদ্র করি আজ্ঞা পাই যদি।
দরিদ্রে ধনিন করি দিয়া রত্ন নিধি ।।
প্রাণ চাহ প্রাণ দিব ধনে আছে কি।
প্রকাশ করিয়া কহ ভূপতির ঝি ।।
রামের সমান মোর প্রিয় কেহ নাঞি।
শ্রীরামেরে দিব্য আমি করি তোর ঠাঞি ।।
তোমা ছাড়া একদণ্ড রহিতে নারিব।
যা মাগিবে চন্দ্রমুখী সেই বর দিব ।।

(প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৫-৬ক)

এই অংশেও উভয় কাব্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। বাংলা শব্দ 'ধনী' কিন্তু উপরের সংস্কৃত শব্দের অনুসারে 'ধনিন' শব্দটিকে অপরিবর্তিতরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

রাজাকে সত্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বুঝিতে পারিয়া কৈকেয়ী যে লোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করান তাহাতে রাজা কৈকেয়ীকে 'ব্যাঘ্রীর ন্যায়' অবলোকন করতঃ অচেতন অবস্থা প্রাপ্ত হন।

'ইত্যালোক্য পুরঃ পত্নীং ব্যাঘ্রীমিব পুরঃস্থিতাম্' ॥ ২৫ ॥

(অযোধ্যা/৩য় অঃ/পৃ.৪৯)

কবিচন্দ্রের ভাষায় —

(মিল) শোকেতে আকুল রাজা চারি পানে চায়।
কৈকেয়ীরে দেখে আগে বাঘিনীর প্রায় ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৬ক)

অধ্যাত্ম রামায়ণে রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে এই সময়ে বলপূর্বক রাজ্যগ্রহণ করিতে বলিয়াছেন কিন্তু কবিচন্দ্রের কাব্যে তাহা পাওয়া যায় না ; যথা :-

"স্ত্রীজিতং ভ্রান্তহৃদয়মুন্মার্গপরিবর্ত্তিনম্।
নিগৃহ্য মাং গৃহাণেদং রাজ্যং পাপং ন তদ্ভবেৎ ॥৬৯॥
এবং চেদনৃতং নৈব মাং স্পৃশেদ্রঘুনন্দন।
ইত্যুক্ত্বা দুঃখসন্তপ্তো বিললাপ নৃপস্তদা" ॥৭০॥

—— "আমি স্ত্রীবশ ভ্রান্তবুদ্ধি ও বিপথগামী ; আমাকে নিগৃহীত করিয়া বলপূর্বক এই রাজ্য গ্রহণ কর ; তাহাতে তোমার পাপ হইবে না ; এবং হে রঘুনন্দন ! এইরূপ করিলে আমাকেও সত্যচ্যুত হইতে হইবে না।" "এই বলিয়া রাজা তখন সাতিশয় দুঃখে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥" (অযোধ্যাকাণ্ড/৩য় অঃ/৬৯-৭০ শ্লোঃ/পৃ. ৫২)

কবিচন্দ্রের দশরথ সে স্থলে শুধুই বিলাপ করিতে থাকেন। বলপূর্বক রাজ্য গ্রহণের কথা তিনি বলেন নাই।

(অমিল) দশরথ বলে রাম বিধাতা আমারে বাম
কিবল্যা বলিব বনে জাহ।
জীবনে নাহিক কাজ দেশ জুড়্যা হল্য লাজ
কালি জায়্য আজি দেশে রহ ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৮)

কিন্তু রামচন্দ্র সত্যপ্রতিজ্ঞ, মাতা কৌশল্যার শত অনুরোধ ও ভীতি প্রদর্শন উপেক্ষা করিয়া বনগমনে স্থির সঙ্কল্প করেন। রাণী কৌশল্যার চরিত্র 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' অপেক্ষা কবিচন্দ্রের কাব্যে অধিক বিকশিত। সীতার দৃঢ় উক্তি উভয় কাব্যেই খুব সুস্পষ্ট। বনগমনে অভিলাষিণী সীতাদেবীর রামচন্দ্রের প্রতি উক্তি এইরূপ :-

"সীতাং বিনা বনং রামো গতঃ কিং কুত্রচিদ্বদ ।
অতস্ত্বয়া গমিষ্যামি সর্ব্বথা ত্বৎসহায়িনী ।।৭৮।।
যদি গচ্ছসি মাং ত্যক্ত্বা প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি তেঽগ্রতঃ ।
ইতি তং নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা সীতায়া রঘুনন্দনঃ" ।।৭৯।।

—— "সীতা ব্যতীত রাম বনে গিয়াছেন, ইহা কোনখানে আছে কি ? — বল ! বিশেষ আমি ত তোমার সকল কার্য্যে সম্পূর্ণ সহায় ; অতএব তোমার সহিত গমন করিব । যদি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহ, তাহা হইলে তোমার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিব।"

(অযোধ্যাকাণ্ড/৪র্থ অঃ/৭৮-৭৯ শ্লোঃ/পৃ. ৫৯)

কবিচন্দ্রের সীতাও বামচন্দ্রের সঙ্গে বনে যাইতে না পারিলে প্রাণত্যাগ করিবেন বলিয়া জানান —

(মিল) সীতা বলে কারে এত যোগ কহ তুমি ।
স্বর্গে অভিলাষ নাঞি বন জাব আমি ।।
যুবতীর পতি গতি রহিতে নারিব ।
এড়্যা গেলে অহে নাথ পরাণে মরিব ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১১)

অধ্যাত্ম রামায়ণে সীতার এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া রঘুনন্দন রামচন্দ্র সীতাকে তাঁহার সমস্ত আভরণ অরুন্ধতীকে প্রদান করিতে বলেন ;

"অব্রবীদ্দেবি গচ্ছ ত্বং বনং শীঘ্রং ময়া সহ ।
অরুন্ধত্যৈ প্রযচ্ছাশু হারাণাভরণানি চ ।
ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং সর্ব্বং দত্ত্বা গচ্ছামহে বনম্" ।।৮০।।

—— "দেবি ! শীঘ্র আমার সহিত বনে চল; হার ও অন্যান্য আভরণ অবিলম্বে অরুন্ধতীকে প্রদান কর । ওহে আমরা সকলেই ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিয়া বনগমন করি।"

(অযোধ্যাকাণ্ড/৪র্থ অঃ/৮০ শ্লোঃ/পৃ.৫৯)

কিন্তু কবিচন্দ্রের কাব্যে অরুন্ধতীকে আভরণ বা ধন দানের কোনও উল্লেখ নাই । তবে রামচন্দ্র ধন প্রদানের জন্য একবার দ্বিজদিগকে আনিতে আদেশ করেন ।

(অমিল) আদেশ পাইয়া বীর সুযজ্ঞে আনিল ।
কুণ্ডল অঙ্গদ হার নানা রত্ন দিল ।।
নানা ধনে তোষে রাম যত দ্বিজগণে ।
প্রবেশ করিল রাম পিতার ভবনে ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১২)

অধ্যাত্ম রামায়ণে রামচন্দ্রের বনগমন প্রসঙ্গ বর্ণনায় বক্তা মহাদেব, শ্রোতা পার্বতী । আর কবিচন্দ্রেব কাব্যে বক্তা শুক তপোধন এবং শ্রোতা পরীক্ষিৎ ।

পরীক্ষিৎ মহারাজা করে জিজ্ঞাসন ।
কহিতে লাগিলা তবে শুক তপোধন ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১২)

অধ্যাত্ম রামায়ণে পাওয়া যায় মূঢ়বুদ্ধি কৈকেয়ীকে দোষারোপ করিতে থাকিলে রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার তাহা জানিয়া মুনিবর বামদেব সাধুগণের মধ্যবর্তী হইয়া রামচন্দ্র ও সীতার জন্য শোক করিতে নিষেধ করেন ও তত্ত্বকথা সকলকে অনুধাবন করিতে বলেন ;

"এষ রামঃ পরো বিষ্ণুরাদির্নারায়ণঃ স্মৃতঃ ।
এষা সা জানকী লক্ষ্মীর্যোগমায়েতি বিশ্রুতা ।।১১।।
অসৌ শেষস্তমন্বেতি লক্ষ্মণাখ্যশ্চ সাম্প্রতম্ ।
এষ মায়াগুণৈর্যুক্তস্তত্তদাকারবানিব" ।।১২ ।।

—— "এই রাম আদি নারায়ণ পরমবিষ্ণু বলিয়া স্মৃত হইয়াছেন । এই জনকনন্দিনী যোগমায়া বলিয়া প্রসিদ্ধা সেই লক্ষ্মী ; আর অনন্তদেব সম্প্রতি লক্ষ্মণ নাম ধারণ করিয়া সেই বিষ্ণুর অনুগমন করিতেছেন । ইনি (রাম) মায়া গুণযোগে সেই সেই আকার যুক্তের ন্যায় প্রতীয়মান হন ।" (অ. কাণ্ড/৫ম অঃ/১১-১২শ্লোঃ/পৃ. ৬০)

রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার । পূর্বকালে বিষ্ণুই মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন ও পরশুরাম মূর্তি ধারণপূর্বক জগৎকে রক্ষা করিয়াছেন । সেই জগদীশ্বর এখন রামরূপেঅবতীর্ণ হইয়া ভূভার রক্ষা করিতে আসিয়াছেন । কবিচন্দ্র এই প্রসঙ্গটি যেভাবে বর্ণনা করিয়া রামচন্দ্রের অবতারত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এইরূপ,

(মিল) তারপর বামদেব মুনি সর্বে কয় ।
মোর ঠাঞি শুন সভে দূর কর ভয় ।।
এই রাম আদি পুরুষ নারায়ণ ।
জানকী কেবল লক্ষ্মী অনন্ত লক্ষ্মণ ।।
মৎস্য আদি সকল ঞিহার অবতার ।
চরাচর যত কিছু সৃজন ঞিহার ।।
দশরথ বহু তপে আরাধিয়া হরি ।
রাম নামে পুত্ররূপে ভূপে কৃপা করি ।।
রাবণবধের তরে মানব শরীর ।
অতেব চলিলা বনে রাম রঘুবীর ।।
রাজা কৈকেয়ীরে দোষ দেহ সভে বৃথা ।
বিবরিয়া শ্রীরামেরে কহিলাঙ কথা ।।
রাম রাম রাম বাণী যেবা নিত্য জপে ।

যম ভয় নাঞি তার কিবা করে পাপে ॥
মায়ায় মানুষরূপ রাম অবতার ।
রাম নামে চারি যুগে তরিব সংসার ॥
এত শুনি সভাকার মোহ গেল কথো ।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে আধ্যাত্মিক মত ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১৪ক)

বনগমনের প্রাক্কালে কৈকেয়ীর ব্যবহার উভয় কাব্যে নির্মম তবে কবিচন্দ্রের কাব্যে নির্মমতর । অধ্যাত্ম রামায়ণে পাওয়া যায় :-

"ইত্যুক্ত্বা সহসোত্থায় চীরানি প্রদদৌ স্বয়ম্ ।
রামায় লক্ষ্মণায়াথ সীতায়ৈ চ পৃথক্ পৃথক্ ॥৩৫॥
রামস্তু বস্ত্রাণ্যুৎসৃজ্য বন্য চীরাণি পর্য্যধাৎ ।
লক্ষ্মণোঽপি তথাচক্রে সীতা তন্ন বিজানতী ॥৩৬॥
হস্তে গৃহীত্বা রামস্য লজ্জয়া মুখমৈক্ষত।
রামো গৃহীত্বা তচ্চীরমংশুকে পর্য্যবেষ্টয়ৎ" ॥৩৭॥

—— "রাম এই কথা বলিলে, কৈকেয়ী আপনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে পৃথক পৃথক চীরখণ্ড প্রদান করিল । রাম বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বনবাসোপযোগী চীরখণ্ড পরিধান করিলেন; লক্ষ্মণও তাহা করিলেন, সীতা তাহা পরিধান করিতে জানিতেন না, সুতরাং ঐ চীরখণ্ড হাতে করিয়া সলজ্জভাবে রামের মুখের দিকে চাহিলেন। রাম সেই চীর গ্রহণ করিয়া সীতার বস্ত্রোপরি বেষ্টন করিয়া দিলেন।"

(অযোধ্যাকাণ্ড/৫ম অঃ/৩৫-৩৭ শ্লোঃ/পৃ. ৬২)

কবিচন্দ্রের কৈকেয়ী সেই সময় তিনজনকে শুধু চীর-বসনই দেন নাই, গাত্রাভরণও খুলিয়া লইবার জন্য বাড়াবাড়ি করিতে থাকেন ;

(মিল) কৈকেয়ী পাপিনী দুষ্টা অতিশয় হয়্যা রুষ্টা ।
চীর-বসন নিল হাথে ।
লাজ ভয় পরিহরি হায় হায় মরি মরি
ধর ধর বলে রঘুনাথে ॥

★ ★ ★ ★ ★

কানেব কুণ্ডল ধরে রামচন্দ্র কন তারে
আজ্ঞা কর ভূপতির ঝি ।
বস্য মা বাপার পাশে রামচন্দ্র মৃদু ভাষে
আপনি খসায়্যা আমি দি ॥

পদক প্রবাল বালা হার হীবা কন্ঠমালা
খসাইল কানের কুণ্ডল ।
লক্ষ্মণেব পানে চান সীতার না বাঁচে প্রাণ
একে একে দিলেন সকল ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১৪ক)

কৈকেয়ীর ব্যবহাবে সকলে রোদন করিতে থাকিলে বশিষ্ঠদেব ক্রোধে ভর্ৎসনা করিয়া কৈকেয়ীকে যাহা বলেন অধ্যাত্ম রামায়ণে তাহা এইরূপ -

"কৈকেয়ীং প্রাহ দুর্ব্বৃত্তে রাম এব ত্বয়া বৃতঃ ।
বনবাসায় দুষ্টে ত্বং সীতায়ৈ কিং প্রযচ্ছসি ।।৩৯।।
যদি রামং সমন্বেতি সীতা ভক্ত্যা প্রতিব্রতা ।
দিব্যাম্বরধরা নিত্যং সর্ব্বাভরণভূষিতা ।
রময়ত্বনিশং রামং বনদুঃখনিবারিণী" ।।৪০।।

—— "রে দুর্ব্বৃত্তে ! তুই কেবল রামের বনবাসই বর লইয়াছিস্ ; দুষ্টে ! সীতাকে বনবাসোপযোগী চীর খণ্ড দিলি কেন ? তবে পতিব্রতা সীতা ভক্তিবশতঃ যদি রামের অনুগামিনী হন, সে কথায় তোর কাজ কি ? উনি নিরন্তর দিব্য বস্ত্র ও দিব্য অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া রামের বনবাস দুঃখ নিবারণ করতঃ সকল সময়েই আনন্দদায়িনী হইবেন ।"

(অযোধ্যাকাণ্ড/৫ম অঃ/৩৯-৪০ শ্লোঃ/পৃ.৬২)

অধ্যাত্ম রামায়ণে বশিষ্ঠদেব কৈকেয়ীর প্রতি যত পরুষ ও কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন কবিচন্দ্রে তেমন নহে । উহাতে বশিষ্ঠদেব অনেক সংযত ও ধীর ;

(অমিল) সীতার কুণ্ডল ধরি কোপ করি টানে ।
কাতর হইয়া সীতা চান রাম পানে ।।
না লইবে জানকীর বসন ভূষণ।
বশিষ্ঠ বুঝায়্যা তারে করে নিবারণ ।।
বশিষ্ঠ করিয়া কোপ কৈকেয়ীরে কয় ।
সীতারে পরাত্যে চীর সমুচিত নয়।।
শ্রীরামের বনবাস সীতা কৈল কি ।
পবিণামে পাবে দুঃখ ভূপতির ঝি ।।
দূরে পেল চীর না পরায়্য জানকীরে ।
বসন ভূষণ দিয়া পাঠাও সমাদরে ।
বশিষ্ঠের কথা কৈকেয়ী না করে লঙ্ঘন ।
জানকীর না লইল বসন ভূষণ । (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১৪)

বশিষ্ঠদেবের বাক্যে কৈকেয়ী জানকীর বসন ভূষণ গ্রহণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন। বন গমনের পূর্বে রামচন্দ্র পিতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাত্রা শুরু করেন, আর লক্ষ্মণ বনবাসের নিমিত্ত যে সকল অস্ত্রাদি সংগ্রহ করেন তাহা দুই কাব্যে কিছু ভিন্ন। অধ্যাত্ম রামায়ণে পাওয়া যায় খড়্গ, ধনু ও তূণীরের উল্লেখ। কবিচন্দ্রের কাব্যে বরুণের প্রদত্ত ধনুর সঙ্গে তিমুখড়্যা অস্ত্রের নাম পাওয়া যায়।

"রামঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা পিতরং রথমারুহৎ।
লক্ষ্মণঃ খড়্গযুগলং ধনুস্তূণীযুগং তথা ॥৪৪॥
গৃহীত্বা রথমারুহ্য নোদয়ামাস সারথিম্।"

—— "রাম পিতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া রথে আরূঢ় হইলেন; আর লক্ষ্মণ, দুইখানি খড়্গ, দুইটি ধনু এবং দুইটি তূণীর লইয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক সারথিকে রথ চালাইতে আদেশ করিলেন।" (অযোধ্যাকাণ্ড/৫ম অঃ/৪৪-৪৫ শ্লোঃ/পৃ.৬৩)

এই অস্ত্রাদি সংগ্রহের বিষয় কবিচন্দ্রের কাব্যে অনেক পূর্বে যখন লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের নিকট বনবাসে সঙ্গী হইবে বলিয়া দৃঢ়তা প্রকাশ করে তখনই বর্ণিত হইয়াছে।

(স্থান পরিবর্তিত) অস্ত্রপাণি হয়্যা আমি আগে আগে জাব।
আমি ভক্ত অনুরক্ত সেবায় আসিব ॥
লক্ষ্মণের বুঝি মন কহেন ঠাকুর।
বাছ্যা বাছ্যা ভাল অস্ত্র লহরে প্রচুর॥
বরুণের দত্ত ধনু অক্ষয় তর্কচে।
তিমুখড়্যা লহ ভাই মনে যেবা রুচে ॥। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১২ক)

রামচন্দ্রের বিদায়কালে দশরথের করুণ অবস্থা উভয় কবিই মর্মস্পর্শী করিয়া তুলিয়াছেন। অধ্যাত্ম রামাযণে পাই :-

"তিষ্ঠ তিষ্ঠ সুমন্ত্রেতি রাজা দশরথোঽব্রবীৎ ॥৪৫॥
গচ্ছ গচ্ছেতি রামেণ নোদিতোঽচোদয়দ্রথম।
রামে দূরং গতে রাজা মূর্চ্ছিতঃ প্রাপতদ্ভুবি" ॥৪৬॥

—— "তখন রাজা দশরথ বলিতে লাগিলেন, — "সুমন্ত্র! থাক; — থাক! রাম — "চল চল" বলিয়া ত্বরা দিতে লাগিলে সুমন্ত্র রথ চালনা করিল। রাম দূরবর্তী হইলে, রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।"

(অযোধ্যাকাণ্ড/৫ম অঃ/৪৫-৪৬ শ্লোঃ/পৃঃ ৬৩)

কবিচন্দ্র দশরথের যে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এইরূপ ঃ

(মিল) বাপের বিলাপ রাম শুনিঞা শ্রবণে।
ত্বরায় চালায় অশ্ব প্রবেশি গহনে ॥

সারথি চালায় তবে বায়ুবেগে রথ ।
হা পুত্র হা সীতা বলি কান্দে দশরথ ।।
রাম সীতা লক্ষ্মণ আমার বাক্য শুন ।
দেখা দিয়া বনে যাহ ডাকি পুনঃপুনঃ ।।
দুই বাহু তুলি রাজা বলে রহ রহ ।
ভূমে পড়ে ধরিতে না পারে তারে কেহ ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১৬)

অতঃপর রামচন্দ্রাদির তমসা নদীতীরে কিয়ৎকাল অবস্থান, পথে সমৃদ্ধ জনপদ সকল দর্শন করতঃ শৃঙ্গবেরপুরের অনতিদূরে গঙ্গাতীরে উপস্থিতি, গুহের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও নিষাদ রাজ্যে অবস্থানকরতঃ উভয় ভ্রাতার আঁঠাদ্বারা জটাবন্ধন ইত্যাদি বিষয় অধ্যাত্ম রামায়ণের পঞ্চম অধ্যায়ের সঙ্গে মেলে । কিন্তু রামচন্দ্রের বনগমনে শোকার্ত দশরথের আক্ষেপ অধ্যাত্ম রামায়ণ অপেক্ষা কবিচন্দ্রে বিস্তৃততর । আক্ষেপের শেষাংশে ভণিতা নিম্নরূপ:-

ভাগবতে রামলীলা সংক্ষেপেতে কয় ।
বাল্মীকিতে রামলীলা কৈল বিস্তারিত ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১৬)

অর্থাৎ সংক্ষিপ্তভাবে ভাগবতে বর্ণিত রামলীলাকে গ্রহণ করিলেও তিনি বাল্মীকির কাব্য হইতে বিস্তৃততর অংশ গ্রহণ করিয়াছেন ।

অধ্যাত্ম রামায়ণের (অযোধ্যাকাণ্ড/৬ষ্ঠ অঃ) কিছু কিছু বিষয়, যথা- লক্ষ্মণ ও গুহক চণ্ডালের কথোপকথন — সুখ দুঃখের কারণ প্রাণীর আপন কর্মফল, গুহক কর্তৃক নৌকাযোগে তিনজনের গঙ্গা পার, সীতা কর্তৃক গঙ্গাকে পূজাদানের প্রতিশ্রুতি, ভরদ্বাজ আশ্রম ও বাল্মীকি আশ্রমে গমন ইত্যাদির সঙ্গে কবিচন্দ্রের কাব্যের মিল আছে । তবে কবিচন্দ্রের কাব্যে বর্ণিত বনে সুমন্ত্রকে রামচন্দ্রের বিদায় দান প্রসঙ্গ অধ্যাত্ম রামায়ণে পাওয়া যায় না ।

অধ্যাত্ম রামায়ণে সীতা কর্তৃক গঙ্গাকে স্তুতি এইরূপ ঃ-

"গঙ্গামধ্যে গতা গঙ্গাং প্রার্থয়ামাস জানকী ।।২১।।
দেবি গঙ্গে নমস্তুভ্যং নিবৃত্তা বনবাসতঃ ।
রামেণ সহিতাহং ত্বাং লক্ষ্মণেন চ পূজয়ে ।।২২।।
সুরামাংসোপহারৈশ্চ নানাবলিভিরাদৃতা"।

—— "জানকী মধ্য গঙ্গায় উপস্থিত হইয়া গঙ্গার নিকট প্রার্থনা করিলেন, —"হে দেবি ! গঙ্গে ! তোমাকে নমস্কার ; আমি রাম ও লক্ষ্মণের সহিত বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সুরা ও মাংস উপহার এবং অন্যান্য নানাবিধ উপহার দ্বারা সমাদরে তোমাকে পূজা দিব।"
(অযোধ্যাকাণ্ড/৬ষ্ঠ অঃ/২১, ২২, ২৩ শ্লোঃ/পৃ. ৬৬)

কবিচন্দ্রের কাব্যে সীতাদেবীও জাহ্নবীর নিকট অনুরূপভাবে প্রার্থনা জানান, তবে উপহার সামগ্রীর উল্লেখ ভিন্নরূপ :-

(অমিল) তরী আরোহণে তিনে গঙ্গা হল্যা পার ।
সীতাদেবী জাহ্নবীরে কবেন নমস্কার।।
ত্রিপথগামিনী গঙ্গে বলিগো তোমারে ।
চৌদ্দবৎসরের পর জাই যদি পুরে ।।
মধু মাংস দিয়া তোমা কবির পূজন ।
গো সহস্র বিপ্রে দিব বসন ভূষণ ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ২১ক)

কবিচন্দ্রের কাব্যে, — 'সুরা ও মাংস' উপহারের স্থলে 'মধু মাংস' এবং 'নানাবিধ উপহার' এর পরিবতে 'গো সহস্র' বিপ্রে দান ও 'বসন ভূষণ' দ্বারা পূজা করার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় ।

অধ্যাত্ম রামায়ণের যে কাহিনীটি বাংলাদেশে সর্বজন পরিচিত সেই সুপ্রসিদ্ধ রাম-মাহাত্ম্য কথা ও বাল্মীকি মুনির দিব্যত্বলাভ কাহিনী কবিচন্দ্রের কাব্যেও পাওয়া যায় । কিরাতদের সংসর্গে কলুষিত জীবন হইতে মুনিবর কিরূপে 'মরা' নাম জপ করিয়া মুক্তিলাভ করেন তাহাই বিশ্লেষিত হইয়াছে উক্ত গ্রন্থে ।

"ইত্যুক্ত্বা রাম তে নাম ব্যত্যস্তাক্ষরপূর্ব্বকম্।
একাগ্রমনসাত্রৈব মরেতি জপ সর্ব্বদা ।।৮০।।
আগচ্ছামঃ পুনর্যাবত্তাবৎ তত্ত্বং সদা জপ।
ইত্যুক্ত্বা প্রযযুঃ সর্ব্বে মুনয়ো দিব্যদর্শনাঃ" ।।৮১।।

——"..................... এই কথা বলিয়া আমাকে রাম হে! তোমার নামই অক্ষর-বিপর্য্যয়পূর্ব্বক "ম-রা" এইরূপে একাগ্রচিত্তে সর্ব্বদা জপ করিতে বলিলেন এবং যতদিনে আমরা এখানে না আগমন করি, তাবৎ সর্ব্বদা — ইহা জপ কর, এই বলিয়া সেই সকল দিব্য-দর্শন মুনি প্রস্থান করিলেন ।"

(অযোধ্যকাণ্ড/৬ষ্ঠ অঃ/৮০-৮১ শ্লোঃ/পৃ. ৭০-৭১)

এই লোক-বিশ্রুত অধ্যাত্ম রামায়ণান্তর্গত কাহিনীটি কবিচন্দ্রও গ্রহণ করিয়াছেন ।

(মিল) মুনিবর্গে বলে সদা রাম রাম জপ ।
বিনাশ হইব তোর অতি ঘোর পাপ ।।
রাম নাম মহামন্ত্র মুখে না বার্যায় ।
তা দেখিয়া মুনি সব সৃজিল উপায়।।
অরে পাপী দুরাচার মরা মরা জপ ।

পাপ হত্যে হবি মুক্ত ধর্ম পথ দেখ ॥
উপদেশ দিয়া সভে করিল গমন ।
দিবানিশি মরা মরা জপি অনুক্ষণ॥
মবা মরা জপিতে রামের নাম আল্য।
নির্মল শরীর যত পাপ দূরে গেল ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ২২)

বাম নামেব অক্ষব-বিপর্যয় 'ম-রা' । একাগ্রমনে সর্বক্ষণ 'ম-রা' নাম জপ করিয়া সহস্র যুগ অতিক্রান্ত হইলে ঋষিগণ পুনরায় তথায় আসিয়া মুনিবরকে বল্মীক-স্তূপ হইতে নির্গত হইতে বলেন । বল্মীক হইতে নবজন্ম লাভ ঘটায় তাঁহার নাম হয় বাল্মীকি।

"বল্মীকাৎ সম্ভবো যস্মাদ্ দ্বিতীয়ং জন্ম তেঽভবৎ
ইত্যুক্ত্বা তে যযুর্দিব্যগতিং রঘুকুলোত্তম" ॥৮৬॥

—— "হে মুনিবব ! তুমি বাল্মীকি, যেহেতু বল্মীক হইতে উৎপত্তি তোমার দ্বিতীয় জন্মস্বরূপ হইল"। হে রঘুকুলোত্তম ! তাঁহারা এই বলিয়া দিব্যলোকে গমন করিলেন।"
(অযোধ্যাকাণ্ড/৬ষ্ঠ অঃ/৮৬ শ্লোঃ/পৃ.৭১)

কবিচন্দ্রের কাহিনীর মিল এইরূপ ঃ

বল্মীকের রাশি হল্য আমার উপরি ।
যোগে জপি রাম নাম আপনা পাসরি ॥
মুনি বলে রঘুনাথ জন্ম পূর্ব কথা কই ।
সাত ঋষি পুনঃ আল্য হাজার যুগ বই ॥
আমারে কহেন সভে বারি হও ঝাট।
মৃত্তিকা করিয়া ভেদ অহে বাপু উঠ॥
বল্মীক হইতে আমি উঠিলু সত্বর ।
নীহার যেমন নাশ করেন ভাস্কর ॥
সর্বে প্রশংসিয়া কহে শুন গুণধাম ।
আজি হত্যে বাল্মীকি হইল তব নাম ॥
এত বলি জ্ঞান দিয়া গেলা সাতজনে ।
সেইরূপ আজি আমি দেখিব নয়নে॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ২২)

বল্মীক রাশি হইতে নির্গত মুনির নাম বাল্মীকি । এই কাহিনীটি কবিচন্দ্র যে 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' হইতে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা এই বিষয়ের শেষে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে ।

বাল্মীকি রামায়ণে এই কাহিনীটির কোনও আভাস পর্যন্ত নাই । তবে সেখানে আছে কমলালোচন রামের নাম প্রভাবে তিনি ঋষি হইয়াছেন, সেই রামচন্দ্রকে সীতা ও লক্ষ্মণসহ দর্শন করিয়া তিনি (বাল্মীকি) মুক্তি লাভ করেন ।

দ্বিতীয় লোক-বিশ্রুত কাহিনী, অন্ধকমুনির পুত্রবধ কথা। ইহা বাল্মীকি রামায়ণেব 'দশরথের ঋষিকুমার বধ' (অযোধ্যাকাণ্ড/৬৩-৬৪ সর্গ) বৃত্তান্তের অন্তর্গত এবং পরবর্তীকালের বহু রাম-কথায় ইহা গৃহীত হইয়াছে। অধ্যাত্ম রামায়ণেও (অযোধ্যাকাণ্ড/ ৭ম অঃ) এই কাহিনীটি পাওয়া যায়। কৌশল্যার বাক্যবাণে দগ্ধ নৃপতি পূর্বের অভিশাপ বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করেন। অন্ধক মুনির পুত্রকে রাজা দশরথ ভ্রমবশতঃ 'শব্দবেধী' বাণে বধ করায় মুনি রাজাকে পুত্রশোকে মৃত্যু হইবে বলিয়া অভিশাপ দেন।

"তত্র বৃদ্ধঃ পিতা প্রাহ ত্বমপ্যেবং ভবিষ্যসি।
পুত্রশোকেন মরণং প্রাপ্স্যসে বচনান্মম' ॥ ৪৫ ॥

—— "তখন বৃদ্ধ পিতা বলিয়াছিলেন, —"তোমারও এইরূপ হইবে ; — আমার শাপে তুমিও পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবে।"

(অযোধ্যাকাণ্ড/৭ম অঃ/৪৫ শ্লোঃ/পৃ.৭৫)

অভিশাপের কথা স্মরণ হইলে কবিচন্দ্রের দশরথ পূর্বকৃত কর্মফলের ব্যাখ্যা করিয়া বলেন—

(মিল) মুনির আদেশে আমি রচিলাঙ চিতা।
স্নান করিয়া তাতে রাখে তাঁর পিতা ॥
অগ্নি দিয়া চিতায় শুইল দুইজনে।
তিনজন স্বর্গ জায় দেখিলু নয়নে ॥
মুনি বলে দশরথ দুঃখ দিলে মোকে।
অরে পাপী এমনি মরিবি পুত্রশোকে ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ২৫ক)

রাজা দশরথ অন্ধক মুনির অভিশাপের কথা স্মরণ করিয়া রামচন্দ্রের জন্য বিলাপ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করেন।

ভরতের পিতৃশ্রাদ্ধ পালা :—

'অধ্যাত্ম রামায়ণ' (অযোধ্যাকাণ্ড) হইতে ভরতের পিতৃশ্রাদ্ধ এবং রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে বনগমন (৭ম অঃ), গুহা চণ্ডালের সঙ্গে ভরতের সাক্ষাৎ এবং ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে অবস্থান (৮ম অঃ) ইত্যাদি বিষয় কবিচন্দ্রের এই পালাটিতে গৃহীত হইয়াছে। এই পালাটিতেও 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' কথার পরিবর্তে ভাগবতের 'নবম স্কন্ধ' ও 'গোবিন্দমঙ্গল'-এর উল্লেখ দেখা যায়।

অধ্যাত্ম রামায়ণে রামচন্দ্রের মধু সহযোগে পিতার নিমিত্ত পিণ্ডদান প্রসঙ্গ এইরূপ :—

"ইঙ্গুদীফলপিণ্যাক-রচিতান্মধুসংযুতান্।
বয়ং যদন্নাঃ পিতরস্তদন্নাঃ স্মৃতিচোদিতাঃ" ॥১৯॥

—-— "আমাদিগের যাহা অন্ন আমাদিগের পিতৃগণেরও তাহাই অন্ন — ইহা স্মৃতি শাস্ত্রে কথিত" । এই কথা বলিয়া দুঃখে অশ্রুপূর্ণ নয়নে ইঙ্গুদী ফলের পিণ্যাক দ্বারা প্রস্তুত পিণ্ড মধুসিক্ত করিয়া পিতৃ উদ্দেশ্যে দান করিলেন ।"

(অযোধ্যাকাণ্ড/৯ম অঃ/১৯ শ্লোঃ/পৃ.৮৬)

কবিচন্দ্রের কাব্যে রামচন্দ্রের শ্রাদ্ধকর্ম এইরূপ :-

রোদন সম্বরি রাম গঙ্গাস্নান কৈল।
বশিষ্ঠ মুনির স্থানে অনুমতি নিল ।।
পিণ্ডবের ফল রাম আনিল যতনে ।
মধু দিয়া পিতার নামে দিল পিণ্ডদানে ।।
অগ্নিতে আছএ ইহা পিণ্ডের বিধান।
গোবিন্দমঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্র গান ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৪ক)

'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এর সর্ব প্রধান আকর্ষণ রামচন্দ্রের দৈবী ভাব, এবং সেই দেবত্ব প্রতিষ্ঠার চূড়ান্তরূপ এই 'রামায়ণ'-এ স্বীকৃত । কৈকেয়ীর নয়ন জল ধারায় কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্দ্রকে নির্জনে বন্দনা ততোধিক বিস্ময়কর :-

কৃতং ময়া দুষ্টধিয়া মায়ামোহিত চেতসা ।
ক্ষমস্ব মম দৌরাত্ম্যং ক্ষমাসারা হি সাধবঃ ।।৫৬।।
ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরব্যক্তঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।
মায়ামানুষরূপেণ মোহয়স্যখিলং জগৎ।
ত্বয়ৈব প্রেরিতো লোকঃ কুরুতে সাধ্বসাধু বা ।।৫৭।।
ত্বদধীনমিদং বিশ্বমস্বতন্ত্রং করোতি কিম্ ।
যথা কৃত্রিমনর্ত্তক্যো নৃত্যন্তি কুহকেচ্ছয়া ।।৫৮।।
ত্বদধীনা তথা মায়ানর্ত্তকী বহুরূপিণী।
ত্বয়ৈব প্রেরিতাহং চ দেবকার্য্যং করিষ্যতা ।।৫৯।।
পাপিষ্ঠং পাপমনসা কর্ম্মাচরমরিন্দম।
অদ্য প্রতীতোঽসি মম দেবানামপ্যগোচরঃ" ।।৬০।।

—— "আমি দুষ্ট-বুদ্ধি তোমার মায়ায় মোহিত চিত্ত হইয়া তোমার রাজ্য প্রাপ্তির বিঘ্ন করিয়াছি, আমার দৌরাত্ম্য মার্জনা কর, ক্ষমাই সাধুগণের সার বস্তু । তুমি সাক্ষাৎ পরমাত্মা সনাতন অব্যক্ত বিষ্ণু মায়া মনুষ্যরূপে তুমি অখিল জগৎ মোহিত করিতেছ । তোমার দ্বারা প্রবর্তিত হইয়াই লোকে ভাল মন্দ কাজ করে । এই জগৎ তোমার অধীন, নতুবা স্বভাবতঃ অস্বাধীন এই জগৎ কি করিতে পারে ? যেমন বাজিকরের ইচ্ছায় গুপ্ত সূত্র পরিচালনায়

নর্ত্তকী পুত্তলী নাচিতে থাকে, সেইরূপ বিচিত্র রূপধারিণী মায়া তোমার অধীনা হইয়াই নাচিতেছে। হে রিপুদমন ! তুমিই দেবকার্য্য করিবার জন্য আমাকে প্রবৃত্তি দিয়াছিলে বলিয়া আমি পাপ মনে পাপ কর্ম্ম করিয়াছি। তুমি দেবগণেরও অগোচর ; কিন্তু আজ আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি"। (অযোধ্যাকাণ্ড/৯ম অঃ/৫৬-৬০ শ্লোঃ/পৃ.৮৯)

নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের মহিমা কবিচন্দ্রের কাব্যেও সুপ্রকট। কৈকেয়ী পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন একইভাবে, — নরনারায়ণ রামচন্দ্রের প্রতি অশ্রুপ্লাবিত নয়নে দীর্ঘ বন্দনার দ্বারা। এই প্রশস্তি দ্বারা শুধুমাত্র দেবলীলার সুমহান্‌রূপের উন্মোচনই হয় নাই অধিকন্তু মাতা-পুত্রের মধুরতম মানবীয় সম্পর্কটিও কবিচন্দ্র সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

বামের সাক্ষাতে সভে বিদায় হইল।
হেনকালে কৈকেয়ী রামের স্থানে গেল ।।
কৃতাঞ্জলি হয়্যা রয় রামের সাক্ষাতে।
কাতর হইয়া কয় কান্দিতে কান্দিতে।।
শুন শুন রামচন্দ্র মোর নিবেদন।
তিন লোক নাথ তুমি রাজীবলোচন ।।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি সভার কারণ।
জল স্থল চন্দ্র সূর্য আকাশ পবন ।।
জে ঘটে থাকিয়া যবে জে কর্ম করায়।
ফলরূপী হও তুমি সে ফল ভূঞ্জায়।
বাক্যরূপী হও তুমি জীবের শরীরে।
স্বতন্ত্র তোমার মায়া কে বলিতে পারে।
চর্মচক্ষে আমি তোমায় চিনিতে নারিনু।
কুজ্জার বুদ্ধিতে তোমায় বনবাস দিনু ।।
মোর সম অপরাধী নাই এ ভুবনে।
অপরাধী ক্ষেম মোরে আপনার গুণে ।।
সীতা লয়্যা বনবাসে আল্যা দুই ভাই।
সেই দিন হইতে লোকে মুখ না দেখাই ।।
ভরতের গঞ্জনা আর সহনে না জায়।
দিনে শতবার মোরে কাটিবারে চায়।।
দূর করি দিতে চায় নগরে না রাখে।
সেই দিন হইতে মোর মুখ নাঞি দেখে ।।

আসিবার কালে আইল্যা আমারে ছাড়িয়া ।
শুনিয়া আইনু আমি পাছু গোড়াইয়া ।।
কৃপা করি মুনিঠাকুর আনিল আমারে ।
নয়ন ভরিয়া তেঞি দেখিনু তোমারে ।।
যতেক আমার দোষ হয়্যাছে সকলি ।
শ্রীমুখে করহ আজ্ঞা ক্ষেম কৈল্য বলি ।।
দয়ার সাগর রাম কমললোচন ।
কৈকেয়ীর দুঃখ শুনি করেন রোদন।।
মায়েরে করেন (প্র)বোধ মধুর বচনে ।
বনবাস ছিল মোর অদৃষ্টের লিখনে ।।
বিধির লিখন মিথ্যা নহে কোনকালে ।
সুখ দুঃখ ভোগাভোগ যথাকালে ফলে ।।
ধর্মরক্ষা করি বনবাস দিলা পিতা ।
ইহাতে কি দোষ তোর শুন অগো মাতা ।।
প্রীতবাক্যে রামচন্দ্র বলিলা তাঁহাবে ।
আশীর্বাদ করি মাতা জায় নিজ ঘরে ।।

(ক.বি. ২৬নং, পু.পৃ. ৫-৬ক)

ঈশ্বরত্ব উপলব্ধি করিয়াও কেহই মানব সম্পর্কের কথা বিস্মৃত হন নাই । অমলিন হৃদয়ের ঔদার্যে কৈকেয়ীর পূর্বকৃত জ্বালা বিধৌত হইলে তিনি সর্বান্তঃকরণে রামচন্দ্রকে আশীর্বাদ করিয়া গৃহে গমন করেন । অধ্যাত্ম রামায়ণে এই মানবীয় সম্পর্কের প্রকাশ ঘটে নাই । কৈকেয়ী রামচন্দ্রের ঈশ্বরত্ব উপলব্ধি করিয়া বন্দনা করিবার পর রামচন্দ্রও কৈকেয়ীর নিকট আপন স্বরূপ ব্যক্ত করেন । সেখানে মাতা পুত্রের মানবীয় সম্পর্ক অনুপস্থিত :-

যদাহ মাং মহাভাগে নানৃতং সত্যমেব তৎ ।
ময়ৈব প্রেরিতা বাণী তব বক্ত্রাদ্বিনির্গতা ।।৬৩।।
দেব কার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থমত্র দোষঃ কুতস্তব ।
গচ্ছ ত্বং হৃদি মাং নিত্যং ভাবয়ন্তী দিবানিশম্ ।।৬৪।।
সর্ব্বত্র বিগতস্নেহা মদ্ভক্ত্যা মোক্ষ্যসেঽচিরাৎ ।
অহং সর্ব্বত্র সমদৃগ্‌দ্বেষ্যো বা প্রিয় এব বা" ।।৬৫।।

—— "হে মহাভাগে ! তুমি যাহা বলিলে, তাহা মিথ্যা নহে, সত্যই । দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্য আমার প্রবর্ত্তিত কথাই তোমার মুখ দিয়া নির্গত হইয়াছে ; ইহাতে তোমার দোষ কি ?

যাও তুমি, প্রতিদিন, নিরন্তর আমাকে মনে মনে ভাবনা কর গিয়া, আমার প্রতি গাঢ় ভক্তিবশতঃ সর্ব্বত্র স্নেহশূন্য হইয়া অচিরে মুক্তি লাভ করিবে। আমি সর্ব্বত্র সমদর্শী ; যেমন মায়াবী ব্যক্তির, নিজ মায়াকৃত বস্তুতে দ্বেষ বা প্রীতি থাকে না, সেইরূপ আমার কেহ দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই, ..."

(অযোধ্যাকাণ্ড/৯ম অঃ/৬৩-৬৫ শ্লোঃ/পৃ. ৯০)

এইরূপে 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এ রামচন্দ্রের ঐশ্বর্যরূপের প্রকাশ অধিক মাত্রায় প্রকটিত। রামচন্দ্র কৈকেয়ীকে যেভাবে উপদেশ দেন তাহাতে ভক্ত ভগবানের সম্পর্ক ভিন্ন মাতার প্রতি পুত্রের যে শ্রদ্ধাবনত মনোভাব জাগা স্বাভাবিক তাহার বিন্দু মাত্র প্রকাশ নাই। তবে উভয় কাব্যেই ভরতের প্রতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্নেহশীল উপদেশাবলী বড়ই মর্মস্পর্শী।

সীতাহরণ পালা :-

অধ্যাত্ম রামায়ণে দেখা যায়, রামচন্দ্র যখন জানিতে পারিলেন দুর্বৃত্ত রাবণ ভিক্ষুকরূপে সীতাকে হরণ করিতে আসিতেছেন, তখন তিনি সীতাদেবীকে তাঁহার ছায়া কুটীরে স্থাপনপূর্বক অগ্নিতে প্রবেশ করিতে বলেন। এক বৎসর অদৃশ্যরূপে অবস্থান করাব পর রাবণবধ হইলে পুনরায় তিনি রামচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া জানান। ইহার পর সমস্ত ঘটনা ঐ মায়া-সীতা দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে, আসল সীতা অনলে অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন (অরণ্য/৭ম অঃ)। কবিচন্দ্রের কাব্যে এই মায়া-সীতার কাহিনী একেবারেই বর্জিত হইয়াছে। সীতাহরণেব পূর্বে লক্ষ্মণকে সীতাদেবীর কটূক্তি, যাহা প্রায় সকল রাম-কথাতেই পাওয়া যায়, কবিচন্দ্রের কাব্যে তাহারও উল্লেখ মাত্র নাই।

দ্বিতীয়তঃ অধ্যাত্ম রামায়ণে সীতাহরণকালে রাবণ নখদ্বারা মৃত্তিকা বিদীর্ণকরতঃ সেই মৃত্তিকা সমেত সীতাকে বাহুদ্বারা উত্তোলনপূর্ব্বক রথে নিক্ষেপ করিয়া শীঘ্র গগনমার্গে গমন করেন (অরণ্য/৭ম অঃ/৫১-৫২ শ্লোক) এবং অশোককাননে রাক্ষসীগণকে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত কবিয়া মাতৃভাবে তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে থাকেন (অরণ্য/৭ম অঃ/৬৫ শ্লোঃ)। কবিচন্দ্রের 'সীতাহরণ' পালায় এই সকল কথারও উল্লেখ নাই।

তৃতীয়তঃ 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এ রামচন্দ্রের চিন্তায় ও কর্মে সর্বত্রই দেবত্বের প্রকাশ, সীতার জন্য রোদনও ছলনা মাত্র। লক্ষ্মণকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া রামচন্দ্র স্থির করেন, লক্ষ্মণ মায়া-সীতার কথা জানেন না, অতএব লক্ষ্মণের নিকট প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় প্রবঞ্চনা করিয়া শোক প্রকাশ করিবেন। তাহা না করিলে তিনি কোটি রাক্ষসকুল বিনাশ করিবেন কি প্রকারে? তিনি ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে মনুষ্যভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই জগতে তাঁহার মনুষ্য-চরিত প্রকাশিত হইলে ভক্তিমার্গানুসারী ব্যক্তিগণ অনায়াসে উহা শ্রবণ করিয়া মুক্তি

লাভ করিবে । এইহেতু মনুষ্য-ভাব প্রকাশ করিয়া তিনি ছদ্মভাবে থাকিতে চাহিলেন (অরণ্য/৮ম অঃ)। কিন্তু কবিচন্দ্র রামচন্দ্রকে ঈশ্বর, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, মানবাতীত মহাপুরুষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন তথাপি কোনও অলৌকিক কর্মের সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করেন নাই ।

চতুর্থতঃ কবন্ধ বধ ও শবরীর কাহিনীর পরিবর্তে কবিচন্দ্র 'সীতাহরণ' পালায় মাছরাঙ্গা পক্ষীর কথা ও হনূমান-অঞ্জনার প্রসঙ্গ এই দুই 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' ও 'ভাগবত' বহির্ভূত বিষয় গ্রহণ করিয়াছেন । কাজেই এই পালাটিকে অধ্যাত্মের প্রভাবহীন সম্পূর্ণ বাঙ্গালী ভাবাদর্শে রচিত বলিয়া উল্লেখ করা চলে ।

রামসুগ্রীব মিলন পালা :-

'কবিচন্দ্র কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের অন্তর্গত পালাটির (বি.ভা. ১২৬৮) অন্যান্য পালার মত ঠিক কি নামকরণ করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় নাই, কেননা পালাটি খণ্ডিত । আরম্ভেও কোনও নাম পাওয়া যায় নাই । এইহেতু পালাটির ভণিতাসমূহের উল্লেখ হইতে একটি নাম গ্রহণে আমরা প্রয়াসী । কবির ভণিতাসমূহ যথার্থভাবে বিচারের পব একটি নাম গ্রহণ অবশ্যই করা যাইতে পারে । পালাটির ভণিতা এইরূপ :-

দোঁহে রাখি সুগ্রীবের পাশে হনূ জায়।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের কথা কবিচন্দ্র গায় ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১)

কিষ্কিন্ধ্যায় রামলীলা কবিচন্দ্র গায় ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৫)

এত কয়্যা আশ্বাসিয়া বালী রণে যায় ।
আধ্যাত্মিকে রামলীলা কবিচন্দ্র গায় ॥ (প্রাগুক্ত পু.পৃ. ৪ক)

অঙ্গদ পড়িল পায় কবিচন্দ্র দ্বিজ গায়
ব্যাস উক্তি বাল্মীক বর্ণনা ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৬)

ইহাতে পালার নাম নাই আবার ঠিক 'কাণ্ড' বলিয়াও উল্লিখিত হয় নাই । 'কিষ্কিন্ধ্যায় রামলীলা' কথার বিশ্লেষণ করিলে দাঁড়ায় কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের অন্তর্গত রামলীলা কাহিনী । আমরা ইহাকে 'কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড' বলিতে পারিনা, কারণ কবিচন্দ্রের অন্যান্য পালাতেও 'কাণ্ড' নাম পাওয়া যায় নাই । 'অযোধ্যাকাণ্ডের কথা', 'অরণ্যকাণ্ডেব কথা' বলিবাব পরও 'রঘুনাথের বনবাস', 'সীতাহরণ' পালা ইত্যাদি নামের উল্লেখ পাওয়া যায় । ঠিক অনুরূপভাবে বলা যায়, "কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের কথা"-র অর্থ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের অন্তর্গত কাহিনীর বিবরণ । এই দিক হইতে পুথিটির নাম 'রামসুগ্রীব মিলন' পালা দেওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত ।

এই পালার বিষয়বস্তু 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এর অনুরূপ হইলেও শেষাংশে পার্থক্য আছে।

কবিচন্দ্রের কাব্যে দেখা যায় শ্রীরামের নিকট হইতে বিদায় লইয়া হনূমানাদি বীবগণ সীতা অন্বেষণেব অভিপ্রায়ে প্রথমে বিন্ধ্যপর্বতে প্রবেশ করে। সেখানে মারীচ পুত্র অসুরকে বধ করিয়া নানা বনান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। অবশেষে তৃষ্ণায় কাতর হইয়া এক গুহার অভ্যন্তরে প্রথমে এক বকের নিকট জলের জন্য অনুসন্ধান করে। মূর্ছিত বক কোনও উত্তব দিতে না পারায় তাহারা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া এক যোগমগ্না যোগিনীকে দেখিতে পায়। তাঁহার নিকট পিপাসায় কাতর হনূমানাদিসহ বানরকুল জলের সন্ধান প্রার্থনা করে। যোগিনী তাহাদের পরিচয় জানিতে চাহিলে হনূমান সানন্দে রামের পরিচয় দিয়া যোগিনীরও পরিচয় জানিতে কৌতূহলী হয়। ফলমূল ভোজন ও পিপাসা নিবারণের পর হনূমানেব প্রশ্নের উত্তরে যোগিনী জানান যে, তিনি মেরুসাবর্ণ্যির কন্যা নাম প্রভাবতী। ইহা ব্যতীত তাঁহার অপর আর একটি পরিচয় তিনি হেমা নামক গন্ধর্ব-কন্যার দাসী। শিবকে নৃত্যগীতে সন্তুষ্ট করায় তিনি হেমাকে উক্ত স্থান দিয়াছেন। অতঃপর অযুতাযুত বৎসর যাবৎ প্রভাবতী সেই গুহার ভিতরে আছেন। হনূমানের মুখে শ্রীরামের কথামৃত শ্রবণ করিয়া তিনি কৃতার্থ হন। হেমা তাঁহাকে বলিয়াছেন— ইহার পর পুথি খণ্ডিত। পরের অংশ 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এ পাওয়া যায় যে, রামের অনুচরদের সম্মানিত করিবার পর সে রামসন্নিধানে গমন ও মুক্তি প্রাপ্ত হইবে।

'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এর সঙ্গে কবিচন্দ্রের কাব্যের পার্থক্য এইরূপ :-

প্রথমতঃ অধ্যাত্ম রামায়ণে দেখা যায় বিশ্বকর্মা তনয়া হেমা নৃত্য দ্বারা মহেশ্বরের সন্তোষ উৎপাদন করেন, মহেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত দিব্যপুর হেমাকে প্রদান করেন। হেমা আবার তাঁহার সখী স্বয়ংপ্রভাকে সেইস্থানে থাকিয়া তপস্যা করিতে বলেন। স্বয়ংপ্রভা দিব্যনামা গন্ধর্বের দুহিতা। কবিচন্দ্রের কাব্যে অবশ্য হেমার পিতার নাম নাই, তাঁহার সখীর নাম স্বয়ংপ্রভার পরিবর্তে পাওয়া যায় প্রভাবতী। এই প্রভাবতী আবার হেমার সখী নহেন, দাসী এবং তিনি মেরুসাবর্ণ্যির কন্যা।

দ্বিতীয়তঃ অধ্যাত্ম রামায়ণে পাওয়া যায় হেমা ব্রহ্মলোকে যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিলেন রামানুচরদের এই গুহামধ্যে আগমন ঘটিবে, তাহাদিগকে সম্মানিত করিবার পব স্বয়ংপ্রভা বিষ্ণুধামে গমন করিতে পারিবেন। কবিচন্দ্রের কাব্যে এই অংশও পাওয়া যায় নাই। উহার শেষাংশ এইরূপ ঃ-

নৃত্যগীতে তুষিলাঙ যায়্যা শিবের পুর।
এইস্থান দিয়াছেন মহেশ ঠাকুর ॥

অযুতাযুত বৎসর বসত করি আমি ।
রামের বার্তা কয়্যা কৃতার্থ কৈলে তুমি ॥
মেরুসাবর্ণ্যির কন্যা আমি নাম প্রভাবতী ।
হেমা গন্ধর্ব্বির দাসী ইথে করি স্থিতি ॥
হেমা গন্ধর্ব্বি কয়্যাছেন মোরে (★★★)
★ ★ ★ ★ ★ (বি.ভা. ১২৬৮, পু.পৃ. ১০)

এই অংশে বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে অধ্যাত্ম রামায়ণের কিছু পার্থক্য আছে । অধ্যাত্ম রামায়ণে হেমা বিশ্বকর্মা-তনয়া । কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে দানবগণের বিশ্বকর্মা ময়দানব হেমার প্রণয়ী । ময়দানবের নির্মিত উক্ত পুরী ব্রহ্মা হেমাকে প্রদান করিয়াছিলেন (কি. কাণ্ড/৫১ সর্গ/১৫ শ্লোঃ)। অধ্যাত্ম রামায়ণে স্বয়ংপ্রভা দিব্য নামা গন্ধর্বের দুহিতা (কি. কাণ্ড/৬ষ্ঠ অঃ), তিনি মুক্তি প্রয়াসী । বাল্মীকি রামায়ণে স্বয়ংপ্রভা মেরুসাবর্ণ্যির কন্যা (কি. কাণ্ড/৫১ সর্গ/১৬ নং শ্লোঃ) তিনি মুক্তি লাভেচ্ছু না হইলেও তাপসী । কবিচন্দ্র, স্বয়ংপ্রভার পিতার নাম বাল্মীকি-রামায়ণ অনুসারে গ্রহণ করিয়াছেন ।

সীতার উদ্দেশ পালা :-

এই পালাটিতে লৌকিক কাহিনীর অনুসরণ বেশী অধ্যাত্ম রামায়ণের সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য খুব কম । অধ্যাত্ম রামায়ণে হনূমানের ফলভক্ষণ বিষয় খুব সামান্য ;

বুভুক্ষিতঃ কপিঃ প্রাহ দর্শনাৎ পারণং মম ।
ভবিষ্যতি ফলৈঃ সর্ব্বৈস্তব দৃষ্টো স্থিতৈ র্হি মে ॥৬৭॥
তথেত্যুক্তঃ স জানক্যা ভক্ষয়িত্বা ফলং কপিঃ ।
ততঃ প্রস্থাপিতোঽগচ্ছজ্জানকীং প্রণিপত্য সঃ।
কিঞ্চিদ্দূরমথো গত্বা স্বাত্মন্যেবান্বচিন্তয়ৎ ॥৬৮॥

—— "বানর বলিল — "আমি ক্ষুধার্ত্ত ; আপনাকে যখন দেখিতে পাইলাম, তখন আমাকে আপনার পারণ করান উচিত হইতেছে । আপনার চক্ষের উপর যে সকল ফল রহিয়াছে তাহার দ্বারা পারণ করিতে আমাকে অনুমতি দিন"। অনন্তর জানকী 'তথাস্তু' বলিয়া অনুমতি করিলে, বানর সেই সমস্ত ফল ভোজন করিল । অনন্তর জানকীর নিকট গমনে অনুমতি লইয়া জানকীকে প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান করিল । কিছুদূর গমন করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল ।" (সু. কাণ্ড/৩য় অঃ/৬৭-৬৮ শ্লোঃ/পৃ. ১৯১)

কিন্তু কবিচন্দ্রের পালাটি অধ্যাত্ম বামায়ণের উক্ত বর্ণনার মত নহে । উহাতে সীতা কর্তৃক হনূমানকে চারিটি আম প্রদান, রামের আমভক্ষণ করায় হনূমানের কন্ঠরোধ, রাম নাম স্মরণে যন্ত্রণার উপশম, এই সকল লোকশ্রুতি-প্রসূত মৌখিক রূপের প্রকাশ আছে ।

কবিচন্দ্র 'মহানাটক'-এ বর্ণিত কাহিনী হইতে ইহা গ্রহণ করিয়াছেন । ফলভক্ষণ ছাড়া, হনূমানের সাগর লঙ্ঘনার্থে লম্ফ প্রদান (১ম অঃ), সীতা দর্শন, অভিজ্ঞান গ্রহণ, অশোকবন ভঞ্জন (২য় অঃ), মেঘনাদ কর্তৃক হনূমানের বন্ধন (৩য় অঃ), লঙ্কাদাহকরণ (৪র্থ অঃ), হনূমান কর্তৃক রাম সমীপে সীতা বার্তা কথনাদি (৫ম অঃ) বিষয়ে অধ্যাত্ম রামায়ণের সঙ্গে কবিচন্দ্রের কাহিনীর মিল আছে । পালাটিতে লোকাচাব ও ভাঁড়ামি প্রবেশ লাভ করায কাব্য সৌন্দর্য ও রসবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয় ।

'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এ বর্ণিত সিংহিকা বধ পূর্বক হনূমানের লঙ্কা প্রবেশ ও লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী দেবীসহ সাক্ষাৎ (১ম অঃ), রাবণের স্বপ্নদর্শনাদি (২য় অঃ), কবিচন্দ্রের কাব্যে পাওয়া যায় নাই ।

অঙ্গদ রায়বার ও রাবণ-কুম্ভকর্ণ সংবাদ :-

কবিচন্দ্রের 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ'-এর একটি প্রধান আকর্ষণ এই দুইটি পালা । রাবণ সভায় অঙ্গদের দৌত্যই 'অঙ্গদ রায়বার'-এর প্রধান বিষয় । ইহাতে রাবণকে নিদারুণ তর্কে পরাজিত করিয়া তাঁহার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে বিজয়ী হইয়া রাবণের মাথার মুকুট ছিনাইয়া লওয়ার মত দুঃসাহসী কার্যে পারঙ্গম অঙ্গদ রামচন্দ্রের অকুন্ঠ আশীর্বাদ লাভ করে । কবিচন্দ্র অঙ্গদের এই বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' হইতে গ্রহণ করেন নাই । ইহার পরিবর্তে অধ্যাত্ম রামায়ণে পাওয়া যায় রাবণ দূত শুক সারণের লাঞ্ছনা (ল.কাণ্ড/৩য় অঃ) ও রামচন্দ্র কর্তৃক রাবণের মুকুটচ্ছেদনের (ল. কাণ্ড/৫ম অঃ/৪৩-৪৫ শ্লোঃ/পৃ. ২২৬) কথা । রাবণ কর্তৃক বিভীষণের অপমান (ল.কাণ্ড/২য় অঃ) এবং লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদ বধ (ল.কাণ্ড/৯ম অঃ) প্রভৃতি বিষয়ের উপর কবিচন্দ্রের ভণিতাযুক্ত কোনও পুথি আমরা পাই নাই ।

কুম্ভকর্ণের প্রসঙ্গটি কবিচন্দ্রের পুথিতে বিভিন্ন নামে পাওয়া যায় । 'রাবণ কুম্ভকর্ণ সংবাদ' 'কুম্ভকর্ণের রায়বার', এবং 'কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ' । এইরূপ বিভিন্ন নাম থাকিলেও উহাদের মূল বিষয় এক । 'অঙ্গদ রায়বার'-এর মত ইহা দৌত্য ক্রিয়ার বিষয় নহে। আমাদের নির্বাচিত আদর্শপাঠের নাম 'রাবণকুম্ভকর্ণ সংবাদ' । প্রকৃতপক্ষে এই পালার পুথিসমূহের মধ্যে এই নামটিই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত । রাবণ কুম্ভকর্ণের প্রসঙ্গ অধ্যাত্ম রামায়ণে সংক্ষিপ্ত ;

"পুরা মন্ত্রবিচারে তে গদিতং যন্ময়া নৃপ ।
তদদ্য ত্বামুপগতং ফলং পাপস্য কর্ম্মণঃ ।।৫৭।।
পূর্ব্বমেব ময়া প্রোক্তো রামোনারায়ণঃ পরঃ ।
সীতা চ যোগমায়েতি বোধিতোঽপি ন বুধ্যসে" ।।৫৮।।

—— "হে, রাজন্ ! আমি মন্ত্রণা-সময়ে তোমাকে যাহার অবশ্য সম্ভাবিত্ব বলিয়াছিলাম — সেই পাপকার্য্যের ফল আজ তোমার ফলিয়াছে । পূর্বেই আমি বলিয়াছিলাম, রামচন্দ্র পরমপুরুষ নারায়ণ ; এবং সীতা যোগামায়া ; তুমি ত ইহা বুঝিলেও বুঝিবে না" ।

(ল.কা/৭ম অঃ/৫৭-৫৮ শ্লোঃ/পৃ. ২৩৮)

'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এর অনুরূপ না হইলেও কবিচন্দ্রের কাব্যে কুম্ভকর্ণ রাবণকে সীতা অপহ্রণের জন্য তিরস্কার করিয়াছেন ;

যে একাকী ভ্রময়ে নির্ভয়ে বনান্তরে ।
যে বীর মারি তালভেদ কর্য়া গেল শরে ।
খর দূষণ বীর যাঁর এক শরে মরে ॥

* * * * * *

তবু না বুঝিলি আরে পাপ দুরাচার ।
মজিল তোমার পাপে কি বলিব আর ॥
দশ হাজার নারী আছে তোমার জে ঘরে ।
পব নারী আন তুমি মরিবার তরে ॥
সীতা লয়্যা দুই ভাই রামের স্থানে জাই ।
তবে ত রামের হাথে মরণ এড়াই ।
বিভীষণের কথা তুমি না শুনিলে কানে ।
শরশয্যা কর গিয়া শ্রীবামের বাণে ॥

(রাবণকুম্ভকর্ণ সংবাদ, পু.পৃ. ৬ক-৬)

কুম্ভকর্ণের এই উক্তিতে প্রচ্ছন্নভাবে রামচন্দ্রের দেবত্বই ঘোষিত হইয়াছে । অবশ্য রাবণও একবার স্বীকার করিয়াছেন রামচন্দ্রের মূর্তির কথা স্মরণ করিলে তাঁহার ব্রহ্মপদও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয় ।

একদিন মনে কইলাঙ রামের মূর্তি হই ।
দূর্বাদলশ্যাম রাম যেই ভাবি মনে ।
ব্রহ্মপদ তুচ্ছজ্ঞান হয় ততক্ষণে ॥

* * * * * *

সেই হইতে না যাই ভাই অশোকের বনে ।
শয়নে স্বপনে রাম নাম হয় মনে ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৫)

কিন্তু কবিচন্দ্রের রাবণ রামকে শত্রুভাবেই ভজনা করিয়াছেন, 'শত্রুর অশেষ বুদ্ধি কোনদিন কি করে' — এইজন্য রাবণ সর্বদাই শঙ্কিত । রাবণের এইরূপ রামভীতি 'অঙ্গদ রায়বার'-এও পাওয়া যায় ;

শুইলে রামের রূপ স্বপনেতে দেখে ।
ভরমে রামের রূপ ধরণীতে লেখে ॥
অন্য কথা কইতে রাজার মুখে বাইরায় রাম ।
নয়ন মুদিলে দেখে দূর্বাদলশ্যাম॥
রাবণ বলে ক্ষিতিতলে রাম হল্য কি ।
এবারে রামের হাতে কদাচিৎ জি ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৩ক)

'বাল্মীকি রামায়ণ'-এ মারীচেরও এইরূপ রামভীতি হইয়াছিল ;

"বৃক্ষে বৃক্ষে হি পশ্যামি চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরম্ ।
গৃহীত ধনুষং রামং পাশহস্তমিবান্তকম্ ॥১৫॥
অপি রামসহস্রাণি ভীতঃ পশ্যামি রাবণ।
রামভূতমিদং সর্ব্বমরণ্যং প্রতিভাতি মে ॥১৬॥
রামমেব হি পশ্যামি রহিতে রাক্ষসেশ্বর ।
দৃষ্ট্বা স্বপ্নগতং রামমুদ্‌ভ্রমামীব চেতনঃ ॥১৭॥

—— আমি পাশধারী কৃতান্ততুল্য সেই চীর কৃষ্ণাজিন পরিধায়ী ধনুর্দ্ধারী বামকে প্রত্যেক বৃক্ষেই দেখিতে পাই । আমি ভীত হইয়া নিরন্তর সহস্র সহস্র রামকে দেখি, — এই সমস্ত বনই আমার নিকটে যেন রামময় বলিয়া মনে হয়; রাক্ষসনাথ ! আমি রামশূন্য প্রদেশেও কেবল সেই রামকেই দেখি ; অধিক কি, স্বপ্নেও তাঁহাকে দেখিয়া জাগরিতের ন্যায় চারিদিকে ধাবিত হই"।[১৯] (অরণ্যকাণ্ড/৩৯ সর্গ/১৫-১৭ শ্লোঃ)

কবিচন্দ্রের 'রাবণ কুম্ভকর্ণ সংবাদ' পালাটিতে 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' অপেক্ষা বাল্মীকি রামায়ণের (যুদ্ধকাণ্ড/৬২-৬৩ সর্গ) প্রভাবই অধিক বলিয়া মনে হয় ।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল পালা :-

এই পালাটি অধ্যাত্ম রামায়ণের অনুসারে রচিত হইলেও বহুস্থলে কাহিনীর পরিবর্তন ঘটিয়াছে । অধ্যাত্ম রামায়ণে লক্ষ্মণ রাবণ কর্তৃক শরাঘাতে মূর্চ্ছিত হইলে রামচন্দ্র হনূমানকে মহৌষধি দ্বারা লক্ষ্মণ ও বানর সকলকে সঞ্জীবিত করিতে আদেশ করেন (ল.কাণ্ড/৬ষ্ঠ অঃ/৩২-৩৩ শ্লোঃ)। কিন্তু কবিচন্দ্রের কাব্যে সুষেণ ঐরূপ নির্দেশ দিয়াছেন । উভয় কাব্যের প্রথমাংশের মিল এইরূপ :-

হনূমান লক্ষ্মণকে পুনর্জীবিত করিতে ঔষধের সন্ধানে হিমালয় পর্বতে গমন করিতেছে জানিয়া রাবণ কালনেমিকে হিমালয়ের পার্শ্বে এক তপোবন সৃষ্টি করিয়া মায়াপ্রভাবে হনূমানের কার্যে বিঘ্ন ঘটাইতে নির্দেশ দেন । কালনেমি তাহাই করে । অনন্তব হনূমান পিপাসার্ত অবস্থায় এক জলাশযে নামিলে কালনেমির মাযা প্রভাবে এক ঘোবরূপিনী

মকরী (কুম্ভীর) হনূমানকে গ্রাস করিতে আসে । হনূমান মকরীকে তুলিয়া আছাড় দিলে সে প্রাণ ত্যাগ করে । প্রাণ ত্যাগের পর মকরী শুন্যমার্গে এক দিব্যরূপধারিণী রমণীতে পরিণত হয় । গন্ধকালী নামে বিখ্যাত সেই রমণী হনূমানকে বলে যে সে একজন অপ্সরা, দক্ষের অভিশাপে মকরীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । হনূমানের হস্তে তাহার শাপবিমুক্তি ঘটে । সেই অপ্সরা হনূমানকে দুষ্ট কালনেমির কুচক্রের কথাও জানায় এবং অতি সত্বর সেখান হইতে গন্ধমাদন পর্বতে গমন করিয়া উক্ত ঔষধিপত্র সংগ্রহ করিতে বলে । স্নানাদির শেষে কালনেমি হনূমানকে সত্বর তাহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে বলিলে হনূমান মুষ্টাঘাতে কালনেমিকে বধ করিয়া গন্ধমাদন পর্বতে বিশল্যকরণী পত্র সংগ্রহ করিতে যায় । সেখানেও তিনকোটি গন্ধর্বকে মারিয়া হনূমান বিশল্যকরণী পত্র চিনিতে না পারায় গন্ধমাদন পর্বত মাথায় তুলিয়া লইয়া আসে । এই দুই কাব্যের অমিল অংশ এইরূপ :-

অধ্যাত্ম রামায়ণে এই পর্বতের নাম 'দ্রোণ' পর্বত; "ততঃ ক্ষীর-নিধিং গত্বা দৃষ্ট্বা দ্রোণং মহাগিরিম্ ।।" — অর্থাৎ "অনন্তর হনূমান ক্ষীব সমুদ্রে গমন করিয়া দ্রোণ নামক মহাপর্বত দর্শন কবিলে" (ল.কাণ্ড/৭ম অঃ/৩৩ শ্লোঃ/পৃ. ২৩৬) । আর এই অপ্সরাব নাম ধান্যমালী ; — "ধান্যমালীতি বিখ্যাতা হনূমন্তমথাব্রবীৎ" ।। অর্থাৎ, 'ধান্যমালী নামে বিখ্যাতা সেই অপ্সরা হনূমানকে বলিতে লাগিল' (ল.কাণ্ড/৭ম অঃ/৩৪ শ্লোঃ/পৃ. ২৩৬) ।

কাজেই দেখা যাইতেছে কবিচন্দ্র 'দ্রোণ' পর্বতের স্থলে 'গন্ধমাদন' পর্বত এবং 'ধান্যমালী' অপ্সরাব নাম 'গন্ধকালী' করিয়াছেন ।

ইহার পর অধ্যাত্ম রামায়ণে কাহিনী অতি সংক্ষিপ্ত । হনূমান সত্বর পর্বত উৎপাটন করিয়া রাম সমীপে স্থাপন করিলে সুষেণের সাহায্যে মহামতি রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণের চিকিৎসা করাইয়া নিরাময় করিয়া তোলেন (ল.কাণ্ড/৭ম অঃ/৩৩-৩৭ শ্লোঃ/পৃ. ২৩৬)।

কবিচন্দ্র এই কাহিনীর শেষে আরও দুইটি উপকাহিনী যুক্ত করিয়াছেন । প্রথমটি, হনূমান গন্ধমাদন পর্বত লইয়া লঙ্কা যাইবার পথে ভরতকে দর্শন করার ইচ্ছায় নন্দীগ্রামের উপর দিয়া আকাশমার্গে গমন করিতে থাকে । ভরত সন্দেহপরবশ হইয়া বাটুলদ্বারা তাহাকে আঘাত করিলে হনূমান আহত অবস্থায় ভূতলে পতিত হয় । ভরতসহ অযোধ্যাবাসী সকলে হনূমানের নিকট সমস্ত সংবাদ লাভ করিয়া বিস্মিত ও মুমূর্ষু লক্ষ্মণের নিমিত্ত শোকাকুল হইয়া পড়েন । আহত হনূমানকে ভরত গন্ধমাদন পর্বত শুন্যমার্গে তুলিয়া দিতে সাহায্য করেন ।

ভরত প্রভুর অংশ নিজ বাহুবলে ।
পর্বত তুলিয়া দিল ধনুকের হূলে ।।

(লক্ষ্মণের শক্তিশেল, পু.পৃ. ১৩)

কথাবার্তায় যামিনী শেষ হইতে চলিলে হনূমান তথা হইতে বিদায় লইয়া আকাশ পথে পুনরায় ধাবিত হয়।

দ্বিতীয়টি. সূর্যের সঙ্গে হনূমানের পরিহাস প্রসঙ্গ। রাত্রি প্রভাত হওয়ার পূর্বে ঔষধ প্রয়োগ করিতে না পারিলে লক্ষ্মণের জীবনের আশা নাই। দিনমণি উদিত হইতে যাইতেছে দেখিতে পাইয়া হনূমান সত্বর তাহাকে বামকাঁখে ধরিয়া চাপিয়া রাখে। ফলে সূর্য উদিত হইতে পারে না। এই অবসরে বিখ্যাত বৈদ্য সুষেণ বিশল্যকরণীর পাতা শিলে বাঁটিয়া ঘ্রাণ করাইলে লক্ষ্মণ পুনর্জীবন লাভ করেন। অতঃপর রামচন্দ্রের আদেশে হনূমান দিনমণিকে ছাড়িয়া দিয়া গন্ধমাদন পর্বত স্বস্থানে স্থাপন করিতে যাত্রা করে। রাবণ তাহা জানিতে পারিয়া তালজঙ্ঘ আদি সাত বীরকে হনূর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করেন। সেখানেও হনূমান বিজয়ী হয়। অতঃপর হনূমান আকাশবাণী শুনিতে পায় ঐসব নিহত গন্ধর্বদের প্রাণদান করিতে হইবে। সুষেণের নিকট হনূ ঔষধ পূর্বেই চিনিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং সেই লতাপাতা নিঙ্গড়াইয়া মৃতদেহের উপর ছড়াইয়া দিলে তাহারা উহা হইতে পুনরায় প্রাণ ফিরিয়া পায়। হনূমান অবিলম্বে গিরি স্বস্থানে স্থাপনকরতঃ রামচন্দ্রের নিকট ফিরিয়া আসে। এই দুই উপকাহিনী কবি জনশ্রুতি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

সীতার অগ্নিপরীক্ষা পালা :-

অধ্যাত্ম রামায়ণের শেষে দুইটি অভিনব বিষয়ের উল্লেখ আছে, একটি সীতার অগ্নিপরীক্ষাকালে ছায়া-সীতার বিসর্জন (ল.কাণ্ড/১২শ অঃ) এবং অপরটি রামগীতা মাহাত্ম্য বর্ণনা (উ.কাণ্ড/৫ম অঃ)। এই দুইটি বিষয় কবিচন্দ্রের কাব্যে পাওয়া যায় না। রাবণ বধের পর জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ রমণীয় বিগ্রহ রাম, মায়া-সীতাকে পরিত্যাগ এবং অনলে অবস্থিতা প্রকৃত জানকীকে গ্রহণ করিতে মনে মনে স্থির করিয়া সীতাদেবীকে অবলোকনপূর্বক নানাপ্রকার অবক্তব্য কথা বলেন। সীতাদেবী, রাম-কথিত সেই বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া লক্ষ্মণকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে আদেশ করেন। অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে সীতাদেবী তাহাতে প্রবিষ্টা হন। (ল.কা. ১২শ অঃ)। অতঃপর ব্রহ্মা শ্রীরামচন্দ্রের নিকট সীতাদেবীকে প্রত্যর্পণ করেন। প্রতিবিম্বরূপিনী সীতা যেজন্য নির্মিতা হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে কৃতকার্য হইয়া অনলে অন্তর্হিতা হন।

কবিচন্দ্রের 'অগ্নি পরীক্ষা' পালাটির মধ্যে এই প্রতিবিম্বরূপিণী সীতার কোনও উল্লেখ নাই। উহা সম্পূর্ণভাবে বাল্মীকি 'রামায়ণ' দ্বারা প্রভাবিত। তৎসত্ত্বেও উহাতে দেখা যায় ভাগবতের উল্লেখ ;

সীতা না দেখিয়া রাম হৈলা অচেতন।

কি হৈল কি হৈল বলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ ।।
দ্বিজ কবিচন্দ্র গান দশমের কথা ।
নানামত পুরাণ হৈল ভাগবতামৃত কথা ।।

(প্রাগুক্ত, পু.প্. ১০ক)

কিন্তু 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এ সীতার অগ্নিপরীক্ষা বর্ণিত হয় নাই ।

রঘুনাথের দেশাগমন পালা :-

এই পালা 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর প্রভাবে রচিত, ইহাতে অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রভাব পাওয়া যায় না ।

মহানাটকের প্রভাব :

কবিচন্দ্রের কয়েকটি লৌকিক পালায় 'মহানাটক'-এর প্রভাব বর্তমান[১]। 'সীতার উদ্দেশ' এবং 'অঙ্গদ রায়বার' পালা উহাদের মধ্যে মুখ্য ।

'সীতার উদ্দেশ' পালায় অশোক কাননে হনূমানের আম্রভক্ষণ কাহিনী পাওয়া যায় । ইহার উৎস 'মহানাটক'-এর পঞ্চম অঙ্কে নিহিত ;[১০]

এক । ফলান্যপি দদাতি । (ফ)
শ্রীমদ্রামপদারবিন্দযুগলে দাতব্যমেকং ফলং
সৈন্যোভ্যো যুগলে ফলে, কপিপতাবেকং সুরম্যং ফলম্ ।
একঞ্চাপি ফলং ততস্তদনুজে দেয়ং শুভাশীঃশতং,
পশ্চাৎ সৈন্যনিবাকূলপ্রকৃতিনা ভোক্তব্যমেকং ত্বয়া ।। (ব)

—— ফল দান করিলেন । (ফ)

শ্রীমান্ রামচন্দ্রের পাদপদ্মযুগলে একটি ফল দান করিবে । সৈন্যগণকে দুইটি ফল দিবে, বানররাজ সুগ্রীবকে উৎকৃষ্ট একটি ফল দিবে । রামচন্দ্রের অনুজ লক্ষ্মণকে একটি ফল ও শত শুভাশীর্বাদ দান করিবে । পরে সৈনিকোচিত স্থিরচিত্ত তুমি একটি ফল ভোজন করিবে । (ব) (ঐ.পৃ. ৪১৩-৪১৪)

দুই। সীতাসম্ভাষণান্তে পবনসুতবরঃ কাননং ভঙ্‌ক্তুকামো
ব্যাজেনাপি দ্বিজোহভূদ্গালিতবদনখঃ শীর্ণকায়োঽতিবৃঢ়ঃ ।
শ্বেতো মুণ্ডিতোঽপি ভূত্বা বননিকটগতো ভাষতে মন্দমন্দং
ভ্রাতর্যুস্মৎপ্রসাদাৎ পতদমৃতফলং কিঞ্চিদভ্যর্থয়ে চ ।। (চ)

—— শ্রেষ্ঠ বায়ুপুত্র হনূমান্ সীতা সম্ভাষণের পর কানন ভগ্ন করিবার ইচ্ছায় ছল করিয়া

গলিত নখদন্ত শীর্ণকায় অতিবৃদ্ধ পাণ্ডুবর্ণ মুণ্ডিত মস্তক ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিলেন। এবং কাননের অতি নিকটে যাইয়া উদ্যানপালককে ধীরে ধীরে বলিলেন, হে ভ্রাতঃ! আমি তোমার অনুগ্রহে বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত একটি অমৃত ফল পাইতে ইচ্ছা করি। (চ)

(ঐ. পৃ. ৪১৫-৪১৬)

তিন। রাবণঃ। (স্বগতম্) যদ্যয়ং রুদ্রাবতারো
মারুতিস্তর্হি কিমিতি রুদ্রভক্তস্য
মে নগরং দহতি? অহহ! জ্ঞাতম্। (ল)

----- রাবণ স্বগতভাবে বলিতে লাগিলেন, — এই পবননন্দন হনূমান যদি রুদ্রাবতার হয়, তবে কেন রুদ্রভক্ত আমার নগরী দগ্ধ করিতেছে। ওঃ বুঝিয়াছি। (ল)

(ঐ. পৃ. ৪৪১)

চার। তুষ্টঃ পিনাকি দশভিঃ শিরোভিস্তুষ্টো ন নৈকাদশমো হি রুদ্রঃ।
অতো হনূমান্ দহতীব কোপাৎ যুঙ্ক্তে হি ভেদো ন পুনঃ শিবায় ॥ (ব)

----- আমার দশমস্তক দ্বারা শিব তুষ্ট হইয়াছেন। অবশিষ্ট একাদশ রুদ্র (একাদশ মস্তকের অভাবে উহাকে শিরদান করিতে না পারায়) তুষ্ট হন নাই। অতএব ক্রুদ্ধ হইয়াই যেন (রুদ্রাবতার) হনূমান আমার লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিতেছেন। এক সঙ্ঘান্তর্গত ব্যক্তিগণের মধ্যে বৈষম্য সম্পাদন করিলে উহা মঙ্গলের কারণ হয় না। (ব) (ঐ.পৃ. ৪৪২-৪৪৩)

উপরে বর্ণিত মহানাটকের (৫ম অঙ্ক) চারিটি সংস্কৃত শ্লোক হইতে সীতাকর্তৃক হনূমানকে আম্রফল প্রদান এবং আম্রের লোভে হনূমানের অশোকবন উৎপাটন করার মূল 'রামায়ণ' বহির্ভূত প্রসঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে শিবভক্ত রাবণের মুখে স্বীয় একাদশ শির না দিতে পারায় শিবের অসন্তোষেই রুদ্রাবতার হনূমান কর্তৃক সুদৃশ্য লঙ্কানগরীর ধ্বংস সাধন করারও উল্লেখ আছে। তবে শুধু আম্রভক্ষণ প্রসঙ্গটিই কবিচন্দ্রের পালাতে পাওয়া যায় কিঞ্চিৎ বিস্তৃতাকারে।

সীতা বলেন শুন বাপু পবননন্দন ॥
লয়্যা জাহ তুমি মোর হস্তের কঙ্কণ ॥
আর এক ভেট বাপু পড়িল মোর মনে।
চারি আম্র লয়্যা জাহ প্রভু রামের স্থানে ॥
সুগ্রীব লক্ষ্মণ তুমি তিন আম্র খাবে।
এক আম্র লয়্যা মোর রঘুনাথে দিবে ॥
জোড়হস্তে নিল হনূ আম্র আর কঙ্কণ।
ভূমিষ্ঠ হইয়া বন্দে সীতার চরণ ॥

বিদায় হইয়া জান বীর হনূমান ।
সেবিয়া বাল্মীক ব্যাস কবিচন্দ্রে গান ।

(সীতার উদ্দেশ পালা, পু.পৃ. ৪)

কবিচন্দ্রের কাব্যে হনূমানেব অসংযত লোভের ফলও ব্যক্ত হইয়াছে । লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও নিজের এই তিনটি ফল ভক্ষণের পর চতুর্থ রঘুনাথের আম্রটিও হনূমান ভক্ষণ করিতে গেলে বিপত্তি উপস্থিত হয় :-

হাকুপাকু করি হনূ করে হায় হায় ।
পুনর্বার হনূমান সীতার কাছে জায় ।।
সীতা বলে কেন আইলে কহ বিবরণ ।
বা কাড়িতে নাহি পারে পবননন্দন।।
মনেতে বুঝিয়া সীতা করে অনুমান।
রঘুনাথের আম্র বুঝি করেছো ভক্ষণ । (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৫ক)

শুধু রামচন্দ্রের আম্রভক্ষণ করিয়াই হনূ নিবৃত্ত হয় নাই সুমিষ্ট আম্রের লোভে হনূ অশোকবন উৎপাটন করে । হনূর অত্যাচারে অতিষ্ঠ রাক্ষসেরা লেজে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাকে মারিতে চাহিলে সেই অগ্নিতে লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া সে নিজের মুখখানাও পোড়াইয়া ফেলে । সীতা কর্তৃক মুখেব আব দ্বারা লেজের অগ্নি নির্বাপিত করার নির্দেশ যথাযথরূপে পালন না করায় হনূমানের অবিমৃষ্যকারিতায় তাহার জ্ঞাতিসকলেরও মুখ পোড়া হইয়া যায় ।

অঙ্গদ রায়বার :-

কবিচন্দ্রের 'অঙ্গদ রায়বার' পালাটির বিষয়বস্তু রাবণসভায় রামানুচর অঙ্গদের দৌত্য । এই প্রসঙ্গটি মূল রামায়ণে (লঙ্কাকাণ্ড/৪১শ সর্গে) বর্ণিত আছে । রামচন্দ্র অঙ্গদকে আহ্বানপূর্বক শ্রীভ্রষ্ট, গতৈশ্বর্য, মুমূর্ষু এবং লুপ্তচেতন দশাননকে কিছু কথা লঙ্কাপুরী মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিয়া আসিতে বলেন । রামচন্দ্র কর্তৃক উক্ত "সীতাকে প্রদান না করিলে .... জন্মের মত দশাননের লঙ্কাপুরী দর্শনের জন্য প্রস্তুত হইবার কথা" (ল.কা./৪১শ সর্গ/৫৮-৭২ শ্লোঃ) অঙ্গদ রাবণসভায় সুতীব্র ভাষায় (ল.কা./৪১শ সর্গ/৭৩-৮১ শ্লোঃ) ব্যক্ত করিলে রাক্ষসেরা অঙ্গদকে বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হয় ।[১১] কিন্তু অঙ্গদ অপরাজেয় শক্তিতে রাক্ষসদের ভূতলশায়ী করিয়া আকাশপথে উঠিয়া রামের পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হয় ।

কবিচন্দ্রের কাব্যে অঙ্গদের ভাষা যথেষ্ট ক্ষুরধার ও শ্লেষাত্মক এবং বর্ণনাও যথাসম্ভব দীর্ঘায়ত । অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু মনে করিয়াছেন, "ফকিররাম কবিভূষণ যেভাবে

কৃত্রিম হিন্দীতে এই পালা রচনা করিয়াছেন, তাহারই প্রায় আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ কবিচন্দ্র ও কৃত্তিবাসের পালায় পাওয়া যায়, ... ফকিররামের অনুকরণে রচিত কবিচন্দ্রের পালা কৃত্তিবাসী রামায়ণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে"।[১২] কিন্তু আমাদের মনে হয় মহানাটকের সপ্তম অঙ্কে রাবণ ও অঙ্গদের যে সুদীর্ঘ সংলাপ আছে (১-৮০ শ্লোঃ) ফকিররাম ও কবিচন্দ্র উভয়েই উহার দ্বারা পুষ্ট ।[১৩] ফকিররামের মাত্র কয়েকটি ছত্রের সঙ্গে কবিচন্দ্রের রচনার ভাবগত মিল ভিন্ন উভয়ের আর কোনও সাদৃশ্য পাওয়া যায় না । অপরদিকে মহানাটকে বর্ণিত শ্লোক এবং কবিচন্দ্রের রচনার কিছু কিছু অংশ ক্রমান্বয়ে উপস্থাপিত করিলে উভয় কাব্যের সাদৃশ্য অধিক পরিমাণে অনুভূত হইবে । 'মহানাটক'-এ বর্ণিত শ্লোক এইরূপ :-

অঙ্গদ : রে রে রাবণ ! রাবণানপি বহূনেতান্ বয়ম্ শুশ্রুমৈ-
তেষ্বেকঃ কিল কার্ত্তবীর্য্যনৃপতের্দোর্দণ্ডপিণ্ডীকৃতঃ।
একো নর্ত্তনলম্ভিতান্নকবলো দৈত্যেন্দ্রদাসীশতৈঃ
অন্যো মৎপিতৃবাহুমূলগলিতস্ত্বং তেষু কোঽন্যোঽথবা ? ।।১৪।।

—— অঙ্গদকে ভয় প্রদর্শনার্থ রাবণ মায়াদ্বারা বহুরূপ ধারণ করায় অঙ্গদ বলিল, "ওহে রাবণ, আমরা বহু রাবণের কথা শুনিয়াছি, উহাদেব মধ্যে একজন নৃপতি কার্তবীর্যের দোর্দণ্ড প্রতাপের দ্বারা কারাগারে নীত হয়, অপরজন দৈত্যশ্রেষ্ঠ বলির শতদাসীর নৃত্যের দ্বারা পাতালে প্রবিষ্ট হইয়া অন্নগ্রহণ করে । পুরাকালে দৈত্যেন্দ্র কর্তৃক পরাজিত রাবণ পাতালে উক্ত হইল, "তুমি যদি আমার এই কারাগারে ভৃত্যদের সহিত নৃত্য কর তোমাকে অন্ন দিব" । এইরূপ উক্ত হইলে রাবণ সেই কারাবাসে তাঁহার অনুগ্রহ লাভের জন্য নৃত্য করিলে (দৈত্যরাজ) তাঁহাকে অন্নভক্ষণ করাইয়া প্রাণ রক্ষা করে । (ঐ. শ্লোঃ ১৪)

কবিচন্দ্রের কাব্যে অঙ্গদ ও রাবণের সংলাপ মহানাটকে বর্ণিত সংলাপের মত সুসংবদ্ধ না হইলেও উহার প্রভাব অবশ্যই উপলব্ধ হয় । উপরের শ্লোকটির প্রতিফলন নিম্নলিখিত অংশে স্পষ্ট :—

অঙ্গদে দেখিঞা রাবণ মায়াছল পাতে ।
শতশত রাবণ হঞা বসিল সভাতে ।।
যেদিগে অঙ্গদ চায় সেদিগে রাবণ ।
দশমুণ্ড কুড়ি কর বিংশতিলোচন ।। (অঙ্গদ রায়বার, পু.পৃ.৩)

ধূর্ত অঙ্গদ রাবণের ছলনায় বিভ্রান্ত না হইয়া ইন্দ্রজিৎকে ব্যঙ্গোক্তি করিয়া বলে —

অঙ্গদ বলে সত্য কথা কহিস ইন্দ্রজিতা ।

যতেক রাবণ বস্যা আছে সব কি তোব পিতা ।।

★ ★ ★ ★ ★

কোন বাপ তোর দিগবিজয়ে গেছিল কুথাকে ।
কোন বাপ তোর কুথঃ গেছিল পরিচয় দে মোকে ।।
চেড়ীর উচ্ছিষ্ট খালেক কোন বাপ পাতালে ।
কোন বাপ তোর বন্দী ছিল অর্জুনের অশ্বশালে ।।
কোন বাপ তোর যম জিনিতে গেছিল দক্ষিণ ।
কোন বাপ তোর মান্ধাতার বাণে দন্তে করিলেক তৃণ ।।
কোন বাপ তোর ধনুক ভাঙ্গিতে গেছিল মিথিলা ।
তুলিতে কৈলাস গিরি কোন বাপ গেছিলা ।।

(প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৩-৪ক)

এই অংশে উভয় কাব্যের মধ্যে মিল যথেষ্ট । আবার মহানাটকেব ১৪নং শ্লোকে কার্তবীর্যের দ্বারা রাবণের লাঞ্ছনা ভোগ করার কথা পাওয়া যায় । কবিচন্দ্রের রচনায় তাহা ইহার কয়েক পত্র পরে বর্ণিত হইয়াছে ;

কার্তবীর্যার্জ্জুন তোরে তৃণ করাল্য দাঁতে ।
তার দর্প চূর্ণ হইল পরশুরামের হাতে ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৬ক)

কবিচন্দ্রেব কাব্যে কার্তবীর্য এবং দৈত্যেন্দ্র বলি কর্তৃক রাবণের অপমানিত হওয়ার বিষয়টি 'মহানাটক' অপেক্ষা বিস্তৃত । আবার কোনও কোনও সংলাপ 'মহানাটক'-এ বিস্তৃত, কবিচন্দ্রে সংক্ষেপিত । 'মহানাটক'-এ অঙ্গদের উক্তি এইরূপ :-

(এক) অঙ্গদঃ রে রে রাবণ ! কার্ত্তবীর্য্যদলিতাহঙ্কার ! গত্বা স্বযং
সীতামর্পয়, পালয় স্বতনয়ান্ যাবন্ন রামঃ শরান্ ।
কোপান্মুঞ্চতি, হৈহয়াধিপভুজশ্রেণীমহাকানন-
ছেত্তুর্যশ্চ কুঠারধারণপটোঃ রামস্য জেতা বণে ।।২০।।

—— অঙ্গদ ঃ ওহে রাবণ, তোমার অহঙ্কার কার্তবীর্যের দ্বারা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে । তুমি স্বয়ং যাইয়া সীতাকে অর্পণ কর এবং নিজ পুত্রদিগকে রক্ষা কর, যতক্ষণ না মহা বিক্রমশালী কুঠারধারী পরশুরাম বিজেতা রামচন্দ্র ক্রোধবশতঃ তোমাব প্রতি শব নিক্ষেপ করে । অর্থাৎ রাম ক্রুদ্ধ হইলে তোমার বংশ নাশ হইবে । (ঐ, শ্লো ২০)

(দুই) অঙ্গদঃ জঘান যুধি তাড়কাদিকমসীমরক্ষঃকুলং,
বভঞ্জ ধনুরৈশ্বরং, পরিবভূব তং ভার্গবম্ ।

স তালতরুসপ্তকং সপদিকৃত্তবানম্বুধিং
ববন্ধ, ন তথাপি তে পরিচিতো রঘুনাং পতিঃ ।।২৮।।

—— অঙ্গদ : যে রঘুপতি যুদ্ধে তাড়কা প্রভৃতি বহু রাক্ষসকুলকে ধ্বংস করিয়া হরধনু ভঙ্গ করেন এবং পরশুরামকেও পরাজিত করেন, সপ্ততালকে ভঙ্গ করিয়া যিনি সাগর বন্ধন করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় কি তুমি জান না ? (ঐ. শ্লোঃ ২৮)

মহানাটকে বর্ণিত ২০ এবং ২৮ নং শ্লোকের বিষয় কবিচন্দ্রের কাব্যে একত্রে পাওয়া যায় :-

কার্তবীর্যার্জুন তোরে তৃণ করাল্য দাঁতে ।
তার দর্প চূর্ণ হইল পরশুরামের হাতে ।।
ক্ষেত্রি মার‍্যা নিক্ষেত্রি করিল না থুইল নাম ।
শমন দমন মাল্যা বীর পরশুরাম ।।
পরশুরাম পরাভব শ্রীরামের ঠাঁই ।
তাঁহার সহিতে কক্ষা আর রক্ষা নাই ।।
যে বধিলেক তাড়কা পাঁচ বচ্ছরে(র) কালে ।
ভাঙ্গিলেক হরের ধনুক নিজ বাহু বলে ।।
সপ্ততাল ভেদ করিল যাঁর বাণ ।
যাঁর বাণে বালী রাজা না ধরিল টান ।।
যে বান্ধিলেক অলঙ্ঘ্য সেতু গাছ পাথরে ।
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস যাঁর এক বাণে মরে ।।
ভুবনের নিধি রাম দয়ার সাগর ।
যাঁর গুণে পশু বন্দী বনের বানর ।।
তাঁহার রমণী সীতা আনুস তোঁ হর‍্যা ।
কালকূট বিষ ভক্ষিলি হাতে কর‍্যা ।
সুখেতে থাকিতে তোরে না দিল বিধাতা।
আপনার বুদ্ধে খাইলে আপনার মাথা ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৬ক)

কার্তবীর্য কর্তৃক রাবণের অহঙ্কার চূর্ণ হওয়ার কথা উভয় কাব্যে আছে । আবার রামচন্দ্র কর্তৃক হরধনুভঙ্গ, পরশুরামের পরাজয় এবং সপ্ততাল ভঙ্গ করিয়া সাগর বন্ধনের কথাও উভয় কাব্যে অঙ্গদের মুখে বর্ণিত হইয়াছে । অঙ্গদের প্রশ্ন — 'এহেন রামকে কি রাবণ জানে না' ? আর যদি জানে তবে, কবিচন্দ্রের অঙ্গদ বলিয়াছে যে, "সে কোন বুদ্ধিতে তাঁহার স্ত্রীকে হরণ করিয়াছে" ?

মহানাটকে রাবণের ভাষায় আপনার বংশ মর্যাদাবোধ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে নিজের, ভ্রাতার এবং পুত্র মেঘনাদের পরিচয় বেশ দম্ভের সঙ্গে দিয়াছে। অঙ্গদ তো তাহার নিকট তুচ্ছ শাখাচারী জীব মাত্র। ১৯, ২১ এবং ২৩ নং শ্লোকে এইরূপ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় :-

(এক) রাবণঃ ভ্রাতা মে কুম্ভকর্ণঃ সকলরিপুবলপ্রাণসংহাররূপঃ
পুত্রো মে মেঘনাদঃ প্রহসিতবদনং যেন বদ্ধঃ সুরেন্দ্রঃ।
খড়্গো মে চন্দ্রহাসো রণমুখচপলা রাক্ষসা মে সহায়াঃ
সোহহং গীর্বাণশত্রুস্ত্রিভুবনবিজয়ী রাবণো নাম রাজা ॥১৯॥

—— রাবণ : আমার ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ সকল রিপুর প্রাণসংহাররূপী, আমার পুত্র মেঘনাদ সুরেন্দ্র দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় করিয়াছিলেন। আমার খড়্গ চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল রণে দুর্ধর্ষ রাক্ষসগণ আমার সহায়, এইরূপ আমি দেবগণের শত্রু ত্রিভুবনবিজয়ী রাবণ নামে খ্যাত।
(ঐ, শ্লোঃ ১৯)

(দুই) রাবণাঙ্গদয়ো রুক্তিপ্রত্যুক্তীঃ
রামঃ কিং কৃতবান্ ? প্রবীরবিজয়ং, কোহ সৌ প্রবীরো জিতঃ ?
বালী, সোঽপি চ কো ? ন বেৎসি কিমুমাং ? কো বেত্তি শাখামৃগম্ ?
অস্ত্যত্রাপি তবাপি বিস্মৃতিরহো ! ? মোহোমহীনীদৃশঃ
পর্য্যঙ্কে নিজবালকেলিকৃতয়ে বদ্ধোঽসি যেনোরসি ॥২১॥

—— রাবণ অঙ্গদের প্রশ্নোত্তর

রাবণ। রাম কি করিয়াছে ?
অঙ্গদ। প্রকৃষ্ট বীর শত্রুকে জয় করিয়াছে।
রাবণ। প্রকৃষ্ট শত্রু কে ?
অঙ্গদ। বালী।
রাবণ। সেই বালী কে ?
অঙ্গদ। ঐ বালীকে তুমি জান না ?
রাবণ। কে আবার শাখাচারী জীবকে জানে ? (অর্থাৎ কেউ জানে না)।
অঙ্গদ। বিরক্তি প্রদর্শনপূর্বক বলিল, আমার পিতা যেরূপ আমাকে খেলাইবার জন্য বক্ষে ধারণ করিতেন সেইরূপ তোমাকেও করিতেন, ইহা তুমি কিরূপে ভুলিয়া গেলে। আশ্চর্য এইরূপ বিস্মৃতি ! (ঐ, শ্লোঃ ২১)

(তিন) রাবণঃ। প্রবীরগণনাসু বা তব পিতৈব কৈ গণ্যতে ?
পতিঃ স হি বনৌকসাং ত্বমপি কো বরাকোঽর্ভকঃ ?
চকার কিল রাঘবঃ কিমপি কর্ম্ম লোকোত্তরম্ ?
তরঙ্গয়সি যন্মুহুর্মম পুরস্তদীয়ং যশঃ ? ।।২৩।।

—— রাবণ : তোমার পিতাকে কাহারা প্রকৃষ্ট বীরদের মধ্যে গণনা করে (অর্থাৎ কেহ করে না) ? তুমিও অনুকম্পার যোগ্য শিশু মাত্র। রামই বা কি অলৌকিক এবং অসাধারণ কর্ম করিয়াছে যে বার বার তাঁহার যশোগান করিতেছ ?

উল্লিখিত তিনটি শ্লোকে (১৯, ২১ এবং ২৩) রাবণের আত্মপরিচয় ও অঙ্গদের প্রতি অবজ্ঞা মিশ্রিত ভাব দ্বারা রামচন্দ্রকে হেয় প্রতিপন্ন করার ইচ্ছা সুকৌশলে ব্যক্ত হইয়াছে। কবিচন্দ্রের রচনায় আরও লঘু তরল ভাব ও ভাষায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

রাবণ বলে ওবে বানরা শুন তোরে বলি।
হেতা কেনে লঙ্কাপুরী মরতে কেনে আলি ।।
কি নাম তুঞি কার বেটা কোনদেশে বসিস।
মারিব নাই ভয় না করিস সত্য কথা বলিস।।
অঙ্গদ বলে তোব ডরেতে থরথরাঞা কাঁপি।
এখন এমন ধরণ কথা মররে বেটা পাপী ।।
তোঁ কোন ঠাকুরের বেটা তোরে ভয় কি।
আমি কে তা জানিস নারে শুন পরিচয় দি ।।
বালী সুগ্রীব দুঁহে বীর অবতার।
যা জিনিতে কিষ্কিন্ধ্যা গেছিলি একবার।।
সে পড়ে বা না পড়ে মনে হল্য অনেকদিন।
হাত বুলাঞা দেখ গলায় আছে লেজের চিহ্ন ।।
সে বালীর তনয় আমি সুগ্রীবের চর।
বীর অঙ্গদ আমার নাম শ্রীরামের কিঙ্কর ।।
বেটা রাম কে তা জানিস নারে যাঁর আনিলি সীতা হর্‌্যা।
দেখিব এখন লঙ্কাপুরী রাখুস কেমন কর্‌্যা ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৪)

এখানে উল্লেখযোগ্য যে মহানাটকে অঙ্গদ ব্যঙ্গার্থে পিতা বালী কর্তৃক রাবণকে খেলাইবার যে কথা বলিয়াছে তাহাই কবিচন্দ্রের অঙ্গদ স্মরণ করাইয়াছে গলায় লেজের চিহ্নে হাত বুলাইয়া দেখিতে বলিয়া। মহানাটকে প্রশ্নোত্তর যথাসম্ভব পর পর সজ্জিত কিন্তু কবিচন্দ্রের

কাব্যে রাবণ অপেক্ষা অঙ্গদের উক্তিই বেশী । তবে মহানাটকের কিছু কিছু অংশ তিনি পরিবর্তন করিয়াছেন । যেমন মহানাটকে পাওয়া যায় —

অঙ্গদ । রামোনাম স এষ, যেন ভগিনীনাসাবসাপঙ্কিলঃ
খড়্গাস্তে খরদূষণত্রিশিরসাং ধৌতঃ শিরঃশোণিতৈঃ ।
বদ্ধা ত্বাং চতুরম্বুরাশিষু পরিভ্রাম্যন্ মুহূর্ত্তেন যঃ
সন্ধ্যামর্চয়তি স্ম নিস্ত্রপ ! কথং তাতস্ত্বয়া বিস্মৃতঃ ? ॥২৪॥

—— ইনি সেই রাম যিনি তোমার ভগিনীর নাসিকা কর্তন দ্বারা পঙ্কিল খড়্গ খরদূষণের শিরচ্ছেদন হেতু শোণিতের দ্বারা ধৌত করিয়াছিলেন । ওরে নির্লজ্জ, তোমাকে যে আমার পিতা লাঙ্গুলের দ্বারা বদ্ধ করিয়া চতুঃসমুদ্র ভ্রমণ করাইয়াছিলেন তাহা তুমি কি করিয়া ভুলিয়া গেলে ? (ঐ, শ্লোঃ ২৪)

উপরের ২৪নং শ্লোকটির প্রয়োগ কবিচন্দ্র অন্যভাবে করিয়াছেন :-

সেইদেব বলবান তোরামার বোলে কি হয় ।
খসিলে হাতের শর বশীভূত নয় ॥
দিগে দিগে রণ করিঞা জিতা আস্যাছিলি।
লোক বলিবেক এই বীরকে বাঁধ্যাছিল বালী ॥
অজয় তুমার নাম থাকিলে ভাল হয় ।
নইলে তোরকে এমন কথা মানুষ হঞা কয় ॥
তেঞি তোকে এমন কথা বলিলাঙ রে গরু ।
তুঞি হঞাছ মোর বাপের কীর্তিকল্পতরু ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৬)

মহানাটকে বর্ণিত বালীকর্তৃক রাবণকে চতুঃসমুদ্র ভ্রমণ করাইবার কথাই কবিচন্দ্রের ভাষায় 'বাপের কীর্তিকল্পতরু' এই শ্লেষার্থক শব্দে ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহার পর মহানাটকে রাবণের উক্তি বেশ তীক্ষ্ণ, —

রাবণ : যস্তাতং তব নির্ব্যলীকমবধীত্তত্রাপি নির্মৎসরঃ
তস্য প্রেষ্যতয়া ভ্রমণ্ কপিশিশো ! নির্লজ্জ ! কিং গর্জসি ?
ত্বৎপিত্রে পুনরেকদা কিল ময়া মৈত্রীপ্রসাদঃ কৃতঃ
তৎপুত্রে ত্বয়ি তাবদেবমুচিতো দণ্ডঃ কথং ধার্য্যতে ? ॥২৫॥

—— রাবণ : যে রাম নিরপরাধ তোমার পিতা বালীকে হত্যা করিয়াছে, হে কপিশিশু ! তোমার পিতৃশত্রু দ্বারা ভৃত্যের ন্যায় প্রেরিত হইয়া কেন গর্জন করিতেছে ? একদিন

তোমার পিতা বালীর সহিত আমাব বন্ধুত্ব ছিল, তোমাকে আমি কি দণ্ড দিব ?

(ঐ, শ্লোঃ ২৫)

আর কবিচন্দ্রের কাব্যে রাবণের এই উক্তিটি ততোধিক তীক্ষ্ণতর, -

বিনি দোষে রাম তপস্বী তোর বাপকে মালেক ।
তার পায় প্রণতি হলি লজ্জা নাই পালেক ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৬)

রাবণের উক্তিতে শ্লাঘ্যভাব উভয় অংশে বর্তমান । পববর্তী উদ্ধৃতিটিতে অঙ্গদের ভাষা মার্জিত তবে কূটনীতিপূর্ণ :-

অঙ্গদ : প্রপন্নঃ পন্থানং নয়ময়মমিত্রোঽপি নিয়তং
নিষেব্যঃ সাধূনাং ন পুনরপনীতিঃ সুহৃদপি ।
তথাপি ত্বাং হিত্বা সহজমপি নক্তঞ্চরচমূ-
বিরামং শ্রীরামং ভবদনুজ এবৈষ ভজতে ।।২৬।।

——— শত্রুও যদি ন্যায়বান হন তবে সজ্জনদের উচিত তাহার আশ্রয় গ্রহণ করা । বন্ধুও যদি দুর্নীতিগ্রস্থ হয় তাহা হইলে তাহার আশ্রয় পরিত্যাগ করা বিধেয় । যেরূপ তোমার অনুজ বিভীষণ তোমাকে ত্যাগ করিয়া রাক্ষস-শত্রু রামের সেবায় নিযুক্ত আছেন ।

(ঐ, শ্লোঃ ২৬)

মহানাটকের ২৬ নং শ্লোকে বর্ণিত ন্যায় নীতি প্রসঙ্গটি কবিচন্দ্রের কাব্যে একটু পরিবর্তিতাকারে বর্ণিত ও চতুর বিভীষণের শত্রু পক্ষাবলম্বন উভয় কাব্যে প্রশংসিত হইয়াছে । কবিচন্দ্রের কাব্যে উপর্যুক্ত প্রসঙ্গটির উল্লেখ খুব সাধারণভাবে পাওয়া যায় ।

শিষ্যের পাপে গুরু নষ্ট নারীর পাপে পতি ।
তোর পাপে মজিল রাজা লঙ্কার বসতি ।।
আপুনি মজিলে আর মজালি কত জনা ।
সভেমাত্র এড়ালেক চতুর বিভীষণা ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৬ক-৬)

এইরূপে কবিচন্দ্রের কাব্যে মহানাটকের অনুসরণ থাকিলেও পাপাচারীর প্রতি একটা সহজ তর্জনী সঙ্কেত সর্বদা ফুটিয়া উঠিয়াছে ।

মহানাটকে রাবণ যেখানে অঙ্গদকে বলিয়াছে, ‘অনেক বামের মধ্যে কোন্ রামের কথা সে বলিতেছে ?’ সেখানে কবিচন্দ্রের কাব্যে রাবণ কেবল দ্বিধা জড়িত কন্ঠে প্রশ্ন করিয়াছে । এই প্রসঙ্গটি মহানাটকের ২৭ নং শ্লোকে আছে :-

রাবণ : শ্রুতমস্তি, বিভীষণশ্চ নঃ
সহজঃ সম্প্রতি রামমাশ্রিতঃ ।

কতি সন্তি ন রামনামকাঃ[৭]
কতমস্তেষু স যস্ত্বয়োচ্যতে ? ।।২৭।।

—— রাবণ : শুনিয়াছি আমার সহোদর বিভীষণ সম্প্রতি রামের আশ্রিত। রামনামধারী বহু ব্যক্তি আছেন সেই রামনামধারীদের মধ্যে তুমি যে রামের কথা বলিতেছ, সে কোন রাম ?[২৪]

কবিচন্দ্রের কাব্যে ঠিক বিপরীত ভাব দেখা যায় :

রাবণ বলে কি বলিলি রাম লঙ্কায় আসে ।
না জানি কি হবেক তবে থাকিতে নারিব দেশে ।।

(প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৪)

মহানাটকের ২৫ নং শ্লোকে রাবণ একবার বামের বালী হত্যার প্রসঙ্গ অঙ্গদকে ব্যক্ত করার পরেও আবার ২৭নং শ্লোকে পুনরায় বহু রামের মধ্যে কোন্ রামের কথা অঙ্গদ বলিতেছে, রাবণ তাহা জানিতে চায় । এইরূপ পুনরুক্তি কবিচন্দ্রের কাব্যেও আছে । তবে ইহাও ঠিক, মহানাটকের অনুসরণ করিলেও কবিচন্দ্র স্বাধীনভাবেই তাঁহার এই পালাটি রচনা করিয়াছিলেন আর উহাতে সর্বত্র মহানাটকের মত সুসংবদ্ধ ও মার্জিত রসবোধের পরিচয় মেলেও না ।

আমরা এই কয়েকটি পংক্তিতে অঙ্গদবায়বারের সঙ্গে মহানাটকের সাদৃশ্য বিচার করিয়া দেখিলাম যে, প্রকৃতিগত বিচারে উভয়ের মিল থাকিলেও কবিচন্দ্রের রচনায় অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা সহজ কবিত্ব বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে নাই ।

মহানাটকের প্রভাব ব্যতীত পালাটির আরও দুইটি মুখ্য আলোচনার দিক আছে । প্রথমতঃ, রায়বার বিষয়ক আলোচনা ; দ্বিতীয়তঃ, পালাটি সম্পর্কে অশ্লীলতার অভিযোগ ।

'রায়বার', শব্দের উৎপত্তি "রায়বারিচ" শব্দ হইতে । আবার 'রায়বার' বলিতে "রাজস্কন্ধাবার" শব্দের উল্লেখও পাওয়া যায় । রাজস্কন্ধাবারে উপস্থিত হইয়া কোনও যাচক কিছু যাজ্ঞা বা প্রার্থনা পেশ করিলে তাহা হয় রায়বার ।

ডঃ সুকুমার সেনের মতে — "রায়বার শব্দেব অর্থ, রাজদ্বারের অর্থাৎ রাজসভার বর্ণনা এবং রাজস্তুতি । ষোড়শ শতাব্দের শেষ হইতে মোগল শাসনের টানে যখন ছোটখাট হিন্দুরাজ্য একে একে লোপ পাইতে লাগিল তখন জনসাধারণের মন হইতেও প্রকৃত রাজ মহিমার ও রাজদ্বারের ঐশ্বর্যের স্মৃতি মিলাইয়া আসিতে থাকিল । রাজদ্বারের সঙ্গে সাধারণ শ্রোতার কিছুমাত্র পরিচয় না থাকায় রাজৈশ্বর্যের প্রতি বালোচিত অবজ্ঞা এবং রাজসভার ইতরজনোচিত বাগ্‌ব্যবহার রায়বার নিবন্ধের মধ্য দিয়া প্রকাশিত । মল্লরাজাদের সভায়

ফারসী ও নাগরী অক্ষর, হিন্দুস্থানী ভাষা এবং পশ্চিম অঞ্চলের আদব কায়দা অজানা ছিল না। তাই এই অঞ্চলে, হিন্দী-প্রভাবিত রায়বার-কাহিনীর বিশেষ সমাদর হইয়াছিল। তবে রায়বার নিবন্ধেব মধ্যে যেগুলি প্রাচীনতম সেগুলির কোন কোনটির ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। ছন্দ সাধাবণতঃ অত্যন্ত হাল্‌কা চালের"।[২৫]

উপরের এই উদ্ধৃতিটিতে ডঃ সুকুমার সেন মল্লভূমে রচিত রায়বার সম্পর্কে যথার্থ পরিচয় দান করিয়াছেন। প্রাচীনকালেও রাজা এবং রাজবংশের প্রশস্তি গাথা চারণদের মাধ্যমে গীত হইয়া প্রচারিত হইত। এই চারণদের মাগধ, ভট্ট বা ভাট নামেও অভিহিত করা হইত। 'বাল্মীকি রামাযণ' লবকুশ কর্তৃক গীত হইয়াছিল, সেকথার উল্লেখ রামায়ণেই পাওয়া যায় :-[২৬]

'কৃৎস্নং বামায়ণং কাব্যং গায়েতাং পরয়ামুদা' ॥৪॥

(উ. কাণ্ড/১০৬ সর্গ/৪র্থ শ্লোঃ)

অধ্যাপক পার্জিটার উল্লেখ করিয়াছেন বিচরণশীল গায়কসম্প্রদায় বা সূতদের সঙ্গে বর্তমান রাজপুতনায় ভাটদের তুলনা করা চলে। অধ্যাপক উইন্টারনিৎসের মতে এই মাগধ ও সূতেরা গায়ক শ্রেণীভুক্ত ছিল, মাগধরা ছিল মগধের এবং সূতেরা বাস করিত মগধের পূর্বদেশে।[২৭] প্রাচীনকালে এই সূতেরা বা ভাটেরা সম্ভবতঃ রাজদূতের মর্যাদা লাভ করিতেন। পরবর্তীকালে পেশাগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই 'ভাট' পদটির সম্মান হ্রাস পায় এবং সেই সঙ্গে 'রায়ভাট' বা 'রাজভাট' পদটির অর্থের অবনমন ঘটিতে দেখা যায়। তুলসীদাসী রামায়ণে পাওয়া যায় "মাগধ সূত ভাট নট যাচক জঁহতহঁ কবহিঁ কবার" (রামচরিত মানস)। এই ভাটদের লিখিত গাথাকেও 'রায়বার' বলা হইত। বাংলা সাহিত্যে এই রায়বার শব্দের সঙ্গে আমরা বহুকাল হইতে পরিচিত আছি।

(ক) "প্রবেশ করিতে হাট দেখা পাইল রাজভাট
রায়বার পড়ে ঊর্দ্ধ হাত" (কবিকঙ্কণ, 'চণ্ডীমঙ্গল')

(খ) 'বিপ্রগণ বেদ পড়ে ভাটে রায়বার' (বৃন্দাবন দাস, 'চৈতন্যভাগবত')

(গ) 'ভাটে পড়ে বায়বার যশ বর্ণাইয়া'
('অন্নদামঙ্গল', ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩০৯, পৃ.৪৫৯)

বাংলায় এই 'রায়বার'কে 'কায়বার'ও বলা হইয়াছে, —

'ব্রাহ্মণেতে বেদ পঠে ভাটে কায়বার'

(লোচনদাস, চৈতন্যমঙ্গল, বঙ্গবাসী সং, ১৩০৮, পৃ. ৬৩)

তবে এই সকল রচনায় বায়বাবের উল্লেখ থাকিলেও তাহাতে দৌত্য ক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। মধ্যযুগে রায়বার সম্পর্কিত যেসব পালা পাওয়া যায় তাহাদের

নাম 'অঙ্গদ রায়বার', 'কুম্ভকর্ণের রায়বাব', 'হনূমানের রায়বাব' এবং 'বিভীষণের রায়বার' প্রভৃতি। কবিচন্দ্রের 'অঙ্গদ রায়বার' বাংলা সাহিত্যে এক উৎকৃষ্ট সংযোজন। বাজস্তুতিবাচক চারণদের প্রাচীনকালে প্রয়োজনবোধে দৌত্য কার্যের জন্য স্থানান্তরে প্রেরণ করা হইত। বাল্মীকির রামায়ণে অঙ্গদ এইরূপ দৌত্য কর্মে বাবণ সভায় প্রেরিত হইয়াছিল। রামচন্দ্র কর্তৃক কথিত জ্বালাময়ী ভাষণ (ল.কাণ্ড/৪১ সর্গ/৫৮-৭২ শ্লোঃ) অঙ্গদ রাবণের উদ্দেশ্যে তীব্র ভাষায় বিষোদ্‌গার করিয়া লঙ্কাপুবী হইতে (ল.কাণ্ড/৪১ শ সর্গ/৭৩-৮১ শ্লোঃ) প্রভুর মান রক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। অধ্যাত্ম রামায়ণে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

কবিচন্দ্র তাঁহার রামায়ণে বাল্মীকি রামায়ণের আদর্শ অনুসবণ করিয়া লিখিয়াছেন —

দূতকে মারিলে হয় বড অবিচার।
তে কারণে মোর আগে করিস অহঙ্কার ॥

(অঙ্গদ রায়বার, পু.পৃ. ৭ক)

দূত অবধ্য, রাবণের উক্তিতে তাহাই প্রকাশিত। এইরূপ দূতপ্রেরণ প্রাচীন ভারতের একটি বিশেষ রীতি ছিল বলিয়া মনে হয়। মহাভারতের বনপর্বে ৪টি শ্লোক (২৭-৩০ শ্লোঃ)[২৮] এবং মহানাটকের সপ্তমাঙ্কে (১-৮০ শ্লোঃ) অঙ্গদের দৌত্যের কথা বর্ণিত হইয়াছে। কবিচন্দ্রের কাব্যেও অনুরূপ দৌত্য ক্রিয়ার উল্লেখ পাওয়া যায় 'অঙ্গদ রায়বার' পালায়। রামচন্দ্রের আদেশে অঙ্গদ রাবণসভায় উপস্থিত হইয়া রাবণকে গালাগালি শুরু করিলে রাবণও তাহার প্রতি স্পর্ধা চূর্ণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

অঙ্গদ নিজের বিশাল বপু সৃষ্টি করিয়া রাবণসভায় প্রবেশ করিতেই রাক্ষসেরা ভীত হইয়া পলায়ন করিতে থাকে। অপবদিকে রাবণ অঙ্গদকে অপ্রতিভ করার জন্য মায়াছলে সভাশুদ্ধ সকলকে রাবণরূপে পরিণত করেন। একমাত্র ইন্দ্রজিৎ পিতৃরূপ ধারণ করা অনুচিত বিবেচনায় আপন রূপেই বসিয়া থাকে। এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া সপ্রতিভ অঙ্গদ ইন্দ্রজিতের উদ্দেশ্যে প্রথমে কটূক্তি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে :—

অঙ্গদ বলে সত্যকথা কহিস ইন্দ্রজিতা।
যতেক রাবণ বস্যা আছে সব কি তোর পিতা ॥
এত অহঙ্কারে লঘু গুরু না মানিস।
এতেক বাপের তেজ নৈলে ইন্দ্র বান্ধ্যা আনিস ॥
ধন্য রাণী মন্দোদরী সাবাস তোর মাকে।
এক যুবতী শতেক পতি ভাব কেমনে রাখে ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৪ক)

এইরূপ অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া রাবণ আপন মায়াজাল সংহরণ করিয়া অঙ্গদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। রাবণ অঙ্গদকে ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া ওঠেন — "সমুদ্রের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিলে, বিভীষণ আসিয়া পায়ে কাঁদিয়া পড়িলে, হনূমানকে বাঁধিয়া আনিয়া দিলে এবং রামলক্ষ্মণ ধনুর্বাণ পরিত্যাগপূর্বক নাকে খত দিলে, রাবণ সকল দোষ ক্ষমা করিয়া কৃপা করিতে পারে।" অঙ্গদ তাহাতে জবাব দেয় — 'গোসাঞি উহাই আমার চাই'। সেতুবন্ধ ভাঙ্গিয়া লঙ্কা নির্মাইয়া দিলেও 'শূর্পণখার নাক কানটি কেমনে যাবেক জুড়্যা'? (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৫ক)

অঙ্গদের এই শ্লেষাত্মক প্রশ্নের কিন্তু কোনও উত্তর মিলিল না। অঙ্গদ একে একে রাবণের সকল কীর্তিকলাপ প্রকাশ করিয়া দিল। রাবণও তাহাকে পাপিষ্ঠ বলিয়া ধিক্কার জানাইলেন —

ধিক্ জীবন তোর মররে অধম বেটা।
বৃথাই জীবন তোর অঙ্গদ, তোর মা কুলটা॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৬)

অঙ্গদ পাল্টা প্রতিশোধ নিল —

অঙ্গদ বলেন বা রাবণ, মোর মা কুলটা।
সত্যি করয়া বল দেখি রাবণ, তুই কার বেটা॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৬)

এই সকল অসংযত বাক্যালাপের মধ্যে রাবণের রাজসিক ভোগাসক্তি ও তামসিক বিলাস ব্যসনের পরিচয় মেলে। অঙ্গদের ভাষায়ও মহাকাব্যের বীরজনোচিত ভাবের প্রকাশ নাই। বাক্যগুলি অসংলগ্ন এবং নিতান্ত স্থূলভাবে বর্ণিত।

এই 'অঙ্গদ রায়বার' পালা সম্পর্কে এতকাল যত সমালোচনা হইয়াছে এত বোধহয় কবিচন্দ্রের আর কোনও পালা সম্পর্কেই হয় নাই। ইহা যেমন হাস্যরসের উদাহরণস্থল তেমনি ইহার সম্পর্কে আছে অশ্লীলতার অভিযোগ।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন কবিচন্দ্রের এই পালাটির প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন — "Kavichandra, ... introduced the humorous speech of prince Angada in the court of Ravana, a speech characterised by its pointedness, flashes of poetry and no less by its Coarse wit, which, however appealed to the simple and illiterate villagers the most." [২৯]

ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন — "অঙ্গদ রায়বার কবিচন্দ্রের রঙ্গরস ও ব্যঙ্গ কৌতুকের সার্থক দৃষ্টান্ত। কবিচন্দ্র প্রতিভার দিক দিয়া কখনই কৃত্তিবাসের সমকক্ষ নহেন, কিন্তু তাঁহার রচনার কোন কোন অংশ কৃত্তিবাসের সমতুল্য তাহা স্বীকার করিতে হইবে।"[৩০]

আবার অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় কবিচন্দ্রের এই পালাটিকে অশ্লীল রচনা বলিয়া মত প্রকাশ কবিয়াছেন। তাঁহার মতে —

"............. ঐ অশ্লীল ও গ্রাম্য বসিকতার জন্যই বিষ্ণুপুরী রামায়ণের অঙ্গদ রায়বার নিম্নস্তরের রুচিসম্পন্ন লোকের কাছে জনপ্রিয় হয়েছিল............."।[৩১]

কাজেই দেখা যায়, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ও ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কবিচন্দ্রের এই পালাটি সম্পর্কে প্রশংসাসূচক অভিমত প্রকাশ করিলেও অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মনে করিয়াছেন পালাটির জনপ্রিয়তার মূল কারণ 'অশ্লীল ও গ্রাম্য রসিকতা', তাহাও আবার হইয়াছিল, 'নিম্নস্তরের রুচিসম্পন্ন লোকের কাছে।'

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের কথায় ইহাব উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন, — "অঙ্গদের রায়বারের মধ্যে যে পবিহাস রসিকতা আছে, তাহা বিশেষ মার্জিত রুচির পরিচায়ক না হইলেও উহা তৎকালোপযোগী হইয়াছিল। এই মৌলিকত্বই কবিচন্দ্রের বাহাদুবী।"[৩২] আমাদেরও মনে হয়, অঙ্গদের এই তীক্ষ্ণ বাক্‌চাতুর্য মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য। 'মার্জিত রুচিব' অভাব এবং 'অশ্লীলতা'র অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও দেখা যায়, কবিচন্দ্রের পূর্বে এবং পরে বাংলা সাহিত্যে বহু 'রায়বার' পালা রচিত হইয়াছে, কিন্তু কবিচন্দ্রের এই পালাটির যত বিপুল সংখ্যক পাঠ পাওয়া যায়, এত পাঠ অন্য কোনও কবির রায়বার পালায় পাওয়া যায় না। যদি ইহা 'অশ্লীলতা'র দোষে অভিযুক্ত হইত তাহা হইলে বোধকরি ইহার এত অধিক পাঠ লিপিকৃত হইতে পারিত না। এই সকল পুথি জনমানসের চাহিদানুসারেই লিপিকৃত হইয়াছিল। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন এই পালাটির কবিত্বশক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার গ্রন্থে এই পালাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৩৩]

আমরা 'অঙ্গদ রায়বার' (ক.বি. ১৬৩) পালার কোনও অংশ রুচি বিগর্হিত মনে করিয়া পরিবর্তন করি নাই। সর্বসাধারণের বিচারের জন্যই উহা তুলিয়া ধরা হইয়াছে। প্রায় তিনশত বৎসর পরে মানুষের রুচির কতখানি পরিবর্তন ঘটে তাহাও বিবেচনার বিষয়। আধুনিক রুচিশীল মানুষের নিকটেও ইহার আবেদন কমিয়া যায় নাই। নচেৎ এই তথাকথিত গ্রাম্যতা দোষে অভিযুক্ত কবিচন্দ্রের 'অঙ্গদ রায়বার' পালাই বহু কৃত্তিবাসী রামায়ণের মুদ্রিত সংস্করণকে প্রভাবিত করিতে পারিত না। অথচ শ্রীরামপুর প্রেস হইতে প্রথম মুদ্রিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের (১৮০৩ খ্রীঃ, ৬ষ্ঠ কাণ্ড, পৃ. ৩৮-৬৩) অঙ্গদ রায়বার অংশের পাঠ অন্যরূপ। অঙ্গদ এবং রাবণের উক্ত কৃত্তিবাসী রামায়ণের শান্ত উক্তি প্রত্যুক্তি কবিচন্দ্রের রচনার মত অম্ল-মধুর ঝাঁঝালো রসাদিষ্ট নহে। মনে হয়, এই ঝাঁঝালো রসই আধুনিক রুচিসম্পন্ন মানুষও অপছন্দ করেন নাই। অঙ্গদ রায়বারের উক্ত অশ্রাব্য ভাষা প্রকৃতপক্ষে যেন দুই পালোয়ানেরই ভাষা। অশ্রুভারানত করুণ-বসাত্মক রামায়ণগানের দীর্ঘ বর্ণনার ফাঁকে

রায়বারের লঘু-চপল গতি খুব সম্ভব শ্রোতা সাধারণকে হাল্কা আমেজে ভরপুর করিয়া তুলিত, এইজন্য রামায়ণগানের আসরে কি নিম্নস্তরের, কি উচ্চস্তরের, সকল রুচিসম্পন্ন মানুষই ইহার কলাকৌশলে মুগ্ধ না হইয়া পারিতেন না। আর এই কারণেই অন্যান্য কবির রায়বার পালায় এবং কৃত্তিবাসের নামাঙ্কিত কিছু অঙ্গদ রায়বারের পুথিতেও কবিচন্দ্রের রচনাই ঈষৎ পরিবর্তিত হইয়া অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। এমনকি কয়েকটি মুদ্রিত কৃত্তিবাসী রামায়ণও কবিচন্দ্রের এই প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহে।

লোকশ্রুতি :

কবিচন্দ্রেব বামাযণের দুইটি পালা খুব সম্ভব, লোকশ্রুতি হইতে সংগৃহীত। উহাদের নাম 'শিবরামের যুদ্ধ' এবং 'সীতার উদ্দেশ' পালা। 'সীতার উদ্দেশ' পালার বিষয় পূর্বে 'মহানাটক'-এব প্রভাব প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। এই সকল লোকশ্রুতিমূলক পালার মূল উৎস কোথায় তাহা সঠিকভাবে নিরূপিত না হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত কাহিনীই পরে শক্তিমান কবির লেখনী স্পর্শে অমরত্ব লাভ করে।

কবিচন্দ্রের ভণিতায় 'শিবরামের যুদ্ধ' পালার একটি পুথিতে ভবিষ্য পুরাণের উল্লেখ আছে (বি.ভা. ৬১১১, পু.পৃ. ৫ক, ৫ এবং ৭)। কিন্তু কবিচন্দ্রের কাহিনীটি যেরূপে বিন্যস্ত তাহা কোনও বিশেষ একটি পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত বলিয়া মনে হয় না। কবিচন্দ্রেব এই পালাটির বিষয় সংক্ষেপে এইরূপ :—

সীতাহরণের পর লক্ষ্মণ ক্ষুধার্ত রামচন্দ্রের জন্য কিছু ফল তুলিয়া আনিবার উদ্দেশ্যে শিবের বাগানে গিয়া উপস্থিত হন। ডালপালা লণ্ড ভণ্ড করার অপরাধে উদ্যানরক্ষক হনূমান লক্ষ্মণকে যুদ্ধে পরাস্ত কবিয়া পাথর চাপা দিয়া রাখে। অবশেষে ভ্রাতার খোঁজে রামচন্দ্র বহির্গত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলে হনূমানের মুখে লক্ষ্মণের মৃত্যুর কথা শুনিয়া তিনি দিশাহারা হইয়া পড়েন। ভ্রাতৃঘাতীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি শরাঘাতে হনূমানকে ভূতলশায়ী করেন। পবনের মুখে শিব সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কৈলাস হইতে ছুটিয়া আসেন ও হনূমানকে সুস্থ করিয়া তোলেন। অতঃপর লক্ষ্মণের পক্ষে রাম ও হনূমানের পক্ষে শিবের মধ্যেও ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। দেবতারা ভয়ে কম্পমান হইয়া ভবানীকে যুদ্ধ থামাইতে নির্দেশ দেন। ভবানী রণমধ্যে উপস্থিত হইয়া সংগ্রামে বাধা প্রদান করিলে শিব ও রাম উভয় দেবতাই উভয়ের পরিচয় পাইয়া পূর্বকৃত কর্মের জন্য লজ্জাভিভূত হন। শিব তখন রামচন্দ্রকেই আপন ইষ্ট ও গুরুরূপে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন। রামচন্দ্রের নির্দেশে শিব মুমূর্ষু লক্ষ্মণকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলেন ও আপন অনুচর হনূমানকে পর্যন্ত বামচন্দ্রেব নিকট সীতা উদ্ধারার্থে সমর্পণ করিয়া দেন।

উপরে উল্লিখিত পালাটির মধ্যে তিনটি বিষয় খুব স্পষ্ট, — শিব ও রামের যুদ্ধ, যুদ্ধশেষে উভয়ের অভেদত্ব বর্ণনা এবং রামচন্দ্রের শিবের অনুচর হনূমানকে লাভ ও হনূমানের মন্ত্র গ্রহণ প্রসঙ্গ। অতএব কবিচন্দ্রের 'শিবরামের যুদ্ধ' পালাটির সঙ্গে বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণিত শিব ও বিষ্ণুর যুদ্ধ প্রসঙ্গের কোনও মিল আছে কিনা দেখা যাক। কেননা মধ্যযুগে রামকেও বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন। কবিচন্দ্র এইরূপ কোনও ধারণাবশতঃ শিব ও রামের মধ্যে যুদ্ধের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন কিনা কে জানে ?

মূল রামায়ণে পাওয়া যায়, রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করিয়া সীতাসহ অযোধ্যায় ফিরিবার পথে পরশুরাম দাশরথি রামের বল পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বিষ্ণুপ্রদত্ত সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দ্বিতীয় ধনুটি ভঙ্গ করিতে বলেন। সেইসময় তিনি বিষ্ণু ও মহাদেবের মধ্যে সংঘটিত মহাযুদ্ধের কথাও জ্ঞাপন করেন। উক্ত যুদ্ধে বিষ্ণুর পরাক্রমে শৈব-ধনু স্খলিত হইতে দেখিয়া দেবতারা বিষ্ণুকেই সমধিক বলবান মনে করেন। যুদ্ধ শেষে ভগবান রুদ্র উক্ত ধনু বৈদেহ রাজর্ষি দেবরাতের হস্তে সমর্পণ করেন এবং বিষ্ণুও স্বীয় ধনু ভার্গব ঋচীককে প্রদান করেন। অতএব সেই বৈষ্ণবধনু ভঙ্গ করিয়া পরশুরাম রঘুনন্দন রামকে স্বীয় শক্তিমত্তার পরিচয় প্রদান করিতে বলেন (বালকাণ্ড/৭৫ সর্গ/১১-২৮ শ্লোঃ)।

যদিও পরশুরাম কর্তৃক বর্ণিত রামায়ণের এই কাহিনীর মধ্যে শিব ও বিষ্ণুর যুদ্ধ প্রসঙ্গ পাওয়া যায়, তথাপি উহার উপস্থাপনা ভিন্নরূপ। তবে তাহাতে শিব অপেক্ষা বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হওয়ায় উহা দ্বারা শৈব ও বৈষ্ণব বিরোধের একটা আভাস পাওয়া যায় মাত্র। রামায়ণে বর্ণিত এই কাহিনীর সঙ্গে কবিচন্দ্রের রচনার কোনও মিল না থাকিলেও তাঁহার পালাটিতেও শেষ পর্যন্ত ভোলা মহেশ্বর কর্তৃক রামচন্দ্রের প্রতিই সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে। শিব রামচন্দ্রকেই আপন ইষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন এবং অনুচর হনূমানকে রামচন্দ্রের নিকট ভৃত্যরূপে সমর্পণ করিয়া দেন। এই পালাটির রচনার মূলে মধ্যযুগে বহুল প্রচারিত রামায়েত সম্প্রদায়ের প্রভাব ক্রিয়াশীল হইয়ছিল কিনা বলা যায় না। তবে বাল্মীকি-রামায়ণের উল্লিখিত শিব ও বিষ্ণুর যুদ্ধ প্রসঙ্গে বিষ্ণুর বিজয়লাভের মধ্যে বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, সে সম্পর্কে অনেকেই মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে ইংরাজ গবেষক জে. ম্যুর লিখিয়াছেন —

"In this state of enmity of great and terrible fight ensued between Sriti-Kantha and Vishnu, each of whom was eager to conquer the other................................

Seeing that the bow of Siva had been relaxed by the prowess of Vishnu, the gods and rishis esteemed Vishnu to be superior"[৩৪]

মূল রামায়ণে বর্ণিত শৈব ও বৈষ্ণব দ্বন্দ্বের মত কবিচন্দ্রের 'শিবরামের যুদ্ধ' পালাটির

মধ্যে শিব ও রামের বিরোধের আভাস থাকিলেও পরাক্রমে শিব এবং রাম কাহাকেও হীন না করিয়া যুদ্ধের অবসান ঘটানো হইয়াছে এবং যুদ্ধশেষে রাম অর্থাৎ বিষ্ণুকেই শিবের গুরু বলিয়া উল্লখ করা হইয়াছে। রামায়ণ রচয়িতা হিসাবে কবিচন্দ্র রাম অর্থাৎ বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া মধ্যযুগের জনমানসের গভীর ধর্মানুভূতিকেই যে ইহার মধ্যে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা দ্বারা শৈব এবং বৈষ্ণব উভয় ধর্মমতের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে।

পাদটীকা

১। রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ : ঋগ্বেদ সংহিতা, প্রথম খণ্ড, হরফ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬ খ্রীঃ, পৃ. ২৬-২৭

২। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অনূদিত : ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, বিশ্বকোষ প্রেস, ১৩১৮ সাল, ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়, ১ম খণ্ড-৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৮৩-৬০০।

৩। মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীতম্, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃতানুবাদ : শ্রীমদ্ভাগবতম্, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, ১৩০৬ শ্রাবণ। ৯ম স্কন্ধ/১৬ শ অঃ/১৮-১৯ শ্লোক, পৃ. ১২১।

৪। পঞ্চানন তর্করত্ন (দেব শর্ম্মণঃ) সম্পাদিত ও অনূদিত (ভট্টপল্লীনিবাসিনঃ) : বাল্মীকি-রামায়ণম্, বঙ্গবাসী প্রেস, কলিকাতা, ১৩১১ সাল। বালকাণ্ড/৬১ সর্গ/পৃ. ১০৮।

৫। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত ও অনূদিত : কূর্মপুরাণ, দ্বিতীয় সং ১৩৩২ সাল, পৃ. ১১২-১১৬

৬। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত ও অনূদিত : দেবীপুরাণম্, ২য় সং ১৩৩৪ সাল, পৃ.৩৯৩-৩৯৪।

৭। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত ও অনূদিত : স্কন্দপুরাণ, নাগরখণ্ড, পৃ. ১৮১৮।

৮। মহেশচন্দ্র পাল সঙ্কলিত ও অনূদিত : মার্কণ্ডেয় পুরাণ, মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত, ১৮১২ শকাব্দ। অষ্টম অঃ, পৃ. ১২-২০ এবং হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানের অনুবাদ অংশ, পৃ. ১৭-২৮।

৯। আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, তৃতীয় সং, ১৯৫৮। পৃ. ৫৯৫-৫৯৬।

১০। সুকুমার সেন	:	বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড অপরার্ধ, ২য় সং, ১৯৬৫। পৃ. ১২৯
১১। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত ও অনূদিত	:	বাল্মীকি-রামায়ণম্, বঙ্গবাসী, কলিকাতা, বাং-১৩১১ সাল। পৃ. ৩৮১।
১২। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত এবং অনূদিত	:	পদ্মপুরাণম্, স্বর্গখণ্ডম্, বঙ্গবাসী প্রেস, ১৩১৩ সাল, পৃ. ১২৫-১২৬।
১৩। রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত	:	'শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, সাধনা প্রকাশনী, ১৯৬৬ খ্রীঃ। দ্বাদশ অধ্যায়, পৃ. ৪৩৭।
১৪। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত এবং অনূদিত	:	শিবপুরাণম্, জ্ঞান-সংহিতা, ত্রিংশ অধ্যায়, সংস্কৃত মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত, ১৩১৪ সাল, বঙ্গবাসী প্রেস, কলিকাতা, পৃ. ১১৫-১১৬।
১৫। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীতম্, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃতানুবাদ।	:	'শ্রীমদ্ভাগবতম্', মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, ১৩০৬, শ্রাবণ। নবম স্কন্ধ/দশম অধ্যায়, পৃ. ৭২-৯১ পর্যন্ত শ্লোক ও অনুবাদ এই অধ্যায় গৃহীত হইল।
১৬। প্রাগুক্ত	:	প্রাগুক্ত
১৭। প্রাগুক্ত	:	প্রাগুক্ত
১৮। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীতম্ পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত এবং অনূদিত	:	অধ্যাত্ম রামায়ণম্, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গতম্, ২য় সং-১৩৩৫ সাল। বঙ্গবাসী, কলিকাতা (নটবর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।) অযোধ্যা-লঙ্কা/পৃ. ৪৬-২৪০ পর্যন্ত শ্লোক ও অনুবাদ গৃহীত হইল।
১৯। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত ও অনূদিত	:	বাল্মীকি-রামায়ণম্, বঙ্গবাসী, কলিকাতা, ১৩১১ সাল। অরণ্যকাণ্ড/৩৯ সর্গ/ ১৫-১৭ শ্লোঃ পৃ. ৪৭৭।
২০। মহাকবি শ্রীলহনূমতা বিরচিতম্, শ্রীকালীপদ তর্কাচার্যেণ অনুবাদ সমেত	:	মহানাটকম্ (পঞ্চমাঙ্গ পর্যন্তম), কলিকাতা, ১৯৪৫। দেবনাগরী হরফকে বঙ্গাক্ষরে প্রদত্ত হইল। পৃ. ৪১৩-৪১৬ এবং ৪৪২-৪৪৩ হইতে শ্লোক ও অনুবাদ গৃহীত হইল।
২১। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত ও অনূদিত	:	বাল্মীকি-রামায়ণম্, বঙ্গবাসী, কলিকাতা, ১৩১১ সাল। লঙ্কাকাণ্ড/৪১ শ সর্গ/পৃ. ৯৭৪-৯৭৬।

২২। মণীন্দ্র মোহন বসু : বাঙ্গলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, ১৯৪৭। পৃ. ৯৭।

২৩। মহাকবি শ্রীলহনুমতা বিরচিতম্, শ্রীমধুসূদন মিশ্রেণ সন্দর্ভ। শ্রীজীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাচার্যেন বিরচিত ব্যাখ্যা : মহানাটকম্, তৃতীয় সংস্করণম্। কলিকাতা গিরীশ যন্ত্রে মুদ্রিতম্। ১৯৩৯ খ্রীঃ (দেবনাগরী হরফে লিখিত সপ্তম অঙ্কের শ্লোক বঙ্গাক্ষরে প্রদত্ত হইল)

২৪। 'মহানাটক'-এর এই শ্লোকসমূহের 'ভাবার্থ'-ব্যাখ্যা স্কটিশচার্চ কলেজের (শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ) সংস্কৃত ভাষার প্রাক্তন অধ্যাপিকা শ্রীযুক্তা প্রতিভা ঘোষ কৃত।

২৫। সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ২য় সং ১৯৬৫। পৃ. ৪০৬।

২৬। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত ও অনূদিত : বাল্মীকি-রামায়ণম্, বঙ্গবাসী কলিকাতা। ১৩১১ সাল। উত্তরাকাণ্ড/১০৬ সর্গ,/১-৬ শ্লোক বর্ণিত সঙ্গীতের উল্লেখ, পৃ. ১৪৪৪।

২৭। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ : সঙ্গীত ও সংস্কৃতি, ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস, উত্তরভাগ। পৃ. ৫৫-৫৬ হইতে গৃহীত।

২৮। হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ সম্পাদিত : মহাভারত, বনপর্ব, ৪র্থ খণ্ড, ২৭-৩০ শ্লোক।

২৯। Dinesh Chandra Sen : 'The Bengali Ramayanas 1920. Chap-VI. P. 181

৩০। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড, ১ম সং ১৯৬৬ খ্রীঃ। পৃ. ১০৪৬।

৩১। সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত: কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিরচিত রামায়ণ, ভারবি প্রকাশিত, ২য় সং ১৯৮১, ভূমিকা পৃ. ৫৬

৩২। দীনেশচন্দ্র সেন : বৃহৎ বঙ্গ, ২য় খণ্ড, ১৩৪২ সাল। পৃ. ৯৮০।

৩৩। দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত : বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, ১ম খণ্ড, ১৯১৪ খ্রীঃ। পৃ. ৫২৪।

৩৪। J. Muir : Original Sanskrit Texts on the Origin and History. The people of India. Vol. IV, 2nd edition. London 1873. Sect. V, PP. 176-177

।। সপ্তম অধ্যায়।।

।। বিষ্ণুপুরী রামায়ণের কাব্যগুণ।।

'রামায়ণ' একাধারে কাব্য, ইতিহাস, সবই । ইহার কাব্যরস যেমন রসপিপাসুচিত্তকে নানাভাবে আকুল করে, চরিত্রচিত্রণে ইহার বাস্তবানুসারিতাও সকল যুগের মানুষকে তেমনি মুগ্ধ করে। ভারতীয় পারিবারিক জীবনের পবিত্র আদর্শ রামায়ণই বিশ্বের নিকট তুলিয়া ধরিয়াছে । এইখানেই রামায়ণের আসল সার্থকতা । রামায়ণীকথার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে । পিতা-পুত্র, ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতি ভক্তির সম্বন্ধ, রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে । ....
রামায়ণের মহিমা রাম-রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই — সে যুদ্ধ ঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্যপ্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষ মাত্র ।"[১]

বস্তুতঃপক্ষে ভারতবর্ষের সুপ্রাচীনকাল হইতে গৃহধর্মেব আদর্শ যে কত গভীর, কত উন্নত, কত মহৎ ও উদার ছিল রামায়ণই তাহা দেখাইতে পারিয়াছে । মানুষের স্নেহ-প্রেম, বিরহ-মিলন, সুখ-দুঃখ, ত্যাগ-ভোগ প্রভৃতির সহজ সরল মানবিক আবেদনেই কাব্যখানির আসল সার্থকতা । "সত্যনিষ্ঠা, পিতৃভক্তি, পাতিব্রত্য, পত্নীপ্রেম, সৌভ্রাত্র, প্রভুভক্তি, আশ্রিতরক্ষা প্রভৃতি যে-সমস্ত গুণে সমাজে মানুষের মধ্যে শান্তি ও সুখ সহজলভ্য হয়, যে-সমস্ত গুণে মানুষ দেবতার পদে উন্নীত হইতে পারে, নিখিল চিত্ত-মথনকারী মনোহর উপাখ্যানের মাধ্যমে উপাখ্যানের পটভূমিকা নগর ও অরণ্য উভয়ের পারিপার্শ্বিক, অদ্ভুত সুন্দরভাবে সকলকে প্রীত-বিস্মিত করিবার সে-সমস্ত গুণ ও আদর্শ রামায়ণে প্রতিফলিত হইয়া আছে ।"[১] এইরূপ সহজ স্নিগ্ধ আদর্শের জন্যই মুদির দোকান হইতে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্র রাম-কথার সমাদর ।

এইরূপ পারিবারিক জীবনের মধুর আদর্শ আছে বলিয়াই আর কোনও কাব্যের সঙ্গে তাহার তুলনাও করা চলে না । মানব-চিত্তবৃত্তির প্রকাশবৈচিত্র্যে মহাভারতে অধিক, কিন্তু হৃদয়বৃত্তির সুমহান আদর্শ, চারিত্রশক্তির কঠোর অনুশাসন প্রতিপদে বামায়ণে অভিব্যক্ত হওয়ায় তাহা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে পরিণত হইতে পারিয়াছে । রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, ভরত ও লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি এবং সীতার পতিভক্তি শ্রদ্ধার আসনে যেভাবে পূজিত, মহাভারতের কোনও চরিত্র তেমন নয় । মানুষ যে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ বা বিশ্বমিলনের পরিপ্রেক্ষিতে আদর্শ সমাজের স্বপ্ন দেখে তাহা 'রামরাজ্য' ভিন্ন অন্য কোন রাজ্য ? এইজন্য রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "রামায়ণে ভারতবর্ষ যাহা চায় তাহা পাইয়াছে ।"[২]

সমসাময়িক দেশ ও কালের চিত্র, সাহিত্যে অল্পাধিক প্রতিফলিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বস্তুপ্রধান মহাকাব্যের বিশেষত্বই ইহা। হোমারের 'ইলিয়াডে' তৎকালীন গ্রীক জীবনের ছায়া প্রতিভাসিত, ভার্জিলের "ঈনিডে' রোমের জীবনাদর্শ প্রতিফলিত। বাল্মীকির মহাকাব্যেও ভারতবর্ষেব একটা বিশেষ যুগ ও জীবনাদর্শের সংস্কৃতির প্রভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল। মহাকবি-বর্ণিত চরিত্রসমূহ প্রত্যেক জনসমাজে আদৃত হওয়ার মূল কারণ প্রত্যেক অঞ্চলের জনসাধারণ আপন সংস্কারের উপযুক্ত করিয়া এই সকল চরিত্রকে স্বেচ্ছামত পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছেন। রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতা প্রত্যেক জনসমাজেই শ্রদ্ধার্হ। কিন্তু বাল্মীকিব নরশার্দুল রামচন্দ্র বাঙ্গলায় নবদূর্বাদলশ্যাম। 'রামায়ণ'- বর্ণিত চরিত্রসমূহের অঞ্চলভেদে এত বিভিন্নতা লক্ষ্য করিয়া ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, — "বাল্মীকি-রামায়ণের সীতা ক্ষত্রিয়াণী, বীরাঙ্গনা ; বাঙ্গলায় আসিয়া তিনি কৃত্তিবাস-প্রমুখ বাঙ্গালী কবির অঙ্কিত চরিত্রালেখ্যে বাঙ্গলাব গৃহস্থ ঘরের বধূ হইয়া গিয়াছেন। আবাব রাজস্থানে তিনি মধ্যযুগের রাজপুতানী, কেরলে তিনি কেরল-সীমন্তিনী, তুলসীদাস-প্রমুখ কবিব কল্যাণে তিনি উত্তরভারতেব লজ্জাশীলা অথচ তেজোদৃপ্তা কুলবধূ। সীতা মহীয়সী বীবাঙ্গনা, কিন্তু আমরা 'জনমদুখিনী' বাঙ্গালী ঘরের লাজুক বধূ সীতাকেই জানি, তাঁহার পুণ্য চরিত্র আকুলচিত্তে পূজা করি — এবং এই জনমদুখিনী অথচ স্বামীর প্রেমে গরবিনী এবং স্বামীর আদর্শে ধন্যা ও অনুপ্রাণিতা রাম-ঘবণী সীতাকে, নূতন কবিয়া গৌরাঙ্গ-জায়া বিষ্ণু প্রিয়ারূপে ও রামকৃষ্ণ-পত্নী সারদাদেবী রূপে পাইয়াও আমরা ধন্য হইয়াছি।"[৪] অতএব ইহা অনস্বীকার্য যে, মহাকাব্য-বর্ণিত চরিত্রসমূহে নিখিল ভারতীয় আর্য সংস্কৃতির সাধাবণ উপাদানের সঙ্গে বাঙ্গালীর কিছু কিছু নিজস্ব চিন্তা ও ভাবধাবার প্রকাশ ঘটিয়াছে। আর্য মহাকাব্যের বিশাল ও ব্যাপক সংস্কৃতি বাঙালী অনুবাদকের কাব্যে বাংলাদেশের পটভূমিকায় বসায়িত। সুতবাং কবিচন্দ্র যে আর্য বামায়ণের ধারা অনুসবণ কবিলেও বাংলাদেশের এক প্রান্তীয় চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইবেন তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।

'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' খানি বিশ্লেষণ কবিলে দেখা যায়, কবি সংস্কৃত রামায়ণের কাণ্ডবিভাগকে একটু নূতনরূপে উপস্থাপিত কবিয়াছেন পালাগুলির পৃথক্ নামকরণ করিয়া। অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দবা এবং লঙ্কাকাণ্ডেব পরিবর্তে পাওয়া যায় — 'রঘুনাথের বনবাস', 'সীতাহরণ', 'বামসুগ্রীবমিলন', 'সীতার উদ্দেশ' এবং 'অঙ্গদ রায়বার' ইত্যাদি পালা। এই নামকরণ স্বভাবতঃই আধুনিক নাটকেব নামকরণেব ভাবধারাব আদর্শ। প্রত্যেকটি পালার এইরূপ নামকরণের মূলে উক্ত পালাব প্রধান চরিত্রটি বর্তমান, এবং সমস্ত পালাব কেন্দ্রীয় চবিত্র শ্রীবামচন্দ্র এই পালাসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছেন। একদিকে নাম মহিমা প্রচাব এবং অপবদিকে মহাকাব্য-বর্ণিত চবিত্রেব পবিচয়দানেব প্রচেষ্টা

এইরূপ শিল্পকর্মের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য দ্বারাই পালাগুলির গতি প্রকৃতি সুনির্দিষ্ট। লঙ্কাকাণ্ডের অন্তর্গত পালাসমূহের নামকরণও এইরূপ কিছুটা চরিত্রভিত্তিক ; যথা — অঙ্গদরায়বার, রাবণ-কুম্ভকর্ণ সংবাদ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, সীতার পরীক্ষা, রঘুনাথের দেশাগমন প্রভৃতি। চরিত্র-চিত্রণ এবং নাট্যধর্মিতা কবিচন্দ্রের পালাসমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রামায়ণের কাহিনী স্বতঃই অভূতপূর্ব নাট্যাবেগ-সম্পন্ন বিষয়। নাটকের প্রধান গুণ রসের চরমোৎকর্ষ। রামচন্দ্রের বনগমনদৃশ্যে তাহার অব্যর্থ প্রতিফলন দেখা যায়। ইহা ব্যতীত, কবিচন্দ্রের কল্পিত কিছু ছোট ছোট ঘটনা সংস্থাপনে আকস্মিকতা এবং সংলাপ-বৈচিত্র্যও লক্ষনীয়। তবে মূল রামায়ণে ঘটনা সংস্থান ও চরিত্রসমূহ যেমন জটিল এবং ব্যাপক কবিচন্দ্রের কাব্যে সেইরূপ নয়। কবিচন্দ্রের রচনার সর্বপ্রধান গুণ ভাষায় প্রাঞ্জলতা এবং রচনায় স্বকীয়তা। এইহেতু চরিত্রগুলিও সহজ এবং সংক্ষিপ্ত।

নাট্যরসকেই পরবর্তী আচার্যগণ কাব্যরসস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কাব্য মুখ্যতঃ নাট্যস্বভাব-সম্পন্ন, উহাতে ভাষা, বৃত্তি, কাকু এবং নেপথ্য বিধান প্রভৃতি দ্বারা রস পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে।

চরিত্র চিত্রণ:

দশরথ:- রাজা দশরথ অতিমাত্রায় পুত্রবৎসল এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ। কাব্যের প্রথমেই রাজা দশরথ সভায় সমাসীন ভক্ত প্রজাবৃন্দ কর্তৃক যুবরাজ রামকে রাজপদে অভিষেক করিতে প্রোৎসাহিত হন। নৃপতিরও বাসনা তাহাই। কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেবের অনুমতিক্রমে পুষ্যানক্ষত্রযোগে রামচন্দ্রের অভিষেক-আয়োজন স্থিরীকৃত হইলে রাজা সীতাসহ রঘুপতিকে নিয়মে থাকিতে নির্দেশ দেন। রাজপুরী উৎসব-সজ্জায় সজ্জিত হয়, কিন্তু বিধি বাম, কৈকেয়ী বাদ সাধিয়া বসেন। ক্রোধাগারে প্রিয়তমা মহিষীর মরণপণ প্রতিজ্ঞা শ্রবণে রাজা দশরথ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন। যে চন্দ্রমুখীকে ক্রোধ পরিহারের নিমিত্ত তাঁহার মতানুক্রমে রাজা ধনীকে দরিদ্র ও দরিদ্রকে ধনী করিবার প্রতিশ্রুতি দান করিতে চাহিয়াছিলেন; সেই চন্দ্রমুখী অকস্মাৎ ভরতকে রাজ্যদান এবং রামকে চৌদ্দ বৎসরের নিমিত্ত বনবাস — এই দুই বর প্রার্থনা করিয়া রাজার হৃদয়ে নিদারুণ শেল হনন করিয়া বসেন।

নিরুপায় রাজা মহিষীর মত পরিবর্তনের আশায় পত্নীর চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আবার লোকনিন্দার কথা স্মরণ হইলে রাজা তাহাতে মহা চিন্তায় পড়েন।

রাম বনে গেলে মোর হব অপযশ।
লোকে বলিবেক রাজা যুবতীর বশ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৬)

কিন্তু তাঁহার অপযশ ঘোষিত হইবে ভাবিয়া তিনি বিচলিত নহেন । রাজা ভালরূপেই জানেন যে সত্যের জন্যই তাঁহার প্রাণপ্রতিম পুত্রকে তিনি হারাইতে বসিয়াছেন । রাজা কখনও ক্রুদ্ধস্বরে ভৎর্সনা করিয়া কখনও বা কৃতাঞ্জলিপুটে কৈকেয়ীর পদে নিপতিত হইয়া রাণীর মত পরিবর্তন করিতে সচেষ্ট হন । অবশেষে রাজা স্থির করেন ভরতকে রাজ্যপ্রদানপূর্বক রামচন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া তিনি দেশান্তরী হইবেন । ঘরে ঘরে ভিক্ষা মাগিয়া খাইবেন তথাপি তিনি পোড়ারাজ্যে আর থাকিবেন না । ইহাতে সত্যের অপলাপ হইবে বলিয়া কৈকেয়ী রাজাকে ধর্মপথে থাকিতে বলেন এবং পুত্রস্নেহে অন্ধ রাজাকে অশ্রুমোচন করিতে দেখিয়া 'কাপুরুষ' বলিয়া ধিক্কার প্রদান করেন । 'কপোত ঘুঘুকে আপন মাংস কাটিয়া, সমুদ্র অধিক উথোলিত না হইয়া, অলর্করাজা বিপ্রকে তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করিয়া যেরূপে সত্যরক্ষা করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন, মহারাজার উচিত সেইরূপে ধর্মপথে থাকা । সত্যের সমান ধর্ম নাই । কৈকেয়ীর এই দীর্ঘ উপদেশ শ্রবণ করিয়া অসীম ধৈর্য সহকারে রাজা আপন প্রাণের বিনিময়ে রঘুনাথের জীবন আরেকবার ভিক্ষা করেন । পুত্রস্নেহাতুরের নিকট সকল দৃঢ়তা এক নিমিষে অন্তর্হিত হইয়া যায় । রামচন্দ্রকে দশরথ কখনই নিজমুখে বনে যাইতে বলেন নাই । সুমন্ত্রকেও প্রভাতে রাজা নিজে কিছু বলেন নাই । কৈকেয়ীই রাজা দশরথকে উদ্দেশ্য করিয়া সুমন্ত্রকে সকল কথা অবগত করান । সুমন্ত্র একে একে ছয় দ্বারে দশরথের বার্তা নিবেদনপূর্বক রামচন্দ্রকে রাজার নিকট উপস্থিত হইতে বলেন । তাহাতে রামচন্দ্র লক্ষ্মণসহ পিতার নিকট সানন্দে আসিয়া উপস্থিত হইলে নির্বাক দশরথ অশ্রুপূর্ণ নয়নে রামচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া থাকেন । কৈকেয়ীকে নিকটে দেখিয়া রামচন্দ্র তাঁহাকেই ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কৈকেয়ী সময় অযথা অপব্যয় হইবে ভাবিয়া বলিয়া ওঠেন, 'রাজা সত্যে বন্দী, যদি তুমি পুত্র হও তবে পিতাকে উদ্ধার কর।' পিতার প্রতি রামচন্দ্রের মনোভাব জ্ঞাত হইয়া দশরথের পরিবর্তে কৈকেয়ীই রামচন্দ্রকে বনগমনের আদেশ প্রদান করেন । দশরথ নিজমুখে যাহা ব্যক্ত করিতে অপারগ ছিলেন অশ্রুধারার মধ্য দিয়াই তাহা অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে ।

দশরথের চরিত্রে আর্য মহিমার দৃঢ়তার অভাব থাকিলেও বাৎসল্য-পরায়ণ বাঙ্গালী পিতার হৃদয়টি যথোপযুক্তরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে । এইরূপ পুত্রস্নেহাতুর পিতার প্রতিও কৌশল্যার অভিযোগের অন্ত ছিল না ।

রাজা স্ত্রীর বশীভূত, এই অপবাদই ছিল দশরথের সর্বাধিক । অথচ বর প্রদানের পর হইতে তিনি কৈকেয়ীব সঙ্গে সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন । দশরথের স্পষ্ট জবাব এইরূপ —

রাম বনে গেলে আমি তোরে না রাখিব।
পুত্রের সমেত তোমা দূর করি দিব ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১২)

কৈকেয়ীকে দশরথ 'পাপিনী শাপিনী' বলিয়া তিরস্কার করেন । বনবাসে রামচন্দ্রের দুঃখের

কথা চিন্তা করিয়া দুঃখেব হেতু যিনি সেই প্রিয়দর্শিনী কৈকেয়ীকে রাজার বিষবৎ অসহ্য বোধ হইতে থাকে। রামচন্দ্রের সঙ্গে রাজা নিজে বনবাসী হইতে চাহিয়াছিলেন কারণ তাহাতে যদি বা কৈকেয়ীকে জব্দ করিতে পারা যায়।

রামচন্দ্র পিতাকে শান্ত হইতে বলিলে দশরথ একরাত্রি অন্ততঃ পুত্রকে নিজের কাছে থাকিবার জন্য অনুনয় করেন, তাহাতেও যদি তিনি শোক কিছুটা প্রশমিত করিতে পারেন এইরূপ অভিপ্রায়ের বশবর্তী হইয়া বলেন —

একরাত্রি রামচন্দ্র থাক মোর সনে।
মাতৃবর্গে আশ্বাসিয়া কালি যাবে বনে।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১৩ক)

রামচন্দ্র পিতার অপেক্ষা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পিতা সত্যপাশে বন্দী, অতএব এক রাত্রি অবহেলা করাও উচিত নহে। দশরথ ধর্মধীর পুত্রের অভিপ্রায় জানিয়া অন্য উপায় চিন্তা করিতে থাকেন। বনগমনে পুত্রেব যাহাতে কোনও কষ্ট না হয় সেইজন্য চতুরঙ্গ-দল, বসন-ভূষণ এবং বহু ধন সঙ্গে দিতে প্রস্তুত হন।

দশরথের এইরূপ মনোভাবে কৈকেয়ী কোপান্বিত হইয়া বলিয়া ওঠেন, 'দ্রব্যহীন এরাজ্যে ভরতের প্রয়োজন নাই,' ববং তিনি রাজাকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, 'দশরথের বংশেই সগর জ্যেষ্ঠপুত্র অসমঞ্জকে বিনাদোষে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অতএব রাজার উচিত রামকেও অনুরূপভাবে পরিত্যাগ করা'। সিদ্ধার্থ অসমঞ্জসম্বন্ধীয় ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলে দশরথ কৈকেয়ীর প্রতি গর্জিয়া ওঠেন —

দশরথ বলে যাব বনের ভিতর।
ভরত লইয়া পাপী রাজ্য ভোগ কর।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১৩)

রামচন্দ্রের বনগমনকালে দশরথের যে উন্মাদ অবস্থার কথা কবিচন্দ্র বর্ণনা করিয়াছেন, বাল্মীকিও সেইরূপ বর্ণনা করেন নাই। কবিচন্দ্রের কাব্যে পাওয়া যায়, রামচন্দ্র পত্নী ও ভ্রাতা সহ রথাবোহণে বনযাত্রা করিলে রাজা দশরথ মূর্ছিত অবস্থা হইতে একবার চেতনা প্রাপ্ত হন। রাণী কৌশল্যার মুখে সেইকালে পুত্রের বিদায় গমনের কথা শ্রবণ করিয়া উর্দ্ধমুখে তিনি রথের পিছনে ধাবমান হন।

রামচন্দ্র পিতার বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়া সারথিকে বায়ুবেগে রথ চালাইতে নির্দেশ দিলে দশরথের বিলাপধ্বনি দ্বিগুণতর হয়। তিনি দুই হাত তুলিয়া রথকে একবার থামিবার জন্য অনুরোধ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। রথ দৃষ্টিপথের আড়াল হইলে দশরথ পুনরায় ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়েন।

বাল্মীকি-রামায়ণে দশবথ এতটা অপ্রকৃতিস্থ নহেন, তবে পুত্র বিরহে তিনি শোকসন্তপ্ত[২]।
কবিচন্দ্রের কাব্যে রাজা দশরথ মূর্ছিত হইয়া পড়িলে রাণীরা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া তোলেন।

রামবিহীন নিষ্প্রভ পুরীতে রাজা দশরথ অমাত্যবর্গ কর্তৃক নীত হইযা কৌশল্যার গৃহে শয্যায় শায়িত হন। পুত্রদ্বয় ও পুত্রবধূর নাম ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে একবার কৌশল্যাকে হস্তদ্বারা নিজের দেহ স্পর্শ করিতে বলেন। কারণ তিনি তখন দৃষ্টিশক্তি রহিত হইয়াছেন। রামচন্দ্রের রথের পশ্চাতে তাঁহার দৃষ্টি চলিয়া গিয়াছে, তাহা আর ফিরিয়া আসে নাই। দূর্বাদলশ্যাম-রামকে দর্শন করিবার বাসনা রাজার ইহজীবনের মত শেষ হইয়া যায়। এই অংশের বর্ণনা বাল্মীকি কাব্যের অনুরূপ। দর্শনেন্দ্রিয়ের বিলুপ্তি বাজাব অন্তিম সময় সূচিত করিয়া দেয়।

এই নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও রাণী কৌশল্যা রাজাকে নানা কটূক্তি করিতে থাকেন। সুমন্ত্র প্রত্যাগত হইয়া রামচন্দ্রের বিদায়কালীন অবস্থা বর্ণনা করিলে কৌশল্যা পুনবায় পুত্রকে বনবাসে পাঠাইবার নিমিত্ত রাজাকে দোষারোপ করিতে থাকেন। বারংবার ভর্ৎসনা শ্রবণে রাজা কৌশল্যার নিকট স্বীয় অপরাধ স্বীকার করেন। রামের বিরহে রাজার অন্তর বিদীর্ণ হইতেছিল, তাহাতে আবার তিনি বাক্যবাণে বিদ্ধ হইতেছিলেন — এই দ্বিগুণ জ্বালা রাজা সহ্য করিতে না পারিয়া অচিরে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করেন।

গভীর সঙ্কটকালে জ্ঞানীর তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। অনুশোচনার অনলে দগ্ধ না হইলে প্রকৃত সত্য লাভ হয় না। অনুতপ্ত হৃদয়ে পুত্র-বিরহিতের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হওয়ায় তিনি স্বীয় কর্মফল প্রত্যক্ষ করেন। বহুকাল পূর্বের এক বিস্মৃত কাহিনী রাজার স্মৃতিপথে জাগ্রত হয়। সেই কাহিনী তিনি রাণী কৌশল্যার নিকট বিবৃত করেন। 'শব্দভেদী-বাণে'[৬] ভ্রমবশতঃ অন্ধকমুনির পুত্র রাজা দশরথের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন এবং পুত্র শোকাতুর অন্ধ পিতা-মাতা পুত্রের সঙ্গে অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন। অন্ধকমুনির অভিশাপেই রাজা দশরথকেও অনুরূপ পুত্রশোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে, কাজেই তাঁহারা যেরূপ বিলাপ করিয়াছিলেন রাজা দশরথেরও পুত্রশোকে সেইরূপ নিদারুণ বিলাপ গাথা অন্তরে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। 'হা রাম', হা পুত্র, হায় সীতা' এবং 'প্রাণের লক্ষ্মণ' এই শেষবাক্য উচ্চারণের পব অর্ধরাত্রে রাজা প্রাণত্যাগ করেন।

দাসী সব বলে রাণী ডাক আর কারে।
মহারাজা মরিয়াছেন দুঃখের সায়রে॥

(রঘুনাথের বনবাস, পু.পৃ. ২৫)

প্রভাতের আলোর আগমনে রাজপুরীতে মুরজধ্বনি বাজিয়া ওঠে, বন্দীগণ রাজার স্তুতিগীতি আরম্ভ কবেন। কিন্তু রাজা কোথায়? তিনি তখন চিরশান্তির কোলে বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন।

কবিচন্দ্র দশরথের চরিত্রকে আর্য রামায়ণের আদর্শে সত্যপ্রতিজ্ঞ, প্রজানুরক্ত, পুত্রবৎসল ও নির্ভীক করিয়া তুলিয়াছেন। বরদান ব্যাপারে রাজা সত্যপ্রতিজ্ঞ, অপবাদ

সহ্য করিয়াও তিনি সত্য হইতে বিচ্যুত হন নাই। কৈকেয়ীকে শাসন করিয়াছেন, কিন্তু কখনও স্ত্রীর মর্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই।

রামচন্দ্র :-

'রামায়ণ'-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র রাম, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই কাব্য সর্বত্র নাট্যোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। কবিচন্দ্রের কাব্যে রামচন্দ্রের জন্ম, বাল্যলীলা ও বিবাহ অতি সংক্ষেপে বর্ণিত। রামচন্দ্র যুবরাজ পদের উপযুক্ত হইলে রাজা দশরথ কর্তৃক রাজসভায় আহূত হন। পিতৃপদে প্রণাম করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে তাঁহার রূপের আলোতে প্রাতঃকরোজ্জ্বল রবির ন্যায় চারিদিক ঝলমল করিয়া ওঠে। রাজা দশরথ পুত্রকে নির্দিষ্ট দিনে রাজপদে অভিষেকের ইচ্ছা জ্ঞাপনপূর্বক রাজ্যপালনের বিধি-বিধান জ্ঞাত করাইয়া সীতার সঙ্গে নিয়মে থাকিতে বলেন। তাঁহার রূপের ব্যাখ্যা কবিচন্দ্র এইভাবে দিয়াছেন—

প্রবাল পুরট হার পদক ভূষণ।
গলে গজমোতিহীরা জড়িত কাঞ্চন ॥
বসন ভূষণে রাম বড় শোভা পায়।
ঝলমল করে রূপ দিবাকর প্রায় ॥
চন্দ্র যেন শোভা পায় গগনমণ্ডলে।
তেমনি রামের দেহচ্ছবি দীপ্ত জ্বলে ॥
আসনে বসায়্যা রাজা রামচন্দ্রে কন।
ইন্দ্র প্রতি প্রিয় বাক্য কশ্যপ যেমন ॥

(রঘুনাথের বনবাস, পু.পৃ. ২)

এইরূপ কোমলকান্তের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে অপূর্ব বীর্যবত্তা। সর্বোপরি মহৎ ভাবানুভূতির জন্যই তিনি ছিলেন প্রজা সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন।

রামচন্দ্র ছিলেন সকলের সহচর এমনকি বিমাতা কৈকেয়ীরও একান্ত প্রিয় পাত্র। দাসী মন্থরার মুখে কৈকেয়ী রামচন্দ্রের অভিষেক বার্তা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে দাসীকে কোলে তুলিয়া লইতে যান এবং নানা বসন ভূষণ দ্বারা মন্থরাকে খুশী করিতে সচেষ্ট হন। কৈকেয়ী জানেন ভরত অপেক্ষা রামই তাঁহাকে অধিক সমাদর করেন। রামচন্দ্রকে তিনি জানেন 'ধার্মিক', 'সুবুদ্ধি' ও জ্ঞানবান পুত্ররূপে।

সেই সেবাপরায়ণ, ধার্মিক পুত্র যখন পরদিন প্রভাতে দশরথ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া লক্ষ্মণ সহ পিতৃসকাশে উপস্থিত হন, তখন পিতাকে অতি দীনভাবে মাতা কৈকেয়ীর পার্শ্বে অবস্থিত দেখিয়া বিস্মিতভাবে রাজার শোকের হেতু কি তাহা জানিতে চাহেন। কৈকেয়ী তখন নির্দ্বিধায় জবাব দেন, 'পিতা সত্যে বন্দী', কাজেই 'পিতার জন্য তাঁহাকে বনবাসে যাইতে

হইবে'। বিমাতার প্রচ্ছন্ন জবাব সহসা বোধগম্য না হওয়ায় রামচন্দ্র পুনরায় প্রশ্ন করেন তাঁহাকে কী করিতে হইবে ? প্রয়োজন হইলে পিতার জন্য তিনি প্রাণত্যাগ, বিষভক্ষণ, সীতাকে পরিত্যাগ, অধিক কি রাজ্যপাট ও কৌশল্যামাতাকে পর্যন্ত পরিহার করিতে পারেন । পিতার জন্য তিনি অনলেও প্রবেশ করিতে প্রস্তুত আছেন । যিনি পিতৃবাক্য পালন করেন তিনি উত্তম এবং পৃথিবীতে তিনি ধন্য । আর যিনি পরাঙ্মুখ তিনি শাস্ত্রের মতে অধম । এইভাবে কৈকেয়ীর নিকট রামচন্দ্র প্রতিশ্রুতি দ্বারা সত্যেবদ্ধ হন । তিনি তো দুইরকম কথা বলিতে জানেন না ।

রামচন্দ্রের বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া কৈকেয়ী জানান যে, রাজা লজ্জায় প্রিয়পুত্রকে কিছু বলিতে পরিতেছেন না । তাহাকে অদ্যই জটাবল্কল ধারণপূর্বক চৌদ্দবৎসরের জন্য বনবাসী হইতে হইবে । রামচন্দ্র বিমাতার মুখের এই আদেশকেই পিতৃআদেশরূপে ধীর চিত্তে গ্রহণ করিয়া বনবাসে যাইতে প্রস্তুত হন । মাতৃ আজ্ঞাই "ব্রহ্ম" মনে করিয়া পিতার অনুমতির জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন । কৈকেয়ী বনযাত্রার জন্য তাড়না করিতে থাকিলে দশরথ একবার সকরুণ নয়নে রামচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন ।

ক্রন্দনরত নির্দোষ পিতাকে রামচন্দ্র নানাভাবে সান্ত্বনা প্রদান করেন । কোনও প্রকার অধীরতা প্রকাশ না করিয়া রামচন্দ্র বনবাসে যাইবার পূর্বে ভরতের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিয়া অযোধ্যার রাজ্যভার তাঁহার হস্তে সমর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন ।

কিন্তু কৈকেয়ী ভরতের প্রতি রামচন্দ্রের এই স্নেহ এবং গভীর বিশ্বাসবোধের কোনও মর্ম না বুঝিয়া এইরূপ প্রস্তাবের মূলে হয়তো কোনও কপট অভিসন্ধি নিহিত আছে বলিয়া মনে করেন । তাই রামচন্দ্র বিদায় হইলে তবেই তিনি ভরতকে রাজ্যে আনাইবেন বলিয়া জানান । রামচন্দ্র অবশ্য জোরের সঙ্গেই বলেন যে, তিনি বনে নিশ্চয়ই যাইবেন, তাহা অন্যথা হইবার নয় ।

মাতা কৌশল্যা ক্ষুধার্ত পুত্রকে অন্ন ভোজন করিতে বলিলে রামচন্দ্র গভীর দুঃখে জানান, ভোজনের সময় নাই কারণ পিতা চৌদ্দবৎসরের জন্য বনবাস দিয়াছেন । অতএব অল্পক্ষণের মধ্যে দণ্ডক কাননে গমন করিতে হইবে । পুত্রের কথায় কৌশল্যাদেবী হাহাকার করিয়া ওঠেন এবং রামচন্দ্রকে মাতার বাক্য অবহেলা করিয়া বনে যাইতে নিষেধ করেন । রামচন্দ্র জননীর সকল কথা মানিয়া লইলেও বনবাসে যাইবেন বলিয়া দৃঢ়তা প্রকাশ করেন । পিতৃভক্তির মত মাতৃভক্তিও তাঁহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তাই কৌশল্যার পদপ্রান্তে নত হইয়া বলেন —

পিতা হত্যে তুমি গুরু বট।
বেদ শাস্ত্র জানি নীত নাঞি করি অনুচিত
কোন মূঢ়ে বলে তোমা খাট ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১০)

রামচন্দ্রের চরিত্রে অসামান্য মহত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে বিমাতা কৈকেয়ী সম্পর্কিত উক্তিতে। যে কৈকেয়ী রাজপুরীর সকলকে শোকবিদ্ধ করিয়াছেন, সেই স্বজনবিচ্যুতা কৈকেয়ীর জন্য রামচন্দ্রের করুণার পরিসীমা ছিল না। কৌশল্যাকে তিনি সপত্নীসুলভ মনোভাব দূর করিবার জন্য বলিয়াছেন —

বৃথা তুমি কর রোষ কৈকেয়ীর নাহি দোষ
কালেতে সকল কর্ম হয়।
রাজা ছিলা প্রতিশ্রুত নাহি হল্যা সত্যে চ্যুত
তাঁহারে দিলেন বরদ্বয় ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১১ক)

কৌশল্যা পুত্রের সঙ্গে বনে যাইতে চাহিলে রামচন্দ্র মাতাকে বলেন পতিকে ছাড়িয়া কোনও সাধ্বী নারীর পুত্রের সঙ্গে দূরে গমন করা উচিত নহে। অধিকন্তু ভরত তাঁহার সেবায় সর্বদা নিযুক্ত থাকিবে। তাহাকে দেখিয়া মাতা নিশ্চয়ই সকল শোক ভুলিয়া থাকিতে পারিবেন। ভরতকে তিনি প্রকৃত সেবক এবং ধর্মধীর বলিয়া জানেন। কবিচন্দ্র রামচন্দ্রের চরিত্রকে মহনীয় করিয়া তুলিয়াছেন ভরতের প্রতি তাঁহার স্নেহার্দ্র মনোভাবে। ভরতকে তিনি যতদূর জানেন রাজপুরীতে ততদূর আর কেহ জানেন বলিয়া মনে হয় না। আর কাহারও উক্তিতে ভরতের চরিত্রের এত সূক্ষ্ম অনুভবের প্রকাশ দেখা যায় না। রামচন্দ্র সত্যই মহানুভব, তাই তিনি মহতের যথার্থ মূল্য দিয়াছেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন রামচন্দ্র সম্পর্কে বলিয়াছেন, "পিতৃভক্ত বিষয় নিস্পৃহ কুমারের স্নিগ্ধ, কিন্তু অটল সঙ্কল্প এই মহাশোক ও ক্রোধের অভিনয়ক্ষেত্রে এক অসামান্য বৈরাগ্য ও বীরত্বের শ্রী জাগাইয়া দিল।"[৭]

প্রকৃতপক্ষে কবিচন্দ্রের কাব্যেও রামচন্দ্রের কথায়-ও বিনম্র ব্যবহারে এবং সকলের সকল যুক্তি উপেক্ষা করিয়া বনগমনে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করার মধ্যে অভূতপূর্ব "বৈরাগ্য ও বীরত্বের শ্রী" ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়। লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী রামচন্দ্রের সঙ্গে বনগমনে সঙ্গী হইতে চাহিলে রঘুপতি নানা প্রবোধ সহকারে তাঁহাদের নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন। বনবাসের কষ্ট ও বিপদের কথাও তিনি জনকদুহিতাকে স্মরণ করিতে বলেন। যতদিন তিনি ফিরিয়া না আসিবেন ততদিন শ্বশুর শাশুড়ীর সেবাযত্ন করিয়া এবং ভরত, শত্রুঘ্নকে পুত্রবৎ পালন করিয়া জানকীকে দিনাতিপাত করিতে বলেন।

বনবাস হত্যে যাবত নাহি আসি আমি।
শ্বশুর শাশুড়ীর বাসে সদা রবে তুমি ॥
ভরত শত্রুঘ্নতে দেখিবে পুত্রবৎ।
সকল মায়ের সেবা করিবে সদত ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১১)

কিন্তু কিছুতেই তিনি পত্নীকে রাজপুরীতে থাকিবার জন্য রাজী করিতে সমর্থ হন নাই।

অগত্যা সীতাদেবীকে সঙ্গে লইতে সম্মত হন। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকেও রাজপুরীতে অবস্থান করিয়া জননীদের সেবা করিতে বলেন। নিজের অপেক্ষা অযোধ্যার ও দুঃখিনী জননীদের অসহনীয় দুঃখের কথাই রামচন্দ্রকে সর্বাপেক্ষা পীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল।

রাম বলে আমি তুমি বনে যদি যাব।
তব মম জননীর সেবা কে করিব ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১২ক)

তাহাতে লক্ষ্মণ দৃঢ়ভাবে উত্তর দিয়াছিলেন, 'মাতাদের পরিচর্যার উপযুক্ত ভরত এবং লক্ষ্মণের মত বহু সেবক রঘুবরের আদেশ পালনে নিযুক্ত আছেন। বনবাসে 'অস্ত্রপাণি' হইয়া তিনিই অগ্রে গমন করিবেন।'

অস্ত্র-পাণি হয়্যা আমি আগে আগে যাব।
আমি ভক্ত অনুরক্ত সেবায় আসিব ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১২ক)

লক্ষ্মণের দৃঢ় মনোভাবে রঘুনাথ প্রীত হন এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে লইতে বলেন। জানকী ও লক্ষ্মণসহ রামচন্দ্র বনগমনে পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনিও পুত্রের অনুগমন করিবেন বলিয়া জানান। রামচন্দ্র পিতাকে অধীর হইতে নিষেধ করেন।
সহস্র বৎসর যাঁহার আয়ু, যাঁহার কীর্তি ও বল লাভ হইয়াছে, চৌদ্দ বৎসর তাঁহার পক্ষে সময়ের দিক হইতে নিতান্তই তুচ্ছ। পিতার শত অনুরোধেও রামচন্দ্র আর এক রাত্রিও অযোধ্যায় অবস্থান করিতে সম্মত হন নাই।
পুত্র স্নেহান্ধ রাজার প্রতি কৈকেয়ী নানা কঠোর বাক্য প্রয়োগে উত্তেজিত হইলে উভয় দিক রক্ষা করিয়া রাম বিমাতাকেও শান্ত হইতে বলেন।

অনুতাপে মরে বাপ না বলিহ কিছু।
আমি গেলে উচিতে জে হয় কর‍্যা পাছু। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১৩)

কবিচন্দ্র রামচন্দ্রের চরিত্রে ঐশ্বর্যভাবের প্রকাশ দ্বিজ মুনিগণের মুখে প্রথম ব্যক্ত করেন। পরে ধীরে ধীরে সকলেই বিষ্ণুর অবতার এই নরনারায়ণের পদপ্রান্তে আপন আপন ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। প্রথমে মুনিবর বামদেব সর্বসাধারণের নিকট রামচন্দ্রের ঈশ্বরত্ব ব্যাখ্যা করিয়া শোনান—

রাবণ বধের তরে মানব শরীর।
অতেব চলিলা বনে রাম রঘুবীর ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১৪ক)

কৈকেয়ী রামচন্দ্রকে বসনভূষণ পরিত্যাগ পূর্বক চীর গ্রহণ করিতে বলিলে তিনি স্মিতহাস্যে তাহা পরিধান করেন। দয়ার্দ্র-চিত্ত রাম ব্যথাতুরা জননী কৌশল্যার চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া মাতার দায়িত্বভার পিতা ও আপন বিমাতাদের উপর প্রদান করিয়া যান।
সুমিত্রাদেবী লক্ষ্মণের অভিপ্রায় জানিয়া পুত্রকে রামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করেন। রামচন্দ্র সকলের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনাকরতঃ জ্ঞানাজ্ঞানে যে সকল অপরাধ করিয়াছেন

বিনম্রচিত্তে সকলের নিকট তাহার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া রথারোহণে বনগমন করেন। পরদিন প্রভাতে সুমন্ত্র সারথিকে বিদায়দানকালে তিনি পিতা ও মাতাদের জন্য যে অন্তর্বেদনা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে কর্তব্যবোধের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে বিনম্রভক্তি ও শ্রদ্ধাবোধ। বশিষ্ঠদেবকে প্রণতি, বন্ধুবান্ধবে মধুর বচন, সুমিত্রার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা, মন্দভাগিনী কৌশল্যা মাতাকে প্রণাম, এবং ভরতের প্রতি আন্তরিক প্রীতি ও স্নেহ জ্ঞাপনকরতঃ সুমন্ত্রকে নানারূপ প্রবোধ বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া রামচন্দ্র তাহাকে ফিরিয়া যাইতে বলেন এবং যাইবার কালে ইহাও বলিয়া দেন যে কৈকেয়ীঁর বচনে বনে আসিয়া তিনি স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছেন। তবে বাল্মীকির অনুরূপ কবিচন্দ্রও একবার সংশয়পরায়ণা কৈকেয়ীর সম্পর্কে রামচন্দ্রের মুখে বিমাতার আনন্দের কারণ কিসে হইবে তাহা ব্যক্ত করেন। সুমন্ত্র রামচন্দ্রের সঙ্গীরূপে বনবাস অবলম্বন করিতে চাহিলে কমললোচন রাম তাঁহাকে কৈকেয়ীর প্রত্যয় লাভের জন্যই ফিরিয়া যাইতে বলেন।

আরণ্যক পরিবেশেই দয়ানিধি রামের অবতারত্বের সুপ্রকাশ ঘটে। প্রজাহিতৈষী রাম নিষাদরাজ গুহককে পরম সুহৃদরূপে গ্রহণ করেন। উভয়ে উভয়কে 'মিতা' সম্বোধনে ভূষিত করিলে গুহকই দুই ভ্রাতার শিরোপরি বটের আঁঠা দ্বারা জটা বন্ধন করিয়া দেয়। গঙ্গাপার হইয়া ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলে মুনি রামচন্দ্রকে ঈশ্বরের অবতার রূপে বন্দনা করেন।

ভরদ্বাজ বলে মোর সার্থক জীবন।
আশ্রম পবিত্র হৈল দেখিনু চরণ ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ২১ক)

'ব্রহ্মার আরাধ্য' শ্রীরামচন্দ্রকে নানাভাবে আপ্যায়নপূর্বক মুনিবর তাঁহাকে বাল্মীকির তপোবন চিত্রকূটের পথ নির্দেশ করেন। লক্ষ্মণ ও সীতাসহ রামচন্দ্র চিত্রকূটে প্রবিষ্ট হইয়া তপোবনের বিচিত্র শোভাদর্শনে মুগ্ধ হন। বাল্মীকিমুনি রামচন্দ্রকে নানাভাবে বন্দনাপূর্বক 'রাম-নাম' প্রভাবেই যে তিনি ব্রহ্মর্ষি হইয়াছেন তাহা আনুপূর্বিক বর্ণনা করেন :

ম-রা ম-রা জপিতে রামের নাম আল্য।
নির্মল শরীর যত পাপ দূরে গেল ॥
বল্মীকের রাশি হল্য আমার উপরি।
যোগে জপি রামনাম আপনা পাসরি ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ২২)

এদিকে চিত্রকুটে জটাচীরধারী ভরত নগ্নপদে আসিয়া রামচন্দ্রের পদতলে পতিত হইলে তিনি ভরত ও শত্রুঘ্ন উভয় ভ্রাতাকে বাহু প্রসারিত করিয়া কোল দান করেন। পিতৃবিয়োগের সংবাদে অধীরতা প্রদর্শন করিলেও ক্ষণপরে চিত্তসংযমপূর্বক তিনি আত্মস্থ হন। বশিষ্ঠ, জাবালি প্রভৃতি কুল পুরোহিতসহ ভরত রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনের জন্য নানাভাবে অনুবোধ করিয়া ব্যর্থ হন। পরিশেষে ভবত বনবাসী হইতে চাহিলে রামচন্দ্র

তাঁহাকে নানাভাবে প্রবোধ দান করিয়া স্নেহার্দ্র কন্ঠে ফিরিয়া যাইতে বলেন। শোকক্লিষ্ট ভরত অগ্রজের সম্মতিলাভ না করিতে পারায় অনশনে প্রাণত্যাগ করিবেন বলিয়া দন্তে তৃণ ধারণপূর্বক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তাঁহার অটল প্রতিজ্ঞায় রঘুবর সত্যই অভিভূত হইয়া পড়েন। অবশেষে রামচন্দ্রের ইঙ্গিতে বশিষ্ঠমুনি ভরতকে রামচন্দ্রের নরজন্মলাভের কারণ বর্ণনা করিলে জ্ঞানী ভরতের মনে বিচার উপস্থিত হয়। ভরত বুঝিতে পারেন তাঁহার অগ্রজ রামচন্দ্র রাজ্য ত্যাগ করিয়াই যেন প্রকৃত রাজাধিরাজ সাজিয়াছেন। এই দুই ত্যাগী মহাপুরুষের বিচিত্র জীবনালেখ্যে কাব্যখানি সমুজ্জ্বল। ভরত মণিমাণিক্যে খচিত একজোড়া বিচিত্র সুন্দর পাদুকা রামচন্দ্রের পদদ্বয়ে পরাইয়া উহাকে অযোধ্যার রাজপাটে স্থাপন করিবেন বলিয়া ভ্রাতৃপদরজে বিভূষিত পাদুকা শিরোপরি তুলিয়া লন। এই পাদুকা ভরতকে অপূর্ব রাজশ্রী প্রদান করে। অবশেষে সকলে প্রস্থান করিলে কৈকেয়ী স্বীয় অপরাধের জন্য রামচন্দ্রের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কৈকেয়ীর বেদনা অনুভব করিয়া রামচন্দ্রও ব্যথিত হন। এই পর্যন্ত রামচন্দ্রের চরিত্র বাল্মীকি-রামায়ণের অনুরূপ সত্য পালনে, ত্যাগে, শীলতায় ও সাহসে সমুজ্জ্বল। কিন্তু ইহার পর হইতে কবিচন্দ্র বাংলার যুগ জীবনের কূল ঘেঁষিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। ফলে চরিত্রও কিছুটা স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে।

ফল্গুনদীর তীরে শ্বশুর দশরথের প্রেতাত্মার অনুরোধে জানকী বালির পিণ্ড প্রদান করেন। রামচন্দ্র তাহা শুনিয়া সীতাদেবীর কথায় অবিশ্বাসবশতঃ তাঁহার উপর অতিশয় রুষ্ট হন। রামচন্দ্রের আত্মসংযমের এবং ধৈর্যশীলতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায় সীতাহরণের পরে। সীতা অপহৃতা হইলে রামচন্দ্র সত্যই যেন হইয়া পড়েন 'মণি হারা ফণী'। পূর্বে যিনি সকলকে প্রবোধ দিতেন তাঁহাকে তখন সকলে প্রবোধ দানে অগ্রসর হয়। তাঁহার বৈরাগ্যশ্রী সহসা কাব্যশ্রীতে পূর্ণ হইয়া ওঠে।

সমগ্র বনস্থলীতে সীতা-শূন্যতা বিরাজ করিতে থাকে। লক্ষ্মণকে তিনি দেশে ফিরিয়া গিয়া রাম ও সীতার মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া জানাইতে বলেন। সীতাকে কেহ হরণ করিয়া লইয়াছে, এই আশঙ্কার পরিবর্তে রামচন্দ্রের ধারণা হয়, কমনীয় সীতার শরীর বাঘ ভাল্লুকে ভক্ষণ করিয়াছে। রামচন্দ্র মালতী ও যূঁথি ফুলের নিকট তন্বী বেপথুমতীর সন্ধান জিজ্ঞাসা করিয়াও কোনও উত্তর পান নাই। সীতার চিন্তায় তাঁহার বাক্‌রুদ্ধ হইয়া যায় এবং অঝোরে অশ্রুরাশি ঝরিতে থাকে। অবশেষে অন্যায়ের প্রতিবাদকারী স্বার্থত্যাগী জটায়ুর নিকট তিনি সকল বৃত্তান্ত অবগত হন। রামচন্দ্র দুঃখিতচিত্তে পিতৃসখা জটায়ুর ভগ্নদেহে পদ্মহস্ত বুলাইতে থাকেন। সীতা হারাইয়া রামচন্দ্র আত্মত্যাগী জটায়ু এবং নিশিদিনের অনুসঙ্গী অনুজ লক্ষ্মণের সাহচর্য লাভ করেন। শিবের উদ্যানে প্রচণ্ড সংঘর্ষের পর লাভ করেন আর এক অনুচর হনূমানকে। হনূমানের মধ্যস্থতায় সুগ্রীবের সঙ্গে রামচন্দ্রের সখ্য

স্থাপিত হয়। সুগ্রীবও স্ত্রী এবং রাজ্য হারাইয়া বনে বনে ঘুরিতেছিলেন। শোকবিহ্বল রামচন্দ্র সুগ্রীবকে সমদুঃখী দেখিয়া তাহার প্রতি সহানুভূতিশীল হন। উভয়ের মিত্রতা স্থাপিত হইলে সুগ্রীব-শত্রু বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবের হৃতরাজ্য উদ্ধার করিয়া দেওয়াই রামচন্দ্রের নিকট ধর্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। অবশেষে সুগ্রীব ও হনূমানাদির সাহায্যে সীতার অনুসন্ধান ও লঙ্কাগমন ত্বরান্বিত হইয়া ওঠে।

রামচন্দ্রের কর্তব্যবোধ ও ভ্রাতৃপ্রেম অতুলনীয়। সুমিত্রামাতা বনবাসের প্রাক্কালে বীরতনয় লক্ষ্মণকে রামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন। রামচন্দ্র বনবাসের শেষদিন পর্যন্ত ভ্রাতাকে জীবন দিয়া রক্ষা করিয়াছেন। রাবণের শক্তিশেলে লক্ষ্মণ অচেতন হইয়া পড়িলে ব্যাঘ্রী যেমন বিপদে নিজের শাবককে রক্ষা করে, রামচন্দ্রও তদ্রূপ লক্ষ্মণকে বক্ষে রাখিয়া শত্রুহস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন। একদিকে তিনি রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিলেন অপরদিকে লক্ষ্মণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বানরদিগকে নিযুক্ত করিতেছিলেন, রাবণের শরবর্ষণে পৃষ্ঠদেশ ছিন্ন ভিন্ন হইতেছিল, তথাপি ভ্রাতৃবৎসল রামচন্দ্রের নিজের জন্য ভ্রূক্ষেপও ছিল না।

রামচন্দ্র মনুষ্যদেহে ঈশ্বর — একে একে বিভীষণ, মন্দোদরী, কুম্ভকর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া সকলের এই বোধ উপস্থিত হয়। সকলেই রাবণকে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া সীতাদেবীকে রামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিতে বলেন, কিন্তু রাবণ স্বীয় প্রতিজ্ঞায় অটল। অথচ তখন ভিতরে সাহস নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে এবং ইহাও জানেন যে, রামচন্দ্রের হস্তেই তাঁহার মৃত্যুবাণ অপেক্ষা করিতেছে। রাম রাবণের যুদ্ধের কোনও উপমা নাই। অবশেষে রাবণ বধের পর সীতা উদ্ধার হয়।

স্বর্ণলঙ্কা বিজয়ের পর ধর্মপত্নী সীতার প্রতি রামচন্দ্রের মনোভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়। রামচন্দ্রের নির্দেশে সীতাদেবী সভামধ্যে আনীত হইলে লোকনিন্দা ভয়ে রামচন্দ্র অন্তরে দ্বিধাগ্রস্ত হইতে থাকেন। হৃদয়ের আবেগ সম্বরণ করিয়া তিনি জানকীকে বলেন, দশাননকে সবংশে নিহত করিয়া তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছে, অতঃপর সীতাদেবী যথা ইচ্ছা তথায় গমন করিতে পারেন। একবৎসরকাল সীতা পরগৃহে ছিলেন, অতএব তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া তিনি পবিত্র ইক্ষ্বাকু বংশের অসম্মান করিতে পারিবেন না।

রাবণের ঘরে থাকিতে নহিত উদ্ধার।
ত্রিভুবনে অপযশ ঘুষিত আমার ॥ (সীতার পরীক্ষা, পু.পৃ. ৭ক)

যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া এই অপযশের হাত হইতে তিনি মুক্তি পাইয়াছেন। রামচন্দ্রের বংশ মর্যাদাবোধ জাগ্রত হইলে তিনি সীতার দুঃখ ভুলিয়া তাঁহাকে কঠোর ভাষণে বিদ্ধ করিতে থাকেন।

চতুর্দিকে অসংখ্য সৈন্য পরিবৃত অবস্থায় সীতাদেবী রামচন্দ্রের মুখে এই অপমানজনক কথা শ্রবণ করিয়া মরমে মরিয়া যান। তিনি অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করিতে গেলে রামচন্দ্রকে শোকাতুর দেখিয়া অগ্নি আসিয়া সীতাকে রামচন্দ্রের নিকট সমর্পণ করেন। স্ত্রৈণ অপবাদের ভয়ে রামচন্দ্র প্রথমে সীতাদেবীকে গ্রহণ করেন নাই বলিয়া জানান। কিন্তু তিনি অন্তরে জানেন যে সীতা ত্রিলোকের মধ্যে বিশুদ্ধা। অগ্নি সীতাকে ফিরাইয়া দিলে রামচন্দ্র সাগ্রহে পত্নীকে গ্রহণ করেন।

চৌদ্দ বৎসরান্তে রঘুপতি দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া অযোধ্যার রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। রাম-চরিত্রটির সর্বপ্রধান ত্রুটি, রামচন্দ্র নরনারায়ণ অথচ কাব্যের শেষে সীতাকে নিষ্পাপ জানিয়াও তিনি তাঁহাকে বর্জন করেন। 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এ যে সীতাকে রামচন্দ্র বর্জন করিয়াছিলেন তাহা মায়া-সীতা। আসল সীতাকে রাবণ স্পর্শই করেন নাই। 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এ সীতার পরীক্ষা নাই। এই দুই গ্রন্থের আদর্শে কবিচন্দ্রের কাব্য রচিত হইলেও 'সীতার পরীক্ষা' পালা তিনি বাল্মীকি রামায়ণের আদর্শে সৃষ্টি করেন। বাল্মীকির রামচন্দ্র নরনারায়ণ নহেন। উল্লিখিত দুই গ্রন্থের নরনারায়ণ রামচন্দ্রের সঙ্গে বাল্মীকি বর্ণিত নরশার্দূল রামচন্দ্রের মিশ্রণ জনিত অসঙ্গতি এই চরিত্রটির প্রধান ত্রুটি।

রামের চরিত্র কাব্যের সকল চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। তিনি আদর্শ পুত্র, ভ্রাতা, স্বামী, সখা এবং প্রভুরূপে বিকাশ পাইয়াছেন। বাল্মীকির রামচন্দ্র নিপুণ সমালোচক, তাঁহার চরিত্রে কবিগুরু যে জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছেন কবিচন্দ্রের রাম-চরিত্রে তাহা অনুপস্থিত। 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ'-এর রামচন্দ্র প্রেমের দেবতা, ভক্তপ্রাণ, অশ্রুসজল এবং আবেগব্যাকুল, কিন্তু তাঁহার বীরধর্ম ও প্রজাহিতৈষণার ভাবটিও সুস্পষ্ট।

ভরত :—

রামচন্দ্র বনবাস যাত্রাকালে তাঁহার সঙ্গে বনগমনে ইচ্ছুক অযোধ্যাবাসীর উদ্দেশ্যে ভ্রাতা ভরত সম্পর্কে বলিয়াছিলেন —

আমা হৈতে ভরতে অধিক প্রীত পাবে।
ভরত ভূপতি হৈলে সুখে গোঙ্গাইবে ॥
মহাবীর ধর্মধীর জ্ঞানী প্রিয়বাদী।
গুণাকর নৃপবর ভরত গুণনিধি ॥
প্রজাপ্রিয় পুণ্যবান পুরুষরতন।
অবিরত পুত্রবৎ করিব পালন ॥
তোমাদের প্রীতি স্নেহ আমাতে জেমন।

ভরণ করিব সভার ভরত তেমন ।।

(রঘুনাথের বনবাস, পু.পৃ. ১৮ক)

ধর্মধীর, জ্ঞানী, প্রিয়বাদী, প্রজাবৎসল এবং পুণ্যবান এতগুলি গুণের সমাবেশে ভরতের চরিত্র সুমহান সার্থকতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, সন্দেহ নাই । অযোধ্যার বিপ্রবর্গ রামচন্দ্রের সঙ্গী হইয়া বনে যাইতে চাহিলে কমললোচন তাঁহাদের নিকট ভরতের কর্তব্যপরায়ণতা ও উদারতার কথা উল্লেখ করিয়া বনে যাইতে নিবৃত্ত করেন । জননী কৌশল্যা পুত্রশোকে কাতরতা প্রদর্শন করিলে তাঁহাকেও সান্ত্বনা দিয়া রামচন্দ্র বলিয়াছেন —

রাম বলে অগো মা না ভাবিহ দুঃখ ।

আমা হত্যে ভরতের সঙ্গে পাবে সুখ ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১১ক)

ভরতের পরিচর্যাতেই মাতা কৌশল্যা অধিক সুখে থাকিবেন রামচন্দ্র তাহা ভালই জানিতেন । ভরতকে তিনি যত গভীরভাবে জানিতেন তেমন বোধহয় আর কেহ জানিতেন না । কিন্তু এহেন নিষ্পাপ সরল বিশ্বাসী পুত্রকেও রাজা দশরথ অবিশ্বাস করিয়াছেন । তিনি রামচন্দ্রকে রাজ্যাভিষেকের প্রকৃষ্ট সময় সম্পর্কে বলিয়াছিলেন —

প্রবাসে ভরত পুত্র আছয়ে যাবৎ ।

অভিষেকের কাল প্রশস্ত তাবৎ ।। (প্রাগুক্ত, পু. পৃ. ৩ক)

ভরত প্রবাসে থাকিতেই রাজা দশরথ জ্যেষ্ঠ পুত্রের অভিষেক ক্রিয়ার উপযুক্ত সময় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন । ভরত সম্পর্কে রাজার সন্দেহ ছিল যথেষ্ট । কৈকেয়ীর প্রতি রুষ্ট রাজা দশরথ পুত্র সমেত তাঁহাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিতে চাহিয়াছিলেন ।

সমগ্র রামায়ণের নিষ্কলুষ চরিত্রে ভরতের ভাগ্যে সকলের সন্দেহ ও অবিশ্বাসে সারা জীবন বিড়ম্বনাই জুটিয়াছিল । মাতার স্বার্থবুদ্ধির জন্য তিনি সকলের নিকট অপরাধীরূপে সাব্যস্ত হইয়াছিলেন। অথচ তিনি মাতার সঙ্গে কোনওরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন না । দশরথ পিতা হইয়া এই নিষ্পাপ পুত্রের উপর সুবিচার করেন নাই ।

এই সাধুচরিত্রের ব্যক্তিটি আত্মীয় পরিজনের নিকট হইতেও বহু লাঞ্ছনা ভোগ সহ্য করিয়াছিলেন । রামের বনযাত্রাকালে প্রজাগণ বলিয়াছেন —

ভরতের অভিষেক না দেখিব লোচনে ।

রাম সঙ্গে ভ্রমণ করিব বনে বনে ।।

যতেক পুরীর লোক রাম ঠাঞি জাই ।

নতুবা পরাণে মর সভে বিষ খাই ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১৯ক)

দৈবচক্রে পড়িয়া এই দেবতুল্য চরিত্র অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছে । একমাত্র রামচন্দ্রই তাঁহাকে সস্নেহে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিলেন । সুমন্ত্রকে বিদায়দানকালে রামচন্দ্র সকলেব

জন্য প্রণতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া ভরতের সঙ্গে অদর্শনজনিত ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন ।

ভরতে আমার যত বিবরণ বল্য ।
এই তাপ ভাই সঙ্গে দেখা নাঞি হল্য ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ২০)

কৌশল্যাও মনে মনে বুঝিয়াছিলেন কৈকেয়ীর এই রাজ্যলোলুপতা ভরতের নিকট শ্রদ্ধা পাইবে না । দশরথের মৃত্যুতে তিনি কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন —

মনের বাসনা তোর হল্য এতদিনে ।
অপমান পাবি পাছু ভরতের স্থানে ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ২৫)

দশরথের মৃত্যুর পর একাদশ দিবসে ভরত পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপ্ত করেন । বশিষ্ঠমুনি ভরতকে অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিতে চাহিলে ধর্মধীর ভরত একবাক্যে রামচন্দ্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইতে অস্বীকার করেন ।

কি কাজ রাজত্বে মোর করি নিবেদন ।
রামচন্দ্র বিনে কারে শোভে সিংহাসন ।।
(ভরতের পিতৃশ্রাদ্ধ, সা. ২৪০৩, পু.পৃ.১)

ভরত যখন জানিতে পারেন যে রামচন্দ্রের বনবাস এবং পিতার মৃত্যুর কারণ তাঁহার মাতা, তখন তিনি জননীকে পাপিষ্ঠা জানিয়া রাজ্যপাট, ধন, জন সকল পরিত্যাগ করিয়া জটাবল্কল পরিধানপূর্বক যোগীবেশ ধারণ করেন । তিনি কৈকেয়ীর শিরচ্ছেদ করিয়া অন্তরের বেদনা ঘুচাইতে চাহিয়াছেন, কিন্তু মাতৃঘাতী হইলে রামচন্দ্র স্পর্শ করিবেন না এইভয়ে তাহা হইতে বিরত হন । একমাত্র কৈকেয়ী ব্যতীত কৌশল্যা সহ অযোধ্যার সকলকে লইয়া তিনি রামচন্দ্রকে গৃহে ফিরাইবার আশায় বনযাত্রা করিবেন বলিয়া স্থির করেন । আর যদি একান্তই তিনি না ফিরিতে চান, তবে ভরত ও শত্রুঘ্ন উভয় ভ্রাতা রামচন্দ্রের পার্শ্বে ভৃত্যের ন্যায় দিনাতিপাত করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করেন ।

যত্ন করি রামচন্দ্রে দেশেরে আনিব ।।
কদাচিৎ রাম যদি না আসিব দেশে ।
ভৃত্য হয়্যা দুটি ভাই থাকিব রামের পাশে ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১)

ভরত ও শত্রুঘ্ন শৃঙ্গবেরপুরের নিকট পৌঁছিলে নিষাদরাজ গুহকের ভরত সম্পর্কে সন্দেহ উপস্থিত হয়, কিন্তু উভয় ভ্রাতাকে সন্ন্যাসীর বেশে রাম-নাম জপ করিতে দেখিয়া সন্দেহভঞ্জন হয় । গুহক তাঁহাদের প্রেমালিঙ্গনকরতঃ শ্রীরামের তৃণশয্যা প্রদর্শন করে । উহাতে রামচন্দ্রের আভরণবিন্দু দৃষ্ট হওয়ায় উভয় ভ্রাতা সশব্দে ক্রন্দন করিতে থাকেন ! ভরদ্বাজমুনি চিত্রকূটের পথ নির্দেশ করিলে তথায় রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া ভরতের মনে হইয়াছিল তাঁহার অগ্রজের এত কষ্ট বহন করিতে হইতেছে শুধু তাঁহার নিজের দুর্ভাগ্যের

জন্য। তিনি বিশুষ্ক মুখে অগ্রজের পদতলে ক্ষমা ভিক্ষা করিলে রামচন্দ্র ভ্রাতাকে সাদরে আলিঙ্গন প্রদান করেন। দুই প্রজ্ঞাবান ত্যাগী মহাপুরুষের মিলনে বনভূমিও ধন্য মনে হইতেছিল। অবশেষে ভরত রামচন্দ্রকে দেশে ফিরিয়া রাজপদে অভিষিক্ত হইতে বলেন। পিতামাতর দোষেই রামচন্দ্র এই দুঃখ ভোগ করিতেছেন, এইহেতু উভয় ভ্রাতা রামচন্দ্রের সঙ্গে বনবাস যাপন করিতে চাহিলে রামচন্দ্র তাহাতে আপত্তি করেন। সহাস্যে তিনি ভরতকে বলেন, পিতা চতুর্দশ বৎসরের জন্য তাঁহাকেই বনবাস দিয়াছেন আর রাজসিংহাসন দিয়াছেন ভরতকে। অতএব ভরতের উচিত শত্রুঘ্নসহ রাজত্ব পরিচালনা করা।

এইরূপে উভয়ের বাক্‌বিনিময় চলিতে থাকে। ভরত মহা ফাঁপরে পড়িয়া অনশনব্রত ধারণপূর্বক কুটীরদ্বারে ভূলুন্ঠিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিবেন বলিয়া স্থির করেন।

রামচন্দ্র মনুষ্য নহেন স্বয়ং ঈশ্বর, বশিষ্ঠদেব এইরূপ বলিলে ভরতের চৈতন্য লাভ হয়। তিনি তখন রামচন্দ্রের আবির্ভাবের কারণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অগ্রজের পদে শেষ নিবেদন জ্ঞাপন করেন —

চৌদ্দ বছর পথ দেখিব তোমার।
একদিন ঊর্ধ্ব হইলে মরণ আমার॥
চৌদ্দ বছরের প্রান্তে নাঞি যদি যাবে।
ভরত মরিল বলি সমাচার পাবে॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ.৫ক)

রামচন্দ্রের আদেশে ভরত শেষপর্যন্ত অযোধ্যায় ফিরিতে বাধ্য হন, অবশ্য চৌদ্দ বৎসরের শেষে এক দিবসও অধিক হইলে যদি রামচন্দ্র দেশে না ফেরেন তবে ভরত প্রাণত্যাগ করিবেন বলিয়া জানান। তিনি বিচিত্র মণিমাণিক্যে গঠিত একজোড়া পাদুকা ভাতৃ পদরজে বিভূষিত করিয়া শিরে তুলিয়া লন এবং ছত্রদণ্ড সহকারে পাদুকার অভিষেক করিয়া উহার প্রতিনিধিরূপে চতুর্দশ বৎসর রাজত্ব পরিচালনা করিবেন বলিয়া জানান।

ইহার পর ভরতকে একেবারে কাব্যের শেষে রঘুনাথের সহিত মিলিত হইতে দেখা যায়। সীতা, লক্ষ্মণ ও হনূমানের সঙ্গে রঘুনাথ চৌদ্দবৎসর অন্তে দেশে প্রত্যাগত হইলে ভরত ছত্র ও পাদুকাসহ সন্ন্যাসীর বেশে প্রত্যুদ্গমনপূর্বক রামচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিয়া আনেন। তাহার তপঃক্লিষ্ট চেহারাই রামচন্দ্রের প্রতি বিচ্ছেদজনিত বেদনা সূচিত করিতেছিল। ভরতের ন্যায় ভ্রাতা প্রকৃতই দুর্লভ।

বাল্মীকির রামায়ণে ভরত এক আদর্শ যোগীপুরুষ। রামচন্দ্র এই ত্যাগী মহাপুরুষটির সম্পর্কেও দুই একবার বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কবিচন্দ্রের কাব্যে অনুরূপ কোনও উক্তি রামচন্দ্রের কথায় পাওয়া যায় না। রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্যই ত্যাগ ও দুঃখবরণ করিয়াছিলেন, আর ভরত যে দুঃখবরণ ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা কেবল স্বেচ্ছাকৃত।

লক্ষ্মণ চরিত্রের সূচনা এবং পরিণতি অগ্রজ রামচন্দ্রের একান্ত অনুসঙ্গীরূপে। লক্ষ্মণ ব্যতীত রামচরিত্র যেন অসম্পূর্ণ। আবার রামকে বাদ দিয়া যেন লক্ষ্মণের কোনও অস্তিত্বই নাই। বাল্মীকি সীতাবিহীন রামকে উপস্থিত করিয়াছেন কিন্তু লক্ষ্মণ ছাড়া রাম অকল্পনীয়। বাংলাদেশে ও বাংলাসাহিত্যে 'রাম-সীতা' অপেক্ষা 'রাম-লক্ষ্মণ' কথাটি সমধিক প্রচলিত। কবিচন্দ্রের কাব্যেও দেখা যায়, দশরথ রামচন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতে চাহিলে রামচন্দ্র সানন্দে যাঁহাকে উক্ত রাজপদের প্রকৃত বহালকারীরূপে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার প্রাণের ভ্রাতা লক্ষ্মণ। বামচন্দ্র উপলক্ষ মাত্র, আসল রাজকর্ম পরিচালনার ভার ন্যস্ত ছিল লক্ষ্মণের উপর। রামচন্দ্র স্পষ্টতঃই লক্ষ্মণকে তাহা বলিয়াছেন:-

কেবল থাকিব পাটে উপলক্ষ আমি।
তোমার তরে নবরাজ্য দেশে রাজা তুমি ॥

(রঘুনাথের বনবাস, পু.পৃ. ৩)

কিন্তু এই রাজত্বলাভের কথা শ্রবণ করিয়াও লক্ষ্মণের একবিন্দু মোহ উপস্থিত হয় নাই। তিনি প্রকৃত সেবকের মত উত্তর দিয়াছেন —

লক্ষ্মণ বলেন প্রভু আমি আজ্ঞাকারী।
উপানহ জোগায়্যা থাকিব বিভাবরী ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৩)

লক্ষ্মণ প্রভু-রামচন্দ্রের একনিষ্ঠ ভক্ত ও সেবক। প্রভুর আজ্ঞাকারীরূপে নিশিদিন সেবায় নিযুক্ত থাকিবেন, ইহা ভিন্ন অপর বাসনা তাঁহার নাই। রামচন্দ্র তাঁহার রাজত্ব পরিচালনার ভার ভরত বা শত্রুঘ্নের উপর দিবার কথা চিন্তা না করিয়া কেবল লক্ষ্মণের কথাই মনে করিয়াছেন। ইহাতে উভয় ভ্রাতার গাঢ়তর সম্পর্কের কথাই দ্যোতিত হয়। এমনকি দাসী মন্থরা পর্যন্ত জানে, রামের রাজ্যলাভের অর্থ লক্ষ্মণের রাজ্যলাভ। মন্থরা সে-কথা কৈকেয়ীকে বরদানের ব্যাপারে উত্তেজিত করিবার সময় উল্লেখ করিতে ভোলে নাই। দাসী মন্থরার স্থূল বুদ্ধিতেও ইহা প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল যে লক্ষ্মণই এ রাজ্যের প্রকৃত রাজা, রাম উপলক্ষ মাত্র। বাল্মীকি রামায়ণের মত কবিচন্দ্রের কাব্যেও লক্ষ্মণ তেজস্বী রাজকুমাররূপেই পরিচিত। এত তেজস্বিতা অন্য কোনও চরিত্রে বিরল। রামচন্দ্রের প্রতি অন্যায়কারীকে তিনি ক্ষমা করিতে পারিতেন না। কৈকেয়ীর নির্মম বনবাসাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া কোন অলৌকিক প্রভায় রামচন্দ্র সহসা বৈরাগ্যশ্রীতে মণ্ডিত হইয়া ওঠেন, আর লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া রামচন্দ্রের বিঘ্নকারীদের বিনাশসাধন করিতে বদ্ধপরিকর হন। রাজা দশরথের মূর্ছাকালের মধ্যেই তিনি রামচন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত হইতে বলেন। বাল্মীকির লক্ষ্মণ দশরথকে কামভাবাপন্ন মনে করিয়া পিতাব প্রতি জিঘাংসু হইয়া ওঠেন।[৮] লক্ষ্মণ পিতা দশরথের পরিবর্তে রাজ্য-প্রাপক ভরতকে হনন করিয়া

রামচন্দ্রকে রাজ্য প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন ;

লক্ষ্মণ বলেন রাম কেন জাবে বনে।
রাজা পড়্যা আছে ভূমে মূর্ছায় যাবৎ ।
অভিষেকের কাল প্রস্তুত তাবৎ ॥
তোমার রাজত্ব কেবা নিবারিতে পারে ।
ভরতে করিয়া নাশ বিনাশিব তারে ॥
যে সাজিয়া আসিবেক ভরতের তরে ।
তোমার সেবকে নাথ বিনাশিব তারে ॥

(রঘুনাথের বনবাস, পু.পৃ. ৯)

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের বৈরাগ্য-নীতি ও কর্তব্যবুদ্ধির প্রশংসা করেন নাই । রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকে বদ্ধপরিকর লক্ষ্মণের সকল তেজস্বিতা কান্নার প্রবেগে অচিরে ধুইয়া মুছিয়া যায়, যখন তিনি দেখেন রামচন্দ্র একান্তই বনবাসে যাইতে প্রস্তুত।
অতি স্বল্প ভাষায় আজন্ম সহচর অশ্রুমুখী লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের সঙ্গী হইবার অনুমতি ভিক্ষা করেন । লক্ষ্মণের অভিপ্রায় বুঝিয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে 'প্রাণসম সখা' সম্বোধনে বনগমনের আজ্ঞা প্রদান করেন ।

ইহার পর বনের উপযুক্ত ভাল ভাল অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে লইয়া লক্ষ্মণ বনবাসে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলে জননী সুমিত্রাদেবীও তাঁহাকে নানাভাবে কর্তব্যবোধে উৎসাহিত করেন । পুত্রের বিদায়কালে তিনি সামান্য বিলাপ পর্যন্ত করেন নাই । উপরন্তু বলিয়াছেন, "রাম বিনে রহিতে নারিবে বাপু তুমি"। তাহার উত্তরে —

লক্ষ্মণ বলেন মাতা তব কথা ব্রহ্ম ।
বেদ নীত হিতাহিত জানি যত ধর্ম ॥ (প্রাগুক্ত,পু.পৃ. ১৫ক)

সুমিত্রাদেবী তাঁহার সংসার-নির্লিপ্ত পুত্রটিকে কর্তব্য পালনের নানা উপদেশ প্রদান করিয়া রামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া দেন । রামচন্দ্রের জন্যই লক্ষ্মণের যত শোকোচ্ছ্বাস, নিজের জন্য এমনকি মাতা বা স্ত্রীর জন্যও ভাবিবার অবকাশ তাঁহার ছিল না । কবিচন্দ্রের কাব্যেও এই আত্মত্যাগী পুরুষটিকে শুধু রামচন্দ্রের জন্যই জীবন উৎসর্গ করিতে দেখা যায় । রামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী সীতাদেবীর অরণ্যজীবনের ভার বহন করিয়াই লক্ষ্মণের আত্মত্যাগ সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। সীতাও এই নিষ্কলুষ দেবরটির উপর নিজের জীবনের অনেকখানি দায়িত্বভার দিয়া রাখিয়াছিলেন । নিদ্রাদেবীকে প্রার্থনাপূর্বক বিনিদ্রভাবে চৌদ্দবৎসর গাণ্ডীব হস্তে সৌমিত্রি কুটিরের প্রান্তে প্রহরায় নিযুক্ত থাকিতেন । এইরূপ আত্মহারা দাস্যভক্তিপরায়ণ ভ্রাতা যে কোনও সাহিত্যে দুর্লভ। রাবণ কর্তৃক সীতা অপহৃতা

হইলে রামচন্দ্রের দুঃখে যিনি সমান দুঃখ অনুভব করিয়া গোদাবরীর তীরভূমিতে উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় সীতাকে খুঁজিয়া ফিরিতেছিলেন এবং যিনি রামচন্দ্রের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাজা সুগ্রীবকে তাঁহার বিস্মৃতির জন্য তেজোদৃপ্ত-কন্ঠে শাসন করিয়াছিলেন, তিনি রামচন্দ্রের সেই পরম সুহৃদ্ ভ্রাতা লক্ষ্মণ। রাবণের শক্তিশেলে তিনি মূর্ছাপন্ন হইয়া বীরের মৃত্যুবরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। রাবণবধের পর সীতাকে রামচন্দ্র গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে রামচন্দ্রের উক্ত মনোভাব লক্ষ্মণের অন্তরে শ্রদ্ধা লাভ করে নাই। আবার রামচন্দ্রের কার্যাবলীর তিনি প্রতিবাদও করেন নাই। মনে হয় কাহারও ব্যক্তিত্বে হস্তক্ষেপ করা তিনি অনুচিত মনে করিতেন।

মূল রামায়ণে লক্ষ্মণ যেন পুরুষকারের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন 'রামায়ণী কথা' গ্রন্থে লক্ষ্মণকে "মৌন সন্ন্যাসী" আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। ইহাই লক্ষ্মণ-চরিত্রের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বিশেষণ। কবিচন্দ্রের কাব্যে লক্ষ্মণ-চরিত্রের অনন্যসাধারণ বলিষ্ঠতাই ইহাকে সর্বত্র একমুখী ঋজু চরিত্রের গৌরব দান করিয়াছে। ভরতের ভ্রাতৃভক্তি অনেকখানি বাঁধনহারা, অস্থির ও আবেগপ্রবণ, তুলনায় লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি স্থির, উচ্ছ্বাসহীন এবং সংযত। লক্ষ্মণের চরিত্রটি একদিকে ক্ষাত্রতেজের কঠিনতা অপরদিকে বালকোচিত স্বভাবের সরলতা, — এই দুই বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশে সমুজ্জ্বল। আধুনিক যুগের দুর্লভ সৌভ্রাতৃত্বের অনুপম আদর্শ বাল্মীকি হইতেই ভাষা রামায়ণের কবিরা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

কৌশল্যা :-

কৌশল্যা রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠা মহিষী এবং রামচন্দ্রের মাতা, পতিভক্তিপরায়ণা, সরলা, অনাড়ম্বর এবং বুদ্ধিতে প্রৌঢ়া। এই রাজমহিষী পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ফলস্বরূপ ইন্দ্র সদৃশ পুত্র রঘুবরকে লাভ করেন। পতি-পুত্রের সুখ কামনা ভিন্ন এই মহীয়সী নারী অন্য কিছু জানিতেন না। তিনি পুত্রের কল্যাণ কামনায় প্রফুল্লচিত্তে দেবারাধনায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় রামচন্দ্র নিদারুণ পিতৃআজ্ঞা জননীর নিকট জ্ঞাপন করেন। একমাত্র পুত্রের উপর রাজার নিষ্ঠুর বনবাসের আজ্ঞা শ্রবণে রাণী শোকাভিভূত অবস্থায় মূর্ছিত হইয়া পড়েন। কিন্তু রাজার এক বাক্যেই তিনি পুত্রকে বনে যাইতে সম্মতি দিবেন কেন ? মাতা হিসাবে পুত্রের উপর তাঁহারও সমান অধিকার আছে। বহু দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়া তিনি পুত্রকে অষ্টাদশ বৎসরের তরুণ করিয়া তুলিয়াছেন, আর সেই পুত্রকে সতীনের পরামর্শে রাজা বনে পাঠাইবেন, কৌশল্যা এমন অসঙ্গত প্রস্তাব কোনও মতেই মানিয়া লইতে রাজী হন নাই। তিনি পুরাণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলেন, 'মাতার আদেশেই ইন্দ্র ভ্রাতাকে বধ

করিয়াছেন। জননীর কথা অগ্রাহ্য করিয়া রামচন্দ্র বনে গমন করিলে মাতৃহত্যার অবশ্যম্ভাবী ফল তাঁহাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।' কৌশল্যাদেবী নানা ভয় প্রদর্শনপূর্বক পুত্রকে বনবাস যাত্রা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রও পিতৃআজ্ঞা পালনের স্বপক্ষে কিছু যুক্তি উত্থাপন করেন। জামদগ্ন্য স্বীয় মাতা রেণুকার শিরচ্ছেদ করিয়াছিলেন পিতৃআদেশে। অতএব পিতৃআজ্ঞায় বনে তাঁহাকে অবশ্যই যাইতে হইবে। কৌশল্যা তথাপি বলেন নারীর বশীভূত বৃদ্ধ রাজার আদেশে রামচন্দ্র বনে গেলে মাতাকে কে পরিচর্যা করিবে ? অতঃপর তিনি রামচন্দ্রকে বুঝাইয়া বলেন, 'মাতা পিতা অপেক্ষা শতগুণে বড়, অতএব মাতার বাক্য অবহেলাপূর্বক পিতার আদেশে বনে যাওয়া পুত্রের কোনও মতেই উচিত নহে।

কিন্তু রামচন্দ্র প্রতিশ্রুতি পূর্বেই দিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি মাতাকে বহু প্রবোধ সহকারে বলেন, "স্বামী, নারীর প্রত্যক্ষ দেবতা, তাঁহার পরিচর্যাই নারীর ধর্ম। চতুর্দশ বৎসরের অন্তে তিনি ফিরিয়া আসিয়া মায়ের শ্রীচরণ বন্দনা করিবেন।" কৌশল্যা পুত্রের অনুগমন করিয়া বনে যাইতে চাহিলে তাহাতেও কমললোচন উত্তর দেন, 'স্বামী বর্তমান থাকিতে কোনও নারীর পুত্রের সঙ্গে যাওয়া বিধেয় নয়। স্বামী সেবাই সাধ্বী নারীর কর্তব্য'। তাহাতে কৌশল্যা দুঃখে ক্রন্দন শুরু করেন।

এইরূপে নয়নাশ্রু অঞ্চলাগ্রে মুছিয়াও কৌশল্যা পুত্রের মত পরিবর্তনে ব্যর্থ হন। অতঃপর রামচন্দ্রের মুখে ভরতের রাজত্বলাভের ও ভরতের মুখদর্শনে সকল শোক ভুলিয়া থাকার কথায় ভক্তিমতী রাণী কৌশল্যার হৃদয়ে অপূর্ব ধর্মভাব ও সহিষ্ণুতা জাগ্রত হয়। পুত্রকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দেখিয়া তিনি তাঁহার কার্যে বাধাপ্রদান অধর্মোচিত হইবে বিবেচনায় তাহা হইতে বিরত হন। পরে দেবতার পূজার নির্মাল্য পুত্রের দক্ষিণবাহুতে বাঁধিয়া দিয়া মাথার আঘ্রাণ লইয়া মন্ত্র পড়িয়া দেন এবং বন হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে পুনরায় 'মা' বলিয়া ডাকিতে অনুরোধ করেন।

কৌশল্যা পুত্রবধূ সীতাকেও আশীর্বাদ সহকারে বহু তপস্যায় এমন গুণী পুত্রবধূ লাভ করিয়াছেন বলিয়া জানান।

রামচন্দ্রকে তিনি দয়া ও ক্ষমা গুণের দ্বারা জানকী ও লক্ষ্মণের দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে বলেন। রামচন্দ্র জানান জানকী তাঁহার দেহস্বরূপ আর লক্ষ্মণ তাঁহার দক্ষিণবাহুর তুল্য। এই দুইজন ব্যতীত তৃতীয় কোনও বন্ধু তাঁহার নাই। রামচন্দ্র বিদায় গ্রহণের পূর্বেই কৌশল্যার নিকট সমগ্র পুরী অন্ধকারময় শূন্যবৎ প্রতীয়মান হইতে থাকে। অতি শীঘ্র তিনজনে পুরীর বাহিরে নিষ্ক্রান্ত হইলে পুত্রবিরহে কৌশল্যার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল কিন্তু সেই নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও যে সহিষ্ণুতা তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা একমাত্র লৌহেব সুদৃঢ়

কাঠিন্যের সঙ্গেই তুলনীয় হইতে পারে। জীবনব্যাপী দুঃখ সহিয়া যে সহিষ্ণুতা তিনি অর্জন করিয়াছিলেন তাহা দ্বারাই মহা দুঃখের মধ্যে পড়িয়াও অসীম ধৈর্য ও সংযম রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দশরথের প্রতি জ্যেষ্ঠামহিষী হিসাবে তাঁহার অভিযোগের অন্ত ছিল না।

কৌশল্যা অধীর হইয়া পড়িলে দশরথ স্বীয় অপরাধের জন্য শোকদগ্ধ চিত্তে ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে পত্নীর প্রসাদ ভিক্ষা করেন। রাজার অকাল মৃত্যুর জন্য কৌশল্যা কৈকেয়ীকে দায়ী করেন।

কৌশল্যা আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ মাতা। তিনি স্বামীকে তবু ক্ষমা করিয়াছেন কিন্তু কুটিলা সপত্নীকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রিয়পুত্রের বনবাস ও স্বামীর মৃত্যুর কারণ তো সেই। কৌশল্যা ভালই জানিতেন যে, ভরতের নিকট কৈকেয়ীর নীচাশয়তা কখনই প্রশ্রয় পাইবে না। কৈকেয়ীকে তিনি স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন —

রাম-বনবাস আর রাজার মরণ।
মোদের বৈধব্য দশা নাশের কারণ ।।
মনের বাসনা তোর হল্য এতদিনে।
অপমান পাবি পাছু ভরতের স্থানে ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ২৫)

সপত্নী-পুত্র ভরতের প্রতি কৌশল্যার স্নেহ এবং বিশ্বাস স্বীয় পুত্র নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্র অপেক্ষা কিছুমাত্র কম ছিল না। এইরূপ কোমল স্নেহময়ী মাতা সকলের নিকট চিরপূজার্হ।

কৈকেয়ী :—

কবিচন্দ্রের রামায়ণে কৈকেয়ী কোপনস্বভাবা, প্রাজ্ঞমানিনী এবং সুখের ক্রীড়নকরূপে চিত্রিত হইলেও রামচন্দ্রকে তিনি যথার্থই স্নেহ করিতেন। রামাভিষেকের সংবাদ প্রদান করিয়া মন্থরা কৈকেয়ীকে ভরতের রাজত্বলাভের জন্য উত্তেজিত করিতে চাহিলে তিনি প্রথমে তাহাতে অস্বীকৃতা হন এবং রামচন্দ্রের রাজ্যপ্রাপ্তির আনন্দে দাসীকে মুক্তার হার সহ নানা বসনভূষণ পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করেন। ভরত অপেক্ষা রামের রাজত্বলাভেই যেন তিনি অধিক খুশী হন। মন্থরাকে তিনি সেকথাই ব্যক্ত কবিয়াছেন। রাম তাঁহার নিকট প্রাণতুল্য প্রিয়। রামচন্দ্রের রাজত্বলাভের কথায় তিনি দাসীকে বলেন যে, রাম স্বীয় জননী কৌশল্যা অপেক্ষা তাঁহাকেই অধিক সেবা-শুশ্রূষা করেন।

যেই বাক্য বলি রামে সেই বাক্য ধরে।
কৌশল্যার অধিক ভাব বাছা করে মোরে ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৪)

কিন্তু এইরূপ অভিমত অধিক সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয় নাই। ভরতের রাজত্বলাভের ব্যাপারে

কৈকেয়ী মন্থরাকে প্রথমে তিরস্কার করিলেও পরে তাহাই ধীরে ধীরে মনের মধ্যে অঙ্কুরিত হইতে থাকে। অবশেষে মন্থরার যুক্তিই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মন্থরার পরামর্শে রাণী দশরথের নিকট হইতে প্রতিশ্রুত বরলাভের আশায় ক্রোধাগারে ভূলুন্ঠিতা অবস্থায় পড়িয়া থাকেন। দশরথ নানাভাবে অভিমানিনী কৈকেয়ীকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে থাকিলে তিনি ধীরভাবে দশরথকে দেবাসুর যুদ্ধের পর প্রতিশ্রুত দুইটি বরের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। দশরথ বরদানে স্বীকৃত হইলে কৈকেয়ী বজ্রতুল্য দুইটি ভীষণ বর প্রার্থনায় বৃদ্ধ রাজাকে একেবারে বিমূঢ় করিয়া ফেলেন। ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য আদি দেবতাকে আহ্বানপূর্বক মহারাজাকে সত্যে বন্দী করতঃ এক বরে ভরতকে রাজত্ব প্রদান এবং দ্বিতীয় বরে রামচন্দ্রের বনবাস সঙ্কল্পে তিনি অবিচল থাকেন। রাজা একবার তাঁহাব প্রিয়তমা মহিষীর নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে ও আরেকবার তাঁহার পদ প্রান্তে নিপতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা দ্বারা রাণীর মনে কৃপালেশ জাগ্রত করিতে সচেষ্ট হন। কৈকেয়ী তাঁহার স্বামীর অযোগ্যতাকে ধিক্কার জানাইলে রাজা দশরথ প্রেয়সী রাণীকে সেই মুহূর্তে বাঘিনীর ন্যায় অনুভব করিতে থাকেন। রামচন্দ্রের দুর্গতির কথা স্মরণ করিয়া রাজা কৈকেয়ীর দয়া ভিক্ষা করিয়াও ব্যর্থ হন। কৈকেয়ী রোষপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মহারাজাকে বলেন, "রাজা কাপুরুষ, তাই বরদান করিতে কুন্ঠিত। সত্যের সমান ধর্ম নাই, কপোত ঘুঘুকে সত্যে বদ্ধ হইয়া আপন মাংস কাটিয়া দিয়াছিলেন, অলর্ক রাজা সত্য রক্ষার্থে স্বীয় চক্ষু উৎপাটিত করিয়াছিলেন, সত্যের জন্যই তাঁহারা প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন। অতএব মহারাজার উচিত সত্য রক্ষা করা"। রাজা কৈকেয়ীর দীর্ঘ উপদেশ শ্রবণ করিয়া বলেন যে, তিনি সবই জানেন। সুমন্ত্র পরদিন প্রভাতে রাজসকাশে উপস্থিত হইলে আর্ত রাজাকে কথা বলিতে অপারগ দেখিয়া কৈকেয়ী নিজেই সুমন্ত্রের অবগতির জন্য রাজাকে উদ্দেশ্য করিয়া রামচন্দ্রকে ডাকাইতে বলেন।

সুমন্ত্র রামচন্দ্রকে রাজার নিকট ডাকিয়া আনিলে তাঁহাকেও কৈকেয়ী-ই বনবাসের সংবাদ প্রদান করেন।

সত্যে বন্দী রাজা মোরে দিল দুই বর।
পুত্র যদি বট রাম পিতাকে উদ্ধার॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৮ক)

পাছে রাজার আদেশ শ্রবণ না করিলে রামচন্দ্র বনযাত্রা না করেন, এইরূপ আশঙ্কায় কৈকেয়ী রামচন্দ্রকে বলেন —

লজ্জায় পড়িয়া রাজা না কহেন তোবে॥
চৌদ্দ বৎসর তুমি হও বনচর।
বীর বসন পরি শিরে জটা ধর॥
বসন ভূষণ ছাড় তেজ রাজ্য আশ।

চৌদ্দ বৎসর তোরে দিল বনবাস ।।
অরে রাম দাণ্ডায়্যা রয়্যাছ আর কেনে।
বাপে উদ্ধারিবি যদি আজি যাহ বনে ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৮)

শীঘ্র বনে গমনের জন্য কৈকেয়ী রামচন্দ্রকে তাড়না করিতে থাকেন । যে মুখে তিনি একবার রামচন্দ্রকে 'প্রাণতুল্য প্রিয়' বলিয়াছেন, সেই মুখেই কৈকেয়ী আবার তাঁহাকে বিদায় হইতে বলেন ।

রামচন্দ্র বিদায় হইলেই ভবতকে তিনি রাজা করিবেন, এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াই কৈকেয়ী ক্ষান্ত হন নাই, যাত্রা করিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তিনি রামচন্দ্রকে হাতে ধরিয়া উঠাইয়া দেন ।

কৈকেয়ীর ব্যবহারের মধ্যে কবিচন্দ্র এক নির্দয়া বাঙালী বিমাতার নিষ্ঠুরতার জীবন্ত চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন । রামচন্দ্র বিমাতাকে অহেতুক ব্যাকুল হইতে দেখিয়া আশ্বস্ত করিতে সচেষ্ট হন ।

রামচন্দ্রের একান্ত বিনম্র উত্তরে কৈকেয়ীর সামান্যতম লজ্জাও বোধ হয় নাই । তিনি রাজ্ঞীর ন্যায় প্রভুত্বব্যঞ্জক কন্ঠে দশরথকে শাসন করিয়াছেন । সগর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অসমঞ্জকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কৈকেয়ী এই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া মহারাজাকে বলেন মিথ্যা লোকলজ্জা পরিহার করিয়া রামকে অচিরে পরিত্যাগ করিতে । কেবল সকলের সকল যুক্তিতর্ক উপেক্ষা করিয়া এবং স্বীয় দম্ভোক্তি ঘোষণা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই ; রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে চীর ও বল্কল আনিয়া পরিধান করিতে দেন । নির্দয়তার শেষ নজীর স্থাপন করেন যখন রামচন্দ্রের কানের স্বর্ণাভরণ খুলিয়া লইতে যান । লক্ষ্মণ এবং সীতাদেবীকেও বাকল পরিধান করিতে বলেন । দশরথ রামচন্দ্রের সঙ্গে অযোধ্যার রাজকোষ উজার করিয়া দিতে চাহিলে কৈকেয়ী ঈর্ষান্বিত হইয়া বলেন —

হায় হায় মরি মরি আই-মা কি লাজ ।
দ্রব্যহীন এ রাজ্যে ভরতের নাঞি কাজ ।।
(প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১৩)

পুত্রের ভাবী সুখ লাভের চিন্তাই কৈকেয়ীকে অনড় করিয়া রাখিয়াছিল । স্বামি-পরিত্যক্তা, প্রজাদের ধিক্কারে জর্জরিতা, সপত্নীদের নিকট নিন্দার্হ এবং কৌশল্যার ঘৃণ্য উক্তি 'পতিঘ্নী', 'পাপিনী' প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিতা হইয়াও তিনি রাজপ্রাসাদে নিঃসঙ্গদর্পে এবং অকুন্ঠিতারূপে অবস্থান করিয়াছেন । দশরথের বিচ্ছেদে তিনি একবিন্দুও অশ্রু বর্ষণ করেন নাই । ভরতের সুখের সঙ্গে রাজমাতা হিসাবে তাঁহার নিজের সুখ-চিন্তাতেই তিনি সকলের বিরুদ্ধাচারিণী হইয়াছিলেন । অথচ যাঁহার জন্য তিনি এত অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছেন,

সেই ভরত আসিয়া মাতার সযত্ন রক্ষিত অযোধ্যার রাজ সিংহাসন স্পর্শও করেন নাই। মাতৃঘাতী হইলে রামচন্দ্র তাঁহাকে স্পর্শ করিবেন না, এইরূপ ভয়ে ভরত, মাতা কৈকেয়ীকে তাঁহার কৃতকর্মের জন্য সমুচিত দণ্ড দিতে সাহসী হন নাই।

এই সর্বলোকনিন্দিতা, ব্যর্থমনোরথা এবং হৃদয়হীনা রমণীর চোখেও কবি অশ্রু প্রবাহিত করিয়াছেন। ভরতের সঙ্গে অপরাধিনীর ন্যায় গমন করিয়া বনবাসে রামচন্দ্রের নিকট কৈকেয়ী পূর্বকৃত অপরাধের জন্য সর্বান্তকরণে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। রামচন্দ্র মানুষ নহেন, ঈশ্বর, তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়া তিনি বলিয়াছেন —

চর্মচক্ষে আমি তোমায় চিনিতে নারিনু।
কুব্জার বুদ্ধিতে তোমায় বনবাস দিনু ॥
মোর সম অপরাধী নাই এ ভুবনে।
অপরাধ ক্ষেম মোর আপনার গুণে ॥

(ভরতের পিতৃশ্রাদ্ধ ; পু.পৃ. ৫)

কৈকেয়ী রামচন্দ্রকেই নিরাপদ আশ্রয়স্থল মনে করিয়া স্বীয় পুত্র ভরতের গঞ্জনাদানের কথা বলিলে দয়ারসাগর রঘুনাথ ভরতকে মাতার সঙ্গে অনুচিত ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন। ভরত সম্পর্কে কৈকেয়ীর অভিযোগ সত্যই দুঃখদায়ক।

ভরতের গঞ্জনা আর সহনে না জায়।
দিনে শতবার মোরে কাটিবারে চায় ॥

(প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৫-৬ক)

কমললোচন রামের মাতৃসম্বোধনে ও ক্ষমাগুণে প্রীত হইয়া কৈকেয়ী সকল দুঃখ প্রশমিত করেন।

সুমিত্রা :—

কবিচন্দ্রের কাব্যে সুমিত্রা এক অসামান্য নারীচরিত্র। কৌশল্যা স্বীয় পুত্র রামচন্দ্রের দুঃখে ব্যাকুলা, কৈকেয়ী আপন পুত্রের রাজ্য প্রাপ্তির নেশায় মশগুল, আর সুমিত্রা ? নিজ পুত্রদের সুখ ও সকল আশা আকাঙ্ক্ষার কথা বিস্মৃত হইয়া মর্ত্যসীমার ঊর্ধ্বে বিরাজিত যেন এক দেবীপ্রতিমা। তাঁহার পুত্রদ্বয় লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন দুই সপত্নী পুত্রের সেবায় নিযুক্ত, ইহাই এই রমণীর পরম গৌরব। মূল 'রামায়ণ' হইতে কবিচন্দ্রের কাব্য পর্যন্ত এমন নারী চরিত্র বাস্তবে বিরল, যিনি আপন পুত্রদের সুখের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া সপত্নী পুত্রের সেবায় নিজ পুত্রদের আজীবন উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। কবিচন্দ্রের কাব্যে মাত্র কয়েকটি বিশেষ বিশেষ স্থলে তিনি উপস্থিত হইয়াছেন। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের প্রিয় সহচররূপে বনবাসে

যাইতে চাহিলে রঘুবব তাঁহাকে প্রথমে মাতা সুমিত্রার অনুমতি প্রার্থনা করিতে বলেন। লক্ষ্মণ যে তাঁহার অগ্রজ রামের বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিবেন না, জননী সুমিত্রা তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত ছিলেন। পুত্রের অকৃত্রিম ভ্রাতৃভক্তিতে তিনি তৃপ্তি অনুভব করিতেন। লক্ষ্মণকে তিনি আপন সেবার জন্য নিজের কাছে রাখিবার ইচ্ছা কখনও প্রকাশ করেন নাই, বরং রামচন্দ্র ও সীতার সেবায় নিযুক্ত থাকিতেই অধিকতর উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। বনযাত্রার অনুমতি গ্রহণের প্রস্তাবে সুমিত্রা অতি সহজে, দ্বিধাহীন চিত্তে পুত্রকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুসঙ্গী হইয়া যাইতে আদেশ দান করেন।

সুমিত্রা বলেন বাপু কার মুখ চাহ।
রাম সঙ্গে অরে পুত্র বনবাস যাহ॥
পুণ্যের উদয় মোর বড় দিলে প্রীতি।
যুগে যুগে ধন্য ধন্য রাখিলে খেয়াতি॥
সৎ পুত্র সার্থক গর্ভে ধরিলু তোমারে।
শুধিলে দুধের ধার তারিলে আমারে॥

(রঘুনাথের বনবাস, পু.পৃ. ১৫ক)

অযোধ্যায় যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বর্তমান বনবাসে তাহার বিপরীত অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে জানিয়াও সুমিত্রা তাঁহার পুত্রকে রামচন্দ্রের অনুগমন করিতে নির্দেশ দান করেন। পুত্রের ইতিকর্তব্যতার কথা চিন্তা করিয়া তিনি পুত্রের উদ্দেশ্যে একটি নাতিদীর্ঘ উপদেশ প্রদান করেন এবং বনকে অযোধ্যাপুরী, শ্রীরামকে পিতৃবৎ এবং জানকীকে মাতার সমান মনে করিলে সকল দুঃখ তিরোহিত হইবে বলিয়া জানান :-

অযোধ্যানগর যদি তোমার পড়ে মনে।
ঘুচিব পুরীর শোক চায্য বনপানে॥
তাতের সমান করি শ্রীরামেরে জান্য।
আমার সদৃশ করি জানকীরে মান্য॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১৫ক)

বিদায়কালে পুত্রের কন্ঠলগ্ন হইয়া জননী সুমিত্রা ক্রন্দন পর্যন্ত করেন নাই বরং রামচন্দ্রের সঙ্গী হইয়া বনে যাইতেই পুত্রকে পুনঃপুনঃ উৎসাহ প্রদান করেন। মাতার শোকের উচ্ছ্বাস এবং নয়নাশ্রু লক্ষ্মণ দেখিতে পান নাই, বরং বনে কিভাবে তাঁহাকে কর্তব্য পালন করিতে হইবে সুমিত্রা তাহারই উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন, 'বনে জন্তুভয় দেখা দিলে রাম ও সীতার অগ্রবর্তী হইয়া চলিতে হইবে। কখনও বিটপীর শাখাদ্বারা তাঁহাদের শিরে ছায়া প্রদান করতঃ পিছনে পিছনে চলিয়া, তাঁহাদের মুখ ম্লান হইলে সরসীর নীরে মুখ ধৌত করাইয়া এবং প্রয়োজনমত শ্রীরামের পদসেবা ও শয্যা প্রস্তুত করিয়া হাতে 'গাণ্ডিবাণ'সহ নিশাকালে জাগ্রত অবস্থায় প্রহরায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে।' মাতার দৃঢ় অথচ

স্নেহার্দ্রকন্ঠের এই আদেশ বীরপুত্র লক্ষ্মণ নতশিরে মানিয়া লইয়াছিলেন। আরণ্যজীবনের কঠোরতার সিংহভাগ লক্ষ্মণের উপর পড়িয়াছিল। তিনি আহ্লাদ সহকারে রামচন্দ্র ও সীতার প্রীত্যর্থে তাহা পালন করিয়াছেন। রাবণের শক্তিশেলে লক্ষ্মণ মূর্ছাপন্ন হইয়া পড়িলে তাঁহার পুনর্জীবনের জন্য হনুমান গন্ধমাদন পর্বতে ঔষধিপত্র চিনিতে না পারিয়া সমগ্র পর্বতটি মাথায় লইয়া যাত্রাকালে পথে অযোধ্যায় কিছু সময় অবস্থান করে। সেই সময় আরেকবার অন্তরালবর্তিনী সুমিত্রা লোকচক্ষুর সম্মুখে দৃষ্টিগোচর হন। হনূমানও পুত্রের প্রতি সুমিত্রার মনোভাবে বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া পারে নাই। লক্ষ্মণের পতনের সংবাদে সকলে শোকাকুল হইলেও সুমিত্রা স্থির চিত্তে রামের সেবায় বীরপুত্রের প্রাণদানের জন্য মাতা হিসাবে নিজেকে ধন্য ও সার্থক বলিয়া মনে করিয়াছেন। এতদিনে লক্ষ্মণ প্রকৃতপক্ষে মাতৃঋণ পরিশোধ করিয়াছেন, তাই সুমিত্রাদেবী বলেন, — 'যদি রাম জীবিত থাকে তাহা হইলে বহু লক্ষ্মণ পাওয়া যাইবে।' এইহেতু পুত্রের জন্য তিনি শোক এবং মোহ পরিত্যাগ করেন :-

প্রাণ দিয়া করিল রামের উপকার।
এতদিনে শুধিল লক্ষ্মণ আমার দুগ্ধের ধার ।।
সার্থক তাহারে আমি ধরিলু উদরে।
শোক মোহ নাই মোর লক্ষ্মণের তরে ।।
রামের নাম লয়্যা আমি স্বর্গবাসী হব।
রাম জিয়া থাকিলে লক্ষ্মণ কত পাব।।
সুমিত্রার ভাব দেখি হনূর বিস্ময়।
মা হয়্যা এ কেমন বলে কবিচন্দ্র কয়।।

(লক্ষ্মণের শক্তিশেল, পু.পৃ. ১৩ক-১৩)

পুত্রের প্রাণনাশে মাতা শোক ও মোহ পরিত্যাগ করিতে পারেন তখনই যখন তিনি সকল পার্থিব চেতনার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন। সুমিত্রাদেবী তদ্রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিনা কে জানে ? কবিচন্দ্র সুমিত্রা-চরিত্রটিকে রক্ত-মাংসের মানবীরূপে চিত্রিত করেন নাই। পুত্রকে অপ্রতিহত কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলায় লক্ষ্মণ-জননীরূপে এই চরিত্রটি অপূর্ব নৈতিক মহিমালাভে সমর্থ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সীতা :-

সীতা স্বামিভক্তির অত্যুজ্জ্বল দেবী প্রতিমা। বাল্য-বিবাহিতা এই জনকনন্দিনী রামচন্দ্রের রাজত্বলাভের আশায় সমবেত সখীবৃন্দের সঙ্গে জয়ধ্বনি দিয়া দেব-পূজায় নিরত

ছিলেন। অকস্মাৎ বিষণ্নমুখে রামচন্দ্র তাঁহাকে বনবাসের নিদারুণ সংবাদ জ্ঞাপন করেন। সেইসঙ্গে তিনি বনবাসে গেলে সীতা কিরূপে শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা পরিচর্যায় জীবনযাপন করিবেন তৎসম্বন্ধে নানা নৈতিক উপদেশও প্রদান করেন। সীতাদেবী তাহাতে বিচলিত না হইয়া কিশোরীর কোমল কণ্ঠে প্রৌঢ়ার দৃঢ়বদ্ধ সঙ্কল্প লইয়া উত্তর দিয়াছিলেন যে, তিনিও তাঁহার সঙ্গে অবশ্যই বনে যাইবেন :-

সীতা বলে কারে এত যোগ কহ তুমি।
স্বর্গে অভিলাষ নাঞি বন জাব আমি ॥
যুবতীর পতি গতি রহিতে নারিব।
এড়্যা গেলে অহে নাথ পরাণে মরিব ॥

(রঘুনাথের বনবাস, পু.পৃ. ১১)

সীতার এইরূপ অশঙ্কিত উত্তর শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া যান এবং ক্ষণপরে বলেন, পিতার আজ্ঞাতেই তিনি বনে গমন করিবেন, তাহাতে কুলবধূর যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বনের পথ দুর্গম ও কন্টকাকীর্ণ এবং প্রতিমুহূর্তে সেখানে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সর্প, মর্কট, গণ্ডার ও নানা বন্যজন্তুর ভয়। তিনি আরও বলেন, তরণীহীন খরস্রোতা নদী পার হওয়া, নানা কটুতিক্ত বন্যফল আহার, তৃণপত্রের শয্যায় শয়ন, নিরাশ্রয়ে ভ্রমণ, কখনও বল্কল অজিন পরিধান ও বনের নানা কষ্ট সহ্য করিয়া চৌদ্দ বৎসরের মত সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত করা সীতার মত কোমলা বালিকার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সীতা তাহাতেও নির্ভয়ে বলেন, "স্বয়ং প্রভু যাহার স্বামী, তাহার কোথা হইতেও ভয় নাই"। তিক্ত কটু বন্যফল যাহা প্রভুর 'ভক্ষ-অবশেষ' থাকিবে তাহাই সাধ্বী-স্ত্রী সীতাদেবী অমৃতবৎ গ্রহণ করিবেন :-

নানামত রামচন্দ্র কহিলেন তাঁরে।
জানকী কহেন প্রভু না ছাড়িহ মোরে ॥
তোমা সঙ্গে জাব আমি তুমি নাথ যার।
কোন ভয় নাঞি মোর কিবা দুঃখ তার ॥
তিক্ত কটু ফল তোমার ভক্ষ-অবশেষ।
অমৃত সমান মোরে না হবেক ক্লেশ ॥
বল্কল অজিন মোরে পট্টের বসন।
তৃণপত্র শয্যা মোর পালঙ্ক জেমন ॥
তোমাছাড়া একদণ্ড রহিতে নারিব।
চৌদ্দ বৎসর নাথ কেমনে গোঙাব॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১২ক)

এইরূপ নানা বিনয় ও প্রেমসূচক বাক্যে সীতাদেবী রামচন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার বনবাসের

সঙ্গী হইবার অনুমতি লাভ করেন। কৈকেয়ী সীতাকে চীর পরিধান করিতে দিয়া ক্রোধে কানের কুণ্ডল ধরিয়া আকর্ষণ করেন! সীতা কৈকেয়ীর ব্যবহারে রামচন্দ্রের প্রতি সকাতর দৃষ্টিপাত করিলে, বশিষ্ঠমুনির আদেশে কৈকেয়ী শেষ পর্যন্ত সীতাকে আর চীর পরিধান করাইতে পারেন নাই। রামচন্দ্রের নির্দেশে সীতা বশিষ্ঠদেবের পুত্র সুযজ্ঞকে কুণ্ডল, অঙ্গদ, হার আদি রত্নঅলঙ্কার দান করিয়া বনগমন করেন। সীতার পতিভক্তি সম্পর্কেও কবিচন্দ্র কিছু আভাস দিয়াছেন। বনগমনকালে কৌশল্যা সীতাকে পতিসেবায় নিযুক্ত থাকিতে বলিলে সীতাদেবী কায়মনোবাক্যে তাহা পালন করিবেন বলিয়া জানান। অতঃপর অযোধ্যার রাজবধূ বনদেবীর মত ত্রয়োদশ বৎসর রামচন্দ্রের মনে হর্ষ উৎপাদন করিয়া কাটান। মূল 'রামায়ণে' লিখিত 'স্বর্ণমৃগ' কবিচন্দ্রের কাব্যে 'মায়ামৃগ' এবং 'শূর্পণখা'-র পরিবর্তে 'খণ্ডমা' রাক্ষসীর নাম পাওয়া যায়। কবিচন্দ্র সীতাকে শান্ত কোমলা এবং নম্র স্বভাবের বাঙালী-বধূরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। মায়ামৃগের আর্তরবে উন্মনা লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে গণ্ডিরেখার বাহিরে যাইতে নিষেধ করিয়া প্রস্থান করেন। মূল 'রামায়ণ'-এ বর্ণিত নিষ্পাপ লক্ষ্মণের প্রতি সীতার তীব্র গঞ্জনা কবিচন্দ্র সীতার চরিত্রে আরোপ করেন নাই। সীতাহরণের পর সরলমতি নিষ্পাপ সাধ্বী-স্ত্রীর বিরহে রামচন্দ্র দীর্ঘ বিলাপ করিতে থাকেন। তাহাতে তন্বঙ্গী সীতার রূপের বর্ণনাও বাদ পড়ে নাই;

হা সীতা কেন নীতা আর সীতা পাব কোথা
হা সীতা খঞ্জন-নয়ানী।
হা সীতা চন্দ্রমুখী বনে কেন নাঞি দেখি
কিবা হৈল কিছুই না জানি॥ (সীতাহরণ, পু.পৃ. ৫)

অথবা —

মোর সীতা দীর্ঘকেশা তিলফুল জিনি নাসা
কামানে জিনিঞা দুই ভুরু।
এত বলি রাম কান্দে কেশ পাশ নাহি বান্ধে
মোর সীতা যেন কল্পতরু॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৬ক)

সীতার সৌন্দর্যের উপমা প্রয়োগ 'খঞ্জননয়ানী' 'তিলফুল জিনি নাসা' 'কামানে জিনিয়া দুই ভুরু' ইত্যাদি বঙ্গনারীর সৌন্দর্য বর্ণনার প্রচলিত ধারার অনুরূপ। বনলক্ষ্মীর অপহরণে বনরাজিও যেন হতশ্রী হইয়া পড়ে। সীতার আর্ত চিৎকারে বনভূমি প্রকম্পিত হইয়া ওঠে। তাহা শ্রবণে বৃদ্ধ জটায়ু রাবণের বিরুদ্ধে সম্মুখ সংগ্রামে অবতীর্ণ হন।

ছিন্নব্রততীর ন্যায় সীতা অশোক কাননে রাক্ষসীদের দ্বারা নিগৃহীতা হইয়া সতত স্মরণ করিয়াছেন রামচন্দ্রকেই। নিদারুণ নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন কিন্তু রাবণের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। এমন সময় একদিন তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে চিরমধুর রাম

নাম । হনূমান সীতাদেবীকে রামচন্দ্রের নিদর্শনস্বরূপ অঙ্গুরীয় প্রদান করিলে তিনি আশ্বস্ত হন, কিন্তু শত অনুরোধেও হনূমানের পৃষ্ঠে চড়িয়া আসিতে সম্মত হন নাই । কেননা নিজের জীবন অপেক্ষা কুল-স্ত্রী হিসাবে নিজের মর্যাদা এবং রামচন্দ্রের মত বীর স্বামীর সম্মান রক্ষা করাই তাঁহার নিকট তখন বড় হইয়া উঠিয়াছিল । রাবণ বধের পর সীতা উদ্ধার হইলেও রামচন্দ্র সীতা হেন সাধ্বী-স্ত্রীকে প্রত্যাখ্যান করেন । বিশাল সেনা ও কপিমণ্ডলীর সম্মুখে রামচন্দ্র স্বীয় পত্নীকে যে কঠোর ভাষায় অপমান করেন তাহাতে তিনি লজ্জায় মরিয়া যান । কবিচন্দ্র একবার এই জনমদুঃখিনী সীতার কন্ঠে তেজোদৃপ্ত ভাষা স্ফুরিত করিয়া তোলেন । রামচন্দ্রের কঠোর উক্তিকে প্রাকৃতজনোচিত বলিয়া উল্লেখ করিতে এই তেজস্বিনীর কন্ঠ কম্পিত হয় নাই । পতির পদে অশেষ প্রণতি নিবেদন করিয়া তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হন ।

অবশেষে অগ্নিমণ্ড প্রস্তুত করিয়া তিনি তাহাতে আত্মাহুতি দিতে চান । এই কার্যে সাহায্য করিতে সীতাদেবী একমাত্র দিশারী লক্ষ্মণের উপর নির্ভর করিয়াছেন । অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে জানকী তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া রঘুবংশের মর্যাদা রক্ষা করেন।

আজন্ম-শুদ্ধা এই দেবীকে অগ্নি রামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিলে রামচন্দ্রও পত্নীকে লাভ করিয়া ধন্য হন । হনূমান সীতাকে দুঃখদানের জন্য চেড়ীদিগকে নিগৃহীত করিতে চাহিলে নির্বোধ রাক্ষসীদের প্রতিও সীতাদেবীর করুণা উপস্থিত হয় ।

সীতা বলেন হনূমান বিচারে পণ্ডিত ।
যত দুঃখ পাইলাঙ ললাটে লিখিত ॥
রাজ-মন্ত্রী বানর তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি ।
স্ত্রীবধ করিয়া কেন রাখিবে খেয়াতি ॥

(সীতার পরীক্ষা, পু.পৃ. ৪)

এইরূপ সীতা দণ্ডার্হাকেও অশেষ করুণায় ক্ষমা করিয়াছেন । সীতার সতীত্ব ও কোমলতা কবিচন্দ্রের কাব্যেও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে ।

রসবিচার :

করুণরস :—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥" (বালকাণ্ড/২য়/১৫)

ক্রৌঞ্চ-বিরহের মর্মবেদনা 'রামায়ণ' কাব্যের মূল সুর । আর্য 'রামায়ণ' হইতে নিষিক্ত মহাকাব্যের করুণরসধারা ভাষা রামায়ণেও বহমান । 'রামায়ণ' যথার্থতঃই 'করুণার মহানদী' । কবিচন্দ্রের রামায়ণে করুণরসেরই প্রাধান্য । রসনিষ্পত্তিতে তিনি আর্য-আদর্শই

অনুসরণ করিয়াছেন। রঘুনাথের বনযাত্রাকে কেন্দ্র করিয়া যে বেদনা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেই বেদনার্ত করুণরসটি এই কাব্যের স্থায়ীরস। বীর, শান্ত ও হাস্যরস এই করুণরসকে অবলম্বন করিয়া বিকশিত। রামবনবাস হইতে আরম্ভ করিয়া সীতার পরীক্ষা পর্যন্ত সর্বত্র করুণরসের আস্বাদ রহিয়াছে। রামের বিচ্ছেদে দশরথের মৃত্যু, কৌশল্যার আর্তনাদ, অযোধ্যাবাসীর বিলাপ, সীতাহরণে রাম-লক্ষ্মণের খেদ, বালীবধে তারার শোক, রাক্ষসবংশের পতন ও মন্দোদরীর আর্তনাদ এবং সীতার অগ্নিপ্রবেশ প্রভৃতি বেদনাময় চিত্র সমগ্র কাব্যটির প্রাণস্বরূপ।

পুত্রবিচ্ছেদ কাতরতার যূপকাষ্ঠে প্রথম বলি রাজা দশরথ। প্রাণপ্রিয় পুত্রকে বনবাসে পাঠাইতে রাজার অন্তর শতধা বিদীর্ণ হইতেছিল। এই নিদারুণ যাতনা ডাকিয়া আনিল রাজার অকাল-মৃত্যু। কৈকেয়ীর প্রদপ্রান্তে পতিত হইয়া রাজাধিরাজ পুত্রের বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইতে চাহিয়াছিলেন।

ধর্মপথ রাণী দেখ দেশে রামচন্দ্রে রাখ
দন্তে তৃণ দুটি পদে ধরি।
মূল্যে কিন্যা লহ মোরে থাকিব তোমার ঘরে
কেবল হইয়া আজ্ঞাকারী।
মুখ তুলি রাণী কহ ভরতেরে রাজ্য দেহ
রাম লয়্যা অন্য দেশে যাব।
গলায় বান্ধিয়া রামে নবদূর্বাদলশ্যামে
ঘবে ঘরে ভিক্ষা মাগ্যা খাব ॥
ভূপের শুনিঞা বাণী কোপে কটু কহে রাণী
লোটয়্যা পড়িল রাজা ভূঞে।
দশরথ মূর্ছা যায় শোকেতে মরিল প্রায়
অবিরত রাম রাম মুঞে॥

(রঘুনাথের বনবাস, পু.পৃ. ৬-৭ক)

পুত্রের মঙ্গল কামনায় জননী কৌশল্যা দেবতার পূজায় নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে আকস্মিকভাবে একমাত্র পুত্রের বনগমনের সংবাদে শোকে ভাঙ্গিয়া পড়েন। পুত্রবিহীন এই পোড়া রাজত্বে তিনি বাঁচিবেন কি লইয়া, তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। পুত্রের নিকট অসহায় অবস্থায় পড়িয়া জননী সকাতর মিনতি করেন —

তুমি ছাড়্যা গেলে মোরে কি লয়্যা থাকিব ঘরে
আর কেহ নাহি তোমা বিনু।

দিয়া মোরে গুণনিধি হর্‌্যা পুনঃনিল বিধি
এতদিনে কোল হল্য শুনু ॥
অনেক তপের ফলে তুমি মোর পুত্র হল্যো
প্রাণপণে করিনু পালন ।
যতেক করিল ইচ্ছা সকল হইল মিছা
দৈবদুষ্ট বিধির ঘটন ॥
হরিয়া লইব সর্ব কৈকেয়ী করিব গর্ব
কেমনে তার সহিব বচন ।
আমার বচন ধর শুন পুত্র রঘুবর
ঘরে থাক না জাইহ বন ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১০)

অদৃষ্টকে মানিয়া লইলে অনেক দুঃখ তিরোহিত হয় । সর্বশক্তিমানের উপর প্রকৃতভাবে নির্ভর করিতে পারিলে সমস্ত শোকের অপনোদন ঘটে । পুত্রের সকাতর অনুরোধে মাতা কৌশল্যা শোক প্রশমিত করেন এবং দেবতার মাঙ্গলিক পুত্রের হস্তে বাঁধিয়া মনে যাইতে সম্মতি প্রদান করেন । মায়ের অশ্রুই পুত্রের বনযাত্রার পাথেয় হয় ।

তারপর সেই করুণ রাগিনীর মহাদৃশ্য । যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষের বীণায় যে করুণ মহাসঙ্গীত অনুরণিত হইয়া আসিয়াছে, রামবনবাসের সেই বেদনাতুর মহাদৃশ্যে যাহা মহাকবির হৃদয়ের রক্তে লিখিত রহিয়াছে, তাহাই বাংলার কবির করুণ কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে শুনি । শ্রীঅরবিন্দ বাল্মীকির মহাকাব্যকে বলিয়াছেন, 'Oceanic Poetry' ।[১] বাস্তবিক, মহাসাগরের বিশালতা ইহার মর্মমূলে নিহিত । মহাকবি বাল্মীকির সংবেদনশীল মনের প্রকাশ বা বেদনাই মহাকাব্যের প্রতি সর্গে মহাসমুদ্রের কল্লোল-গীতি বহিয়া আনিয়াছে। 'রামায়ণ' যেহেতু গৃহধর্মের আদর্শকেই বৃহৎ করিয়া, মহৎ করিয়া তুলিয়াছে, সেইহেতু পারিবারিক এমনকি স্বদেশবাসীর সঙ্গে বিচ্ছেদ কাতরতার দৃশ্যগুলিও সমান বেদনাময় হইয়া উঠিয়াছে । আত্মীয় পরিজন হইতে বিযুক্ত রামচন্দ্রের বিদায় দৃশ্যটিকে কবিচন্দ্র যেরূপ করুণ-মধুর-তানে ভরপুর করিয়া তুলিয়াছেন, তাহার প্রতিটি ছত্রে যে আকুলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা আদিকবির বীণার সুরে গাঁথা । সেই গীতিময় রসই এই কাব্যটির প্রাণ । রামচন্দ্রের বিদায় দৃশ্যের বর্ণনা এইরূপ —

মায়ে প্রদক্ষিণ করি চাপিতে যান রথে ।
কান্দিয়া কৌশল্যা রামের ধরিলেন হাথে ॥
তুমি নাহি জাত্যে পুরী হল্য অন্ধকার ।
চাঁদমুখ তুলি বাছা চাহ একবার ॥

মায়ের বিলাপ দেখি কথ হল্য মোহ।
চাপ্যা রাম রাখিতে নারিল চক্ষের লোহ ।।
মুখেতে বলিতে নারে হৃদে প্রাণ ফাটে ।
সুমন্ত্র আনিঞা রথ জোগায় নিকটে ।।
মায়ে প্রণমিঞা রাম উঠিলেন রথে ।
রঘুপতি জানকী লক্ষ্মণ করি সাথে ।।
রামের আদেশে সূত চালাইল হয় ।
হায় রাম রাম রাম শব্দ পুরীময় ।।
আবাল বণিতা বৃদ্ধ ধায় যত লোক ।
আবেশে অবশ তনু পায়্যা ঘোর শোক ।।
শুনহ সারথি রথ চালাহ ধীরিধীরি ।
রাম মুখচন্দ্র মোরা নিরীক্ষণ করি ।।
কবে আসিবেন রাম দেখিব লোচনে ।
পরস্পর কান্দিয়া কহেন পৌরজনে ।।
কৌশল্যার হৃদয় লোহায় নিরমান।
অতএব ফাটিয়া না হল্য খান খান ।।
পুণ্যবতী সীতাসতী রাম সঙ্গে যায় ।
জলসাথে গমনে যেমন ছায়া প্রায় ।।

(রঘুনাথের বনবাস, পু.পৃ. ১৬ক-১৬)

শুধু গৃহের সম্পর্কের মধ্যেই এই বিচ্ছেদ কাতরতা নিবদ্ধ নয়, রাজপুরী হইতে সুবিশাল রাজ্যের প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে বেদনার চিহ্ন বর্তমান । রামচন্দ্রের বিদায় মুহূর্তটিকে কবিচন্দ্র যে ভাষায় চিত্রিত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে শুধু নিপুণ চিত্রকরই বলা যায় না, প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন রসবোদ্ধাও বটেন ।

'হায় রাম রাম রাম শব্দ পুরীময়'।

এই একটিমাত্র ছত্রের মধ্যেই কি ব্যঞ্জনা, কি অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিবার নয় । সমগ্র পুরীর অশ্রুভারানত শোক ঐ একটি কথার মধ্যে ধ্বনিত হইয়াছে । ধ্বনির যেমন প্রতিধ্বনি, চিন্তারও তেমনি গুঞ্জরণ আছে । "হায় রাম" ! শব্দটি তেমনি পুরীময় গুঞ্জরিত হইয়া ফিরিতেছিল । পুরবাসীর হৃদয় তাঁহাদের প্রাণপ্রতিম রাজকুমার কমললোচনের জন্য বিদীর্ণ হইতেছিল । সাশ্রুনেত্রে আকুল আগ্রহে তাঁহারা রাম-মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতেছিলেন । এই নয়নাশ্রু স্বতোৎসারিত । শুধু অযোধ্যার

প্রজাসাধারণ কেন, নিখিল প্রকৃতিও বিচ্ছেদ দৃশ্যে একেবারে নিষ্পন্দ হইয়া যায়। তাহাদের মৌনভাব কবির লেখনীতে জোগাইয়াছে কবিত্বের জাদুমন্ত্র।

নৃপ দারা কান্দে তাঁরা ক্রন্দনের রোল।
দেশ জুড়্যা চমৎকার কেবা শুনে বোল॥
লক্ষ্মী নারায়ণ জাত্যে পুরী শোভা ঘুচে।
রাম রাম বিনে কার অন্ন নাঞি রুচে॥
হাতী ঘোড়া আদি কান্দে শ্রীরামের গুণে।
পশু পক্ষ অচেতন রাম গেলা বনে॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১৬)

প্রকৃতি ও পুরবাসীর আরও কিরূপ অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা ঘটিয়াছে কবি তাহাও সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। পুররমণীগণ বিবৎসা ধেনুর ন্যায় রামশোকে জর্জরিত হন, সূর্য নিজেকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে এবং সকলের গৃহে উল্কাপাত হইতে থাকে। চন্দ্র উদিত না হইয়া, বায়ু প্রবাহহীন অবস্থায় অযোধ্যার রূপকে ইন্দ্রশূন্য অমরাবতীর ন্যায় হতশ্রী করিয়া ফেলে।

ধেনু যত নাই চায় বাছুরের পানে।
রামশোকে জরজর কান্দে অভিমানে॥
উল্কাপাত নিত্য সভার পড়ে গৃহে।
চঞ্চল হইল সর্বে স্থির কেহ নহে॥
দশদিক অতি ঘোর আচ্ছাদিল ধুঙা।
শোকাবেশে পুরীজন হৈল উর্ধ্ব মুণ্ডা॥
হাস্য পরিহাস্য ভোগ বেভায়ে নাই মন।
চন্দ্রের উদয় নাঞি বায়ুতে নাই বল॥
যুবতী যতেক ফিরা না চায় দুগ্ধসুতে।
দুগ্ধপোষ্য শিশু কান্দে পড়িয়া ভূমেতে॥
শ্রীরামেরহিত পুরী ভ্রমিয়া বেড়ায়।
ইন্দ্রশূন্য যেমন অমরাবতী প্রায়॥

(প্রাগুক্ত, ক.বি. ৩৯ নং পু.পৃ. ১৬ক)

এই শোকপূর্ণ অবস্থার মধ্যে দশরথের মূর্ছা যাওয়ার এবং দুই হস্ত তুলিয়া রথের পিছনে ধাবমান হইয়া রথকে থামিতে বলিয়া, পুনরায় ভূমিতে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ার দৃশ্য কম মর্মন্তুদ নহে। রামচন্দ্রের রথের পিছনে দশরথের দৃষ্টিশক্তি চলিয়া যায়, তাহা আর ফেরে নাই। পুত্রহারা রাজার জীবনধারণের আর কোনও হেতু না থাকায় ধীরে ধীরে তিনি মৃত্যুর

কোলে ঢলিয়া পড়েন। শুধু রস উপলব্ধিতেই নয়, কবিচন্দ্রের কাব্যখানি ভাব ও ভাষার কোমলতায় অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত। রামচন্দ্রের বনগমনকালে করুণরসের চরমোৎকর্ষ ঘটে। এই করুণরস অযোধ্যা হইতে লঙ্কার রাজপুরীকেও শোকাহত করিয়াছে, একে একে রাক্ষসবীরদের পতন ও মৃত্যুতে। রাবণ কর্তৃক সীতা অপহৃতা হইলে লক্ষ্মণ অকস্মাৎ শূন্য কুটিরে তাঁহার সাড়া না পাইয়া যেভাবে বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিলেন, কবিচন্দ্রের ভাষায় ও উপমা প্রয়োগের নৈপুণ্যে সে চিত্রও হইয়া উঠিয়াছে অনবদ্য।

সীতা সীতা বল্যা লক্ষ্মণ ডাকিতে লাগিল।
আইস রামের সীতা খাও ফল অল্প ॥
অনেক ডাকিল লক্ষ্মণ উত্তর না পায়।
শূন্য আছে কুড়্যাখানা সীতা নাহি তায় ॥
খাঁচা রাখি পক্ষ যেন গেছে পালাইয়া।
সেই মত কুড়্যাখানা আছে তো পড়িয়া ॥

(সীতাহরণ, পু.পৃ. ৪-৫ক)

বৈদেহীর অদর্শনজনিত শোক, উৎকণ্ঠা এবং অন্তর্জ্বালা কবিচন্দ্র রামচন্দ্রের বিলাপের মধ্যে যে ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা বৈরাগ্যের নহে, বিরহের নির্বেদ ; যথা -

শুন লক্ষ্মণ বলি আমি ফির্যা ঘরে জাহ তুমি
আমার বেদনি মায়ে বল্য।
কহিয় কৈকেয়ী আগে আমার শপতি লাগে।
বল্য তোমার রামসীতা মল্য ॥
কি আর কহিব কথা সকলি করেন ধাতা
শুন ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ।
তনু জরজর বিষে তাপ নিবারিব কিসে
সীতা বিনে না বাঁচে জীবন ॥
ব্যাঘ্র ভল্লুকে খাইল পথ ভুল্যা কোথা গেল
মিলাইল তপনের তাপে।
শুনহ মালতি যুঁথি ·তোর (জাগ) দিবারাতি
এ পথে দেখ্যাছ সীতা জাত্যে ॥
শুনরে লক্ষ্মণ ভাই আর সীতা পাব নাই
বল ভাই কি হবে উপায় ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৫-৬ক)

আবার রামচন্দ্রের শরাঘাতে বালীর মৃত্যু হইলে তারা পতিশোকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়েন

এবং পতির সঙ্গ লাভের আশায় তারা পাগলিনীর ন্যায় দুঃখে রঘুপতির নিকট বিলাপপূর্বক তাঁহাকেও বধ করিতে সকাতর অনুরোধ করিয়াছিলেন;

রামে কান্দ্যা কহে সতী যে বাণে মারিলে পতি
সেই বাণে মারহ আমায় ।
দূর কর মোর শোক পাই যেন পতিলোক
পতি বিনে নাই মোর গতি।।

(রাম সুগ্রীব মিলন পালা, পু.পৃ. ৬ক)

রাক্ষসরাজ দশাননের কামবহ্নিতে লঙ্কাপুরী ছারখার হইলে স্বর্ণলঙ্কায় যে কৃষ্ণছায়া নামিয়া আসে রাণী মন্দোদরীর হাহাকারের মধ্যে তাহা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে । রাবণের মৃত্যুতে মন্দোদরী বলিয়াছেন —

বিধবা করিলে লঙ্কা কারে না করিলে শঙ্কা
মোদের বৈধব্য দশা লাভ ।।
সে হেন সুন্দরকায় শকুনি গৃধিনী খায়
রক্তাঙ্কুর সকল শরীরে ।
মরিল যতেক অসুর শূন্য হৈল লঙ্কাপুর
পাসরিলে অভাগী জায়ারে ।।
বিধি তোমায় হৈল বাম ত্রৈলোক্যের নাথ রাম
বাদ কৈলে তুমি তাঁর সহিতে ।

(সীতার পরীক্ষা, পু.পৃ. ৩ক)

বাল্মীকি সীতার জীবনকে জনমদুঃখিনীরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন[১০]। কবিচন্দ্র জানকীকে বাংলাদেশের কুলবধূর নিপীড়িত জীবনের ভাবধারায় প্রকাশিত করিতে চাহিয়াছেন । সীতার সতীত্বের আদর্শ শুধু চরিত কথা নহে, তাহা বাঙালীর দৈনন্দিন নারী-জীবনের বাস্তব রসে পূর্ণ । রামচন্দ্রের প্রতি সীতার কাতরোক্তি পাওয়া যায় যুদ্ধশেষে অগ্নি পরীক্ষাকালে ।

তোমা বিনে নাহি জানি না ছাড়িহ রঘুমণি
অভাগিনীর আর কেহ নাঞি ।
আপনি সকল জান নিদারুণ হৈলে কেন
কহ মোরে প্রাণের গোসাঞি ।।
মুখ তুলি কহ কথা অভাগিনী যাব কোথা
দেয়র লক্ষ্মণ কিবা দেখ ।
দেশে যাবে দুটি ভাই আমি রব কার ঠাঞি
বলিয়া কহিয়া মোরে রাখ।। (সীতার পরীক্ষা, পু.পৃ. ৮ক)

অবশেষে সীতাদেবী আপন মান রক্ষা করিতে ও বীর জায়ারূপে নিজেকে প্রমাণিত করিতে অগ্নিতে প্রবেশ লাভ করাকেই শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া মনে করিয়াছেন। এখানেও করুণরসের প্রবাহ। কবিচন্দ্র অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন করুণরস সৃষ্টিতে। যেখানেই করুণরসের প্রকাশ ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে, কবিচন্দ্র সেখানেই বাঙালীর সহজ করুণ তান ধরিয়া ছড়াইয়া দিয়াছেন মাধুর্যের বিকম্পিত আলাপন।

বীররস :-

বাল্মীকি-রামায়ণে রাম, লক্ষ্মণ, হনূমান, বালী, সুগ্রীব, অঙ্গদ, জাম্বুবান এবং রক্ষোরাজ দশানন ও ইন্দ্রজিৎ ইঁহারা সকলেই বীর। কেহ সত্যে, কেহ সাহসিকতায়, কেহ ত্যাগে, কেহ বীর্যে এবং কেহ রণ-নৈপুণ্যে অসীম ক্ষমতা প্রদর্শনপূর্বক নজীর স্থাপন করিয়াছেন। কবিচন্দ্র ইঁহাদের চরিত্রকে বীরভাবাপন্ন করিয়াই চিত্রিত করিয়াছেন। বাঙ্গালী কবির মধ্যযুগীয় কাব্যে বীর রস কোথায়ও ফুটিয়াছে বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন না এবং কৃত্তিবাসের কাব্যে রাম-রাবণের যুদ্ধকে অনেকে দুই জমিদারের কলহদ্বন্দ্বের অনুরূপ বলিয়া মনে করেন।[১১] এইরূপ অভিমত অপর সকল ভাষা রামায়ণকারের কাব্য সম্পর্কেও প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহার কারণ আর্য রামায়ণের বীরত্ব অনুষ্টুপছন্দে গ্রথিত জলদগম্ভীর ভাব এবং সর্বোপরি নরচন্দ্রমা রামচন্দ্রের পৌরুষ, গৌড়ীয় কবির পয়ার-লাচাড়ীছন্দে রচিত রামায়ণ-পাঁচালী কাব্যে রক্ষিত হয় নাই। তথাপি বলা যায়, কবিচন্দ্রের কাব্যে কিছু কিছু যুদ্ধ বর্ণনা আছে এবং উহাতে বীররসের যথোচিত অভাব থাকিলেও বর্ণনাগুলি বাংলা সাহিত্যভাণ্ডারে একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। এইরূপ দুই একটি যুদ্ধ-দৃশ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমটি 'শিবরামের যুদ্ধ' পালায় লক্ষ্মণ ও হনূমানের রণ মূলতঃ দুই বীরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ; যথা :-

এত বলি হনূমান ফিরে আরবার।
তুলিল পর্বত এক প্রকাণ্ড বিস্তার ॥
নব্বৈ যোজন পর্বত হেলায় তুল্যা হাতে।
চল্লিশ যোজন দুটা ধরিল দুই হাথে ॥
বত্তিশ যোজন একটা পর্বত দেখিয়া।
তুলিল জাবার কালে লেঙ্গুড়ে বান্ধিয়া ॥
লক্ষ্মণ বলেন বানরবেটা বড় তেজমন্ত।
একবারে তুলিয়াছে চারিটা পর্বত ॥
দূরে হৈতে ডাকি বলে পবননন্দন।
এবার মারিব তোরে তপস্বী লক্ষ্মণ ॥

এত বলি হাথে হৈতে পর্বত ফেলিল।
দুইবাণে দুই পর্বত লক্ষ্মণ কাটিল ॥
হনূমানের কোপ দেখি লক্ষ্মণের বল ।
এইবার তপস্বীবেটা জাবি রসাতল ॥
নৈই যোজন পর্বত ফেলিয়া হনূ মারে ।
নির্ভরে পর্বত পড়ে লক্ষ্মণ উপরে ॥

(শিবরামের যুদ্ধ, পু.পৃ. ৪ক-৪)

দ্বিতীয় যুদ্ধ ঘটে শিব ও রামের মধ্যে হনূমান ও লক্ষ্মণেব পতনের পরে । এই সময়ে কিছু বাণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে । হনূমানকে রামচন্দ্র যে বাণে মূর্ছিত করেন তাহার নাম শতবাহু ।

শতবাহু নামে বাণ জুড়িলা ধনুকে ।
ঘোর শব্দে পড়ে গিয়া হনূমানের বুকে ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৬)

তারপর শিব ও রামের মধ্যে যে সংগ্রাম উপস্থিত হয় তাহাও একেবারে বৈচিত্র্যহীন নহে ।

তবে বাণ মারেন শিব মেঘবন্য বল্যা ।
বায়ুবাণে রাম তারে দিল দূরে ফেল্যা ॥
পুনু জলবাণ তুল্যা মারে শশীধর ।
শোষক বাণেতে সংহারিলা রঘুবর ॥
নাগবাণ রামকে পাঠাল্য শূলপাণি ।
গড়ুরবাণেতে ফিরাইল দেব রঘুমণি ॥

★ ★ ★ ★ ★ ★

তাহা দেখি ক্রোধ হৈলা রামের অন্তরে।
চক্রবাণ নেন হাথে মারিতে শিবেরে ॥
দুইজনে দুই অস্ত্র ধরিলেন হাথে ।
শূন্যপথে দেবগণ লাগিল কাঁপিতে॥

★ ★ ★ ★ ★ ★

বিষ্ণুচক্রে কাটা জান ঝাট চল তুমি ।
কহিতে বিলম্ব হবে শীঘ্র চল মামী ॥
রাম ধরিছেন চক্র শূল ধরিছেন মামা ।
দেবতার সাধ্য নহে যুদ্ধে দিতে ক্ষেমা ॥

(প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৮-৯ক)

বামচন্দ্রের প্রতি ভক্তিতে, সাহসিকতায়, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে এবং শারীরিক বলে হনূমানের

মত বীর কেহ নাই। হনূমান গন্ধমাদন পর্বত আনিতে গেলে রাবণের মাতুল কালনিমার সঙ্গে যে মুষ্টিযুদ্ধ হইয়াছিল তাহাও কবিচন্দ্রের বর্ণনায় নিখুঁত ভঙ্গিমায় প্রকাশিত :-

কালনিমায় কাল জানি করিয়ে প্রকাশ।
পর্বত প্রমাণকায় ঠেকিল আকাশ ॥
চারি মাথা আট ভুজ আট লোচন।
দন্ত কড়মড়ি করে লোহিত বদন ॥
হাতাহাতি মারি করে কেহ কারে নারে।
মুষ্টামুষ্টি কেশাকেশি খামচায়্যা ধরে ॥
হনূমান তার বুকে করে নখাঘাত।
বুকে মুখে অবিরত রক্ত হয় পাত ॥
ইহার মর্দনে অবনী করে দলদল।
টলবল করে যত পর্বত সকল॥
বসুমতী টলটল স্থির হত্যে নারে।
দেবগণ চমৎকার চক্রাবর্তে ফিরে ॥
কোপে হনূমান তারে ধর‍্যা দিল পাক।
কালনিমা ঘুর‍্যা বুলে কুমারের চাক ॥
হনূমান মহাবীর মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হইল হাড় ॥
পুচ্ছে বেড়াইয়া তারে বধিল পরাণে।
ফির‍্যা পেল্যা দিতে পড়ে রাবণের স্থানে ॥

(লক্ষ্মণের শক্তিশেল, পু.পৃ. ৯)

লঙ্কার বহু রাক্ষসসৈন্য নিহত হইলে দশানন তাহার প্রতিশোধ লইতে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। লক্ষ্মণ দশাননের শক্তিশেলবাণে পরাজয় লাভ করেন। যুদ্ধবর্ণনা সংক্ষিপ্ত হইলেও উল্লেখযোগ্য :-

এতবলি দশানন শেল নিল হাতে।
কাতর হইল্যা রাম কাঁপে ত্রিজগতে ॥
বায়ু বরুণ কাঁপে যম পুরন্দর।
ব্রহ্মা আদি দেব কাঁপে গন্ধর্ব কিন্নর ॥
বসুমতী টলটল স্থির হত্যে নারে।
সসিন্ধু গগন গিরি চক্রাবর্তে ফিরে ॥
নাগলোক চমৎকার বাসুকী অস্থির।

পীড়্যা পায়্যা ঘুর্য্যা বুলে অনন্তের শির ॥
চলিল দারুণ শেল মেঘ যেন গাজে ।
যারে এড়ে তারে মারে শত ঘন্টা বাজে ॥
অনল সমান শক্তি ফিরিবার নয় ।
কাটিলে না জায় কাটা দারুণ দুর্জয় ॥
পড়িতে আইসে শেল লক্ষ্মণের বুকে ।
কাতর হইয়া রাম স্তব করি ডাকে ॥

.(লক্ষ্মণের শক্তিশেল, পু.পৃ. ৩)

বীরত্বে রঘুপতি অতুলনীয় । সৌমিত্রি শক্তিশেলে মূর্ছিত হইয়া পড়িলে রঘুনাথ এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে দশাননকে বাণে বাণে জর্জরিত করিয়া ফেলেন । বিপদ আশঙ্কায় রাবণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন ।

দুই বীরে ঘোর রণ হয় পরস্পর।
দেবতা চিন্তিত হইল আকাশ উপর ॥
রাবণ বলে প্রাণ লয়্যা পালা রঘুপতি ।
নহে বা করিব তোরে লক্ষ্মণ সঙ্গতি ॥
রাম বলে কর মনে ঘরে জিন্যা জাব ।
লক্ষ্মণের দাদ আমি হাতে হাতে লব॥
না পালাসি স্থির হয়্যা রসি দশাননে ।
দশ মাথা কাটিয়া পেলিব কুড়ি বাণে ॥
লক্ষ্মণের শোকে রাম বড়ই কাতর ।
বাণে বিন্ধ্যা দশাননে করিলা জর্জর ॥
রণে ভঙ্গ দিয়া রাবণ লঙ্কায় পালায় ।
সেবিয়া বাল্মীক ব্যাস কবিচন্দ্র গায় ॥

(লক্ষ্মণের শক্তিশেল, পু.পৃ. ৪ক-৪)

এই বর্ণনাগুলিতে বীররস যথাযথরূপে পাওয়া না গেলেও উহার আভাস আছে, তবে তাহাতে প্রায়ই ভক্তিরস যুক্ত হওয়ায় বীররস যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুণ্ন হইয়াছে ।

হাস্যরস :-

কবিচন্দ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের সার্থক স্রষ্টারূপে পরিচিত । তবে এই হাস্যরস রঙ্গ ব্যঙ্গ ও স্থূল ভাঁড়ামিতেই পর্যবসতি । হনূমানের অশোকবনে আম্র

ভক্ষণের লোভে গলায় আমের আঁঠি বিধিয়া অসহনীয় অবস্থা এবং রাক্ষসদের পাল্লায় পড়িয়া নানারূপ কেচ্ছা ইত্যাদি 'সীতার উদ্দেশ' পালায় স্থান পাইয়াছে। অশোক বনে হনূমান রাক্ষসদের হাতে ধৃত হইলে রাক্ষসেরা হনূমানকে রাবণের নিকট স্কন্ধে বহিয়া লইয়া চলে। হনূমান তাহাদের সঙ্গে নানাভাবে কৌতুক করিয়া বিরক্তি উৎপাদন করিতে চেষ্টা করে।

কবিচন্দ্রের সর্বাধিক জনপ্রিয় পরিহাসব্যঞ্জক পালা 'অঙ্গদ রায়বার'। লঘুচপল ধামালি ছন্দে রচিত পালাটি বাঙালীর কৌতুকরসের সার্থক দৃষ্টান্ত। অঙ্গদ এবং রাবণ উভয়ের বিদ্রূপাত্মক গালিগালাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হইলে নবীন যোদ্ধা অঙ্গদের ভাষায় হুলের তীক্ষ্ণতা সূচ্যগ্রের ন্যায় রাবণকে বিদ্ধ করিতে থাকে। গালাগালির মাত্রা চরমে উঠিলে শেষ পর্যন্ত উভয়ে উভয়ের পিতামাতাকে লইয়া অশোভন উক্তি প্রত্যুক্তি করিতে থাকেন। উহা যতই অমার্জিত হউক না কেন, পালাটি পাঠকালে উভয় বীরের বাক্যুদ্ধের প্রতি মন সহজে আকৃষ্ট থাকে বলিয়া অমার্জিত অথবা অশোভন বাক্যের জন্য হৃদয় পীড়িত হয় না। এইরূপ উত্তেজক বাক্‌ভঙ্গী বাঙালী শ্রোতাকে মাতাইয়া তুলিত বলিয়া উহার ব্যঙ্গ কৌতুকপূর্ণ রস, কি মধ্যযুগে, কি আধুনিককালে, অমার্জিত মনে হইলেও পরম উপভোগ্য বিষয়রূপে বাংলা সাহিত্যে একটি সুনির্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। কবিচন্দ্রের কাব্যে একদিকে করুণরসের অশ্রুপ্রবাহ, অপরদিকে কবির লড়াই জাতীয় 'আধা-তর্জা'র গ্রাম্য হাস্য-পরিহাস, মধ্যযুগে বাঙ্গালীর নিস্তরঙ্গ জীবনের মধ্যে কিছু বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইহার কিছু দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল।

অঙ্গদ -

অক্ষয় কুমার পুত্র মালেক রামের চরে।
তার স্ত্রী বিধবা হঞা আছে তোর ঘরে ॥
তোর জে দেখি দারুণ পণ নয় করিবেক কে।
নয় বলবি মোর বধূর স্বামী আন্যা দে ॥
একজনাকে আন্যা দিব তোর মনোমত হব।
মনোমত না হইলে ফির‍্যা আন্যা দিব ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৫)

রাবণ —

আন্যাছি রামের সীতা দি বা না দি।
বনের বানর পশু বেটা তোর তায় কি ॥
ইসত এ কথা ভাব করালেক রামের সনে।
দেশ্‌কে জাবে বল্যা সাধ কর‍্যাছ মনে ॥

বিনি দোষে রাম-তপস্বী তোর বাপকে মালেক।
তার পায় প্রণতি হলি লজ্জা নাই পালেক॥

★ ★ ★ ★ ★ ★

পুত্র হঞা পিতার তুই কোন কার্য কল্লি ।
তোর বাপকে মার‍্যা তোর মাকে নিলে হরি ॥
ধিক জীবন তোর মররে অধম বেটা ।
বৃথাই জীবন তোর অঙ্গদ, তোর মা কুলটা ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৬)

অঙ্গদ —

অঙ্গদ বলেন বা রাবণ, মোর মা কুলটা ।
সত্যি কর‍্যা বল দেখি রাবণ তুই কার বেটা॥
ব্রহ্মবীর্যে জন্ম তোর ত্রিভুবন খিয়াতি ।
বিশ্বশ্রবার বেটা তুই পৌলস্তের নাতি ॥
বিশ্বশ্রবা মহাতপা বিশ্বে যার যশ ।
তোঁ যদি তাহার বেটা তবে কেনে রাক্ষস ॥
মা তোর রাক্ষসী হল্য ব্রাহ্মণ তোর পিতা ।
জানিঞা করিলি বিভা দানব দুহিতা॥
কুম্ভনিশা ভগিনী তোর দৈত্যে নিলেক হর‍্যা ।
কতেক জাতে জন্ম তোর দেখ লেখা কর‍্যা ॥
আপনার ছিদ্র তাক্যা পরকে দেস খোঁটা ।
ডুব দিঞাছিস কালিচূণে মররে অধম বেটা॥

(প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৬)

অঙ্গদ রায়বারের এইরূপ বাক্‌চাতুরী ছন্দে গ্রথিত করিয়া কবিচন্দ্র হাস্যরসের এক সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন ।

ভক্তিরস :-

'অধ্যাত্ম রামায়ণ' এবং 'শ্রীমদ্ভাগবত' গ্রন্থের রামকাহিনীতে রামভক্তিবাদ প্রচারিত । কবিচন্দ্র এই দুই গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার 'রামমঙ্গল' বা 'রামলীলা' নামক কাব্যে রাম-নামতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রভাবে কিরাতবেশী ব্রাহ্মণের 'রাম'-নামের বিপরীত শব্দ 'ম-রা' নাম জপ করিয়া দস্যুবৃত্তি হইতে বাল্মীকি মুনিতে পরিণতির অতি পরিচিত কাহিনীটিও কবিচন্দ্র নামাশ্রয়ী ভক্তিবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যেই খুব

সম্ভব গ্রহণ করিয়াছেন। রামচন্দ্রের বনবাস গমনের পূর্বে বামদেব মুনি অলৌকিকপুরুষ রামের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়া বলেন —

এই রাম আদি পুরুষ নারায়ণ।
জানকী কেবল লক্ষ্মী অনন্ত লক্ষ্মণ ॥
মৎস্য আদি সকল ঞিহার অবতার।
চরাচর যত কিছু সৃজন ঞিহার ॥
দশরথ বহু তপে আরাধিয়া হরি।
রাম নামে পুত্ররূপে ভূপে কৃপা করি ॥
রাবণ বধের তরে মানব শরীর।
অতেব চলিলা বনে রাম রঘুবীর ॥
রাজা কৈকেয়ীরে দোষ দেহ সভে বৃথা।
বিবরিয়া শ্রীরামেরে কহিলাঙ কথা ॥
রাম রাম রাম বাণী যেবা নিত্য জপে।
যম ভয় নাঞি তার কি বা করে পাপে ॥
মায়ায় মানুষ রূপ রাম অবতার।
রাম নামে চারি যুগে তরিব সংসার ॥
এত শুনি সভাকার মোহ গেল কথো।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে আধ্যাত্মিক মত ॥

(রঘুনাথের বনবাস, পু.পৃ. ১৪ক)

কবিচন্দ্রের কাব্যে রামচন্দ্র সাধারণ মানুষ নহেন, তিনি সাধকের অন্তর্লোকের দেবতা, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ "রঘুবীর"। শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্তীকালে বৈষ্ণবধর্ম-প্রভাবে কৃষ্ণ নামতত্ত্ব ভক্তিবাদের প্রধান অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। ইহার প্রভাব মধ্যযুগের প্রায় অধিকাংশ সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয়। 'চৈতন্য চরিতামৃত'-এর 'কৃষ্ণনাম' জপের অনুরূপ কবিচন্দ্রের কাব্যেও পাওয়া যায় 'রাম নামে চারিযুগে তরিব সংসার' এবং

'রাম রাম রাম বাণী যেবা নিত্য জপে।
যম ভয় নাঞি তার কিবা করে পাপে'॥

কবিচন্দ্রের রামচন্দ্রের ঈশ্বরত্বের প্রতিষ্ঠায় নানা স্তবস্তুতির বিবরণ আরণ্যক জীবনেই উদ্ঘাটিত কবিয়াছেন। ভরদ্বাজ মুনি তাঁহাকে 'পরমপুরুষ', 'মায়ায় মানুষ দেহ' এবং 'ব্রহ্মার আরাধ্য' বলিয়া স্তুতি করেন,

তপস্যা সফল মোর হল্য এতদিনে।
পরমপুরুষ তুমি তোমা কেবা চিনে ॥

মায়ায় মানুষদেহ ধরিয়াছ তুমি ।
ব্রহ্মার আরাধ্য তুমি সব জানি আমি ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ২১ক)

বাল্মীকিমুনিও তাঁহাকে বন্দনা করিয়া বলেন —

তোমার মহিমা রাম কে বলিতে পারে ।
মহাপাপী কত কত তব নামে তরে ।।

শ্রীরামের পবিত্র নাম প্রভাবেই তিনি বাল্মীকি মুনিতে পরিণত হইয়াছেন তাহাও উল্লেখ করেন :

তব নাম জপি আমি হইনু ব্রহ্ম ঋষি ।
নাম গায়্যা বৈষ্ণব হইলা গিরিবাসী।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ২১)

ভরত রামচন্দ্রকে বনবাস হইতে গৃহে প্রত্যাগমনের নিমিত্ত অনুরোধ করিলে বশিষ্ঠদেব ভরতের নিকট শ্রীরামের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বলেন —

কি কর ভরত তুমি এহ ভাল নয় ।।
অখিলের কর্তা রাম না জান কারণ।
লীলায় মনুষ্য দেখি দেব নারায়ণ ।।
সংসারের ভার দূর করিবারে আসে।
দুষ্টেরে করিতে নাশ আল্যা বনবাসে।।
মুনিগণ নির্ভয় করিবার কারণে ।
সবংশে রাবণ রাজায় করিতে নিধন ।।
চৌদ্দ ভুবনের কর্তা হয় এই জনে ।
মনুষ্য করিয়া ইহায় না বাসহ মনে ।।
উৎপাত প্রলয় স্থিতি সভার কারণ ।
আজ্ঞামত কর্ম কর শুনহ বচন।।

(ভরতের পিতৃশ্রাদ্ধ, পু.পৃ. ৪-৫ক)

অরণ্যজীবনে শুধু মুণিগণই নহেন, নির্দয়া কৈকেয়ীর মুখেও কবিচন্দ্র রামচন্দ্রের মহিমা ব্যক্ত করিয়াছেন । কৈকেয়ীর মুখে নির্গুণ ব্রহ্মের কথাই আভাসিত হইয়াছে :

শুন শুন রামচন্দ্র মোর নিবেদন ।
তিন লোক নাথ তুমি রাজীবলোচন।।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি সভার কারণ ।
জলস্থল চন্দ্র সূর্য আকাশ পবন।।
যে ঘটে থাকিয়া যবে যে কর্ম করায় ।

ফলরূপী হয়্য তুমি সে ফল ভূঞ্জায় ।।
বাক্যরূপী হও তুমি জীবের শরীরে ।
স্বতন্ত্র তোমার মায়া কে বলিতে পারে ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৫)

কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বালীর সঙ্গে সুগ্রীবের বিরোধ ঘটিলে বালীর পত্নী তারা স্বীয় স্বামীকে অকস্মাৎ যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিতে বলেন, কারণ স্বয়ং ঈশ্বর রামচন্দ্র যাঁহার সহায় তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হওয়াই কর্তব্য । কিন্তু অমিততেজের অধিকারী বালী দেবগণকেও ভয় করেন না, এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন । তিনিও তারার নিকট যুদ্ধ যাত্রার পূর্বে নরনারায়ণ রামচন্দ্রের মহিমার কথা স্বীকার করেন ।

নারায়ণ দশরথ-গৃহে জন্ম তাঁর ।
মায়ায় মানব কায় ঘুচাতে ভূভার ।।
বালী কহে আগো তারা শুন্যাছি শ্রবণে ।
চরণ পূজিব তাঁর আনিয়া ভবনে ।।

(রামসুগ্রীব মিলন, পু.পৃ. ৪ক)

রাক্ষসবংশে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, মন্দোদরী হইতে সকলেই একে একে রামচন্দ্রের অবতারত্ব বর্ণনা করিয়াছেন । স্বয়ং রাবণ কুম্ভকর্ণকে বলিয়াছেন —

দয়ার সাগর রাম গুণের নাঞি সীমা ।
কোটি ব্রহ্মা দিতে নারে নামের মহিমা ।।

(রাবণকুম্ভকর্ণ সংবাদ, পু.পৃ. ৪)

রাবণ প্রচ্ছন্ন রাম-ভক্ত, কিন্তু তিনি বামচন্দ্রের নিকট তাহা ব্যক্ত করেন নাই । কুম্ভকর্ণ রাবণের মনোভাব উপলব্ধি করিয়া একবার সীতার নিকট অশোককাননে রাবণকে রামের মূর্তি ধরিয়া গমন করিতে বলিলে রাবণ আপন দুর্বলতা প্রকাশ করিয়া ফেলেন :

রাবণ রাজা বলে ভাই তাও তোমাকে কই ।
একদিন মনে কইলাঙ রামের মূর্তি হই ।।
দূর্বাদল-শ্যাম রাম যেই ভাবি মনে ।
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ জ্ঞান হয় ততক্ষণে।।
প্রজার পালন মনে কিছুই না লয় ।
সদাই বৈরাগ্য ধর্ম উপস্থিত হয়।।

★ ★ ★ ★ ★

সেই হইতে না জাই ভাই অশোকের বনে ।
শয়নে স্বপনে রাম নাম হয় মনে ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৫)

কুম্ভকর্ণ রাবণকে তাঁহার ভুলের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সীতাকে রামচন্দ্রের নিকট সমর্পণ করিতে বলিয়াছেন, কারণ রামচন্দ্রের অপরাজেয় ক্ষমতা তিনি অনুভব করিয়াছেন সাগর বন্ধনকালে। বীর কুম্ভকর্ণ রাবণকে সৎ উপদেশ দিয়া শ্রীরামের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করেন, অর্থাৎ তিনিও শ্রীরামের প্রভাব হইতে মুক্ত নহেন।

সীতা লয়্যা দুই ভাই রামের স্থানে যাই।
তবে তো রামের হাথে মরণ এড়াই ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৬ক-৬)

রাবণের যুদ্ধযাত্রাকালে অশুভ লক্ষণ দেখিয়া রাণী মন্দোদরী স্বামীকে যুদ্ধযাত্রা করিতে নিষেধ করেন। রাবণ অসীম ক্ষমতাশালী হইলেও পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণের সমকক্ষ নিশ্চয়ই নহেন, এইহেতু সাধ্বী ব্যাকুল হইয়া রাবণকে যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিতে বলেন। অবশেষে তাঁহার কথাই সত্য হয়। রাবণ রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হইলে মন্দোদরী বিলাপ করিয়া বলেন —

প্রভুরাম পূর্ণব্রহ্ম   একি মানুষের কর্ম
তখন গেছে জীবনের আশা ॥
* * * * * *
তোমার দশমুকুট   ধুলায় পড়্যা লটপট
দেখ্যা বুক ফাটে মরি মরি ॥
(সীতার পরীক্ষা, পু.পৃ.৩ক-৩)

কবিচন্দ্র রাক্ষসবংশে রামচন্দ্রের প্রতি যে ভক্তি-রসের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন তাহা বাঙালীর জীবন ও সাধনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হইয়া গিয়াছে। তবে তাহাতে কবিচন্দ্রের পরবর্তী কয়েকজন কবির মত রাক্ষসবংশে আবেগপ্রবণ ভক্তিভাবের অতিরেক নাই। এইস্থলে হনূমানের দাস্যভক্তির কথাও স্মরণযোগ্য। হনূমানের আত্মনিবেদন পরম উপভোগ্য, তাহার কারণ উভয়ের প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক প্রয়োজনের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। রামচন্দ্র ভিন্ন হনূমানের অস্তিত্ব যেন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অঙ্গদের মধ্যেও দাস্যভাব বর্তমান। এইরূপ প্রভু-ভৃত্যের স্নিগ্ধ-মধুর সম্পর্ক বাংলা-রস-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

সমাজ চিত্র :—

"................. রামায়ণ-মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে। ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে, কারণ সেরূপ ইতিহাস সময় বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে, রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালেকালে কতই পরিবর্তিত হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্ত্তন হয় নাই।

ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প, তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।"[১২] কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাভারতের সঙ্গে রামায়ণকেও ইতিহাস বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। যদিও এই ইতিহাস তথ্যগত নয়, সত্যগত। কেননা "নিছক তথ্যগত হলে রামায়ণের প্রভাব কখনও এমন গভীর হতে পারত না"।[১৩] রামায়ণ একদিকে জাতির অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করিয়া অপরদিকে নিত্যকালকে অধিকার করিয়া আছে। এইখানে মহাভারতের সঙ্গে রামায়ণের প্রভেদ। "................. ভারতবর্ষ রামায়ণের আদর্শে কালে কালে গঠিত হয়ে রামায়ণকে ইতিহাসই করে তুলেছে। মহাভারতের ন্যায় রামায়ণে ভারতবর্ষের প্রতিফলন ঘটেনি, কিন্তু রামায়ণই ভারতবর্ষের মনে প্রতিফলিত হয়েছে। এইভাবেই এই আদি কাব্যখানি শ্রেষ্ঠ ইতিহাসের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে"।[১৪] আবার রবীন্দ্রনাথও এই রামায়ণকে আমাদের 'চিরকালের ইতিহাস' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ইতিহাসের প্রধান বস্তু সমকালীন সমাজচিত্র, তৎকালীন সভ্যতার আদর্শ ও সংঘাত, সাধারণ জনজীবনের নিখুঁত চিত্র। ইহা দ্বারাই সে জাতির অন্তরে বিরাজিত থাকে। বহু মনীষী ও সমালোচকের মত পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, মহাভারতের যুগের সামাজিক অবস্থা অপেক্ষা রামায়ণের যুগের সামাজিক অবস্থা অনেক সরল ও প্রাচীনতর।

ভারতবর্ষের সকল সমাজেই রামের চরিত্রকে গৃহধর্মের ও সমাজধর্মের আশ্রয়রূপে প্রচার করিবার প্রচেষ্টা দেখা গিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে আজ পর্যন্ত রাম-কথার তাই এত অজস্রতা। এই বিভিন্নমুখী রাম-কথার ধারা আদিকবির কাব্যকে মুখ্যতঃ অবলম্বন করিলেও প্রত্যেক সমাজ ও যুগের ছাপ সেই সেই কাব্যকে করিয়াছে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। রাম-কথার এই ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়াই ভারতবর্ষের সমাজমানসের ধারাও বিভিন্নখাতে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। বাল্মীকির রামায়ণে যেমন খ্রীষ্টপূর্ব যুগের আর্য সংস্কৃতির প্রভাব বর্তমান, কম্বোরামায়ণে তেমনি খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীর তামিল কৃষ্টি প্রচারিত। তুলসী রামায়ণে যেমন পাই খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের উত্তর ভারতের আদর্শ, কৃত্তিবাসী রামায়ণেও তেমনি দেখা যায় খ্রীষ্টীয় পঞ্চাদশ শতাব্দীর গ্রাম বাংলার সমাজ-জীবনের অনুপ্রবেশ।

এইহেতু বাংলা রামায়ণে মূল রামায়ণের বিস্তার কিংবা সমাজনীতির মূলানুগ অনুসরণ পাওয়া যায় না। লঙ্কার রাজপ্রাসাদ 'বন্দোঘরের চাল', চিত্রকূট পর্বত বাংলার প্রান্তর এবং কল্লোলিত সমুদ্র বাংলারই নদী-খাল-বিল-জলাশয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে। কাজেই কোনও কবির পক্ষে সমকালীন দেশ-কাল, আচার-ব্যবহারকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হওয়া একেবারে অসম্ভব, তাই কবিচন্দ্রের 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ'-এও বাংলা তথা মল্লভূম

অঞ্চলের মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রার ক্ষীণ রেখাচিত্রের সন্ধান মেলে। ইহা কবির বাস্তবানুভূতিরই পরিচায়ক। কয়েকটি চিত্রধর্মী আলেখ্য এই জাতীয় দৈনন্দিন বাস্তবজীবনের স্বাদে ভরপুর।

চিত্রধর্মী রচনা :—

চরম দরিদ্রতার চিত্রও কবি আঁকিয়াছেন। রাজরাণীর দীনতম বেশ কিরূপ হইতে পারে হরিশ্চন্দ্রের মহিষীর দাসীত্বলাভে তাহাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। অর্ধেক ধান্য মিশ্রিত একসের চাউলের সঙ্গে শাক-পাতা সহযোগে রাণীর প্রতিদিনের আহার জোটে। রাজশিশুর আহারের নিমিত্ত খুদকুঁড়া সংগ্রহকালে বাঙালীর উপাদেয় খাদ্য ক্ষীর সহযোগে পিঠার কথাই স্মৃতিতে ভাসিয়া ওঠে। ক্ষীর সহযোগে পিঠার উল্লেখ হরিশ্চন্দ্রের কোনোও পুরাণ কাহিনীতেই পাওয়া যায় না। ঢেঁকিশালে রাণী পুত্রসহ লক্ষ লক্ষ মশা ও পিপীলিকার দংশনের মধ্যে নিশি যাপন করেন। রাণীর পরিধেয় বস্ত্র এতই ছোট যে, প্রয়োজনবোধে তিনি শিশুকে বস্ত্রাঞ্চলে আচ্ছাদন করিতে পারেন না।

দরিদ্রতার আর এক জীবন্ত চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে সূর্যবংশ কথায়। পুত্রকে যজ্ঞে আহূতি দেওয়া হইবে জানিয়াও দরিদ্র ব্রাহ্মণ ক্ষুধার তাড়নায় অষ্টমবর্ষীয় বালককে বিক্রয় করিতে দ্বিরুক্তি করেন নাই। ভিক্ষা দিতে অনিচ্ছুক গৃহস্থের মনোভাবের কথাও কবি বলিয়াছেন—

"কঠিন পশ্চিমের লোক দাণ্ডায়া থাকি নাছে।
দণ্ডচারি গেলে কহে হাথ জোড়া আছে"। (সূর্যবংশ কথা, পু.পৃ. ৬ক)

'কঠিন পশ্চিমের লোক' বলিতে কবি পশ্চিম মল্লভূম না বিহার উত্তর প্রদেশের অধিবাসীর মনোভাবের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন, ঠিক বোঝা যায় না। তবে এইসকল ('নাছে' অর্থাৎ খিড়কি বা সদর দরজায়) দণ্ডায়মান গৃহস্থ মানুষেরা দণ্ডচারি পরে যেভাবে প্রতীক্ষারত ভিখারীকে 'মাপ কর' বলিয়া ভিক্ষা দিতে অস্বীকার করেন, তাহাতে প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতার বর্ণনা পাওয়া যায়। ভিক্ষার অন্নে নিত্য উদর পূরণ হয় না, এইরূপ অবস্থায় নিঃসহায় ব্রাহ্মণ উপায়ান্তর না দেখিয়া পত্নী ও তিন পুত্রসহ গোবিন্দের নিকট ধর্ণা দিতে থাকেন। ক্ষুধার বহ্নিজ্বালায় কাতর তিন পুত্রের শোচনীয় পরিণামের কথা চিন্তা করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ অবশেষে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে অম্বরীষ রাজার যজ্ঞে মধ্যম পুত্রকে প্রদানে সম্মত হন। রাজ-প্রার্থনাকে ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ "গোবিন্দের ভার" হইয়াছে মনে করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন। জঠরাগ্নির জ্বালায় পুত্র বিক্রয়ের এইরূপ চিত্র সংবাদপত্রের মারফৎ এখনও মাঝে মাঝে আমাদের শ্রুতিগোচর হয়।

তব পিতা ভিক্ষায় না যায় বাছাধন।
সম্বল মর‍্যাছে বাছা ভজ নারায়ণ ॥

অতঃপর অরে বাছা খাব খাব তেজ ।
পরব্রহ্ম পরাৎপর পরমানন্দ ভজ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ.৬)

'বাছাধন' বাঙালী-মায়ের স্নেহসূচক সম্বোধন। কবি আর একটি নিষ্করুণ চিত্রের অবতারণা করিয়াছেন শ্মশানে ডোমরূপী রাজা হরিশ্চন্দ্রের ব্যবহারে । একদিকে হিন্দুসংস্কারের কঠোরতা অপরদিকে অসহায় মানুষের প্রতি নির্মম অত্যাচার, কাহিনীটির মধ্যে সুপরিস্ফুট । রাজা হরিশ্চন্দ্র স্ত্রী ও পুত্রকে এক সওদাগরের গৃহে বন্ধক রাখিয়া নিজে কৌশিক মুনির দক্ষিণাদানের নিমিত্ত শ্মশানে ডোমবৃত্তি অবলম্বন করেন । সেখানে দীর্ঘদিন ডোমের কাজে নিযুক্ত থাকায় এবং ডোমদের সহবাসে স্ত্রী-পুত্র বিস্মৃত রাজার অন্তরের সকল সুকুমার বৃত্তির অবলুপ্তি ঘটে । সর্পদংশনে পুত্র রোহিতের মৃত্যু ঘটিলে রাণী মৃত পুত্রকে কোলে করিয়া উক্ত শ্মশানে উপস্থিত হন । ডোমরূপী হরিশ্চন্দ্র তখন রাণীর নিকট মৃতের সৎকারের নিমিত্ত প্রাপ্য রাজকর দেড়বুড়ি আদায় করিতে যান । কপর্দকহীন রাণী রাজকর দিতে না পারায় পুত্র সঙ্গে অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করিবেন বলিয়া জানান । উত্তরে হরিশ্চন্দ্র বলেন, "স্বামী ছাড়া নারী কোথা পুত্র সঙ্গে মরে"। এইরূপ উক্তি সতীদাহের স্মৃতিই বহন করে । আর রাণীর ঐরূপ অভিপ্রায়কে হরিশ্চন্দ্র নীচ নারীর ফাঁকি দিয়া পালাইবার পথ বলিয়া মনে করেন । অতঃপর রাণী পুত্রসঙ্গে জাহ্নবীর জলে ঝাঁপ দিয়া মরিতে চাহিলে হরিশ্চন্দ্র রাণীকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া দেন । নিরুপায় রাণী তখন রোদন করিতে থাকেন । ইহাও যেন গ্রামবাংলার সমাজজীবনেরই এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি । দরিদ্র অসহায় নারীর উপর নিগ্রহ এ যুগের মত সে যুগেও ঘটিত ।

নারী হআ একা এস বুকে নাই ড়র ।
ডাকাবুকা মাগী ইহার অতি দূরে ঘর ॥
যুবতী হইআ আইস লআ মৃত তোক ।
আরে মাগী ঘরে তোর কেহ নাই লোক ॥
কান্দিয়া আকুল রাণী বপু কাঁপে ত্রাসে।
দ্বিজ কবিচন্দ্র গান ভূপতি জিজ্ঞাসে ॥

(হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান, পু.পৃ. ৮-৯ক)

বসন-ভূষণের নাম :—

বসন- ভূষণের মধ্যেও বাংলার পরিচিত অঙ্গাভরণের নাম পাওয়া যায় । হরিশ্চন্দ্রের মহিষীর গহনার মধ্যে প্রবাল-মুকুতার হার, টাড়বালা, কুণ্ডল ও কণ্ঠমালার উল্লেখ দেখা যায়। পরে অবশ্য কর্ণপুর এবং কনকের চুড়ির কথাও বলিয়াছেন :

প্রবাল মুকুতা হার লয় টারবালা ।
কুণ্ডল কাড়িআ নিল আর কন্ঠমালা ॥

(হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান, পু.পৃ. ৩ক)

আবার সীতাদেবীর অলঙ্কারের মধ্যে কবি অনুরূপ অঙ্গাভরণের উল্লেখ করিয়াছেন :

পদক প্রবালবালা হার হীরা কন্ঠমালা
খসাইল কানের কুণ্ডল ।

(রঘুনাথের বনবাস, পু.পৃ. ১৪ক)

রামচন্দ্রের ভূষণাদির মধ্যেও অনুরূপ অলঙ্কারের বর্ণনা আছে :

প্রবাল পুরটহার পদক ভূষণ ।
গলে গজমোতি-হীরা জড়িত কাঞ্চন । (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ২)

এখানেও সেই প্রবাল-পুরটহার, পদক এবং গজমোতি-হীরার মালা এই সুপরিচিত কয়েকটি ভূষণের উল্লেখ ভিন্ন কবি অন্য কোনও অলঙ্কারের উল্লেখ করেন নাই ।

বিমাতা কৈকেয়ীর নির্দেশমত বনবাসকালে সীতাদেবী অলঙ্কার ও পাটের শাড়ী পরিত্যাগপূর্বক গাছের বাকল পরিধান করেন । পাটের শাড়ী বাংলার বহুকালের বস্ত্রবয়ন শিল্পেব এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন । বঙ্গের কবির কাব্যে পাটের শাড়ীর উল্লেখ বঙ্গসংস্কৃতির ঐতিহ্যের পরিচয়বাহী ।

নানা অলঙ্কার ছাড়ি তেজিয়া পাটের শাড়ী
গাছের বাকল লৈয়া পর ॥

(রঘুনাথের বনবাস, পু.পৃ. ১৪)

রাজা হরিশ্চন্দ্রের মহিষীর পরিধানেও পাটের শাড়ীর উল্লেখ পাওয়া যায় ।

পরাল্য খুআর বাস নিল পাটশাড়ী ।
হাথে হইতে কাড়ি লইল কনকের চুড়ি ॥

(হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান, পু.পৃ. ৩ক)

বঙ্গে প্রচলিত মোটা বুননের ছোট কাপড়ের নাম 'খুঞা' । কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গলে' পাওয়া যায় "শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঁয়ার বসন ।।" সাধারণতঃ নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের স্ত্রীলোকেরা ইহা পরিধান করিত ।

খাদ্যদ্রব্যের বিস্তারিত তালিকার নিদর্শন না থাকিলেও ক্ষীর ও পিঠার উল্লেখ আছে । রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলে রাণী কৌশল্যা মিষ্টান্ন ও পাকান্ন সহযোগে বনাগত পুত্রদের ভক্ষণ করাইয়াছিলেন।

নিয়ম :-

কাব্যের মধ্যে কয়েকটি সামাজিক নিয়মের উল্লেখ আছে, যেমন :-

পানদান করার নিয়ম । সামাজিক কোনও কাজকর্মে বঙ্গদেশে এই রীতিটি প্রচলিত।

পান দিআ মহারাজা নিশা কৈল বড়ি ।
মড়া প্রতি পঞ্চাশ কাহন কৈল কড়ি ॥

(হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান, পু.পৃ. ৪)

মৃতদেহ সৎকারের নিমিত্ত পঞ্চাশ টাকা (কাহন) ধার্য হইলেও ডোমের পারিশ্রমিক মাত্র দেড়-বুড়ি নির্দিষ্ট ছিল :

আর দেড় বুড়ি নিবে আপন মাগন ।
ঘাট জোগাইয়া থাক করিআ সাধন । (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৪)

দাঁতে তৃণ দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করার বিশেষ ভঙ্গীটির উল্লেখ পাওয়া যায় অঙ্গদের কথায় । অঙ্গদ রাবণকে পূর্বের শোচনীয় পরাজয়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলে —

কার্তবীর্যার্জুন তোরে তৃণ করাল্য দাঁতে ।
তার দর্প চূর্ণ হইল পরশুরামের হাতে ॥

(অঙ্গদ রায়বার, পু.পৃ. ৬ক)

দাঁতে তৃণ করিবার আরও উদাহরণ আছে । রাজা দশরথ রামচন্দ্রের জন্য রাণী কৈকেয়ীর নিকট দন্তে তৃণ দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন ।

ধর্ম পথ রাণী দেখ দেশে রামচন্দ্রে রাখ
দন্তে তৃণ দুটি পদ ধরি ।

(রঘুনাথের বনবাস, পু.পৃ. ৭ক)

ভরত রামচন্দ্রকে বনবাস হইতে ফিরাইয়া লইবার সময় দন্তে তৃণ ধারণের প্রচেষ্টা করেন ।

এত বলি তৃণ আনে কানন হইতে ।
আসন করিয়া বৈসে রামের সাক্ষাতে ॥

(ভরতের পিতৃশ্রাদ্ধ, পু.পৃ.৪)

সামাজিক সংস্কারবোধ :—

সামাজিক পাপবোধ সম্পর্কে কবির ঘৃণা ফুটিয়া উঠিয়াছে কয়েকটি ছত্রে । তাহার মধ্যে 'নারীবধ' অন্যতম ।

পাছে নারী বধ হয় হবে মহাপাপ।
মারিতে না পান রাম করেন মনস্তাপ ॥ (শিবরামের যুদ্ধ, পু.পৃ. ৯)

ভরত বনবাস হইতে রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিবারকালে কতকগুলি সামাজিক সংস্কার ও পাপবোধের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তন্মধ্যে বহুপুত্রের পিতা হওয়া যে এক প্রকার অভিশাপ তাহা আধুনিককালের মতের সঙ্গেও মেলে :

শতধেনু শত বিপ্র নিজ হাথে বধে।
স্বপনে জানিলে মোর এত দুঃখ ঘটে ॥
মাতৃহরণ সুরাপান হরে গুরুপত্নী।
এত পাপ হয় যদি ভালমন্দ জানি ॥
কলির ব্রাহ্মণ হই কলির নৃপতি।
বহু পুত্রের পিতা হই কিছু জানি যদি ॥
যুক্তি কর্যা থাকি যদি জননীর সনে।
শপতি করিয়া ছুঞি তোমার চরণে॥

(ভরতের পিতৃশ্রাদ্ধ, পু.পৃ. ৪ক-৪)

মাতার সঙ্গে ভরত যে কোনওরূপ ষড়যন্ত্রের মধ্যে লিপ্ত ছিলেন না, তাহা বোঝাইবার জন্য রামচন্দ্রের নিকট এই সকল পাপের দায়ভাগী হইবেন বলিয়া তিনি দিব্য করিয়াছেন। তন্মধ্যে দ্বিজ এবং গাভী হত্যা, মাতা এবং গুরুপত্নী হরণ, সুরাপান এবং কলির ব্রাহ্মণ ও কলির নৃপতি হওয়ার মতই দুর্ভাগ্যজনক বহু পুত্রের পিতা হওয়া। পাপবোধের ধারণার মধ্যে কবির খুবসম্ভব মাতৃঘাতীর প্রতি ঘৃণা বেশী পরিমাণে ছিল। কেননা ভরত একবার বলিয়াছেন — "মাতৃঘাতী হইলে রাম না ছুঞিব মোরে"।

কবির খুবসম্ভব আইন সংক্রান্ত বিষয়ের ধারণা ভাল ছিল। সাক্ষ্যদানকালে নব, সপ্ত, পঞ্চ অর্থাৎ নয়, সাত কিংবা পাঁচজনের সাক্ষ্যদান বিধেয়। তবে সুশীল তিনজন অথবা একজনের সাক্ষ্য দ্বারা যদি প্রমাণ না পাওয়া যায় তবে কি করা বিধেয় ?
ইহার উত্তরে লক্ষ্মণ বলিতেছেন মান্যজনের একার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। শতোর্দ্ধজনের সাক্ষ্যও ভ্রান্তিকর হইতে পারে —

শত সাক্ষী শতোর্দ্ধ অন্যথা যদি হয়।
যারে মানি সেই সাক্ষী শুন দয়াময়॥
বিচারের বাড়া নাঞি লক্ষ্মণবীর কয়।
বিচারের কালে হয় ধর্ম্মের উদয় ॥ ('গয়াশ্রাদ্ধ' পালা, পু.পৃ. ৬ক)

রাজনীতি ও বাঙ্গালীয়ানা :-

(ক) কুম্ভকর্ণের বাক্যে রাজনীতির আভাস আছে। রাবণ কর্তৃক যুদ্ধযাত্রায় আদিষ্ট কুম্ভকর্ণ অগ্রজকে কর্তব্যাকর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করিয়াছেন। কেননা কখন যুদ্ধযাত্রা

করা ও কখন সন্ধি করা কর্তব্য তাহা তিনি ভাল জানিতেন। যে রাজা উচিত সময়ে কার্য সাধন করে না, তাহার রাজত্ব অচিরেই বিনষ্ট হয় :

কুম্ভকর্ণ বলে হেদে শুনরে অধম।
রামরূপে চুপে চুপে তোরে আল্য যম ॥
হিত বুঝাইতে লাথি বিভীষণকে মালি ।
হাথে লক্ষ্মী পায়ে ঠেল্যা অধঃপাতে গেলি ॥
তবু না বুঝিলি অরে পর নারী চোরা ।
দুরাচার করি তুঞি পাপে দিলি ভরা ॥
রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট শাস্ত্রে হেন লেখে ।
চক্ষু থাকিতে তবে চক্ষে নাঞি দেখে ॥

(রাবণ কুম্ভকর্ণ সংবাদ, পু.পৃ. ৬-৭ক)

(খ) 'হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা', 'চক্ষু থাকিতে চক্ষে না দেখা' বাংলারই প্রচলিত প্রবাদ । এইরূপ আরও কিছু প্রবাদ কবি বহু ব্যবহার করিয়াছেন । 'অঙ্গদ রায়বার' কিংবা 'শিবরামের যুদ্ধ' পালায় যে সকল উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং বাক্‌ভঙ্গী ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বাংলার লোকজীবন হইতে গৃহীত । সমাজচিত্র ছাড়াও বেশ কিছু বাক্যরীতিতে বাঙালীয়ানা ষোল আনা ফুটিয়া উঠিয়াছে ; যথা :-

১. 'পোড়াঘায়ে নুনের ছিট্যা কেন দেহ মোরে'।
২. 'নখে ছিদ্র হইলে কুঠারে কিবা কাজ'।
৩. 'তক্ষকে দংশিলে যেন কি করে ঔষধে'।
৪. 'বাঙন হঞিঞা হাত বাড়াইলি চাঁদে'।
৫. "রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পায় ।
গৃহিণীর পাপে গার্হস্থ নষ্ট লক্ষ্মী উড়্যা জায়" ॥
৬. "শিষ্যের পাপে গুরু নষ্ট নারীর পাপে পতি ।
তোর পাপে মজিল রাজা লঙ্কার বসতি "॥
৭. 'উল্টা চোরা গিরি বান্ধে সেই হৈল বটে'॥
৮. 'সাগর তরিয়া নৌকা সুখানে ডুবিল'।
৯. 'বুক বাহিয়া পড়ে যেন মন্দাকিনীর পারা'॥
১০. 'সর্প হয়্যা দর্প কর গরুড়ের কাছে'।
১১. 'কোলাকুলি দুইজনে দুইজনে প্রণাম'॥
১২. 'মণ্ডুক পালায় যেন দেখিঞা তক্ষক'।

১৩. 'ঘৃত পাছে দাবানল অধিক উথুলে ।

১৪. 'কেতকী কুসুম যেন ফুটে ভাদ্রমাসে'।

১৫. 'শ্রাবণ মাসের ধারা পড়ে ভূমিতলে'।

১৬. 'বৃক্ষ যেন পীড়া পায় হয়্যা বজ্রাহত'।

১৭. 'অবনী লোটায় যেন ছিন্ন কদলী'।

১৮. 'দশরথ তা দেখিয়া জিয়স্তেয় মরা'।

১৯. 'পড়িল কদলী যেন বৈশাখের ঝড়ে'।

২০. 'মিছা ঝকঝকিতে কাজ নাঞিক দেশ্কে চল্যা যাই'।

২১. 'আপনি কুড়ারি মাল্যি আপনার পায়।
অহঙ্কার ভাবেতে ডিঙ্গা ডুবালি দরায়'।।

২২. 'আপনার বুদ্ধে খাইলে আপনার মাথা'।

২৩. 'আমি যুদ্ধ কর্যা মরি তোদের বাপের কিবা জায়'।

২৪. 'আপনার ছিদ্র তাক্যা পরকে দেস খোঁটা'।

২৫. 'যেন তপ্ত তৈলে দিলে অধিক উথুলে'।

২৬. 'গলাগলি কোলাকুলি করি দুইজনে' ।

২৭. 'ননীর পুতলি আমার রাজীবলোচন'।

২৮. 'নারীর বোলে কৈল এমন দুষ্কৃতি' ।

২৯. 'নফর হইতে নাকি ঠাকুরান হয়' ।

৩০. 'শ্রীমুখে করহ আজ্ঞা ক্ষেম কৈল্য বলি'।

৩১. 'হাকুপাকু করি হনূ করে হায় হায'।

৩২. 'রা-কাড়িতে নাহি পারে পবননন্দন'।

৩৩. 'সকল বানর মুখপোড়া হইল আজি হইতে'।

৩৪. 'আমার সঙ্গে দেখা তোর বাম হৈল বিধি'।

৩৫. 'মরকটের বেশে রঙ্গ দেখেন তখন'।

৩৬. 'পানির পসরা যেন বরিষে গগনে'।

এইধরনের কিছু সংলাপ বিভিন্ন পালায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়ান আছে, যাহার মধ্যে বাংলার নিজস্ব বাক্‌ভঙ্গীর সন্ধান মেলে ।

(গ) বাপধন, প্রাণধন, বাছাধন, বাপু, বাছা ইত্যাদি শব্দ বাংলার কথ্যভাষার নিত্যসঙ্গী । এইরূপ শব্দের প্রয়োগ বহু পাওয়া যায় ; যেমন —

১. সীতার উদ্দেশ করয়া দেহ প্রাণধনে । (সীতাহরণ পালা, পু.পৃ. ৮ক)

২. অতএব লক্ষ্মণ মূর্খ শুন বাপধন। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ.৯ক)
৩. অঞ্জনা বলেন বাছা শুনহ বচন। (প্রাগুক্ত, ”)
৪. তুমি নাহি জান বাপু এসব কারণ। (” ”)

(ঘ) বঙ্গনারীর গলায় বস্ত্রাঞ্চল দিয়া গুরুজনকে প্রণাম করার রীতি বঙ্গদেশে কিছুকাল পূর্বেও প্রচলিত ছিল। সীতাদেবী বনবাসে একবার দশরথের প্রেতাত্মা দর্শন করিয়া গলায় বসন দিয়া প্রণাম করেন।

শ্বশুরে দেখিয়া সীতা উঠিয়া দাণ্ডায়।
প্রণাম করিল্যা সীতা শ্বশুরের পায়॥
গলায় বসন দিয়্যা জোড় করি হাত।
এস্য এস্য বস্য বস্য অযোধ্যার নাথ॥

(গয়াশ্রাদ্ধ পালা, পু.পৃ. ২ক)

(ঙ) প্রেতাত্মা সম্পর্কে সাধারণ বাঙালী সমাজে যে ভয়ভীতি প্রচলিত আছে কবি তাহাও সুন্দরভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

ভয়ে ভীত হয়্যা সীতা করেন ক্রন্দন।
স্বর্গ ছাড়ি মহারাজা কোথায় গমন॥
পরলোক প্রাপ্তি রাজা হয়্যাছে তোমার।
তোমাকে দেখিয়া ভয় জন্মিল আমার॥
রাজা কয় নাঞি ভয় শুন মাতাসীতা।
নঞান জুড়াক মোর রামচন্দ্র কোথা॥

(প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ২ক-২)

ইহার মধ্যে একদিকে যেমন অবলা নারীর পরলোক সম্পর্কে বিশ্বাসবোধ আছে তেমনি পুত্রবধূকে 'মাতা' সম্বোধন করার বাঙালীয়ানার সুন্দর দৃষ্টান্তটিও সুপ্রকট। কবিচন্দ্র নিজেও বাঙালী সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন। সীতাদেবী দশরথকে বালির পিণ্ডদানকালে যে পাঁচজন সাক্ষী রাখিয়াছিলেন তাহারা বাঙালী সংস্কার দ্বারা স্ব স্ব শ্রেণীতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত। তুলসী প্রতি গৃহে অতি পবিত্র বস্তু, কাক পক্ষীকুলে জ্ঞানবান, বটবৃক্ষ ধীর-নম্র-স্বভাবের জন্য পূজিত, আর নদী, বাঙালী মাত্রেরই আদরের সামগ্রী এবং ব্রাহ্মণ সকলের কাছে সম্মানিত ব্যক্তি; ইহাদের উল্লেখ কবি পুরাণ প্রসঙ্গ হইতে গ্রহণ করেন নাই, সম্পূর্ণ নিজস্ব ধ্যানধারণা দ্বারা এই নামগুলি নির্বাচন করিয়াছেন। অথচ একমাত্র বটবৃক্ষ ব্যতীত সকলেই মিথ্যা সাক্ষ্যদান করে। আর এই মিথ্যাকথা বলা যে কত বড় অধর্ম, তাহার ফল ইহারা অচিরেই লাভ করে।

(চ) কবিচন্দ্রের অমঙ্গল ও অশুভ ধারণাগুলি বঙ্গদেশীয় সংস্কার হইতে উদ্ভূত। যাত্রাকালে অশ্রুমোচন, মস্তকোপরি শকুনি গৃধিনী উড়া এবং উল্কাপাত হওয়া এইজাতীয় :

যাত্রাকালে দেখে রাজা বড় অমঙ্গল।
শকুনি গৃধিনী উড়ে মাথার উপর ।। (সীতার পরীক্ষা, পু.পৃ.১)

(ছ) সাধারণতঃ ব্রাহ্মণকে দান করার রীতি ভারতবর্ষের সর্ব সমাজেই প্রচলিত। কবিচন্দ্র নিজেও জাতিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। তিনি মল্লরাজাদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট দান গ্রহণ করিয়াছেন, সে কথার উল্লেখ কবির 'মহাভারত' কাব্যেও পাওয়া যায়। যে কারণেই হউক, ব্রাহ্মণকে দান-কর্ম কবির অন্তরে খুব সম্ভব গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। কেননা বনবাসকালে রামচন্দ্র একস্থলে লক্ষ্মণকে বলিয়াছেন যেদিন তিনি ব্রাহ্মণকে দান না দেন, সেইদিন তিনজনকে অন্নবিহীন অবস্থায় ক্ষুধায় কাটাইতে হয়। অতএব দুর্ভোগের হাত হইতে পরিত্রাণের আশায় পরের দিনই তিনি ব্রাহ্মণভোজনের আয়োজন করেন। এই পুণ্য-কর্মের সঙ্গে বিজড়িত মল্লরাজাদের অবাধ দানধ্যানের স্মৃতিটি কবিমনে হয়তো কাজ করিয়া থাকিবে :

মোরা তিনজনে কেন অন্ন নাঞি পাই।
ইহার উপায় বল শুন প্রাণের ভাই ।।
ব্রাহ্মণে না দান আমি দিয়ে যেই দিন।
অতএব তিনজনে অন্নেতে বিহীন ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ.৭)

ব্রাহ্মণের প্রতি কবির শ্রদ্ধাবোধের দৃষ্টান্ত আরও কয়েকটি স্থলে পাওয়া যায়। তবে 'কলির ব্রাহ্মণ' হওয়া যে একপ্রকার দুরাচারের ফল, ভরতের মুখে কবিচন্দ্র তাহাও একবার জানাইয়াছেন।

(জ) বাঙালীয়ানার আর একটি বিশেষ দিক আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে গৃহের কুশল জিজ্ঞাসা করা। বশিষ্ঠমুনি বনবাসে রামচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে গৃহের সকলের মুমূর্ষু পিতার এবং প্রজাবর্গের কুশল প্রশ্ন করার মধ্যে এইরূপ গৃহাভিমুখী বাঙালী জাতির স্বভাব-ধর্মের ছাপটি সুস্পষ্ট।

কহ মুনি কি নিমিত্ত আইলা এথারে।
বাড়ীর মঙ্গল কহ বিবরিয়া মোরে ।।
কেমনে আছেন প্রজা অযোধ্যানগরে।
কেমনে আছেন পিতা কহ দেখি মোরে ।।
আসিবার কালে পিতা কি বোল বলিল।
নিশ্চয় করিয়া মুনি সমাচার বল ।।

(ভরতের পিতৃশ্রাদ্ধ, পু.পৃ. ৪ক)

(ঝ) এইরূপ সর্বাগ্রে গৃহের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ বাঙালী জাতির মজ্জাগত স্বভাব। ইহা ব্যতীত গুরুজনেব পদস্পর্শ করিয়া চরণধূলা গ্রহণের রীতিটিও বাঙালীদের নিজস্ব। সেই সঙ্গে স্নেহভাজনের চিবুক স্পর্শ করিয়া আদর করার ও কোলদানের রীতিটিও বহু পরিচিত; যথা:-

লোটায়্যা পড়িল রাম মায়ের চরণে।
কৌশল্যা করিয়া কোলে করেন চুম্বনে॥
শোকেতে আকুল রাণী অস্থিচর্মসারা।
মায়েরে দেখিয়া রামের বহে অশ্রুধারা॥
সুমিত্রাকে প্রণাম করিলা রঘুমণি।
কোলে করি চুম্বন করেন রাজরাণী॥
বশিষ্ঠে দেখিয়া রাম প্রণাম করিল।
বেদপাঠ করি মুনি আশীর্বাদ কৈল॥
জানকী লক্ষ্মণ পুনঃ আসি দুইজনে।
একে একে প্রণমিল সভার চরণে॥
গোহা আসি রাঘবের চরণ বন্দিল।
কোলে করি রামচন্দ্র আলিঙ্গন দিল॥
সুমন্ত্র সারথি আসি প্রণমে রামেরে।
হরিষে আশিষ রাম করিল তাহারে॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৩-৪ক)

(ঞ) বাঙালী ঘরের শাশুড়ী-পুত্রবধূর সম্পর্ক যে খুব প্রীতিপ্রদ নয় তাহার আভাস পাই তারার উক্তিতে। বালীর মৃত্যুর পর তারা সহমৃতা হইতে চাহেন, কেননা পতিহীনা নারীর কপালে পরবর্তীকালে পুত্রবধূর গঞ্জনাভোগই ঘটে, তাহা হইতে রক্ষা পাইতে সহমরণই শ্রেষ্ঠ পথ।

হনূমানে শোকাবেশে কহে রাণী তারা।
পতিবিনে দেহ মিছা জিয়ন্তয়ে মরা॥
পতি সঙ্গে পরকালে জে নারী না যায়।
পুত্রবধূ থাকিতে অনেক দুঃখ পায়॥
(রাম সুগ্রীব মিলন পালা, পু.পৃ.৭)

কবিচন্দ্র নারী-মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে একেবারে যে অনভিজ্ঞ ছিলেন না তারার উক্তিটিই তাহার প্রমাণ।

(ট) রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার হইলেও তাঁহার পার্শ্বচর হনূমানকে বাঙালী-কবিকুল কখনই উত্তর ভারতের মত শ্রদ্ধাব আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। তাই তাহাকে লইয়া যত গালগল্পের

অবতারণা বঙ্গসমাজে প্রচলিত। বঙ্গদেশে হনূমান বনের পশু মাত্র। তাহার সম্পর্কে ভোজনপ্রিয়তার এবং মুখপোড়া হওয়ার দুইটি কাহিনী সর্বজন পরিচিত। এই দুইটি কাহিনীই তাহার প্রতি সমাজের অবজ্ঞা মিশ্রিত তাচ্ছিল্যবোধ হইতে সৃষ্ট। তবে হনূমান বীর ভক্ত এইরূপ চিন্তাও প্রচ্ছন্নভাবে সমাজ-মানসে কাজ করিয়াছিল। নচেৎ রাবণের স্বর্ণলঙ্কা সে কিরূপে প্রজ্বলিত করিয়াছিল ? ভোজনরসিক বাঙালীর নিকট আম্র অতি সুস্বাদু ফল। অশোকবনে সীতাদেবী কর্তৃক প্রদত্ত আম্র ভক্ষণ করিয়া হনূমান একে একে লক্ষ্মণ ও রামচন্দ্রের আম্র ভক্ষণ করিতে গিয়া বিপদ ঘটায়। রাম-নাম স্মরণ করিয়া সে বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। অবশেষে অশোকবনের বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া আম্র ভক্ষণ করিতে থাকে। রাক্ষসদের সঙ্গে হাতাহাতি মারামারির পর তাহারা হনূর লেজে অগ্নি সংযোগ করিলে সেই অগ্নিতে লঙ্কার বহু গৃহের চাল ভস্মীভূত হয়। বঙ্গের কবিকুল রাবণের স্বর্ণলঙ্কাকে বাংলার চালা ঘর ভিন্ন কখনই 'প্রাসাদ' বা 'ভবন' বলিয়া কল্পনা করেন নাই। দ্রাবিড় সভ্যতা সম্পর্কে অনভিজ্ঞতাই ইহার হেতু কিনা বলা যায় না।[১৮]

লেজে অগ্নি দেখে হনূ ভাবে মনে মনে।
লাফ দিয়া পড়ে হনূ রাবণ ভবনে ॥
রাম রাম করি চালে লাফিয়া বেড়ায়।
প্রলয় দেখিয়া রাবণ করে হায় হায়।

(সীতার উদ্দেশ পালা, পু.পৃ. ৮)

হনূমান লঙ্কা দহনের নিমিত্ত যেভাবে রাবণের গৃহের চালে লাফিয়া বেড়ায় তাহাতে কৃত্তিবাসের লেখনীর মুখে স্বর্ণলঙ্কা যেমন ফুলিয়া গ্রামে, কবিচন্দ্রের কাব্যেও স্বর্ণলঙ্কা তেমনি পানুয়াগ্রামে পরিণত হইয়াছে।

(ঠ) কবিচন্দ্র তিনটি ক্ষুদ্র কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন, যথা- মাছরাঙ্গার কাহিনী, কৃষাণের কাহিনী এবং হনূমান অঞ্জনার প্রসঙ্গ। বলা বাহুল্য, এই কাহিনীগুলির মধ্যে সমাজের সর্বশ্রেণীর প্রতি দয়া ও মমত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়। কবিচন্দ্রের ভাষায় ও বর্ণনাভঙ্গীতে সর্বত্র একটা রুচিশীল মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায়। 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াৎ যাতি পাত্রতাম্'— রামায়ণের এই সুপরিচিত শ্লোকটি সম্পর্কে কবিচন্দ্র যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান ছিলেন। বাল্মীকি যে রামচন্দ্রের চরিত্রকে সর্বক্ষেত্রে অপূর্ব মহানুভব করিয়া তুলিয়াছিলেন, কবিচন্দ্রও সেই নরচন্দ্রমাকে বিনয়শীল পুরুষরতন রূপে চিত্রিত করিয়াছে। সর্বজীবে ক্ষমা সামাজিক অনুশাসনেরই ফল। উক্ত কাহিনীগুলির মধ্যে অন্যায় আচরণকারীর প্রতিও রামচন্দ্রের ক্ষমাশীল বিনয়াবনত ভাবটিকেই কবিচন্দ্র উদ্ঘাটিত করিতে চাহিয়াছেন।

মাছরাঙ্গা কাহিনীটিতে দেখা যায় যে, সীতা অন্বেষণে বহির্গত হইয়া দুই ভ্রাতা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে রামচন্দ্র অনুজ-লক্ষ্মণকে জল অন্বেষণ করিয়া আনিতে বলেন। লক্ষ্মণ সরোবরের সন্ধান পাইয়া কচুপাতায় করিয়া জল তুলিয়া আনিতে গেলে হঠাৎ এক মাছরাঙ্গাপাখী চঞ্চুদ্বারা ঠোকরাইয়া কচুপাতাটি ছিঁড়িয়া ফেলে। ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ জলসমেত ঐ মাছরাঙ্গাকেও ধরিয়া রামচন্দ্রের নিকট হাজির করেন। উহাকে কিরূপ শাস্তি দিতে হইবে লক্ষ্মণ তাহা জানিতে চাহিলে রামচন্দ্র তাহাকে মুক্ত করিয়া দিতে বলেন।

শ্রীরাম বলেন ভাই শুনহ লক্ষ্মণ।
ছাড়্যা দেহ্ পক্ষগোটা পাক জীবন।।
উহার নাহিক দোষ কপালে লিখ্যন।
কহে দ্বিজ কবিচন্দ্র সরস বচন ।। (সীতাহরণ পালা, পু.পৃ.৭)

দ্বিতীয় কাহিনীটি এক কৃষাণের। কৃষাণের গাত্র চর্মাবৃত এবং মাথায় অগ্নির খোলা প্রজ্বলিত। এইরূপ অদ্ভুত বেশ দর্শনে রামচন্দ্র ইহার কারণ জিজ্ঞাসা কবিলে সমুদ্র সন্নিকটবাসী কৃষাণ জানায় গাত্রে ভুজঙ্গের দংশন এবং মাথায় পক্ষীগণের উৎপাত হইতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য সে এইরূপ আবরণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। রামচন্দ্র তাহাকে অন্যত্র কোথাও কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকানির্বাহ্ করিতে বলিলে বিপন্ন কৃষাণ সগর্বে তাহার পিতৃ-পুরুষের বাসভূমির মায়া পরিত্যাগ করিবে না বলিয়া জানায়। জন্মভূমির প্রতি এহেন মমত্ববোধ রামচন্দ্রের দৃষ্টি এড়ায় না। এই বিষয়ে লক্ষ্মণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে, রামচন্দ্রের কথাব ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া লক্ষ্মণ আপন মনোগত দুর্বলতা প্রকাশ করিয়া ফেলেন। একদিকে সাধারণ মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, তাহাদের মধ্যে নিহিত মহৎভাবের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা, অপরদিকে ভ্রাতাকে সমুচিত শিক্ষাদানের কৌশলরূপে কাহিনীটি বাস্তবিক মূল্যবান।

শুনিলে ভাই লক্ষ্মণরে কৃষাণের এই কথা।
লক্ষ্মণ বলেন ভাই ক্ষেম সেই কথা।।
মোর মনে অভিলাষ ছিল লঙ্কাপুরী।
তাহার কারণে মোরে শিখাইলে বিবরি।।

(রঘুনাথের দেশাগমন, পু.পৃ. ৩)

তৃতীয় কাহিনীটিতে আছে পুত্র হনূমানের নির্বুদ্ধিতায় ক্ষুব্ধ মাতা-অঞ্জনার অলৌকিক শক্তির প্রকাশ। রামচন্দ্রেব প্রতি গভীর বিশ্বাসবশতঃ যে দুই মহীয়সী নারী আপন পুত্রকে সর্বাংশে রামচন্দ্রের নিকট উৎসর্গ কবিয়াছেন তাঁহাদের নাম লক্ষ্মণ-জননী সুমিত্রা ও হনূমানের মাতা অঞ্জনা। সীতা উদ্ধারের পূর্বে অঞ্জনাদেবী একবাব চাবিজনকে -- রাম, সীতা, এবং লক্ষ্মণ সমেত আপন পুত্রকেও তাঁহাদের স্ব স্ব ভ্রান্তপথ অবলম্বনের

জন্য 'মূর্খ' বলিয়া হনূমানের নিকট সকলকে গালি দিয়াছিলেন। সেই অঞ্জনাদেবী আবার সীতা উদ্ধারের পর হনূমানকে 'কুপুতভূত' বলিয়া গালি দেন। সমুদ্রবন্ধন করিয়া সীতা উদ্ধারজনিত যে দীর্ঘ সময়কাল রামচন্দ্রকে দুঃখ সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহার জন্যই পুত্রের প্রতি মাতার আক্ষেপোক্তি এই কাহিনীটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। হনূমান তো এক নিমেষে সীতাদেবীকে মাথায় করিয়া রামচন্দ্রের নিকট আনিয়া দিতে পারিত, সমুদ্রের জলে লঙ্কাপুরীকে সমূলে বিনাশ করিতে পারিত, অঞ্জনার পুত্র হইয়া হনূমান যে বীরের কর্তব্য-কর্ম করে নাই, এইজন্য তিনি পুত্রের মধ্যে আপন একধারা দুগ্ধের তেজেরও অভাব দেখিয়া তাহাকে ধিক্কার করিয়াছেন। অবশেষে রামচন্দ্রের ঈশ্বরত্বেও তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া রামচন্দ্র অঞ্জনাদেবীকে তাঁহার দুগ্ধের তেজ কতখানি তাহা প্রদর্শনের জন্য আহ্বান করেন। তখন পর্বতের আড়াল ভেদ করিয়া মায়ের এক ঝলক দুগ্ধেই দূরে অবস্থিত হনূমানের উদর পরিপূর্ণ হয়। রামচন্দ্র তাহা দর্শন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন।

সাত পর্বত ছেদি দুগ্ধ পড়িল হনূর মুখে।
পেট ভরি গেল হনূর এক ঝলকে ॥
দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিস্ময় মানিলা।
ধন্য ধন্য করিয়া বহুত প্রশংসিলা ॥

(রঘুনাথের দেশাগমন, পু.পৃ. ৪)

কবিচন্দ্র যে এই কাহিনীটি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কারণ তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন, এক সাধারণ নারী কর্তৃক ভর্ৎসিত হইয়াও রামচন্দ্র যে সংযম ও ক্ষমাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার মূলেও নারী জাতির প্রতি সেই বিনয়পূর্ণ সম্ভ্রমবোধ। বঙ্গসমাজে অলৌকিকশক্তির অধিকারিণী এইরূপ তেজস্বিনী নারী চিরকালই সম্মানার্হ।

চতুর্থ কাহিনীটিতে সীতা উদ্ধারের পর দেশে প্রত্যাবর্তনকালে রামচন্দ্র মিত্র গুহকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। গুহক পুরাতন মিত্রকে পাইয়া বার্তালাপের সময় পরমানন্দে তুচ্ছার্থক ভাষায় সম্বোধন করে। ঐরূপ বাক্যে অগ্রজের অপমান হইতেছে ভাবিয়া রুষ্ট লক্ষ্মণ গুহককে মারিতে গেলে ক্ষমার অবতার রামচন্দ্র মিত্রের মনোভাব বুঝিয়া লক্ষ্মণকে উক্ত কর্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন। কেননা জাতি অনুসারে মানুষের ভাষা উচ্চ অথবা নিম্নমানের হইয়া থাকে। সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি ছত্রের মধ্যে কবিচন্দ্র সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি রামচন্দ্রের সহনশীলতার মনোভাবটি আরেকবার তুলিয়া ধরিয়াছেন। রামচন্দ্রের উক্তি এইরূপ —

জাতি অনুরোধে বলে শুন লাভালাভ।

মিতার দোষ নাই মিতার জাত্যের স্বভাব।।

(রঘুনাথের দেশাগমন, পু.পৃ. ৫ক)

সর্বশ্রেণীর মানুষ লইয়াই রামায়ণের বৃহত্তর সমাজ। এই বৃহত্তর সমাজের পাদপ্রদীপে বিভিন্ন শ্রেণীর ভেদরেখাটি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তাহারা কখনই পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। বিভেদের মধ্যেও মিলনের সুমহান আদর্শটি তুলিয়া ধরিতে পারিয়াছিল বলিয়াই রামায়ণের প্রভাব সকল সমাজে এত গভীর ফলপ্রসূ হইয়াছিল। জনমুখী গভীর আত্মপ্রত্যয়সূচক এই ভাবধারাগুলি রাঢ় অঞ্চলে কবিচন্দ্রই তুলিয়া ধরিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহাতে আর্য-আদর্শ ও বঙ্গ-আদর্শবোধ মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গেলেও ব্রাত্য বঙ্গই শ্রেণীভেদ অথবা জাতিভেদ দূরীকরণে সমগ্র ভারতের আদর্শস্থানীয়। বৈষ্ণবভাবাপন্ন মল্লনৃপতিগণ ব্রাহ্মণকে যেমন সমাদর করিয়াছেন, দরিদ্র নিম্নবর্ণের মানুষকেও তেমনি বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে প্রবেশের অগ্রাধিকার দিয়াছেন। মল্লভূমের ইন্দ্রধ্বজ পূজা, ঝাঁপান উৎসব, শিকারোৎসব এবং রাবণকাটা অনুষ্ঠান এইরূপ বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের মিলনের সার্থক দৃষ্টান্তস্থল।

(ড়) কবিচন্দ্র শিবের সুখদ কাননের যে বর্ণাঢ্য চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহা যতই বস্তুনিষ্ঠ হউক, তাহাতে কৈলাসের চিত্র ফোটে নাই। অধুনা বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর শহরের চতুঃসীমায় শাল, পিয়াল, মহুয়া, পলাশ ও শিরীষ প্রভৃতি বৃক্ষ পরিবেষ্টিত যে বিশাল অরণ্যানীর দৃশ্য পর্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহাতে অনুমান করিতে অসুবিধা হয় না যে, বিগত তিন শতাধিক বৎসর পূর্বে কবিচন্দ্রের সময়কালে এই বনরাজির আকার আরও বিশাল এবং ঘনসন্নিবদ্ধ ছিল। কবিচন্দ্র খুবসম্ভব মল্লভূমের এই উন্মুক্ত বনানীর দৃশ্যই কাব্যে তুলিয়া ধরিয়াছেন। উহার কারণ তাঁহার রচনায় মহাকাব্য বর্ণিত বৃক্ষরাশি কিংবা হিমালয়ের শৈলশিখরে অবস্থিত পাইন, ফার ও সীডার বৃক্ষের সমারোহ নাই। নাই কোনও অভ্রংলিহ গিরিশ্রেণীরও সমাবেশ। অতএব সমতল বাংলার তরুশ্রেণী পরিবেষ্টিত, বাংলার পরিচিত ফুলফলের দ্বারা সুশোভিত, বাংলারই পিককুলের কুহতানে কুহরিত এক সুদৃশ্য কাননের বর্ণনায় কবি পাঠককুলকে করিয়াছেন মুগ্ধ। তরুশ্রেণীর মধ্যে কদলী, গুবাক, নারিকেল, বেল, তাল, জম্বীর, নারাঙ্গা, বাতাবি, আম, জাম, পিয়ারা ও খেজুর ফলবৃক্ষের উল্লেখ আছে। আর আছে লেবু, কামরাঙ্গা, করমচা, কাঁকড়ি, আনারস, পনস ও শশার নাম। বিটপীশ্রেণীর মধ্যে শাল, পিয়াসাল, অশ্বত্থ এবং কদম্বই মুখ্য। উদ্যানের তুলসী এবং জাতি গাছও বাদ পড়ে নাই। বসন্তসমাগমে সমীরণে সঞ্চালিত কুসুমশাখায় কেতকী, কাঞ্চন, কেয়া, পলাশ, করবী, কনকচাঁপা, গোলঞ্চ, মল্লিকা, মাধবী, মালতী, বকুল, ঝাটীবক, মরুদা বা মরুয়া, মন্দার, পারুল, সেযতী, গুলাব বা

গোলাপ, পূর্ণনাগেশ্বর, জবা, নাগকিশোর, নিশিগন্ধা, নীলজবা, শতদল, জাতি, এবং যূথী প্রভৃতি পম্পার তটে বাংলাব পবিচিত পুষ্পের মেলা । আর পক্ষীর বর্ণনায় প্রথমেই আসিয়াছে ময়ূর ময়ূরীর পেখম ধরিয়া নৃত্যের এবং সারিও শুক পক্ষীর গানের কথা । খঞ্জন খঞ্জনীর ঘন ঘন নৃত্য এবং ডাহুক ডাহুকী ও টিয়াপাখীর কলরব মনকে বিভোর করে । সুমধুর ডাক শোনা যায় টেসকোনা, বালিহাঁস, সরানি, সিতাল,দলপেচি এবং কামিহংসের। কাক, কোকিল, কয়ের, তিতির, দয়তুল, পাবদা এবং মিহিরও ডাকে । নাম-না-জানা আরও কতরকম পাখী যে সেখানে আছে কবি তাহাদের বর্ণনার বিস্তারে যাইতে চাহেন নাই ।

(ঢ) **বাদ্যধ্বনি :-**

নিষাদরাজ গুহকের রাজত্বে যে সকল বাদ্যধ্বনির বর্ণনা কবিচন্দ্র দিয়াছেন, তাহাও সমসাময়িক লোকজীবনে ব্যবহৃত মঙ্গলসূচক আচার আচরণ হইতে আহরিত । তাহাদের মধ্যে ঢাক, ঢোল, ঝাঝরি, কাড়ানাগরা এবং সরমঙ্গলাই প্রধান ।

রাম রাম বলিয়া নগরে পড়্যা গেল সাড়া ।
ধামগুড় ধামগুড় বাদ্য বাজে নাচে চণ্ডাল-পাড়া ।।
ধাউ ধাউ ধামসা বাজে দগড় ভিণ্ডিমি ভিণ্ডিমি ।
দো দো দামসা বাজে নানা বাদ্য শুনি ।।
কাড়া নাগরা বাজে ভ্রমরঙ্গ করান ।
ঢাক ঢোল ঝাঝবি বাজে অসংখ্য আপার।।
সরমঙ্গলার বাদ্যে স্বর্গ-মর্ত্য ভেদিল ।
যত গুহা রঘুনাথে দেখিতে চলিল।।

(রঘুনাথের দেশাগমন, পু.পৃ.৪, ১০-১৭ ছত্র)

ধর্মবোধ :-

কবিচন্দ্রের কাব্যে সমসাময়িককালের ধর্ম চিন্তাটি বেশ সুপ্রকট হইয়া উঠিয়াছে । একবার শিবপূজার বর্ণনা দিলেও কৃষ্ণ কিংবা গোবিন্দের পায় সাধারণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ হইতে রাজা হরিশ্চন্দ্র পর্যন্ত অনেকেই ধর্ণা দিয়াছেন । তবে মূলকাব্যখানিতে অর্থাৎ 'রঘুনাথের বনবাস' হইতে 'দেশাগমন' পর্যন্ত সকলেব সকল বিশ্বাস ও ভক্তি একমাত্র রামকেন্দ্রিক । তিনিই সকলের আরাধ্য, ইষ্ট, মিত্র এবং পরামর্শদাতা । এই বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্রের মহিমা অযোধ্যার রাজপুরী হইতে আরম্ভ করিয়া রাবণের স্বর্ণলঙ্কা পর্যন্ত সকলেই অনুভব করিয়াছেন । তবে ধর্মবিষয়ে তিনি আর্য- রামায়ণের মত দ্বিজ, গুরু, সাধু এবং অতিথির পালন এবং ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন । কৌশল্যা একবার

রামচন্দ্রের মঙ্গল কামনার্থে দেবতাদের একে একে পূজা করিয়াছিলেন, তবে সেই সকল দেবতাদের নামের উল্লেখ কবিচন্দ্র করেন নাই। 'হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানে' সওদাগরের অথবা সদাগরের শিবপূজার বর্ণনাটি এইরূপ :-

কালে শিব-পূজারম্ভ করে সদাগর।
বৃস্যাসনে রাখিলেন মৃত্তিকা-শঙ্কর।।
বসিলা অজিনাসনে সাধু গুণনিধি।
আচমন করি কৈল ভূত শুদ্ধি আদি ।।
আবাহন করি হরে করাইল স্নান ।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ক্রমে করে দান ।।

(হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান, পু.পৃ. ৫)

বেদবিধিসম্মত এই পূজাচারের মধ্যে অভিনবত্ব না থাকিলেও কবিচন্দ্র এইস্থলে শিবকে প্রেমের দেবতারূপে অঙ্কিত করেন নাই। পুষ্প সঙ্গে শ্রীফলের কাঁটা শিবের মস্তকে পতিত হওয়ায় শিবের রোষেই হরিশ্চন্দ্রপুত্র রোহিতাশ্বের সর্পদংশনে অকালমৃত্যু ঘটে। ভক্তের সামান্য ক্রুটিতে ভগবানের এইরূপ রোষকষায়িত শাস্তির চিত্র কাব্যখানির আর কুত্রাপি নজরে পড়ে না। ইহার মধ্যে মঙ্গলকাব্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

ধর্মচিন্তা ও বিশ্বাসবোধ সম্পর্কে কবির ধারণাটি খুব পরিষ্কার। বনবাসের পূর্বে বামচন্দ্রকে রাজা দশরথ প্রজাপালনের যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে রাজার কর্তব্য সম্পর্কে কবির ধারণাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়—

ধর্মে পালিবে প্রজা ধরণীমণ্ডল ।
দ্বিজ গুরু সাধু পূজা অতিথি সকল ।।

(রঘুনাথের বনবাস, পু.পৃ.২)

তারপরেই এই আজ্ঞা পালনের যে সামান্য একটু বর্ণনা আছে তাহাতে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের আচার আচরণের আদর্শই ফুটিয়া উঠিয়াছে :

স্নান সন্ধ্যা জপ যজ্ঞ বিষ্ণুর পূজন ।
রামচন্দ্র করিলেন দ্বিজের অর্চন ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ.৩)

ভাগ্যের উপর অতিমাত্রায় আস্থাশীল বাঙালী জাতিব মত কবিচন্দ্র রামচন্দ্রের মুখে বলিয়াছেন—

বিধির লিখন মিথ্যা নহে কোনকালে ।
সুখ দুঃখ ভোগাভোগ যথাকালে ফলে ।।

(ভরতের পিতৃশ্রাদ্ধ, পু.পৃ. ৬ক)

বিষ্ণুর অবতার নরনারায়ণ রামচন্দ্রের মহিমা প্রচার কাব্যের উদ্দেশ্য হইলেও তাঁহার মানবিকতার প্রকাশও দেখা যায় । সীতাহরণে রামের আক্ষেপোক্তিতে এবং শক্তিশেলে লক্ষ্মণের পতনের পর রামচন্দ্রের কথাবার্তায় ও আচার-ব্যবহারে জীবন-অনভিজ্ঞ সংসার-পলাতক এক সাধারণ মানুষের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে :

শুন লক্ষ্মণ বলি আমি ফির‍্যা ঘরে জাহ তুমি
আমার বেদনি মায়ে বল্য ।
কহিয় কৈকেয়ী আগে আমার শপতি লাগে
বল্য তোমার রাম সীতা মল্য ।। (সীতাহরণ পালা, পু.পৃ.৫)

লক্ষ্মণের পতনের পর তিনি আরেকবার সীতা উদ্ধারের পরিকল্পনা বিসর্জন দিতে চাহিয়াছিলেন ।

এইভাবে বিচার বিশ্লেষণ করিলে কবিচন্দ্রের রামায়ণে খুব বেশী পরিমাণে না হইলেও বেশ কিছু মানবিক রসের উপাদান ও সমাজজীবনের ছবি দেখিতে পাওয়া যায় । মঙ্গলকাব্যে সমাজজীবনের যে বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়, অনুবাদ সাহিত্যে তাহার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হইলেও, ইহাতে সমাজের যে সামান্যতম অংশের ছায়াপাত ঘটিয়াছে তাহাতেই আমাদের পরম লাভ ।

পরিশেষে বলা যায় কবিচন্দ্রের কাব্যের প্রধান গুণ বর্ণনার সরসতা এবং ভাবের প্রাঞ্জলতা । কাব্যের মধ্যে মধ্যে তিনি কিছু সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কতিপয় শ্লোক কবির স্বরচিত বলিয়া মনে হয় । আবার কাব্যের মধ্যে কবি মাঝে মাঝে স্বীয় মন্তব্যও প্রকাশ করিয়াছেন ; যেমন সীতা অপহৃতা হওয়ার পর রামচন্দ্র বিলাপ করিতে থাকিলে কবিচন্দ্র লিখিয়াছেন —

দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় আর মনে কিছু লয়
পাবে সীতা চিন্তহ উপায়।। (সীতাহরণ, পু.পৃ.৬ক)

এইরূপ উদাহরণ বহু আছে । রাবণের যুদ্ধযাত্রার পূর্বে পাওয়া যায় —

দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে শুনহে রাবণ ।
লীলার কারণ সব না যায় খণ্ডন ।।
(রাবণ কুম্ভকর্ণ সংবাদ, পু.পৃ. ৭ক)

বস্তুতঃ মধ্যযুগের কাব্যরচনার বিশেষত্বই এইরূপ, কবি নিজে কাব্যের অধিকাংশস্থলে সচেতনভাবে আপন মন্তব্য প্রকাশ করিয়া পরিণামটি পূর্বেই ঘোষনা করিয়া দিতেন ।

কবিচন্দ্রের রচনার প্রধাণ গুণ সহজ সরলভাব । তাহাতে চমৎকৃতি অপেক্ষা প্রাঞ্জলতা অধিক । দশরথের রাজসভা কিংবা রাবণের স্বর্ণলঙ্কার বর্ণনায় রাজবৈভবের

ঘনঘটার পরিবর্তে তিনি 'পতাকা চামর', 'স্বর্ণঘট' এবং 'মঙ্গল বাজনা' এইরূপ কতিপয় দৃষ্টান্ত দিয়াছেন মাত্র। সৌন্দর্য বর্ণনাতেও কবি কষ্টকল্পিত কোনও বাহুল্যভাবের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। রাম ও সীতার রূপের বর্ণনায় ভাষার ছটা এবং শব্দের কারুকার্য বিশেষ না থাকিলেও কবির দুই চারি ছত্র তুলির টানে তাহা হইয়া উঠিয়াছে অনিন্দনীয়। বঙ্গদেশের কবিকুলের ন্যায় সীতার সৌন্দর্যে তিনি কোমলা অবগুন্ঠনবতী নারীর স্বাভাবিক রূপটিকেই বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন। রামচন্দ্রের সৌন্দর্যও অকৃত্রিম এবং সহজ মাধুর্যে মণ্ডিত। কবিচন্দ্রের রচনার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনার পরিমিতিবোধ। তাঁহার প্রতিটি কাব্যই সংক্ষিপ্ত এবং যথাযথ। কোনোও কাব্যই কাহিনীর বিশাল ঘনঘটায় এবং ব্যাপক বর্ণনার তথ্য-ভারে অবনত নয়। অথচ কোথাও কাব্যপাঠের রসাস্বাদন হইতে পাঠককে বঞ্চিত হইতে হয় না। এই কারণেই কবিচন্দ্রের কাব্য জনগণের প্রাণে স্থায়ী আসনলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। রাজসভার কবির মর্যাদা লাভ করিলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন জনসাধারণের কবি। 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ'-এর সহজ, সরল এবং অকৃত্রিম ভাবের জন্যই উহা জনসমাজে এত সমাদর লাভ করিতে পারিয়াছিল।

পাদটীকা

১। দীনেশচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত ভূমিকা	: রামায়ণী কথা, পুনর্মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৩৭০, ভূমিকা পৃ. ৮
২। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা	: কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৪ সাল, ভূমিকা, পৃ. পনেরো।
৩। দীনেশচন্দ্র সেন রচিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব লিখিত ভূমিকা	: রামায়ণী কথা, পুনর্মুদ্রণ ১৩৭০, ভূমিকা, পৃ. ১০
৪। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা	: কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ, সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৪ সাল। ভূমিকা, পৃ.১
৫। পঞ্চানন তর্কবত্ন সম্পাদিত ও অনূদিত	: বাল্মীকি-রামায়ণম্, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৩১১ সাল। অযোধ্যাকাণ্ড/৪২/১-৭ শ্লোক, পৃ. ২৪৪-২৪৫।

৬। বাল্মীকির রামায়ণে শব্দবেধী বাণের উল্লেখ আছে। (অযোধ্যা/৬৪ সর্গ। ৫৮ শ্লোঃ) শব্দভেদী নহে। 'শব্দভেদী' কবিচন্দ্রের উল্লেখ।

৭। দীনেশচন্দ্র সেন	: রামায়ণী কথা, পুনর্মুদ্রণ ১৩৭০। পৃ. ৩৫
৮। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত ও অনূদিত	: বাল্মীকি-রামায়ণম্, বঙ্গবাসী সং ১৩১১ সাল। অযোধ্যা কাঃ/২১ সর্গ/১৯ শ্লোক। পৃ. ১৯৫।
৯। Sri Aurobindo	: Valmiki and Vyasa, Sri Aurobindo Birth Centenary Vol.-3. 1972. P. 148
১০। রবীন্দ্রনাথ	: কবিজীবনী, সাহিত্য। রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, ১৩৬৮ সাল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পৃ. ৮২২
১১। অসিতকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায়	: বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, ২য় সং ১৯৬৩। পৃ. ৫৪২
১২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব	: রামায়ণ, প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, ১৩৬৮। পৃ. ৬৬২ (৪)

১৩। প্রবোধকুমার সেন : রামায়ণ ও ভারত সংস্কৃতি, ১ম প্রকাশ, ১৯৬২। পৃ. ৩৩

১৪। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত পৃ. ৩২

১৫। "যে কারণে বঙ্গদেশের অধিবাসীরা আর্য্যগণ কর্ত্তৃক কাক-চটক-পারাবতাদির ন্যায় পক্ষী বলিয়া গণিত হইত, সেই কারণেই দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়গণ বানর, ভল্লুক ইত্যাদি আখ্যালাভ করিয়া থাকিবে।"

"লঙ্কার সভ্যতা ও দাক্ষিণাত্যের সভ্যতা একজাতীয় এবং তাহা হইবারই কথা — আর অযোধ্যার সভ্যতা কোনো কোনো অংশে বিভিন্ন। রামায়ণ-পাঠকালে এই পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে।"

উক্ত উদ্ধৃতি দুইটি রাজেন্দ্রলাল আচার্য্যের 'রামায়ণের অনুধ্যান' নামক প্রবন্ধের অন্তর্গত। উহা শিশিরকুমার নিয়োগী সম্পাদিত : বাল্মীকি-রামায়ণ, আদিকাণ্ড, কলিকাতা ১৩৪৩ সনে মুদ্রিত। পৃ. ৮ এবং ৯ হইতে গৃহীত।

অষ্টম অধ্যায়

।। 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' -এর ভাষা ব্যবহার, ছন্দ ও অলঙ্কার ।।

কবিচন্দ্রের বিষ্ণুপুরী রামায়ণে অন্ত্য-মধ্য যুগের বাংলাভাষার বৈশিষ্ট্য বর্তমান। তবে আদি-মধ্য যুগের বাংলাভাষার দুই একটি নিদর্শনও পাওয়া যায়। ডঃ সুকুমার সেনের 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে (দ্বাদশ সংস্করণ, ১৯৭৫ খ্রীঃ) অন্ত্য-মধ্য বাংলাভাষার যে প্রধান কয়েকটি বিশেষত্বের (পৃ. ১৮০-১৮২) কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহার সঙ্গে কবিচন্দ্রের ভাষা ব্যবহারের বেশ মিল আছে। কবিচন্দ্রের রামায়ণ হইতে এই বিষয়ে সামান্য আলোচনা করা হইল।

আদি-মধ্য যুগের বাংলার দুইটি নিদর্শন এইরূপ :—

তেওিস (প্রা. বাং. তেত্তীস < সংত. ত্রয়স্ত্রিংশৎ) —

তেত্তিস অক্ষৌহিনী সেনা সুগ্রীব রাজা আনে। সী.উ., পু.পৃ. ৪ক

তোহোর (আদি-মধ্য, তোহোর < সংত. তুভ্যম্)—

কি কব লক্ষ্মণ হাথে তোহোর মরণ। সী.উ., পু.পৃ. ৭ক

অন্ত্য-মধ্য বাংলাভাষার উদাহরণ এইরূপ :—

ধ্বনি বিচার

স্বরাগম :-

আদি স্বরধ্বনিতে শ্বাসাঘাতের দরুণ 'অ' 'আ' হইয়াছে, যথা —

আনল < অনল = জ্বলন্ত আনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল। সী.হ., পু.পৃ. ৭ক

আপার < অপার = কালনিমা কালরূপ আনন্দ আপার। ল.শ., পু.পৃ.৮

অপিনিহিতি :—

আল্য < আইল — রাক্ষস সব বলে বাপরে ইটা আল্য কে। অ.রা,পু.পৃ. ৩

এড়্যা < এড়িয়া — এড়্যা গেলে অহে নাথ পরাণে মরিব। র.ব., পু.পৃ. ১১

এইরূপ উদাহরণ : — কইল্য, ছুইট্যা, ডাক্যা, দংশ্যা ইত্যাদি।

স্বরলোপ :—

আনেছি < আনিয়াছি — অতএব আনেছি বান্ধ্যা তোমার সাক্ষাতে। সী.হ.,পু.পৃ. ৭

অভিশ্রুতি :—

খেত < খাইত = ক্ষীর পিঠা যে শিশু খেত ঘৃতভাত। হ.উ.,পু.পৃ. ৫ক

চেলের < চাউলের — সেরেক চেলের অন্ন অতি সুখে খাব। হ.উ.,পু.পৃ. ৪ক

সেধের < সাধুর --- ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা **সেধের** ভবনে। হ.উ.,পু.পৃ. ৩
এইরূপ উদাহরণ — করে, খেয়ে শুনে, এস্যাচ, খেত্যে, এল্য, করেছ, এসাছি এবং হতে ইত্যাদি।

স্বর-সঙ্গতি :—

উ < অ = শুনু < শুন্য — দিয়া মোরে গুণনিধি হর‍্যা পুনঃ নিল বিধি
এতদিনে কোল হল্য **শুনু**। র.ব.,পু.পৃ. ১০
এ < অ = ক্ষেণে < ক্ষণে --- **ক্ষেণে** উঠে **ক্ষেণে** বৈসে করে হায় হায়। হ.উ.,পু.পৃ. ৮ক

স্বরভক্তি :—

পরমাদ < প্রমাদ — দ্বিজ কবিচন্দ্র বলে **পরমাদ** হৈল। সী.হ., পু.পৃ. ৫
বারতা < বার্তা — তোমারে **বারতা** দিতে প্রাণ মোর ছিল। সী.হ.,পু.পৃ. ৬
শবদে < শব্দে — রামের **শবদে** স্বর্গ রসাতল কাঁপে। শি.যু., পু.পৃ. ৬
গেয়ান < জ্ঞান — ভাঙ্গড়ভোলা ভাল মন্দ নাহিক **গেয়ান**। শি.যু.,পু.পৃ. ৯
এইরূপ উদাহরণ — জনম, তেয়াগিব, নিরমাণ, বরিষার, বিসরিবে, মরকট, মুকুতা, সঙরণ এবং হরষিত ইত্যাদি।

সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনি :—

এল্য (< আউল্যা < আলুলায়িত)--- কোন লাজে সমরে দাণ্ডালি **এল্য** চুলে। শি.যু., পু.পৃ. ৯
বিজই (বিজয়ী) — আখণ্ড প্রতাপ হব **বিজই** সংগ্রাম। সু.ক.,পু.পৃ ৫

ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব : —

হুহুঙ্কার < হুঙ্কার --- **হুহুঙ্কার** শব্দে দেবতা কাঁপে ডরে। শি.যু., পু.পৃ. ৬

সমাক্ষর লোপ :—

ধাকা < ধাক্কা — রাজা বলে মর মর খেয়ে ঘাড় ধাকা। হ.উ., পু.পৃ. ৯ক
সাচা < সাচ্চা --- আর যত যুক্তি মিছা গোবিন্দ ভজন **সাচা**
প্রাণ পাই যদি রাজা আইসে। হ.উ.,পু.পৃ. ২ক

চন্দ্রবিন্দুস্থানে 'ন' :—

কান্দে < কাঁদে — পদে ধরি পড়িয়া বিনয় করি **কান্দে**। হ.উ.,পু.পৃ. ২ক
চান্দের < চাঁদের --- দূর হইতে দেখে যেন **চান্দের** উদয়। হ.উ.,পু.পৃ. ১
ফান্দে < ফাঁদে — পুষ্প তুলি লয়া যাহ পড়িয়াছ **ফান্দে**। হ.উ.,পু.পৃ. ২ক

সমীভবন : —

পাঁচ্ছু < পাঁচ + ছয় — মর্দানাটা জানা যাবেক দিন **পাঁচ্ছু** সবই । অ.রা.,পু.পৃ. ৩ক

মচ্ছিস < মরিছস — নিঃস্বার্থক পচাল পাড়্যা কেনে **মচ্ছিস** বুড়া । অ.রা.,পু.পৃ. ২ক

ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন :—

ত < থ = শপতি (শপথ) — **শপতি** করিয়া ছুঞি তোমার চরণ । ভ.পি., পু.পৃ. ৩ক

পদ- বিচার

নাম ধাতু :—

আল্বাইয়া (আউলানো) — শোকে জর জর তনু পড়ে **আল্বাইয়া** । ভ.পি.,পু.পৃ. ৬ক

নিরখিয়া (নিরীক্ষণ)— এক দৃষ্টি হয়্যা বীর **নিরখিয়া** রয় । ভ.পি.,পু.পৃ. ৬

নিয়োজিয়া (নিয়োজন) — ঘাটে ঘাটে **নিয়োজিয়া** লোক রাখাইল । ভ.পি., পু.পৃ. ২ক

বিচারিল (বিচার) — এতেক বলিয়া মনে **বিচারিল** গোহা । ভ.পি., পু.পৃ. ২ক

এইরূপ উদাহরণ — প্রণমিঞা, প্রসারিঞা, এবং প্রবেশিঞা ইত্যাদি ।

অস্ত্যর্থ ও নাস্ত্যর্থ ক্রিয়া :—

বট্ (বৃৎ ধাতু) — আমি যদি সর্বথা **বটি** প্রভু রামের চর । অ.রা.,পু.পৃ. ৬

নহিল (নহ্ ধাতু) — লেজ বাড়াইতে শক্তি **নহিল** তোমার । র.দে., পু.পৃ. ৪ক

অসমাপিকা ক্রিয়া :—

য-ফলার ব্যবহার —

কর‍্যা — অশোক বন সহিত সীতা আনিবে মাথায় **কর‍্যা** । অ.রা.,পু.পৃ. ৫

ধর‍্যা — রাবণকে বামহাথে আনিবে জটে **ধর‍্যা** । অ.রা.,পু.পৃ. ৫

য-ফলা ছাড়াও অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার পাওয়া যায়, যথা :—

পাঞা — না মারিল সুগ্রীব রাজা **পাঞা** রামের কথা । অ.রা.,পু.পৃ. ৫

ক্রিয়ার কাল :—

অনুজ্ঞাভাবে বর্তমান কাল —

জন্মাসি — প্রাণতুল্য প্রিয় রাম না **জন্মাসি** পাপ । র.ব., পু.পৃ. ৪

পালাসি এবং রসি --- না **পালাসি** স্থির হয়্যা রসি দশাননে । ল.শ., পু.পৃ. ৪

এই সাধারণ আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, কবিচন্দ্রের এই কাব্যে অন্ত্য-মধ্য যুগের লক্ষণ সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে । স্বরভক্তি এবং অভিশ্রুতির উল্লেখ পর্যাপ্ত

পরিমাণে পাওয়া গেলেও অপিনিহিত শব্দের ব্যবহার কম। প্রত্যয় ব্যবহারের মধ্যে বাংলা দেশীয় ছাপ বর্তমান। তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় কয়েকটি শব্দ যথা :—

বেটানি (বেটা + নি) — সব বেটানি রাবণ হইল ভেদ নাঞি কোনজনে। অ.রা.,পু.পৃ. ৪ক

নির্লজ্জিনী (নির্লজ্জ + ইন্ + স্ত্রীবাচক 'ই') — তোর সম নির্লজ্জিনী নাহি ভূমণ্ডলে। শি.যু., পু.পৃ. ৯

বীরপনা (বীর + পনা) — বীরপনা দেখাও মোরে ধর‍্যা ধনুঃশর। শি.যু.,পু.পৃ. ৬

দুইগোটা (দুই + গোটা) — দুইগোটা বীর বসি দেখিবারে পায়। সী.হ.,পু.পৃ ২ক

আবার কৃৎ প্রত্যয়ের উদাহরণেও বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের সমৃদ্ধি সূচিত করে ; যথা :—

বড়াই (বর্ধাপিত) — কদাচিৎ বড়াই না করিস মোর সনে। শি.যু.,পু.পৃ. ৬

বোল (বল্লিত) — কি বোল বলিলি দাসী আয় করি কোলে। র.ব.,পু.পৃ.৪

বৈরতা (বৈর + তা) — তার সনে বৈরতা কর‍্যা জাবি কার ঠাঁই। অ.বা.,পু.পৃ. ৬

ভুলান (ভুল্ + আন) — মোর ধন মোরে দিয়া করিস ভুলান। হ.উ.,পু.পৃ. ৩ক

রক্ষণ (রক্ষ্ + অনট) — দণ্ডে দুই সীতা তুমি করহ রক্ষণ। সী.হ.,পু.পৃ. ৩ক

পূজন (পূজ্ + অনট) — এত বলি করে সতী দুর্গার পূজন। র.ব.,পু.পৃ. ৩ক

সন্ধির নিয়মের ফলে কয়েকটি শব্দে পয়ারের অক্ষর মাত্রার সমতা রক্ষিত হইতে দেখা যায়; যথা :—

অতেব (অতঃ + এব = অতএব) — অতেব পরাণে বাঁচ তেজিলাঙ মোহ। রা.সু.,মি. পু.পৃ. ৪ক

এক্কালে (এক + কালে) — বশিষ্ঠের পুত্রে আন সুযজ্ঞে এক্কালে। র.ব.,পু.পৃ. ১২

তোমাইতে (তোমা + হইতে) — তোমাইতে হবে বাছা সীতার নিষ্কৃতি। শি.যু.,পু.পৃ.১১

দন্তাঘাত (দন্ত + আঘাত) — বাল্যের বদনে বীর করে দন্তাঘাত। রা.সু.,মি.পু.পৃ. ৪ক

আবার সন্ধির ফলেই পয়ারের অক্ষর মাত্রার সমতা রক্ষিত না হওয়ার উদাহরণও আছে ; যথা :—

তোরামার (তোর + আমার) — সেই দেব বলবান তোরামার বোলে কি হয়। অ.রা.,পু.পৃ. ৬

সন্ধির নিয়মের মধ্যে পড়েনা এমন শব্দেও সন্ধি করা হইয়াছে ; যথা :—

দেষ্কে, হটঙ্কারে প্রভৃতি।

কোনও কোনও স্থলে সন্ধি বিচ্ছেদের দ্বারাই পয়ারের ১৪ মাত্রা রক্ষিত হইয়াছে ; যথা :—

তিল আধ (তিলার্ধ) — রাম বিনে তিল আধ না জীব পরাণে। র.ব.,পু.পৃ. ৬

যুদ্ধ বর্ণনাকালে 'মুষ্টামুষ্টি', 'কেশাকেশি', 'ঝাঁপাঝাঁপি', 'লাফালাফি', 'ঠেসাঠেসি', এবং 'মিশামিশি' প্রভৃতি ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাসের উল্লেখ আছে।

বাংলা শব্দ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছে তৎসম, অর্ধতৎসম, ব্রজবুলি, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দ। কবিচন্দ্রের কাব্যে এই সকল শব্দ চয়নের পারিপাট্য থাকিলেও বিদেশী শব্দের প্রয়োগ কম দেখা যায়। তবে বিদেশী শব্দের মধ্যে আরবী-ফারসী শব্দের সংখ্যাল্পতা ঘটিলেও একেবারে অপ্রতুল নয়। অপ্রচলিত শব্দ-সূচীর মধ্যে কতিপয় ফারসী ও আরবী শব্দেরও উল্লেখ করা হইল, যেমন — গুণাগার, তর্কচে, দরায়, দস্তুর, দাদ, দিয়ান, নফর এবং হুকুম প্রভৃতি।

ছন্দ :

সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিত কবিচন্দ্র কাব্য রচনাকালে সুকৌশলে পাণ্ডিত্যাভিমান পরিত্যাগপূর্বক বাংলার আর্দ্র জলহাওয়ার উপযুক্ত ধ্বনি, ছন্দ ও অলঙ্কারকে প্রাধান্য দিয়াছেন। প্রবহমান সমাজের পরিচিত ভাবরাশিকে তিনি সাহিত্যে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন। মধ্যযুগে বিবিধ ছন্দের প্রচলন থাকিলেও প্রধানতঃ পয়ার ও ত্রিপদীই ছিল কাব্য রচনার প্রধান অবলম্বন। রামায়ণ যেহেতু করুণরসের কাব্য সেইহেতু তাহাতে পয়ার ও ত্রিপদীর গঠনবিন্যাসই ভাব ও ভাষার পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইত। কবিচন্দ্রের কাব্যখানি বোধ হয় গীত হইত, এইকারণেই পয়ার ও ত্রিপদীর মাত্রা সর্বত্র সুশৃঙ্খলভাবে রক্ষিত হয় নাই। চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারে কোথায়ও তের, ষোল সতের অথবা আঠার অক্ষরের অসমান মাত্রায় এবং ত্রিপদী কোথায়ও লঘু অথবা দীর্ঘ রূপে পাওয়া যায়। পয়ারের সুকঠিন নিয়ম হইল চৌদ্দ অক্ষর, চৌদ্দ মাত্রাতে গঠিত চরণের দ্বারা কাব্য অগ্রসর হইবে। কিন্তু পাঁচালীর যুগে মুখ্যতঃ গায়েনদের উপর নির্ভর করার ফলে কবিগণ চরণ গঠনে ছন্দোগত বৈয়াকরণ দৃষ্টি দিতেন না। তাই মাত্রার হ্রস্বতা গায়কের বা পাঠকের পঠন-সৌকর্যজনিত বা গায়েনের রীতির কারণে পূরিত হইয়া যাইত। ফলে গান শুনিয়া শ্রোতা তৃপ্ত হইতেন, কিন্তু কাব্যের ছন্দঃকলা-প্রসাধন বিচারে সমালোচক প্রসন্ন হইতেন না। ছন্দোবৈচিত্র্যের মধ্যে রায়বারের লঘু-চপল ছন্দ এবং দ্রুততালে কথোপকথনের ভঙ্গী কবিচন্দ্রের রামায়ণকে যথেষ্ট মর্যাদা দান করিয়াছে।

পয়ারের দৃষ্টান্ত —

জিজ্ঞাসা করিলু ক্রমে বন্ধু পুত্র দারে।
অধর্মের ভাগী নহি কহে সভে মোরে ॥
পুনরপি গেনু আমি মুনিদের পাশে।
দর্শনে হইল জ্ঞান বপু কাঁপে ত্রাসে ॥

ধনুতীর পেলি আমি ধরি তাঁর পায় ।
উঠ উঠ বলি কোলে করিল আমায়॥
কান্দিয়া কহিনু মোর কিবা হব গতি ।
করুণাসাগর সর্বে ঘুচাহ দুর্গতি ॥

(রঘুনাথের বনবাস, পু.পৃ. ২২ক)

ত্রিপদীর উদাহরণ :—

শুনি সর্বে কহে মোরে জিজ্ঞাসিয়া দেখ ঘরে
প্রাণীবধ কর যার লাগি ।
তবে আস্যা বধ্য মোরে সত্য সত্য বলি তোরে
যদি হয় অধর্মের ভাগী ॥
এত শুনি আসি ঘরে জিজ্ঞাসিয়ে তা সভারে
আমার হৃদয়ে বাড়ে ভয় ।
ব্যাসের বর্ণন গাথা রামলীলা রস-কথা
কবিচন্দ্র চক্রবর্তী কয় ॥

(রঘুনাথের বনবাস, পু.পৃ. ২২ক)

উপরে লিখিত প্রথমটি পয়ারের আট, ছয় মোট চৌদ্দ মাত্রার এবং দ্বিতীয়টি ত্রিপদীর আট, আট এবং দশ মাত্রার সুন্দর দৃষ্টান্ত । কিন্তু সর্বত্র এই নিয়ম রক্ষিত হয় নাই । পয়ার এবং ত্রিপদীর হ্রস্ব এবং দীর্ঘ মাত্রার নিদর্শনও পাওয়া যায় ; যথা :—

(ক) প্রথম ছত্রে ১৩ মাত্রা এবং দ্বিতীয় ছত্রে ১৪ মাত্রার পয়ার,

রামচন্দ্র বলে মা মোর বাক্য ধর ।
স্বামীর করহ পূজা পরকাল তর ॥

(রঘুনাথের বনবাস, পু.পৃ. ১১ক)

প্রথম ছত্রে 'মা' শব্দটিকে 'মাতা' করিলে ১৪ মাত্রা রক্ষিত হইতে পারে । তবে গায়েনগণ সুরের মাধ্যমে এই ফাঁক পূরণ করিতেন ।

(খ) প্রথম ছত্রে ১০ + ৮ + ১০ এবং দ্বিতীয় ছত্রে ৯ + ৮ + ১৩ মাত্রার ত্রিপদী এইরূপ :—

শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রকূলে সকল কটক মেলে
অযোধ্যায় করিতে পয়ান ।
সমুদ্র আসি হেনকালে জোড়হাথ করি বলে
প্রভু হেঃ হেন মোর কর অপমান ॥

(রঘুনাথের দেশাগমন, পু.পৃ. ২ক-২)

গেয়কাব্যের এই ছত্র দুইটিকে ছন্দের নিয়মে সাজাইলে এইরূপ দাঁড়ায় :—

শ্রীরাম সমুদ্রকূলে সকল কটক মেলে
অযোধ্যায় করিতে পয়ান।
সিন্ধু আসি হেনকালে জোড়হাথ করি বলে
প্রভু মোর কর অপমান ॥

এইরূপে ৮ + ৮ + ১০ মাত্রার দ্বারা ছন্দের নিয়ম ও অর্থ উভয়তঃ রক্ষা করা যায়। আবার দুইটি ছত্রই ৮ + ৫ = ১৩ মাত্রার পয়ার ; যথা :—

হনু বিভীষণ করে চামরের বা।
বানরের উতরোল দেখে রাঙ্গা পা ॥ (সীতার পরীক্ষা, পু.পৃ. ৫)

এইরূপ উদাহরণ বহু আছে।

ষোল মাত্রার পয়ারের উদহারণ এইরূপ :—

দোলার দুয়ার ঘুচাহ হাথের পেল সাট।
সর্বলোক দেখুক সীতা ভুমে রহুক বাট ॥
(সীতার পরীক্ষা, পু.পৃ. ৬ক)

'অঙ্গদ রায়বার' পালাটি শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের জন্য বিখ্যাত। ইহার প্রত্যেকটি চরণে চার পর্ব এবং প্রত্যেক পর্বের গোড়ায় প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে ; যথা :—

কুম্ভকর্ণ। ভাই তোর। বীর জাকে। বলিস।
রাম ধনুকে। বাণ জুড়িলে। কি হয় তা। দেখিস ॥
(অঙ্গদ রায়বার, পু.পৃ. ৫)

অলঙ্কার :

কাব্যের স্বাভাবিক ভূষণ অলঙ্কার। কবিচন্দ্রের কাব্যে নানাবিধ অলঙ্কারের মধ্যে শব্দালঙ্কার অপেক্ষা অর্থালঙ্কারেরই প্রাধান্য। রূপক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পাদির দ্বারা তিনি ভাষার সৌষ্ঠব ও লালিত্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। বাঙালীর সহজ রুচি ও শিল্পবোধের রসে জারিত করিয়া কবিচন্দ্র নিপুণ শিল্পীর ন্যায় কাব্যটিকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তিনি যথাস্থানে, দুঃখের অশ্রুধারাকে 'শ্রাবণমাসের ধারা', দেহের রূপকে 'অগ্নিশিখার সমান' এবং পুত্রশোককে 'বজ্রাহত বৃক্ষ' রূপে তুলনা করিয়াছেন। তাহাতে রূপক, উপমা ও উৎপ্রেক্ষার সংখ্যাই সর্বাধিক। কবিচন্দ্রের কাব্যে অলঙ্কার কোথাও কাব্য হইতে পৃথক বস্তু হইয়া ওঠে নাই, রূপসাম্য ও অর্থসাম্য ঘটায় অলঙ্কার সর্বত্র কাব্যের সঙ্গে অভিন্ন রসরূপ লাভ করিয়াছে ; যথা —

উপমা :-

১। ঝলমল করে রূপ দিবাকর <u>প্রায়</u> (রঘুনাথের বনবাস, পু.পৃ. ২)

২। শোকেতে আকুল রাজা চারিপানে চায় ।
কৈকেয়ীরে দেখে আগে বাঘিনীর <u>প্রায়</u> ।। প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৬)

৩। রাজার বিলাপ শোকে সূর্য অস্ত গেল ।
একরাত্রি শত বৎসরের <u>প্রায়</u> হল্য ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৬)

৪। পুণ্যবতী সীতাসতী রাম সঙ্গে জায় ।
জল সাথে গমনে যেমন ছায়া <u>প্রায়</u> ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১৬ক-১৬)

৫। বল্মীক হইতে আমি উঠিলুঁ সত্বর।
নীহার জেমন নাশ করেন ভাস্কর ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ২২)

৬। দূরে হৈতে শ্রীরামে দেখেন লঙ্কেশ্বর ।
দূর্বাদলশ্যাম তনু মূর্তি বিশ্বম্ভর ।। (লক্ষ্মণের শক্তিশেল, পু.পৃ. ২)

প্রতিবস্তূপমা —

কুপিল রাবণ রাজা অঙ্গদের বোলে।
ঘৃত পাছে দাবানল অধিক উথুলে ।। (অঙ্গদ রায়বার, পু.পৃ. ৭ক)

রূপক :-

১। উথলিল <u>**শোকসিন্ধু**</u> ম্লান হৈল <u>**মুখইন্দু**</u>
লোচনে রাখিতে নারে লোহ । (রঘুনাথের বনবাস, পু.পৃ. ৭ক)

২। <u>**পদ্মহস্ত**</u> দিতে পক্ষ প্রাণ জে পাইল । (সীতাহরণ, পু.পৃ. ৬)

৩। পদ্ম জিনি <u>**পাদপদ্ম**</u> ভ্রমিলা গহনে (রঘুনাথের বনবাস, পু.পৃ. ১)

৪। রামলীলা <u>**সুধারস**</u> কহি পুনঃপুনঃ । (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১)

৫। বিস্তার বাল্মীক মত আধ্যাত্মিক নবম কথ
<u>**রসসিন্ধু**</u> রামলীলা গান ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৭)

৬। <u>**কমললোচন**</u> বাছা দূর্বাদল শ্যাম । (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৬)

৭। দ্বিজ কবিচন্দ্র কহেন রামের কথা ।
ব্যাস উক্তি শুক পরীক্ষিৎ <u>**রসগাথা**</u> । (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ২ক)

উৎপ্রেক্ষা :—

১। অবনী লোটায়া রাজা কান্দে অবিরত ।
বৃক্ষ জেন পীড়া পায় হয়্যা বজ্রাহত ।। (রঘুনাথের বনবাস, পু.পৃ. ৬ক)

২। মূর্চ্ছা হয়া পড়ে রাণী রাম রাম বলি ।
অবনী লোটায় জেন ছিন্ন কদলী ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৯)

৩। কান্দিয়া মহিষী যত মনে তাপ পাই ।
বাছুর হারাল্যে জেন হামা দেই গাই ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১৫)

৪। দূর্বাদলশ্যাম মোর রাম রঘুমণি ।
অতি সুকোমল অঙ্গ জেন কাঁচানুনি ।। (ভরতের পিতৃশ্রাদ্ধ, পু.পৃ. ২)

৫। এত শুনি শ্রীরাম আছাড় খায়্যা পড়ে ।
পড়িল কদলী জেন বৈশাখের ঝড়ে ।। (সীতাহরণ পালা, পু.পৃ. ৫ক)

৬। এত বলি রাম কান্দে কেশ পাশ নাহি বান্ধে
মোর সীতা জেন কল্পতরু ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৬ক)

৭। দেখিয়া লক্ষ্মণবীর মহাক্রোধ হইল ।
জ্বলন্ত অনলে জেন ঘৃত ঢালি দিল ।। (প্রাগুক্তি, পু.পৃ. ৭ক)

৮। অনুসঙ্গী ছিল যত রাজার রক্ষক ।
মণ্ডুক পালায় জেন দেখিঞা তক্ষক ।। (অঙ্গদ রায়বার, পু.পৃ. ৩)

৯। অঙ্গদের কথা শুন্যা দশানন হাসে ।
কেতকী কুসুম জেন ফুটে ভাদ্রমাসে ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৬)

১০। ভাই ভাই একাসনে বসিলা লঙ্কাতে ।
মলয় পর্বত জেন হিমালয় সাথে ।। (রাবণ কুম্ভকর্ণ সংবাদ, পু.পৃ. ১)

১১। ভঙ্গ দিয়া বানর পালায় উভরড়ে ।
পক্ষ জেন দিগে দিগে উড়্যা পড়ে ঝড়ে ।। (লক্ষ্মণের শক্তিশেল, পু.পৃ. ২ক)

১২। দোলা হৈতে সীতা তবে নাম্বিল ভূমিতলে ।
পূর্ণিমার চন্দ্র জেন গগনমণ্ডলে ।। (সীতার পরীক্ষা, পু.পৃ. ৬)

১৩। এমন ধনুক রাম ধরে বামহাথে ।
গজশিশু শুণ্ডে জেন ইক্ষুযষ্টিতে ।। (রঘুনাথের বনবাস, পু.পৃ. ১)

প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা :—

কোপে হনূমান তারে ধর‍্যা দিল পাক ।
কালনিমা ঘুর‍্যা বুলে কুমারের চাক ।। (লক্ষ্মণের শক্তিশেল, পু.পৃ.৯)

ব্যতিরেক :—

১। মুখশশী মৃণাল জিনিঞা ভুজদণ্ড ।
দক্ষিণে লক্ষ্মণ তনু বামেতে কোদণ্ড ।। (অঙ্গদ রায়বার, পু.পৃ. ৭)

২। শিবের দুর্জয় বাণ রামের বুকে ফুটে।
জবাপুষ্প জিনি অঙ্গ রক্তবিন্দু উঠে ॥ (শিবরামের যুদ্ধ, পু.পৃ. ৮)

অনুপ্রাস :—

আদ্যানুপ্রাস —

বাসনা বিনাশ হল্য বঞ্চিত বিধাতা। (রঘুনাথের বনবাস, পু.পৃ. ১১)

মধ্যানুপ্রাস (র-ধ্বনিতে) —

নতশিরে অতিদূরে রাজারে সম্ভাষে। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ২৩ক)

ন-ধ্বনিতে অনুপ্রাস —

গজভ্রমে নিশাযোগে নাশিল অজ্ঞানে ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ২৪)

অন্ত্যানুপ্রাস —

হাতে পদ্ম পায়ে পদ্ম পদ্ম গন্ধ গায়।
চলিতে চরণযুগ মধুকর ধায় ॥ (রাবণ কুম্ভকর্ণ সংবাদ, পু.পৃ. ৫ক)

নদ নদী দুরবার দুর্গম সরণি।
বিষম বনের পথ নাহিক তরণী ॥ (রঘুনাথের বনবাস, পু.পৃ. ১১)

অপ্রচলিত শব্দ ও তাহার অর্থ :-

অকার (ব্রহ্মা) — ত্রৈলোক্য ঈশ্বর হয়্যা সেবিয়া অকারে। শি.যু.,পু.পৃ. ৩
অনুরত (অনুরক্ত) — শ্লাঘ্য জীবন ধন্য প্রজা অনুরত। র.ব.,পু.পৃ. ২ক
অরিষ্ট (অমঙ্গল)— নৃপ কহেন যাউক তোমার অবিষ্ট সকল। র.ব.,পু.পৃ. ১৩ক
আই-মা (বিস্ময় সূচক অব্যয়)— হায় হায় মরি মরি আই- মা কি লাজ। র.ব.,পু.পৃ. ১৩
আওড় (দৃষ্টিবহির্ভূত) — আঁখের আওড় হল্যো তেজিব পরাণি। র.ব., পু.পৃ. ১১ক
আঁকাড়ি (বেষ্টন) — লক্ষ্মণের পায়ে ফেলে আঁকাড়ি করিয়া। শি.যু., পু.পৃ. ৪ক
আঁট (দৃঢ়বন্ধন) — সুগ্রীবের পরাভব বালি রাজার আঁট। রা.সু.মি., পু.পৃ.৪
আড়ায় (ডাঙ্গায়) — কুম্ভীর সহিত বীর উঠিল আড়ায়। ল.শ. (ক.বি. ৩৮৪৩),পু.পৃ. ৪
আড়ে (আড়ালে) — অঞ্জনা কহে হনূমান জাহ পর্বতের আড়ে। র.দে.,পু.পৃ. ৪ক
আতস (ফা. আতশ্ - উত্তাপ, আগুনের ঝাঁজ) — আতসে মিলায় সীতা প্রাণ নহে স্থির। সী.উ.,পু.পৃ.১
ইথে (ইহাতে) — এক পুত্র দিব আমি ইথে কি বিচার। সু.ক.,পু.পৃ. ৬
উছুর (অধিক সময়) — রাজা হত্যে অহে রাম হবেক উছুর। র.ব.,পু.পৃ. ৯

উতরোল (আকুলি বিকুলি) — বানরের উতরোল দেখে রাঙ্গা পা। সী.প.,পু.পৃ.৫

উথলিল (উপচিয়া পড়া) — উথলিল শোকসিন্ধু ম্লান হৈল মুখইন্দু
লোচনে রাখিতে নারে লোহ। র.ব.,পু.পৃ. ১১ক

উপানহ (পাদুকা) — উপানহ জোগায়্যা থাকিব বিভাবরী। র.ব.,পু.পৃ.৩

উভরড়ে (চতুর্দিকে) — ভঙ্গ দিয়া বানর পালায় উভরড়ে। ল.শ.,পু.পৃ. ২ক

ঊন (ন্যূন) — বালির তনয় আছে কোন অর্থে ঊন। (সা. ১৫৪৫ নং)- অ.রা.,পু.পৃ.২ক

একত্তরে (একসঙ্গে) — খাত্যে শুত্যে রাম সঙ্গে একত্তরে মেলা। র.ব.,পু.পৃ. ১৫ক

ঐরি (বৈরি) — রাবণ বলে কালনিমা মার মোর ঐরি। ল.শ., পু.পৃ. ৬

ওর (সীমা) — ভাগ্যের নাইক ওর প্রভু রঘুনাথ। রা.সু.,মি.পু.পৃ. ১

কক্ষা (কলহ) — তাঁহার সহিতে কক্ষা আর রক্ষা নাই। অ.রা.,পু.পৃ. ৬ক

কথ (কথা) — বিস্তার বাল্মীক মত আধ্যাত্মিক নবম কথ
রসসিন্ধু রামলীলা গান। র.ব.,পু.পৃ.৭

কথো (কিছু, কতিপয়) — ভূপতির কথো প্রায় হইল চেতন। র.ব.,পু.পৃ. ১৩ক

করুণা (কাতর ভাব) — করুণা করিয়া কান্দে আর্তনাদ করি। র.ব.(ক.বি.৩৯), পু.পৃ.১৫

কাঁঠী (কন্ঠমালার এক একটি দানা) — পুরটের কাঁঠী হীরা মণি কন্ঠমাল। র.ব.,পু.পৃ. ৫ক

কুতূহলে (কৌতূহলে) — নাচে গায় কুতূহলে নানা খেলা করি। হ.উ.,পু.পৃ.১

কুররী (কুরল পক্ষিণী) — পতি পুত্র শোকদ্বয় ইথে নাকি প্রাণ রয়
কান্দে রাণী কুররীর প্রায়। র.ব.,পু.পৃ. ২৬

কেন্নাই (কেন না) — করে কেন্নাই রাবণ রাজা যুদ্ধের আরম্ভ। অ.রা.,পু.পৃ. ১

খড়ি (খুস্‌কি) — প্রখর নখর দীর্ঘ গায়ে উড়ে খড়ি। ল.শ.,পু.পৃ. ৭ক

খুঞা (মোটা ছোট কাপড়) — পরাল্য খুঞার বাস নিল পাট শাড়ী। হ.উ.,পু.পৃ. ৩ক

খুদ্দিতে (খদ্যোৎ বা স্বল্প আলো) — খুদ্দিতে উদয় হয় সূর্য হয় পাত। অ.রা.,পু.পৃ. ৫ক

খোলাডাঁই (অর্থাৎ অতিশয় ব্যাকুল) — অভাগিনী খোলাডাঁই বাছনের তরে। হ.উ.,পু.পৃ. ৮ক

গারস্ত (গার্হস্থ্য = গৃহস্থালী) — গৃহিণীর পাপে গারস্ত নষ্ট লক্ষ্মী উড়্যা যায়। অ.রা.,পু.পৃ. ৬ক

গুণাকর (গুনবান) — গুণাকর নৃপবর ভরত গুণনিধি। র.ব.,পু.পৃ. ১৮ক

গুণাগার (ফা. গুণহ্‌গাবী = লোকসানীর মূল্য) — গুণাগার নিব তোর একশত টাকা।
হ.উ.,পু.পৃ.৮

গুহা (গোহক চণ্ডাল) — শুনিঞা গুহার চিত্ত হইল বিকল। র.ব.,পু.পৃ. ১৯

গোঙান (কাটান) — বনে যেন রামচন্দ্র সুখেতে গোঙান। র.ব.,পু.পৃ. ১৩

গোড়ায়্যা (অনুগমন করিয়া) — আমরা গোড়ায়্যা যাব লক্ষ্মণের মত। র.ব., পু.পৃ.১২

গোড়াল্য (অনুসরণ করিল) — ইক্ষ্বাকুবংশের শ্রী তোমারে গোড়াল্য। র.ব.,পু.পৃ.৩
ঘাটিআল (ঘাট-রক্ষক) — রাণী বলে ঘাটিআল টাকাকড়ি নাই। হ.উ.,পু.পৃ. ৯ক
চড়া (টান, ছিলা) — চড়া দিয়া আটঙ্কার মাবিয়া দিল টান। র.ব.,পু.পৃ. ২ক
চাকড়া (শক্ত) — চাকড়া প্রস্তর হয়্যা অই স্থানে থাক। সু.ক.,পু.পৃ. ৫ক
চাপড় (চড়) — মর‍্যাছিলে হনূমানের চাপড়ের ঘায়। ল.শ.,পু.পৃ. ৭ক
চোখ (তীক্ষ্ণ) — চোখ অস্ত্র দিয়া ডাল কাটে প্রতি গাছে। শি.যু.,পু.পৃ. ৩ক
চৌরস (প্রশস্ত)— দীর্ঘনাসিকা চারু চৌরস কপাল। অ.রা.,পু.পৃ. ৭
ছণ্ড (ছন্নছাড়া) — শিশুমতি অঙ্গদ হইব মোর ছণ্ড। রা.স.মি., পু.পৃ. ৪ক
ছিড়াইব (ছিড়িব) — লোহার মুদ্গারে তোর ছিড়াইব মাথা। হ.উ.,পু.পৃ. ৮
ছিলে (ছিলাতে = ধনুকের জ্যা) — পর্বত তুলিয়া দিল ধনুকের ছিলে। ল.শ.,পু.পৃ. ১৩
ছোড়ান (মুক্তকরা)— রাজা বলে দেখি তোরে কে করে ছোড়ান। হ.উ.,পু.পৃ. ৯
জাতে (যাত্রায়) — রাবণ বলিবেক এই বানরা আসে প্রতি জাতে। অ.রা.,পু.পৃ. ১
জাঙ্গাল (সেতু) — সীতাবার্তা কয়্যা রামে বান্ধালেক জাঙ্গাল। ল.শ.,পু.পৃ.৭ক
জী (বাঁচি) — এবারে রামের হাতে কদাচিৎ জী। অ.রা.,পু.পৃ. ৩ক
জীতে জীতে (বাঁচিয়া থাকিতে) — তোমাবে করিব রাজা আমি জীতে জীতে।
র.ব.,পু.পৃ.৩ক
জীবার (বাঁচিবার) — নাহিক জীবার আশ এই মনে অভিলাষ
লোচনে দেখিব আমি রাম। র.ব.,পু.পৃ. ২৬
জুয়ায় (উপযুক্ত হয়) — শরণাগত স্বামীবে নাশিতে না জুয়ায়। র.ব.,পু.পৃ. ১২
ঝকঝকিতে (ঝামেলায়) — মিছা ঝকঝকিতে কাজ নাঞিক দেশ্কে চল্যা যাই।
অ.রা.,পু.পৃ.৫ক
ঝাট (ব্রজ. ঝটিতি = শীঘ্র) — রামে ডাক্যা আন ঝাট দেখিব নয়নে। র.ব.,পু.পৃ.৭
ঝুরে (ক্ষরতি)— তোরে না দেখিয়া আমার দুটি আঁখি ঝুরে। র.ব.,পু.পৃ.
ঞিহারে (ইহারে) — ঞিহারে জপিয়া আমি হইয়াছি অমর। শি.যু.,পু.পৃ. ১১
টাড়বালা (উপরহাতের অলঙ্কার) — প্রবাল মুকুতা হার লয় টাড়বালা। হ.উ.,পু.পৃ. ৩ক
টুটা (ভগ্ন, দুর্বল) — শ্রীরাম রাবণে রণে কেহ নহে টুটা। ল.শ.,পু.পৃ. ২ক
ঠাড় (দণ্ডায়মান) — হনূ বলে বলহীন ঠাড় হত্যে নারি। ল.শ.,পু.পৃ. ১৩
ঠেক (সঙ্কট) — তুমি না তারিলে ভূপতির বড় ঠেক। র.ব.,পু.পৃ. ৮ক
ডাকাবুকা (অসমসাহসী) — ডাকাবুকা মাগী ইহার অতি দূরে ঘর। হ.উ.,পু.পৃ.৮
ঢেমচা (বাদ্যযন্ত্র বিশেষ) — ঢেমচা ডিণ্ডিম ঢাক বাজে রণ পড়া। র.ব.,পু.পৃ. ১৯

নৌতন (নূতন) — দূর্বাদলশ্যাম রাম নৌতন তমাল । অ.রা.,পু.পৃ. ৭

তর্কচে (ফা. তরকশ্ > তরকচ = তূণীর)— বরুণের দত্ত ধনু অক্ষয় তর্কচে ।

র.ব.,পু.পৃ.১২ক

তুয়া (তোমার)— মোরে না ছাড়িহ মাতা ধরি তুয়া পায় । হ.উ.,পু.পৃ. ৩

তোক (পুত্র) — যুবতী হইয়া আইস লয়া মৃত তোক । হ.উ.,পু.পৃ. ৮-৯ক

থুক (রাখুক) — আরবার থুক নিঞা জাঞা বাপের সনে । অ.রা.,পু.পৃ. ৫ক

দরায় (ফা. দরিয়া, দরয়া = সমুদ্র বা নদী) — অহঙ্কার ভাবে ডিঙ্গা ডুবালি দরায় ।

অ.রা.,পু.পৃ.৬ক

দস্তুর (ফা. দস্তুর্ = প্রথামত) — তীরে এলে কড়ি লাগে দস্তুর রাজার । হ.উ.,পু.পৃ. ৯

দাদ (প্রতিশোধ) — লক্ষ্মণের দাদ আমি হাথে হাথে দিব। ল.শ.,পু.পৃ.৪

দিঠি (দৃষ্টি) — কখন বা ভূমে রাখি চায় এক দিঠে । হ.উ.,পু.পৃ. ৮ক

দিয়ান (ফা. দীবান্ = দরবার)— এতেক কটকে রাজা কর্য্যাছে দিয়ান । অ.রা.,পু.পৃ. ২

দে (শরীর) — সুমেরু পর্বত যেন অঙ্গদের দে । অ.রা.,পু.পৃ. ৩

দেউটি (প্রদীপ) — আকাশ দেউটি বীরের দুটা চক্ষু জ্বলে । অ.রা.,পু.পৃ. ৩

ধনিন (সংত ধনিন = ধনী) — দরিদ্রে ধনিন করি দিয়া রত্ননিধি । র.ব.,পু.পৃ. ৫

ধিকাধিক (গালি, নিন্দা)— ইহার লাগি মায়ে কেন ধিকাধিক বল । ভ.পি.,পু.পৃ. ৬ক

নক্র (কুম্ভীর) — পড়িল বা ঘোরচক্রে ধরিয়া বা খাল্য নক্রে

হেন বুঝি সর্বনাশ হল্য । র.ব.,পু.পৃ. ২৪ক

নফর (আ. নফর্ = চাকর)— লক্ষ্মণ হৈতে মোরা তোমার নফর । ভ.পি.,পু.পৃ. ৪

নাছে (সদর দরজা, খিড়কি বা পিছনের দরজা) — কঠিন পশ্চিমের লোক দাণ্ডায়্যা থাকি

নাছে । সৃ.ক.,পু.পৃ. ৬ক

নিছনি (সংত. নির্মঞ্ছনিকা = বালাই) — ধন্য লক্ষ্মণ তোমার নিছনি

ধন্য তুমি সকল সংসারে ।

র.দে.,পু.পৃ. ৭ক

নেউ (লাউ > নেউ) — বড় বড় বানরের নেউ পারা পেট । সী.উ.,পু.পৃ. ১

নেহালে (দেখে) — প্রাচীরে উঠিয়া হনূ চৌদিগে নেহালে । সী.উ.,পু.পৃ. ২ক

পক্ষ (পক্ষী অর্থে) — ছাড়্যা দেহ পক্ষগোটা পাক জীবন । সী.হ.,পু.পৃ. ৭

পচাল (অকথ্যগালি)— নিঃস্বার্থক পচাল পাড়্যা কেনে মচ্ছিস বুড়া । অ.রা.,পু.পৃ. ২ক

পাকল (রক্তবর্ণ) — পাকল আঁখি করি রাম বিভীষণে বলে । সী.প.,পু.পৃ. ৬ক

পানি (জল) — পানির পসরা যেন বরিষে গগনে । শি.যু.,পৃ.পৃ. ৬

পামরী পামর (পাপিষ্ঠা পাপিষ্ঠ) — পামরী পামর নাগর সব কোথা। হ.উ.,পু.পৃ. ৯ক
পারা (মতো) — আহা মরি আস্য কোলে বাছা আল্যে পারা। র.ব.,পু.পৃ. ২৪ক
পালার (পল্লবের) — করিয়া পালার সর বনে বাস করি। সূ.ক.,পু.পৃ. ২ক
পাসরি (বিস্মৃত হই) — যোগে জপি রাম নাম আপনা পাসরি। র.ব.,পু.পৃ. ২২
পিয়ল (হরিদ্রা বর্ণ) — বিশল্যকরণী নাম পিয়ল বর্ণের পাতা। ল.শ.,পু.পৃ. ৬
পুত (পুত্র) — পালাবেক বানরা বেটা ধর্ত ওরে পুত। অ.রা.,পু.পৃ. ৭ক
পুরট (স্বর্ণ) — প্রবাল পুরটহার পদক ভূষণ। র.ব.,পু.পৃ. ২
পুষার্ত (পৌরুষত্ব) — পুষার্ত কত এখন ধরা পালনে। অ.রা.,পু.পৃ. ৩ক
পেল (ফেল) — দেড়বুড়ি আগে পেল আমার মাগন। হ.উ.,পু.পৃ. ৮
পোথা (পুথি) — শ্লোকার্থ সঙ্গীত গাথা বাল্মীক ব্যাসের পোথা
কবিচন্দ্র করি অনুমান। র.ব.,পু.পৃ. ৭
ফুকুরি (ডুকরিয়া বা ফুকরিয়া কাঁদা) — ফুকুরি কান্দিতে নারে হৃদে প্রাণ ফাটে। হ.উ.,পু.পৃ.৪
বই (বাদে, পরে) — সাত ঋষি পুনঃ আল্য হাজার যুগ বই। র.ব.,পু.পৃ. ২২
বা (বাতাস) — হনূ বিভীষণ করে চামরের বা। সী.প.,পু.পৃ. ৫
বাঙন (খর্বকায ব্যক্তি, বামন) — বাঙন হঞিঞা হাত বাড়াইলি চাঁদে। অ.বা.,পু.পৃ. ৬ক
বাছনি (বাছা) — সাবধানে কর সেবা শুনরে বাছনি। ভ.পি.,পু.পৃ. ৫
বাট (অবস্থান, লাঠি)— রাজা হৈয়া বিভীষণ ভূমে রহে বাট। সী.প.,পু.পৃ. ৫
বাঢ়া (বৃদ্ধি, বড়) — পতির বাঢ়া নাহি নারীর ধর্মপথ দেখ। র.ব.,পু.পৃ. ১১ক
বানি (পারিশ্রমিক) — অঙ্গদে দিলেন বানি শ্রীরামের পায়। রা.সু.মি., পু.পৃ. ৭ক
বাপা (বপ্র = বাপ) — চৌদ্দ বৎসর বাপা দিল বনবাস। র.ব.,পু.পৃ. ৯
বাল্যে (বালীকে, সুগ্রীব ভ্রাতা) —
বাল্যে কয় রঘুনাথ শুনরে দুর্জন।
তোরে বধিলাঙ আমি প্রতিজ্ঞা কারণ। রা.সু.মি., পু.পৃ. ৫
বিতথা (বিপদ) — চক্ষে সে দেখিবে চল মামার বিতথা। শি.যু.,পু.পৃ. ৯ক
বিদায় (আ. বিদাআ) — বিদায় হইবে তুমি ভরতে আনাব আমি
অযোধ্যার পাটে হব রাজা। র.ব.,পু.পৃ. ৯ক
বেভায়ে (সকল বিষয়ে) — হাস্য পরিহাস্য ভোগ বেভায়ে নাই মন। র.ব.(ক.বি. ৩৯নং),
পু.পৃ. ১৬
ভরমে (ভ্রমে) — ভরমে রামের রূপ ধরণীতে লেখে। অ.রা.,পু.পৃ. ৩ক
ভারিভূরি (ভড়ং) — হনূ বলে মোর ঠাঁই কিসের ভারিভূরি। ল.শ.,পু.পৃ. ৯ক

ভুক্ষিলি (ভক্ষণ করিলি)— কালকূট বিষ ভুক্ষিলি হাতে কর্য়া। অ.রা.,পু.পৃ. ৬ক

ভূঞ্জায় (ভোগকরে) — ফলরূপী হয়্যা তুমি সে ফল ভূঞ্জায়। ভ.পি.,পু.পৃ. ৫

ভেল (ব্রজ. ভৈল = হইল) — পৃথিবী কম্পিত ভেল ভূপ পদভরে। সূ.ক.,পু.পৃ. ৫ক

মর্দানা (ফা. মর্দানা = আস্ফালন) — অঙ্গদ বলে বুঝিলাঙ রাজা মর্দানা তুমার। অ.রা.,পু.পৃ.৭

মালি (মারিলি) — বিদীর্ণ হইল ছাতি শেল মালি বুকে। র.ব.,পু.পৃ. ৬

মুণ্ডা (মুখী)— শোকাবেশে পুরীজন হৈল উর্ধ্বমুণ্ডা। র.ব.,পু.পৃ. ১৬ক

মুঞে (মুখে) — দশরথ মূর্ছা যায় শোকেতে মরিল প্রায়।
অবিরত রাম রাম মুঞে। র.ব.,পু.পৃ.৭ক

মুটকি (কিলমারা) — এত বলি ব্রজ মুটকি মারে বুকে। ল.শ.,পু.পৃ. ৯

মুষ্ঠকায় (মুষ্টাঘাত) — সুমেরু পর্বত যদি মুষ্ঠকায় নড়ে। অ.রা.,পু.পৃ. ৫ক

মোকে (আমাকে) — এতদিনে বিধাতা বঞ্চিত কৈল্ল মোকে। ল.শ.,পু.পৃ. ১৩ক

যুয়ায় (যোগ্য হয়) — বিধাতা বঞ্চিত তোরে শুতে না যুয়ায়। সী.প.,পু.পৃ. ২ক

রহায় (রাখে) — হনূমান আল্যো বল্যা সুগ্রীব রহায়। ল.শ.,পু.পৃ. ১৪ক

রড় (দৌড়) — দ্বারে দুয়ারি ছিল উঠ্যা দিল রড়। অ.রা.,পু.পৃ. ৩

রা কাড়া (স্বর বাহির করা) — রা কাড়িতে নাহি পারে পবননন্দন। সী.উ.,পু.পৃ. ৫ক

রাণ্ডি (সং৩.রণ্ডা > রাঁড়ি = বিধবা) — শূর্পণখা রাণ্ডির কথা তোরে হল্য বেদ।
অ.রা.,পু.পৃ. ৬ক

রায় (শব্দ) — ভূপতির নিদ্রাভঙ্গ ছাওয়ালের রায়। সূ.ক.,পু.পৃ. ৫ক

রুবেক (রোপনকরিবে)— উপাড়্যাছে গাছ পাথর সেইখানে তা রুবেক। অ.রা.,পু.পৃ. ৫

লড়ি (লকুট = লাঠি)— অধনের ধন বাছা অন্ধকের লড়ি। র.দে.,পু.পৃ. ৭ক

লেহ (লহ)— বাঁচাবে আমারে যদি বনে লেহ সাথে। র.ব.,পু.পৃ. ১১ক

লোহ (অশ্রু) — উথলিল শোকসিন্ধু ম্লান হৈল মুখইন্দু
লোচনে রাখিতে নারে লোহ। র.ব.,পু.পৃ. ১১ক

লোরে (অশ্রুতে) — নয়নের লোরে পথ দেখিতে না পায়। ভ.পি.,পু.পৃ. ৩

শয় (শত) — রামের পদে বানর পড়য়ে শয় শয়। রা.সু.মি., পু.পৃ. ১০ক

শাগুল (শার্দূল = বাঘ) — সিংহের সাক্ষাতে কোথা শাগুল বাঁচ্যাছে। শি.যু.,পু.পৃ. ৮ক

শুনু (শুন্য) — কৈকেয়ী কি দোষে মোর কোল কৈল শুনু। র.ব.,পু.পৃ. ১৮ক

সতা (সৎ-মা) — দারুণ নির্দয় সতা বনে পাঠালেক। র.ব.,পু.পৃ. ১৮ক

সর্বলোমা (শূকর) — পাল চারি পাঁচ মোর আছে সর্বলোমা। হ.উ.,পু.পৃ. ৪

সাট (বেত্র) — কটকের হুড়াহুড়ি হাথে নিল সাট। সী.প.,পু.পৃ. ৫

সাম্বাইল (প্রবেশ করিল) — আমা পোড়াইতে উল্কা সাম্বাইল ঘরে। সী.উ.,পু.পৃ. ১২
সতন্তর (পৃথক) — রাজার কড়ি পেল আমি সতন্তর নই। হ.উ.,পু.পৃ. ৯ক
সত্তান্তে (সত্বরে) — অদ্য বা সত্তান্তে হয় অবশ্য মরণ। হ.উ.,পু.পৃ. ৭ক
সায়রে (সাগরে) — মহারাজা মরিয়াছেন দুঃখের সায়রে। র.ব.,পু.পৃ. ২৫
স্মঙরি (স্মরিয়া)— স্মঙরি যতেক গুণ ধূলায় লুটায়। ভ.পি.,পু.পৃ. ৪ক
হটক্কারে (হঠাৎকারে) — হটক্কারে এসব কথা না কর সাহস। অ.রা.,পু.পৃ. ২ক
হাইবাসে (হতাশায়) — আমার হাইবাসে সীতা কোনদিন মরে। সী.উ.,পু.পৃ. ১
হালে (কাঁপে) — আর ভিক্ষায় যাইতে নারি অঙ্গ মোর হালে। সূ.ক.,পু.পৃ. ৬ক
হেদে (হেথায়) — হেদে বস্যাছেন রাবণ রাজা রাম রাম আমার। অ.রা.,পু.পৃ. ৭

নবম অধ্যায়

মল্লভূমের সাহিত্য-ধর্ম-সংস্কৃতিতে কবিচন্দ্রের স্থান
এবং
পরবর্তীকালের বাংলাসাহিত্যে কবিচন্দ্রের প্রভাব

মল্লভূম প্রাচীনকাল হইতেই সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ। সৃজনশীল সাহিত্যের পুরোভাগে পাওয়া যায় রামাই পণ্ডিত রচিত শূন্য পুরাণের নাম। ধর্মঠাকুর মর্ত্যলোকে পূজালাভের জন্য জাজপুর নিবাসী রামাই পণ্ডিতকে অনুগ্রহ করেন। এই শূন্য পুরাণের আনুমানিক রচনাকাল ১৬শ-১৭শ খ্রীষ্টাব্দ।[১] রামাই পণ্ডিত যেমন ধর্মের গাজনের প্রথম পুরোহিত, ময়ূরভট্টও তেমনি হাকন্দ তপস্যার পথ-প্রদর্শক এবং ধর্মমঙ্গলকাব্যের আদিকবি রূপে পরিচিত।[২] বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ১৩১৬ বঙ্গাব্দে বনবিষ্ণুপুরের সন্নিকট কাঁকিল্যা গ্রাম নিবাসী প্রভুপাদ শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশোদ্ভূত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাস রচিত কৃষ্ণলীলা বিষয়ক এক সুবৃহৎ কাব্য আবিষ্কার করিয়া ১৩২৩ বঙ্গাব্দে (১৯১৬ খ্রীঃ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে "চণ্ডীদাস বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" নামে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম এই পাণ্ডুলিপিখানি আবিষ্কারের পর অনেকেই এই বিষয়ে একমত যে, "শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন" কাব্যের রচয়িতা বাসলী উপাসক বড়ু চণ্ডীদাস ছিলেন বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত ছাতনার আর সুললিত পদকর্তা সহজ সাধক দ্বিজ চণ্ডীদাস ছিলেন বীরভূম জিলার নান্নুরের অধিবাসী।* বড়ু চণ্ডীদাসের এই ঐতিহ্যানুসারে অথবা তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই এই জিলায় বাসলীপূজার বিশেষ প্রচলন হইয়া থাকিবে।

মল্লভূমের ধর্মীয় জীবনে ও সাহিত্যাকাশে যে সকল বিভিন্ন ভক্তিধারা সুসংহতরূপ লাভ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে বৈষ্ণব রসধারাই প্রধান। বৈষ্ণবধর্মের প্রবল তরঙ্গাভিঘাত দেখা যায় শ্রীনিবাসাচার্যের প্রভাবে রাজা বীর হাম্বীরের রাজত্বকালে (খ্রীঃ ১৫৯১-১৬১৬)। অবশ্য বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব মল্লভূমে বহু পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। তাহার কারণ শ্রীজীব গোস্বামীর আত্মীয় মথুরেশ সার্বভৌম মল্লভূমে আগমন করেন শ্রীনিবাসের পূর্বে। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া একটি ভক্তমণ্ডলী গড়িয়া উঠিলেও উহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল নিতান্তই সীমিত। প্রভুপাদ শ্রীনিবাসাচার্যকে কেন্দ্র করিয়া বনবিষ্ণুপুরে যে সহজ সাধনার ধারা বিকাশ লাভ করে তাহা বৈষ্ণবের প্রেম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। নবপ্রচারিত প্রেমধর্মের জোয়ারে ও মল্লরাজ বীরহাম্বীর কর্তৃক শ্রীনিবাসাচার্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণের ফলে সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে বিপুল উৎসাহের সাড়া জাগে। ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের নবস্পন্দনে মল্লভূম দ্বিতীয় বৃন্দাবনের শ্রী ধারণ করে। শ্রীনিবাসাচার্য এবং তাঁহার পুত্র

গতিগোবিন্দের প্রভাবে মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুর বৈষ্ণবদের অন্যতম পাটে পরিণত হয়। রামচন্দ্র কবিরাজ ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিখ্যাত পদকর্তা গোবিন্দ দাস আচার্য প্রভুর ভক্ত হন। মল্লভূমের সাহিত্য সম্ভার ইহার পর ক্রমে সমৃদ্ধতর হইতে থাকে। আচার্য প্রভুর কন্যা হেমলতাদেবীও ছিলেন একজন উঁচুদরের পদকর্ত্রী। শ্রীনিবাসাচার্যের দিব্যজীবনের প্রভাবে এবং তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ও কন্যার ধর্মীয় মতাদর্শের স্নিগ্ধ শান্ত স্নেহচ্ছায়া-স্পর্শে বহু খ্যাতিমান বৈষ্ণব ভক্ত কবির আবির্ভাব ঘটে। মল্লবংশ-তিলক বীর হাম্বীরের ভণিতায় দুইটি পদ পাওয়া যায়।[৩] তবে রামচন্দ্র কবিরাজই রাজার ভণিতায় উহা রচনা করিয়াছেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। বীর হাম্বীরের পুত্র ধাড়ি হাম্বীরের ভণিতায়ও (সা.২০০) একখানি গুরুবন্দনা পদ পাওয়া গিয়াছে। মল্লরাজা গোপাল সিংহ (১ম) ছিলেন একজন উঁচুদরের বৈষ্ণব-ভক্ত কবি। তাঁহার রচিত 'রাধাকৃষ্ণ মঙ্গল' (সা. ১২৬৯) কাব্যের ভাষা অতি সুললিত এবং মধুর। শ্যামচাঁদের বন্দনাটি পাওয়া গিয়াছে রাজা চৈতন্য সিংহের ভণিতায়।[৪] সহজিয়া বৈষ্ণব দর্শনের উপর রচিত শ্রীলহেমলতা ঠাকুরাণীর একখানি "মানবী বিলাস" নামক কাব্য পাওয়া যায়।[৫]

কৃষ্ণ দাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের আদর্শে রচিত হয় যদুনন্দন দাসের 'কর্ণানন্দ' (কৃষ্ণ কর্ণামৃত) নামক গ্রন্থ।[৬] উহার চতুর্থ নির্যাসে রাজা বীর হাম্বীরকে রামচন্দ্র কবিরাজের উপদেশাবলী বিবৃত হইয়াছে। তিনি ছিলেন শ্রীলহেমলতাদেবীর একজন ঘনিষ্ঠ অনুচর। তাঁহার রচিত একখানি 'ভ্রমরগীতা' (এ.জি. ৫৪০৯, লিপিকাল ১২৫৮) পাওয়া যায়, গোপীদের বিরহ বর্ণনাই কাব্যখানির প্রধান বিষয়।

গোবিন্দ দাস কবিরাজের পৌত্র এবং দিব্য সিংহের পুত্র ঘনশ্যাম দাসের রচিত "গোবিন্দরতি মঞ্জরী" (এ.জি. ৩৭২৫, ১-৩৪ পৃ., লিপিকাল ১০৬৩ সাল) সংস্কৃত শ্লোকমালায় গ্রথিত একখানি পদাবলী সংগ্রহ।

পরাণ দাসের 'রসমাধুরী' (ক.বি. ৩২৮৯, ১-৩৫০ পৃ., লিপিকাল ১৭০৭ শকাব্দ) ব্রজলীলা বিষয়ক সুবৃহৎ কাব্য। তাঁহার পূর্ণনাম প্রাণবল্লভ দাস। তিনি বীরহাম্বীরের সভাপণ্ডিত ব্যাস আচার্যের বংশধর অথবা শিষ্য-বংশীয় ছিলেন।

উত্তম দাস গোপাল সিংহের রাজত্বকালে রাঘবের 'শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ রত্ন' (আধুনিক কাগজে তিন খণ্ডে অনুলিখিত) বাংলায় অনুবাদ করেন। তিনি রচনার শেষে রাজা গোপাল সিংহের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। (এ.জি. ৩৫৭২, ১-৮৮ পৃ., সম্পূর্ণ)।

অভয়পদ মল্লিক মহাশয়ের গ্রন্থে কয়েকজন মননশীল রচয়িতার নাম পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে মনোহব দাসের 'দিনমণি চন্দ্রোদয়', শুভঙ্কর রায়ের 'দারা' ও কাশীরাম বাচস্পতির 'স্মৃতিতত্ত্বটীকা' উল্লেখযোগ্য।[৭] মল্লভূমে চারিজন মনোহর দাসের নাম শোনা

যায় । প্রথমজন 'দিনমণি চন্দ্রোদয়' রচয়িতা মনোহর দাস সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত । দ্বিতীয়জন 'অনুরাগ বল্লী'র রচয়িতা মনোহর দাস, তিনি প্রথমে কাটোয়ায় পরে বৃন্দাবনে বসবাস করেন । তাঁহার গুরুর নাম রামশরণ চট্টরাজ । তবে এই দ্বিতীয় মনোহর দাসের সঙ্গে মল্লভূমের বিশেষ যোগাযোগ ছিল বলিয়া মনে হয় না । তিনি চৈতন্যদেবের পার্ষদ রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা বাণীনাথ পট্টনায়কের প্রপৌত্র । তৃতীয়জন রামায়েত সম্প্রদায়ের ভক্ত এক মনোহর দাস, রাজা বীর হাম্বীরের রাজত্বকালে কিছু রাম-বিষয়ক পদ রচনা করেন।' সোনামুখী গ্রামে তাঁহার আদি নিবাস ।
চতুর্থ মনোহর দাস রাজা চৈতন্য সিংহের সমসাময়িক কালে 'গীত পুষ্পাঞ্জলি' নামে গীতগোবিন্দের অনুসরণে একখানি সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন । ইহা ব্যতীত অভিরাম দাস (পদবী দত্ত) রচিত 'গোবিন্দ বিজয়' (মুদ্রিত), নরোত্তম দাসের 'বৈষ্ণবামৃত' (এ.জি. ৪৯৮৯এ), কৃষ্ণদাসের 'কণ্বমুনির পারণা' (১ম সং, ১৮২০ খ্রীঃ) ও রামকৃষ্ণ দাসের 'নারদ সংবাদ' (মহেন্দ্র লাল প্রেস হইতে ১৮২৪ খ্রীঃ মুদ্রিত) উল্লেখযোগ্য । আরও কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈষ্ণব নিবন্ধ কাব্য মল্লভূমে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয় । ঐ সকল রচনার মধ্যে তিলক রাম দাসের 'অভিরাম লীলামৃত' (১৩০১ সালে প্রকাশিত), রাইচরণ দাসের 'অভিরাম বন্দনা' (সা.প.প. ১৩১৩, পৃ. ১৯২, জাহ্নবাদেবীর প্রসঙ্গ পাওয়া যায়), শ্রীকৃষ্ণ দাস রচিত 'বৃন্দাবন লীলা' (ক.বি. ১৩৮৮, লিপিকাল ১০৬১ সন), শ্রীরূপ কর্তৃক 'ব্রজতত্ত্বনিবর্ত' (ক.বি. ১১৪৫, লিপিকাল ১০৮২ সন), দামোদর দাসের 'বৃন্দাবন পত্তন' (ক.বি. ২৬০৬, লিপিকাল ১০৮৩ সন) এবং বৃন্দাবন দাসের 'তত্ত্ববিলাস'-এর (এ.জি. ৩৫৯২, লিপিকাল ১০৮৯ সন) নাম করা যাইতে পারে ।

বীর হাম্বীরের রাজত্বকালে মল্লভূমে যে সংস্কৃত সাহিত্যের পঠন পাঠন ও পদ রচনার ধারা অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকে তাহাই বীর হাম্বীরের দুই পুরুষ পরবর্তী মল্লরাজা বীর সিংহের (২য়) রাজত্বকালে সহসা ধীরগতি লাভ করে ও শুরু হয় পালা রচনার প্রয়াস । সংস্কৃত কাব্য রচনা এবং বন্দনা ও পদ রচনা যুগ্মভাবে চলিতে থাকিলেও তদবধি সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ কর্মের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইতে থাকে । আবার অনুবাদের ক্ষেত্রেও এই যুগের সাহিত্য সর্বদা সংস্কৃতের আক্ষরিক নিয়মকে অনুসরণ না করিয়া শুধুমাত্র ভাবানুবাদের মধ্য দিয়া চলিতে চেষ্টা করে । ফলে সংস্কৃত মহাকাব্যের ও ভাগবতাদি গ্রন্থের অনুবাদ কর্মে বাঙ্গালীর সহজ গীতিময় ভাবটিই ধীরে ধীরে বিকশিত হইতে থাকে । ছোট কথা, ছোট ভাব, গীতিকাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য । ইহারই আকর্ষণে মহাকাব্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়া আখ্যান রচনায় ও চরিত্র চিত্রণে রচয়িতার ইচ্ছানুযায়ী অনুবাদ সাহিত্য স্বতন্ত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে । এইরূপ এক একটি আখ্যান অনুবাদ সাহিত্যে এক একটি

পালারূপে পরিচিত হয়। পালাগানের প্রবল জোয়ারে মহাকাব্যের আখ্যানসমূহ জনমানসের অভিপ্রেতানুসারে এক একটি পৃথক কাব্য বা পালারূপে পঠিত ও গীত হইতে থাকে। মঙ্গলকাব্যসমূহ, মহাকাব্য ও ভাগবতাদি হইতে উৎসৃষ্ট বিষয় এই সকল পালাগানের জন্য প্রথম হইতেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। ধর্মই এইযুগের সাহিত্যে মুখ্যস্থান অধিকার করিলেও তাহা সংস্কৃত সাহিত্যের যথাযথ অনুকরণ নয়— ভাবানুসৃতি। আমাদের আলোচ্য কবি শঙ্কর চক্রবর্তী ঠিক এই যুগের একজন সার্থক অনুবাদ শিল্পী। তাঁহার রচিত 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ', 'বিষ্ণুপুরী মহাভারত' (কয়েকটি পর্ব ব্যতীত) ও 'ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গল' কাব্যত্রয় এবং দুইখানি মঙ্গলকাব্য — 'শিবমঙ্গল' ও 'অনাদিমঙ্গল' এইরূপ পৃথক পৃথক পালার সমষ্টি। মল্লরাজ সভায় এবং জনসভায় এই কাব্যসমূহ গীত এবং পঠিত হইত। খুব সম্ভব সেইকারণে উহাদের সংক্ষিপ্ত পালাগুলি আমাদের নজরে পড়ে। মল্লভূমে কবিচন্দ্রের পূর্বে মহাকাব্যের বিষয়কে পালারূপে প্রচার কেহ করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় না। এইজন্য আমরা অনুমান করি তিনিই মল্লভূমে আখ্যানমূলক পালাগানের, বিশেষতঃ মহাকাব্য বর্ণিত পালার প্রথম সার্থক স্রষ্টা। কবিচন্দ্রের পূর্বে আর কেহ মল্লভূমে গীতিকাব্য বা পালাগান রচনায় এতদূর সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। কারণ তিনি বীরসিংহের (২য়) রাজত্বকাল (আঃ ১৬৫৬-১৬৮২ খ্রীঃ) হইতে গোপাল সিংহের (১ম) রাজত্বের (আঃ ১৭১২-১৭৪৮ খ্রীঃ)-প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত একটানা সুদীর্ঘকাল কাব্যসাধনা করিয়া ও কিছুকাল রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়া যশস্বী হন। নিত্য গ্রন্থপাঠ ও ধর্মগ্রন্থ শ্রবণ প্রজাসাধারণের প্রতি ছিল রাজা গোপাল সিংহের সুকঠিন নির্দেশ। ইহার যথোপযুক্ত পরিবেশ রাজসভাকবিদের অবশ্যই প্রস্তুত রাখিতে হইয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের দুরূহ ব্যাখ্যা কিংবা কেবল মহাজন জীবনী-গ্রন্থ দীর্ঘদিন এইভাবের উপযুক্ত বাহন হইতে পারে না। আপামর জনসাধারণকে রসাকৃষ্ট করিতে পারে একমাত্র ভাগবত ও মহাকাব্য বর্ণিত নানা ধর্মীয় এবং নীতিকথামূলক আখ্যানের অকৃত্রিম ভাব ও সুষমা। তাহাও আবার ভাবময় সঙ্গীতের মাধ্যমে পরিবেশিত হইলে যে পরিমাণে হৃদয়গ্রাহী হয় অন্য কোনওভাবেই তাহা হয় না। কথিত আছে কবিচন্দ্র নিজে একজন পালাগায়ক ছিলেন। হয়তো এই কারণেও তিনি মল্লভূমে সকলের প্রিয় কবিরূপে সম্মানিত হইতে পারিয়াছিলেন। কবিচন্দ্রের সমসাময়িককালে ও পরবর্তীযুগে এই পালাগানেরই অনুবর্তন দেখা যায়। এই যুগের অধিকাংশ কবির রচিত পুথিতে মাঝে মাঝে রাগের নাম, যেমন — পাহিড়্যা রাগ, শ্রীরাগ ইত্যাদির উল্লেখ কিংবা ভণিতায় গানের কথা ঘোষিত হইয়াছে। আর রামায়ণের কবিগণ স্ব স্ব রচনাকে 'রামলীলা' আখ্যায় অভিহিত না করিয়া যে পারিতেন না তাহা তো এখন সর্বজনবিদিত। এই যুগের সাহিত্য সৃষ্টিকে আমরা মূল বিষয়ানুসারে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত

করিয়া আলোচনায় অগ্রসর হইতে পারি। এই গুচ্ছের মধ্যে রাম-কথা, ভারত-পাঁচালী, কৃষ্ণলীলা, মদনমোহন বন্দনা, ধর্মমঙ্গল এবং সত্যপীর-বন্দনাই প্রধান। মল্লভূমে বহু খ্যাত অখ্যাত কবি এইযুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সকলের সম্পূর্ণ কাব্য এবং সম্পূর্ণ পরিচয় জানা না গেলেও যাঁহাদের পুথিপত্র আমাদের গোচরীভূত হইয়াছে তাঁহাদের সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য ও কাব্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই সকল কবিদিগের অধিকাংশই কবিচন্দ্রের পরবর্তী কবি, অবশ্য দুই একজন কবিচন্দ্রের অগ্রবর্তী ছিলেন বলিয়াও জানা যায়।

প্রথমে রাম-কথা বা রামায়ণ-কাব্যগুচ্ছ আলোচিতব্য। এই গুচ্ছের মধ্যে ফকিররাম কবিভূষণ, কবিচন্দ্র, দ্বিজলক্ষ্মণ, দ্বিজ সীতাসুত, রামপ্রসাদ ও জগদ্রাম, ভবানীশঙ্কর (?) রাধামাধব ঘোষ, সাফল্যরাম ও দ্বিজ ধনঞ্জয়, বাণীকন্ঠ, দ্বিজ দুলাল, দ্বিজ শম্ভুসুত এবং রায়বার পালা রচয়িতা দ্বিজরাম, কাশীনাথ, দ্বিজ তুলসী ও খোশলশর্মার নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল রামায়ণ রচয়িতাদের মধ্যে একমাত্র ফকিররাম কবিভূষণ ব্যতীত অপর সকলের কাব্য কবিচন্দ্রের রামায়ণ রচনার কিছু পরবর্তীকালে রচিত বলিয়া অনুমান। ফকিররামের যে কয়খানি রামায়ণের পুথি পাওয়া যায় তন্মধ্যে একখানির (ক.বি. ২৮৩, সম্পূর্ণ) লিপিকাল ১০০৮ সন। ইহা খুব সম্ভব মল্লসন, ইহাকে বাংলা সনে পরিবর্তিত করিলে দাঁড়ায় ১১০৯ সাল। কবিচন্দ্রের রামায়ণের পুথিগুলি ১০০৮ সনের পরবর্তীকালে অনুলিখিত দেখিয়া অনেকে মনে করেন ফকিররাম কবিচন্দ্রের পূর্ববর্তী কবি।[৯] তবে কবিচন্দ্রও তাঁহার রামায়ণখানি উক্ত ১০০৮ সন অর্থাৎ ১১০৯ বঙ্গাব্দের মধ্যে (১৭০২ খ্রীঃ) রাজা রঘুনাথ সিংহের (২য়) রাজত্বকালে রচনা শেষ করেন। কাজেই ফকিররাম, কবিচন্দ্রের সময়ের দিক হইতে খুব বেশী অগ্রবর্তী কবি বলিয়া মনে হয় না। সে যাহাই হউক, অনেকের অনুমান কবিচন্দ্র তাঁহার 'অঙ্গদ রায়বার' পালা রচনার জন্য ফকিররামের নিকট ঋণী।[১০] আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে (৬ষ্ঠ অঃ) মহানাটকের প্রভাব প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি, ফকিররাম এবং কবিচন্দ্র তাঁহাদের রায়বারের এই পালাটি রচনার জন্য খুব সম্ভব 'মহানাটক'-এর নিকট ঋণী। তথাপি তর্কের খাতিরে বলা যায় যে, ফকিররামের এই পালাটির কয়েকটি হিন্দী ছত্রের বঙ্গানুবাদ কবিচন্দ্রের 'অঙ্গদ রায়বার' পালায় পাওয়া যায়। তবে রচনার দিক হইতে কবিচন্দ্রের পালাটি ফকিররামের হিন্দী ভাষায় রচিত পালাটি অপেক্ষা অধিক পরিচ্ছন্ন, সুস্পষ্ট এবং পূর্ণাঙ্গ বলিয়া এত জনপ্রিয় হইতে পারিয়াছিল। হিন্দী ভাষায় ফকিররাম স্পষ্টতঃ লিখিয়াছেন —

মেরে বাত লিজে এহি কাম কিজে : যুবরাজ কো ভেজো দশস্কন্ধ লাগিজে :
কহে ফকির দাস বামিরা নিবাস : অঙ্গদ দ্বিগুণ গরজে : (ক.বি. ২৮৩, পু.পৃ. ২)

বামিরা গ্রাম বিষ্ণুপুরের উত্তরপূর্বে প্রায় ১৬ মাইল দূরে বালসিগ্রামের নিকটে অবস্থিত। তাঁহার রচিত 'সত্যপীরকথা'-য়ও কবিভূষণ উপাধির উল্লেখ আছে।

দ্বিজ লক্ষ্মণের রাম-কথার নামও 'রামলীলা'। তিনি ছিলেন আধুনিক বাঁকুড়া জিলার জয়পুর থানার অন্তর্গত দক্ষিণবাড় অঞ্চল নিবাসী। তাঁহার পুথিতে 'কবিচন্দ্র' উপাধির উল্লেখও পাওয়া যায়। এইহেতু কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর সঙ্গে এই কবিচন্দ্র দ্বিজ লক্ষ্মণের পুথির যে জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছে তাহাও চতুর্থ অধ্যায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। এইখানে শুধু এই কথা বলা যায় যে, কবিচন্দ্রের সঙ্গে দ্বিজ লক্ষ্মণের রচনার যে জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ কবিচন্দ্রের বাসভূমি পানুয়া (কোতলপুর থানা, বাঁকুড়া) এবং দ্বিজ লক্ষ্মণের নিবাসস্থল বৈঞ্চিতল, দক্ষিণবাড় (জয়পুর থানা, বাঁকুড়া) খুব দূরবর্তী নয়। খুব সম্ভব কবিচন্দ্রের রামায়ণ রচনার দুই চারি বৎসরের মধ্যে দ্বিজ লক্ষ্মণ রামায়ণ রচনা করেন। তাঁহার 'শিবরামের যুদ্ধ' পালার একটি পুথির (ক.বি. ২৮৪) লিপিকাল ১০০৫ সন। কিন্তু ইহা দ্বারা দ্বিজ লক্ষ্মণকে কবিচন্দ্রের পূর্ববর্তী কবি বলিয়া মনে হয় না। বরং অন্যান্য প্রমাণ হইতে দ্বিজ লক্ষ্মণকে কবিচন্দ্রের পরবর্তী কবি বলিয়াই ধারণা হয়। কবিচন্দ্রের পালা রচনার প্রভাব দ্বিজ লক্ষ্মণের কাব্যেও বর্তমান। তিনিও কবিচন্দ্রের মত সংক্ষেপে অধ্যাত্ম রামায়ণের ভাবানুবাদ করিয়াছেন।

দ্বিজ সীতাসুত পুরাণের আদর্শে যে রাম-কথা রচনা করেন তাহা বাল্মীকি পুরাণ নামে খ্যাত। তিনি মল্লরাজা গোপাল সিংহ ও চৈতন্য সিংহের রাজত্বকালে কাব্য রচনা করেন। যথা :—

বাল্মীকি আদেশে দ্বিজ সীতাসুত গায়।
মহারাজা গোপাল সিংহ নাথের জয় জয়॥

(অরণ্যকাণ্ড, সা.চি. ৩০৪, পু.পৃ. ৪২)

দ্বিজ সীতাসুত কহে বাল্মীকি পুরাণ।
মহারাজা চৈত সিংহের জয় কর রাম॥

(লঙ্কাকাণ্ড, সা.চি. ৩০৩, মল্লভূম।
রাজড়াসন ১১৩৫, ১২৩৬ সাল, পু.পৃ. ১৪০ক)

দ্বিজ সীতাসুতের লঙ্কাকাণ্ডে ১২৩৬ বঙ্গাব্দেও যে লিপিকরদের 'রাজড়া সন' বা 'মল্ল সন' লেখার প্রবণতা ছিল তাহার দৃষ্টান্ত মেলে। পুথিতে 'করুণরাগ', 'কেদার রাগ' ও 'পাহিড়্যা' কথার উল্লেখ হইতে উহা যে গানের জন্য রচিত হইয়াছিল তাহাও জানা যায়। তবে দ্বিজ সীতাসুতের রচনা কবিচন্দ্রের রাম-কথা অপেক্ষা আকারে বড় হইলেও তেমন আকর্ষণীয় নয়।

ভবানীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যে তিলকচন্দ্র রাজার উল্লেখ থাকিলেও খুব সম্ভব তিনি মল্লভূমের সন্নিকটে কোথাও (সাগরদিয়া অঞ্চলে) বসবাস করিতেন। তাঁহার রচিত পুথিগুলির অধিকাংশ বাঁকুড়া হইতে প্রাপ্ত এবং রচনায় কবিচন্দ্রের প্রভাব বর্তমান। অধ্যাত্ম রামায়ণের অনুসরণ তাঁহার কাব্যেই সর্বাধিক দেখা যায়। কবিচন্দ্রের মতই রচনায় আকর্ষণী শক্তি আছে। পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে উভয়ের রচনার সাদৃশ্য ও পার্থক্য আলোচিত হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বাঁকুড়া জিলার ভুলুই গ্রামের কবি জগৎরাম রায় (বন্দ্যঘটী) তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামপ্রসাদের সহযোগিতায় একখানি বৃহত্তম রাম-কথা নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, নাম 'অদ্ভুত রামায়ণ'। এই ভুলুই গ্রাম বাঁকুড়া জিলার অন্তর্ভুক্ত হইলেও তখন উক্ত স্থান পঞ্চকোটের রাজা রঘুনাথনারায়ণের অধিকারে ছিল। এইহেতু কবি কোনও মল্লনৃপতির নাম উল্লেখ করেন নাই। মল্লরাজ বংশের অস্তমিতিরকালে এবং পঞ্চকোটের রাজার আদেশে তিনি কাব্য রচনা আরম্ভ করিয়া পুত্র রামপ্রসাদের দ্বারা ১৭১২ শকে (১৭৯১ খ্রীঃ) রাম-কথার অনুবাদটি সমাপ্ত করেন। আদি কাণ্ড হইতে উত্তরাকাণ্ড পর্যন্ত এবং পুষ্করকাণ্ড ও রাম-রাস সহ এই রামায়ণখানি নয় অংশে বিভক্ত। রচনাটি সুবৃহৎ তবে যথেষ্ট প্রাঞ্জল নয়।

রাধামাধব ঘোষ বাঁকুড়া জিলার দশঘরা গ্রাম নিবাসী, তবে তিনি কোনও মল্লনৃপতির নামোল্লেখ করেন নাই, খুব সম্ভব অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে তাঁহার 'রামলীলা' কাব্যখানি 'বৃহৎ সারাবলী', 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' ও 'অদ্ভুত রামায়ণ'-এর আদর্শে রচিত হয়। মুদ্রিত গ্রন্থখানিতে রাধামাধব ঘোষের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় ; যথা :—

কায়স্থ সাফুল্লিরাম, বাস দশঘরে গ্রাম
তস্য রামপ্রসাদ তনয়।
ঘোষজ পদবী খ্যাতি, মধ্যাংশ কুলের পতি
তস্য সুত শ্রীমাধব কয়॥[১১]

দশঘরা গ্রামের (কায়স্থ পরিবারে) রামপ্রসাদ ঘোষের পুত্র তিনি। তৎকালীন বঙ্গে প্রচলিত সকল রাম-কথার সার সংগ্রহ করিয়া কাব্যখানি বিস্তৃতরূপে লিখিত হইলেও কবিচন্দ্রের মতই আখ্যানসমূহ পালাকারে রচিত হইয়াছিল মনে হয়। উহাতেও কাণ্ড-বিভাগ পাওয়া যায় না।

দ্বিজ সাফল্যরাম ও দ্বিজ ধনঞ্জয়ের একত্র ভণিতাযুক্ত অরণ্যকাণ্ডের পুথি (ক.বি. ৪৩৬৭) পাওয়া যায়। খুব সম্ভব উভয়ের নিবাস মল্লভূমের কোতলপুর গ্রামে।

শ্রীরাম চরিত্র কহে দ্বিজ সাফল্যরামে।

মল্লনাথের অধিকার কোতলপুর গ্রামে ।।

★ ★ ★ ★ ★

দীন হীন ধনঞ্জয় রাম-কথা কয় ।
মল্লাবনীনাথের সর্বথা হউক জয় ।। (প্রাগুক্ত)

সাফল্য রামের বাম-কথায় 'শ্রীরাম চরিত' নামের উল্লেখ দেখা যায়, আবার 'বালির পিণ্ডদান' নামক পুথিটিতেও ঐ নামই পাওয়া যায় । এই পুথিটিতেও সাফল্যরামের ভণিতাই বেশি, দ্বিজ ধনঞ্জয়ের ভণিতা (বি.ভা. ৬১৫১, পু.পৃ. ৬ক) একবার পাওয়া যায় মাত্র ।

বাণীকন্ঠের 'রাম-রাস' (বি.সা. ১৩৭) — বিষ্ণুপুরে চৈত্রমাসে রাম-রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাহার উপর রচিত ।

রাসলীলা শ্রবণে মজিল যাঁর মন ।
রসিক প্রধান সেই ধন্য তাঁর জীবন।।
আর যত লীলা প্রভুর কি বলিতে জানি ।
রামের মাধুর্য লীলা শাস্ত্রেতে বাখানি ।
হেলায় শ্রদ্ধায় হৈয়া যেইজন গায় ।
অনাআসে সীতারামের পাদপদ্ম পায় ।।
হনূমতসঙ্গীতা রাস অপূর্ব কাহিনী ।
ছোটবাণীকন্ঠ ইহা রচিলা আপনি ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১২)

বাণীকন্ঠ এবং কৃত্তিবাস ভণিতায় (ক.বি. ৪৭৭৭) একখানি আদিকাণ্ডের খণ্ডিত পুথি পাওয়া যায় । বাণীকন্ঠের রচনা কবিচন্দ্রের মতই প্রসাদগুণযুক্ত ।

দ্বিজ দুলালের 'কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড'-এর (সা. ২৬২৯, লিপিকাল ১২৪৫ সন) পুথি পাওয়া যায় । তাঁহার নিবাসস্থল বাঁকুড়া জিলার আমদানে। কবির ভণিতাটি সুন্দর :

কিষ্কিন্ধ্যার প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ এহাবধি ।
দ্বিজ শ্রীদুলাল গান ভেব্যা দাশরথি ।।
আমদানে ঘর মহামণ্ডল সুখ্যাতি ।
শ্রীবঙ্কুবিহারী রাজঘরে পান দীপ্তি ।।
দ্বিজ শ্রীদুলালে দাস কর্যা রেখ্য রাম ।
পরকালে পাদপদ্মে পাই যেন স্থান ।।
গৌরীকান্ত আত্মজ শুভদ্রা গর্ভোদ্ভব।
শ্রীরাম রেণুকে সুখে রাখিবে রাঘব ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ২৪)

রচনাটির মধ্যে নূতন কোনও বৈশিষ্ট্য নাই ।

দ্বিজ শম্ভুসুতের আদিকাণ্ডের (এ.জি. ৪৯৯৯, লিপিকাল ১২৫৮ সন) পুথিটি বিষ্ণুপুর পরগণায় অনুলিখিত। তবে রচনায় মল্লরাজার নাম অথবা কবির গ্রামের নাম উল্লিখিত হয় নাই। ভণিতা এইরূপ —

মধুর শ্রীরামলীলা করহ শ্রবণ।
দ্বিজ শম্ভুসুত গীত রচিল রামায়ণ ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৩৪ক)

★ ★ ★ ★ ★

রামলীলা রামায়ণে অক্ষরে মধু ক্ষরে।
আদ্যকাণ্ড সমাপ্ত হইল এতদূরে ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৪২)

পুথিটি শ্রীবীরসিংহ রায় বাহাদুর স্বাক্ষরিত।

দ্বিজ দর্পনারায়ণ (ক.বি. ৩৭), ভিখন শুক্লদাস (ক.বি. ৪৫) এবং দ্বিজ নিধিরামের (ক.বি. ১৪৪) পুথি খুব সম্ভব মল্লভূমে লিপিকৃত।

রায়বার রচয়িতাদের মধ্যে জয়রামপুর নিবাসী দ্বিজরাম রচনা করেন 'বিভীষণের রায়বার' (ক.বি. ২৭০, ১-৭ পত্র, লিপিকাল ১০৯৮ সন)। বাঁকুড়া হইতে প্রাপ্ত এই পুথিটির ভণিতা এইরূপ —

বিভীষণের রায়বার সমাপ্ত এতদূর।
দ্বিজ রাম রচিল নিবাস জয়রামপুর ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৭)

দ্বিজ রামের ভণিতায় আরও দুইখানি পুথি (ক.বি. ২২৬০ এবং সা. ১০৬৬) পাওয়া যায়। লক্ষ্মীরামপুর নিবাসী কাশীনাথ রচনা করিয়াছেন 'কালনেমির রায়বার' (ক.বি. ১৯৪, ১-৫ পত্র, ১২৫৯ সাল)। এই পুথিটিও বাঁকুডা হইতে প্রাপ্ত। ইহার ভণিতা এইরূপ :—

কাশীনাথ বলে (২) রামপদতলে কালনিমার রায়বার। / বাসমোর লক্ষিপুরে (২) আছি টেরে ভরসা রামের নাম ।।/ভজন নাই মোরে দয়া করিবে বীর হনূমান। /(প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৫)

দ্বিজ তুলসীর 'অঙ্গদ রায়বার' (ক.বি. ১৯৫, ১-৭ পত্র, বাঁকুড়া হইতে প্রাপ্ত) পুথির ভণিতা এইরূপ :—

দ্বিজ শ্রীতুলসী কহে রামপদ সাব।
এতদূরে সমাপ্ত হইল রায়বার ।।
শ্রী গৌরাঙ্গ দাস লিখিতং, সাং রাইপুর। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৭)

খোশল শর্মার 'রায়বার' (ক.বি. ২৬৮, ১-৪ পত্র, লিপিকাল ১০৮৮ সন, বাঁকুড়া হইতে প্রাপ্ত) হিন্দীভাষায় রচিত।

ভণয়ে খোশল শর্মা আপকে জনুদার।

অধমকো প্রভু কদম হুকুম হোয়ে দরিয়া উতব পাব ॥
সাকিম পাত্রসায়ের, গোপীনাথপুর। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৪)

এইসকল রায়বার রচয়িতাদের মধ্যে দ্বিজরাম বা রামচন্দ্র এবং দ্বিজতুলসীর রচিত পুথিতে কবিচন্দ্রের মত বিশুদ্ধ বাংলা শব্দ এবং কাশীনাথ বা কাশীরাম ও খোশল শর্মার পুথিতে ফকিররামের মত হিন্দীশব্দের ব্যবহার দেখা যায়। তবে সমস্ত রায়বার রচয়িতাদের মধ্যে কবিচন্দ্রের 'অঙ্গদ রায়বার' সমস্ত দিক হইতেই উৎকৃষ্ট।

মল্লভূমে রচিত রাম-কথাসমূহকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় কবিদিগের কাব্য রচনার প্রবণতা 'বাল্মীকি-রামায়ণ' অপেক্ষা 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' ও 'অদ্ভুত রামায়ণ'-এর দিকে প্রসরমান। ইহার প্রধান কারণ উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত ভক্তিবাদ ও বর্ণাঢ্য আখ্যান কবিদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিল অধিক পরিমাণে। দ্বিতীয়তঃ মল্লরাজ বীর হাম্বীরের রাজত্বকালের পূর্ব হইতেই রামায়েত ভক্ত সম্প্রদায়ের বিষ্ণুপুরে আগমন ঘটে।[১২] রামভক্তি প্রচার এই ভক্ত সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়ায় রামায়ণ রচয়িতাগণ কতক পরিমাণে এই আদর্শ দ্বারাও উদ্বুদ্ধ হন। ফলে রামচন্দ্রের দেবত্ব প্রচার এবং 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' ও অদ্ভুত রামায়ণ'-এর চিত্তাকর্ষক বিষয় কবিদিগের রচনায় প্রেরণাদান করে। তৃতীয়তঃ মল্লভূমে রায়বার নামক পালাগুলির প্রচার অধিক হওয়ার মূল কারণ মল্লরাজাদের উৎসাহ এবং রাজ দরবারে আরবী-ফারসী মিশ্রিত হিন্দী শব্দের প্রচুর ব্যবহার।

ভারত পাঁচালি বা মহাভারত গুচ্ছের মধ্যে কবিচন্দ্রের মহাভারত, রামচরণ চক্রবর্তীর 'অশ্বমেধ পর্ব', মাণিকচন্দ্রের 'অভিমন্যু বধ' (বি.সা. ৬৯১), নিমাই রচিত 'কর্ণপর্ব' (এ.জি. ৫৩৯২) এবং ঘনশ্যাম দাসের 'জৈমিনি ভারত' (এ.জি. ৪৯৪৬) উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে রামচরণ চক্রবর্তীর কাব্যে রাজা দুর্জন সিংহের নাম পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত দুর্জন সিংহ নামে নৃপবর।
শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দে উন্মত্ত ভ্রমর॥
মল্লকুল সলিলেতে উৎপত্তি উৎপল।
মহাবলবান অস্ত্র শাস্ত্রেতে কুশল ॥[১৩]

রামচরণ চক্রবর্তী ভিন্ন অন্যান্য কবিদিগের রচিত পুথিতে কোনও মল্লরাজার নাম পাওয়া যায় না, তবে ঐ সকল পুথি মল্লভূমে অনুলিখিত, এইহেতু মল্লভূমের সাহিত্য আলোচনায় উহাদের বাদ দেওয়া চলে না। এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে সারলা দাস উড়িয়া কবি হইলেও বাঁকুড়া অঞ্চলে তাঁহার ভারত-পাঁচালির একখানা বাংলা-পাঠ প্রচলিত ছিল।[১৪] কবিচন্দ্রের সঙ্গে এইসকল কবির রচিত ভারত-আখ্যানের একটি বড় প্রভেদ এই যে, কবিচন্দ্র বৈয়াসকি মহাভারতের সংক্ষিপ্ত সারানুবাদ করিয়াছেন কিন্তু অপর সকল কবির কাব্যে জৈমিনি রচিত 'মহাভারত'-এর প্রভাব বর্তমান। কবিচন্দ্র যুদ্ধ বর্ণনায় কিছু নৈপুণ্য

প্রদর্শন করিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাহুল্য অংশ বর্জন করিয়াছেন। আবার কবিচন্দ্রের কাব্যে নীতিউপদেশমূলক কাহিনীর আড়ম্বর অধিক দেখা যায়, যাহা অন্যান্য কবিদিগের রচনায় পাওয়া যায় না। চরিত্রচিত্রণেও কবিচন্দ্রের মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী অন্যান্য কবিদিগের অপেক্ষা বেশী সহজ ও স্বচ্ছন্দ।

কৃষ্ণলীলা কাব্যের মধ্যে জীবন দ্বিজের 'নৌকাখণ্ড' (বি.সা. ৬৩৬, ১-৭ পত্র), দ্বিজ বৃন্দাবনের 'রাধিকা মঙ্গল' (বি.সা. ১-১৫ পত্র), ভরত পণ্ডিতের 'প্রসাদ চরিত্র' (বি.সা. ৫৩৮, ৪-৩৫ পত্র), এবং দ্বিজ পরশুরামের 'সুদামা চরিত্র' (বি.সা. ৩১১), 'ভুবন মঙ্গল' (বি.সা.) এবং 'গুরুদক্ষিণা' (বি.সা. ৫০৭) পালা মল্লভূমে লিপিকৃত। ডঃ সুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যে দুইজন পরশুরামের কথা জানাইয়াছেন, একজন শ্রীখণ্ডের অধিবাসী এধং অপরজন দামোদরের উত্তরকূলে চম্পক নগরীতে বসবাস করিতেন।[১৫] বিষ্ণুপুরে লিপিকৃত পরশুরামের উক্ত পুথি তিনটিতে কবির নিবাসস্থলের নাম না থাকায় তিনি ঠিক কোন অঞ্চলের অধিবাসী এবং তৃতীয় কোনও কবি কিনা তাহা বলা শক্ত। আর এই সকল বিচ্ছিন্ন পালা হইতে কবির প্রকৃত পবিচয় ও রচনার গুণাগুণ নির্ণয় করাও কঠিন। কবিচন্দ্রের সঙ্গে এই সকল কবির কাব্যের বড় সাদৃশ্য পালা রচনায়। বস্তুতঃ কবিচন্দ্রের "ভাগবতামৃত শ্রীশ্রী গোবিন্দমঙ্গল" (১৩৪১ সালে মুদ্রিত) নামক গ্রন্থ এবং ভাগবতের উপর লিপিকৃত শত শত পুথি দেখিয়া মনে হয়, কবিচন্দ্রের এই কাব্যখানি মল্লভূমের অপর সকল কবির রচিত কৃষ্ণলীলাব কাব্য অপেক্ষা শিল্প নৈপুণ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আকারেও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ।

কবিচন্দ্রের রচিত 'মদনমোহন বন্দনা' তাঁহার 'ভাগবতামৃত' কাব্যের অন্তর্গত বলিয়া মনে হয়। সে বিষয়ে পূর্বে 'মদনমোহন বন্দনা' আলোচনাকালে (৫ম অধ্যায়) বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। বিভিন্ন কবির রচিত বন্দনায় যে ইতিহাস অংশ পাওয়া যায় এখানে কেবলমাত্র সেই প্রসঙ্গই আলোচিত হইবে। মদনমোহন মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুরের সুপ্রসিদ্ধ নগরদেবতা। কাহারও মতে তিনি মল্লরাজা বীব হাম্বীরের, আবার কাহারও মতে বাজা বীর সিংহের (২য়) সময়ে বিষ্ণুপুরে কোনও এক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে স্বপ্নাদৃষ্ট রাজা কর্তৃক আনীত হইয়াছেন। সে যাহাই হউক, বহু কবি মল্লরাজবংশের ইষ্টদেবতা মদনমোহনের উচ্ছ্বসিত বন্দনা-গান করিয়াছেন। কবিচন্দ্রের বচনায় শুধু বন্দনাই পাওয়া যায়, তাহাতে কোনও ইতিহাস অংশ যুক্ত হইতে দেখা যায় না। তাঁহার 'প্রসাদ চরিত্র' বা 'প্রহ্লাদ চরিত্র' পালায় (বি.সা. ৪৩৫) মদনমোহন বন্দনাকালে বৈষ্ণব-মহান্ত অভিবাম গোস্বামীর বিষ্ণুপুরে আগমন ও মদনমোহন দর্শন কবায় ভক্তের মান রক্ষার্থে মদনমোহনের নিজ অঙ্গ কিঞ্চিৎ বাঁকা করার কথা বর্ণিত হইয়াছে। মল্লবংশের সকল ইষ্টদেবতার নাম

উল্লেখের পর অযোধ্যার শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সীতা, দশরথ, কৌশল্যা ও কৈকেয়ী এমনকি হনূমানেরও চরণ বন্দনা করিয়াছেন তিনি। সাবড়াকোণের রামকৃষ্ণ মন্দিরের উপর দিয়া পাখী উড়িয়া গেলে তাহা মরিয়া পড়িয়া যাইত, এইরূপ প্রচলিত এক অলৌকিক কাহিনীর কথাও কবি এই বন্দনাটিতে যুক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ বৈষ্ণব-ভক্ত কবির দৃষ্টিতে একটি সহজ সরল নম্র স্তুতিগানই ইহাতে উচ্চারিত হইতে দেখা যায়। তুলনায় রতন কবিরাজের বন্দনায় আছে ইতিহাসের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায়। তাঁহার মদনমোহন বন্দনার (এ.জি. ৩৬১৫) প্রথমে অভিরাম গোস্বামীর মদনমোহন দর্শনে প্রভুর অঙ্গ বাঁকা হওয়ার ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। কথিত আছে, বৈষ্ণব-ভক্ত অভিরাম গোস্বামী খানাকুল কৃষ্ণনগরের অধিবাসী। তিনি কোনও নকল বিগ্রহকে প্রণাম করিলে তাহা বিদীর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু মদনমোহন যেহেতু আসল বিগ্রহ, সেইহেতু অভিরাম গোস্বামীর দর্শনের পর ভক্তের মান বৃদ্ধির জন্য মদনমোহন নিজ অঙ্গ কিঞ্চিৎ বাঁকা করেন। সেইসময় হইতে তিনি এক পদে বাঁকা অবস্থায় আছেন। দ্বিতীয় ঘটনা, বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের মল্লভূমে যুদ্ধার্থে সসৈন্যে আগমন ও পশ্চাদপসরণ। তৃতীয় ঘটনা, নবাব সুজার মল্লভূমে আগমন ও মদনমোহনের মহিমা শ্রবণে ফৌজ সঙ্গে প্রত্যাবর্তন। চতুর্থ ঘটনা, বর্গীর আক্রমণ ও মদনমোহনের নির্দেশে মারাঠা সৈন্যসহ ভাস্কর পণ্ডিতের অতি সত্বর মল্লভূম পরিত্যাগ। অর্থাৎ প্রতি অবস্থায় মদনমোহনই মল্লভূমবাসীকে বন্ধুর পথ হইতে রক্ষা কবিয়াছেন। সেই মল্লভূম অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে বারংবার বর্গীদের দ্বারা আক্রান্ত হইতে থাকে (১৭৪২-১৭৪৫ খ্রীঃ)। গঙ্গারাম বর্গীর হাঙ্গামার কয়েক বৎসর পর "মহারাষ্ট্র পুরাণ" (ক.বি. ১৭৮৪ নং, ১৬৭২ শক, ১১৫৮ সাল) রচনা করেন। তাহাতে বর্গীর আক্রমণের কাহিনী বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উহাতেও বিষ্ণুপুরে বর্গী আক্রমণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

গোয়ালাভূঞি সেনভূঞি সবপোড়াইল।
চতুর্দিগ পোড়াইয়া বিষ্ণুপুর আইল ॥
তবে বনবিষ্ণুপুর গোপাল রক্ষা করে।
অসাধ্য বরগীর তবে কি করিতে পারে ॥
শহর লুটিতে বরগী তবে আইল ধাইয়া।
নইহাটী উদ্যানপুর কাটোঞা ডাহিনে থুইয়া ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৪)

মদনমোহন ও বর্গীবিতাড়ন সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন কবি জয়কৃষ্ণ দাস। তাঁহার মদনমোহন বন্দনায় (এ.জি. ৪৯৮৮, ১-১২ পত্র, সম্পূর্ণ, ১২২৬ সাল) বর্গী বিতাড়ন কাহিনী বেশ চমকপ্রদ।

বার বৎসর বরগী যখন গড় ঘেরা্যা ছিল ।
কার সাদ্ধি তুমি গড়ে লুটিতে নারিল ।।
একদিন যত প্রজা একত্র হইল ।
হরিবোল দিয়া রাজায় আদ্দাস করিল ।।
শুন শুন মহারাজা বস্যা কর কি ।
বরগী তাড়াবার লাগ্যা বলিতে আস্যাছি ।।
এইকথা শুন্যা রাজা কাঁপিতে লাগিল ।
শহরে নেম্বা যত কীর্তন গেয়াছিল ।।
এমন কালে মদনমোহন জানিলেন অন্তরে ।
বরগী তাড়াতে এবার জাত্যে হইল মোরে ।।
তা বলার হাঁস ঘোড়ায় সোওয়ারী হইয়া ।
বরগী তাড়াতে জান শাঁখারী বাজার দিয়া ।।

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

এমনকালে ঘোড়ায় হইতে প্রভু ভূমেতে নাম্বিল ।
আপনার হাথে পলিতা লঞা কামানেতে দিল ।।
দ্বারিকার মাঠ দিয়া বরগী সব গেল ।
বরগী পালাইল একটা হাতী মর্যা ছিল ।।

(প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১০-১১ক)

বর্গীরা বৈষ্ণবরাজ্য বিষ্ণুপুরে হানা দিলে রাজা গোপাল সিংহের আদেশে রাজধানী বিষ্ণুপুরের গড়ের মধ্যে সমবেত প্রজামণ্ডলী হরিনাম সংকীর্তনে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। এদিকে কামানের গোলায় শত্রু সৈন্যের নিদারুণভাবে বিপর্যস্ত হওয়ার সংবাদে রাজা সহ সকলেই বিস্মিত হন। গোলন্দাজের নিকট সমস্ত জানিতে পারিয়া রাজা মন্দিরে গিয়া মদনমোহনের হস্তে বারুদের গন্ধ পাইয়া তাঁহার পদতলে নিপতিত হন। মদনমোহনই এইভাবে স্বয়ং বিষ্ণুপুরবাসীর ধন ও মান রক্ষা করেন। তাই মল্লভূমের বহু কবি মদনমোহনের মহিমা বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনিই অন্তর্যামীরূপে সকল কর্মের প্রেরণাদাতা, বিষ্ণুপুরের বৈষ্ণব কবিগণ তাই মদনমোহনের জয়গাথা রচনা করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করিয়াছেন। সেই মদনমোহন রাজা চৈতন্যসিংহ কর্তৃক কলিকাতায় বাগবাজারের ধনী গোকুল মিত্রের নিকট প্রচুর অর্থের বিনিময়ে যখন বাঁধা পড়েন তখন হৃতসর্বস্ব বিষ্ণুপুরবাসী তাঁহাদের প্রাণের দেবতা মদনমোহনকে চিরতরে হারাইয়া ফেলেন।[১৬] অতঃপর বিষ্ণুপুর জমিদারী রাজা মাধবসিংহের কালে (১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর) নিলামে ওঠে। বর্ধমানের মহারাজা উহা (দুইলক্ষ পনের হাজার টাকায়) ক্রয় করিয়া লন।

'মদনমোহনবন্দনা' বিষয়ক রচনাসমূহ তাই মল্লভূমের জাতীয় ইতিহাসের এক একটি মূল্যবান দলিল বিশেষ।

'সত্যপীর পাঁচালি' রচনা করিয়াছেন ফকিবরাম কবিভূষণ ও ব্রজদাস । দ্বিজ কবিচন্দ্রের ভণিতায় সত্যনাবায়ণের বা সত্যপীরের একখানি পুথির সংবাদ জানা যায়, মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালায় ।

ফকিবরামের একখানি খণ্ডিত পুথি বিষ্ণুপুর সাহিত্য পবিষদে সংরক্ষিত আছে, ভণিতা এইরূপ :-

এ বোল শুনিঞা তবে রাজার নন্দিনী ।
লজ্জিত হইয়া কিছু না কহিল্যা বাণী ।।
ভণয়ে ফকিরবাম মনেতে বিচাবী ।
এ বড় লাজের কথা শুনহ সুন্দবী ।।

ইহাতে প্রচুর হিন্দী শব্দের ব্যবহার দেখা যায় ।

ফকিরবামের কাব্যেব আদর্শে ব্রজদাস 'সত্যপীবের কথা' বচনা করেন (বি.সা. ৬৬৪, ১-৭, ৩৯-৪১ পত্র) উহাতে কবির ধর্ম নিরপেক্ষ এক উদাব মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ।

অতঃপব সহস্র সেলাম সত্যপীর।
রামরূপ রহিম অবতার বলবীর ।।
আগমপুরাণে এই কহে সারোদ্ধাব ।
হিন্দু মুসলমান পূজে যে যার বেভার।।
আগে পিছে বন্দনার দোষ না লইবে ।
অক্ষর জটলা করি দোষ ক্ষেমাইবে ।।
ব্রজদাস করে পীরে বহুত সে নাম।
বিষ্ণুপুর সাকিম বাহাদুরগঞ্জ ধাম ।।
সত্যপীরের ব্রতকথা শুন দিয়া‌মন ।
যেবা যে বাসনা কর করিব পূরণ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১ক)

ব্রজদাস বিষ্ণুপুরের বাহাদুরগঞ্জ নিবাসী ।

কবিচন্দ্রের রচিত 'অর্জুনের দর্পচূর্ণ' পালায় রাম ও কৃষ্ণের এবং 'শিব রামের যুদ্ধ' পালায় শিব ও রামের অভেদত্ব বর্ণনার দ্বারা বিভিন্ন ধর্মমত সমন্বয়ের যে প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, তাহারই প্রভাব পাওয়া যায় ব্রজদাসের এই রচনাটির মধ্যে । যদিও ধর্মের ক্ষেত্রে এইরূপ সমন্বয়ের ধারা মল্লভূমে 'শূন্যপুরাণ' হইতেই শুরু হইয়াছিল, পরবর্তীকালের

সাহিত্যে তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। সত্যপীর ও সত্যনারায়ণের পাঁচালীর মধ্য দিয়াও তাহাই সূচিত হইয়াছে। এই দিক হইতে আরিফ রচিত 'লালমোনের কথা' (সত্যপীর মাহাত্ম্য) পালাটি অন্যতম। কবি আরিফের বাড়ী ছিল কোতলপুব থানার অন্তর্গত দেশড়ার দক্ষিণে তাজপুর গ্রামে।[১৭]

রামকথা, ভারত-আখ্যান এবং কৃষ্ণলীলা কাব্যসমূহের আবেদন কাব্যগত সৌন্দর্যবোধের মধ্যেই অধিক পরিমাণে নিহিত। কিন্তু সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ এবং মঙ্গলকাব্যসমূহ ধর্মীয় অনুভূতির উপব অধিক পরিমাণে আধারিত। এই মঙ্গল কাব্যসমূহের মধ্যে ধর্মমঙ্গল, শিবমঙ্গল এবং নাথ সাহিত্যের উৎসভূমি এই মল্লভূম এবং এই সমুদয় সাহিত্যের সঙ্গে মল্লভূমের ধর্মীয় জীবনেব নাড়ীর যোগ বর্তমান। বহু কবি ধর্মমঙ্গলের কাব্য রচনা করিয়া ধর্মের গীত গাহিয়াছেন। ধর্মঠাকুরের পূজায় হিন্দু, বৌদ্ধ এবং মুসলমান প্রভৃতি ধর্মের অনুষ্ঠান অল্প-বিস্তর গৃহীত হইয়াছে। ধর্ম প্রথমে ছিলেন বৈদিক দেবতা বরুণ, তাঁহার সাধারণ নাম ধর্ম ঠাকুর। ধর্মপূজার প্রবর্তক রামাই পণ্ডিতের উল্লেখ প্রথমে করিয়াছি। ধর্মমঙ্গলের বহু কবি পূর্বসূরী হিসাবে ময়ূরভট্টের নাম উল্লেখ করিলেও তাঁহার রচিত পুথি বিরল। পরবর্তীকালে ধর্মমঙ্গল রচয়িতা কবিদিগের মধ্যে দ্বিজ কবিচন্দ্র, রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্জ্যে, প্রভুরাম মুখোপাধ্যায়, মাণিকচন্দ্র গাঙ্গুলী এবং দ্বিজ লক্ষ্মণের নাম উল্লেখযোগ্য। সীতারাম দাস, গোবিন্দ বাঁড়ুজ্জ্যে এবং নিধিরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলের পুথি অনুলিখিত হয় মল্লভূমে। এই কবিদিগের মধ্যে দ্বিজ কবিচন্দ্রই সময়ের দিক হইতে অগ্রবর্তী। তাঁহার রচিত ধর্মমঙ্গলের নাম 'অনাদি মঙ্গল' (সা. ২৬৭১)। অনাদ্য অথবা ধর্মনিরঞ্জনের মাহাত্ম্যই এই কাব্যখানিতে স্থান লাভ করিয়াছে।

কবিচন্দ্রের 'অনাদিমঙ্গল' কাব্যখানি রচিত হইয়াছিল মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহের (২য়) রাজত্বকালে, আর রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্জ্যে এবং প্রভুরাম মুখোপাধ্যায়ের ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হয় রঘুনাথ সিংহের (২য়) পরবর্তী রাজা গোপাল সিংহের (১ম) রাজত্বকালে। রামচন্দ্রের নিবাস ছিল আমোদর নদীর তীরে চামোট গ্রামে (অধুনা বাঁকুড়া জিলা)। গোকুল নগরের শঙ্খাসুরের কৃপায় তিনি কাব্য রচনায় উৎসাহী হন। ময়ূরভট্টের পদ বন্দনা করিয়া খুব সম্ভব ১০৩৮ মল্লাব্দে অর্থাৎ ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাব্য রচনা করেন। তাঁহার ভণিতা এইরূপ :-

দুর্জন সিংহ সুত গোপাল সিংহ খ্যাত
বৈষ্ণব প্রহ্লাদ সমান।
তস্য দেশে বাস ধর্মের ইতিহাস
দ্বিজ রামচন্দ্রে গান ॥[১৮]

গোপাল সিংহের (১ম) রাজত্বকালে প্রভুরাম মুখোপাধ্যায় ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা

করেন (এ.জি. ৫৪৪১, ২২৫ পত্র, লিপিকাল ১০৭৩ মল্লসন)। তিনি নিজের পরিচয় দিয়াছেন সংক্ষেপে :

মল্লভূমে বাটী ফুল্যার মুকুটী
শ্রীযুত জানকীরাম।
তস্য সুত গায় সখা ক্ষুদিরায়
নায়কে পূরহ কাম॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৩ক)

এই পুথিটিতে গানের উল্লেখ বহুবার পাওয়া যায়;

আড়ায় উড়িয়া সেন কর্পূরেতে কন।
প্রভুরাম দ্বিজ গান শুন নিরঞ্জন॥
হরি হরি বলিয়া সভাই যাহ ঘর।
বারুইপাড়া গান হব ইহার উত্তর॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ২১)

এবং

সঙ্গীত সমাপ্ত দ্বিজ প্রভুরাম বলে।
অন্তকালে ক্ষুদিরায় রাখ পদতলে॥
এইবর মাগি মুই দৃঢ় করি মন।
বাসনা করহ পূর্ণ প্রভু নিরঞ্জন॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৬৩)

সুখসায়র নিবাসী সীতারাম দাস ময়ূরভট্টের পদ বন্দনা করিয়া 'হাজারচারি সনে' (১০০৪ মল্লসন) ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছেন (এ.জি. ৪৯৯৮, ২০ পত্র, অসম্পূর্ণ) :

কাড্য হাতে লাউসেন ভাবে মায়াধর
সীতারাম দাস গান শুকসাঅরে ঘর॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৫৭)

সীতারাম দাস গান ধর্ম পদতলে।
এই পুথি হইল হাজার চারি সালে॥
(হস্তিবধ পালা, প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৩ক)

সীতারাম দাসের দিগ্‌বন্দনায় ইন্দাসের গ্রাম দেবতা ধর্মঠাকুরের নাম বাঁকুড়া রায় বলিয়া জানা যায়।[১৪]

মাণিকরাম গাঙ্গুলীর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য রচিত হয় ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে। তাহাতে বিষ্ণুপুরের মদনমোহন ঠাকুরের উল্লেখ আছে।[২৩]

দ্বিজ লক্ষ্মণের কাব্যের নাম 'অনিলপুরাণ' (সা.২৫০৫), অবশ্য ভণিতায় 'রামাঞি' কথার উল্লেখ আছে :

'দ্বিজ রামাঞি পণ্ডিতের কবি লক্ষ্মণে গায়'। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৮৬)

গোবিন্দ বাঁড়ুজ্জ্যের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের পুথি মল্লভূমে লিপিকৃত (১০৭১ সন)। তাঁহার ভণিতা এইরূপ :-

'রচিল গোবিন্দবন্দ্য ধর্মের মঙ্গল'।[২১] নিধিরাম গাঙ্গুলীর (কবিচন্দ্র) ধর্মমঙ্গল (সা ২৬৬১) কাব্য রচিত হয় ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে। ইহাতে বিষ্ণুপুরের মদনমোহন ঠাকুরের উল্লেখ আছে। কবির বাড়ী খুব সম্ভব কোতলপুর থানার নিকটে অবস্থিত ছিল।

মল্লভূমে রচিত মনসামঙ্গলের দুইজন কবির নাম জানা যায়। প্রথমজন ধর্মমঙ্গল রচয়িতা সীতারাম দাস, যাঁহার কাব্যের নাম 'গজলক্ষ্মী'।[২২] দ্বিতীয়জন 'মনসামঙ্গল' রচয়িতা রসিক মিশ্র (এ.জি. ৪৯৭০)।

এই সম্পর্কে বলা আবশ্যক যে, মনসামঙ্গলের কোনও পুথি কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর নামে পাওয়া যায় নাই।

মল্লভূমে রচিত দুই একটি কৌতুক রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কবিচন্দ্রের রচিত 'মশার কবিতা'র মত শ্রীকৃষ্ণচরণ লিখিত 'কপাল চরিত্র' নামক রচনাটি বেশ কৌতুকপ্রদ এবং পুথি কোতলপুরে অনুলিখিত (এ.জি. ৫৩৭৭, ১-৩ পত্র, ১২২৪ সন):—

কন্যা পুত্র ধন জন খাট পাট সিংহাসন
কপালে থাকিলে সেই হয়।
যখন কপাল ফলে শুকনাতে ডিঙ্গা চলে
ঘরে বসে করে নানাভোগ।
কপাল বিরুদ্ধ হইলে গঙ্গা নাই পায় মইলে
পিছে পিছে ধায় নানা রোগ ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ.১)

* * * * * *

কড়ীর মুখ সভে চায় নিকড়ের মুখ নাহি চায়
ধনিনের সভে করে পূজা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে কয় কপাল যদ্যপি নয়
তবে কেন পালাল সাসুজা ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৩)

এইরূপ আর একটি ছড়া লিখিয়াছেন দ্বিজ রাধামোহন। বিষ্ণুপুরের রাজা চৈতন্য সিংহের সঙ্গে যুদ্ধে হেষ্টিংসের পরাজয় ও রাস্তা নির্মাণের কাজে বেগারদের দুর্দশা উক্ত ছড়াটিতে বর্ণিত হইয়াছে।[২৩]

এইখানে মল্লভূমের সাহিত্য আলোচনায় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর যবনিকাপাত ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হইতে সাহিত্য সৃষ্টির ধারাবদল শুরু হয়। ধর্মের স্থান

অধিকার করে যুক্তিবাদী চিন্তা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ । বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সুললিত পয়ারের স্থান অধিকার করে নবীন গদ্য সাহিত্য । এইভাবে মধ্যযুগের কাব্য সাহিত্যের পরিসমাপ্তি ঘটে । বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত পুথিসমূহ উক্ত অঞ্চলে অনুলিখিত । অতএব স্বল্পখ্যাত কবিদিগের নিবাসস্থল মল্লভূম বলিয়াই অনুমিত হয় । বর্তমান জিলাভিত্তিক মানচিত্র সাহিত্য সৃষ্টির বহু পরবর্তীকালের । সাহিত্য-সংস্কৃতি যেহেতু রাজনৈতিক বেড়াজাল মানিয়া চলে না, সেইহেতু মল্লভূমের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সীমারেখা আধুনিক বাঁকুড়া জিলার মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া দক্ষিণ ও পশ্চিম রাঢ় ব্যাপিয়া, শিলাই ও কাঁসাই নদীর তীরে, দামোদর ও রূপনারায়ণ নদীর উপকূলে এবং মুণ্ডেশ্বরী ও দ্বারকেশ্বর নদীর অববাহিকায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল মনে করিলে খুব অপ্রাসঙ্গিক হয় না ।

মধ্যযুগে সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল একান্তভাবেই ধর্মনির্ভর । মল্লভূমের সাহিত্য আলোচনাকালে বিভিন্ন ধর্মমতের প্রভাবের প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় । সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয় । প্রাচীনকাল হইতেই মল্লভূমের আদিবাসী সমাজের ধর্ম ও সভ্যতার সঙ্গে আর্য-হিন্দুর ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমন্বয় ধারা চলিতে থাকে ।[২৪] এই সমন্বয়ের স্রোত পরবর্তীকালের ধর্মমূলক চিন্তাভাবনাকেও গভীরভাবে নাড়া দেয় । এইরূপ সমীকরণের ফলে মনসা ও ধর্মঠাকুরের পূজা মল্লভূমে অতি ব্যাপকভাবে প্রচার লাভ করে । ধর্মমঙ্গল কাব্যকে রাঢদেশের জাতীয় মহাকাব্য বা 'এপিক' বলা হয় । মনসা ও ধর্মঠাকুরের মত শিব এবং চণ্ডী এই দুই মহামান্য দেবতাও সমগ্র অঞ্চলে প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া ওঠেন। বর্তমান রাঢ়অঞ্চলে শিবের জনপ্রিয়তাই সমধিক । মল্লরাজ বীর হাম্বীর বিষ্ণুপুর গড়ের মধ্যে মৃন্ময়ী দেবীর প্রতিষ্ঠা (১৬০১ খ্রীঃ) করেন। তিনি মল্লরাজকুলের গৃহদেবতা চণ্ডীরূপে পূজিতা হইলেও পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে তাঁহার পূজায় বলিদান প্রথা হ্রাস পায় ।[২৫]

আর্য ধর্মের বিভিন্ন শাখা যেমন জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মমতের প্রভাব মল্লভূমের জনজীবনে ও অধ্যাত্ম চেতনায় সুস্পষ্ট নিদর্শন রাখিয়াছে । মল্লরাজাদিগের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মন্দিরে কালাচাঁদ, লালজী, গোকুলচাঁদ, রাধাগোবিন্দ, রাধামাধব, মদনমোহন, রাধাশ্যাম এবং শ্যামরায় প্রভৃতি বৈষ্ণব বিগ্রহের নাম শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার অনুকরণে প্রাধান্য লাভ করে ।[২৬] ইহারই প্রতিফলনস্বরূপ টেরাকোটা মন্দিরের চিত্রসমূহে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলার 'মোটিফ'গুলিই প্রধানতঃ আশ্রয় লাভ করিয়াছে । বিষ্ণুপুরের রাজপরিবার এবং উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ বৈষ্ণব ধর্মের অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন নিষ্ঠাভরে ।

প্রাচীন ধর্মীয় জীবনে শ্রীকৃষ্ণের পরবর্তী গুরুত্বের দেবতা রাম। খুব সম্ভব বীর হাম্বীর কিংবা তৎপূর্ববর্তী মল্লরাজাদের সময় হইতে উত্তরভারতের রামায়েত-ভক্ত-সম্প্রদায়ের দল মল্লভূমে অনুপ্রবেশ করে। বীর হাম্বীরের সময়কালে এক রামভক্ত মনোহর দাসের কিছু রাম-বিষযক পদ পাওয়া যায়। বীর হাম্বীরের পুত্র রঘুনাথ সিংহ (১ম) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জোড়াবাংলা মন্দিরের গর্ভগৃহে খোদিত ষড়ভুজ-গৌরাঙ্গ মূর্তিটি নিঃসন্দেহে রাম, কৃষ্ণ এবং চৈতন্যদেবের অভেদাত্মক রূপের প্রতিচ্ছবি। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ মল্লরাজবৃন্দ ছিলেন পরধর্মমতসহিষ্ণু। মল্লরাজ বীর সিংহের রাণী চূড়ামণির নামে উৎসর্গীকৃত মাধবগঞ্জেব রঘুনাথের সুবৃহৎ পঞ্চরত্ন মন্দিরটি (১৬৭২ খ্রীঃ) তাহার প্রমাণ। উক্ত রাম মন্দিরের রামচন্দ্রের মূর্তি অঙ্কিত শিলালিপিটি বর্তমানে বিষ্ণুপুর-সাহিত্য-পরিষদের প্রত্নশালায় এবং রাম-বিগ্রহটি বিষ্ণুপুরের কাটানধারতলার বৃদ্ধ রামেশ্বর মিশ্রের (ভৈরব মহান্ত) রাম মন্দিরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুর শহরের বিভিন্ন স্থানে ও পার্শ্ববর্তী খামারবেড়ে, চুয়াপাড়া এবং সোনামুখীতে বহু রামায়েত ভক্ত-সম্প্রদায় আছেন যাঁহারা এখনও রাম ও কৃষ্ণ পূজক এবং কয়েক পুরুষ যাবৎ মল্লরাজাদিগের নিকট হইতে প্রদত্ত ভূসম্পত্তি ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন।

গ্রামীণ জনমানসে মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণের প্রভাব অসীম। বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ উত্তর ভারতে প্রচারিত রামভক্তিবাদ, অজস্র রাম-কথাময় লোককাহিনী এবং কৃত্তিবাস-কবিচন্দ্র প্রমুখ কবির রামায়ণ নানাভাবে পরিবেশিত হইয়া বঙ্গ-জনমানসকে রামভক্তির সুউচ্চলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বঙ্গে তিনি অত্যল্প উপাসিত হইলেও তাঁহার নামের প্রচার দেখা যায় রামায়ণগানে, ব্যক্তি নামে ও পল্লীনামে। মল্লবংশে দুইজন রাজার নাম রঘুনাথ। পল্লীনামের মধ্যে মল্লভূমে 'রাম' বা 'রামনাম'-এর রকমফের পাওয়া যায়। বাঁকুড়া অঞ্চলে রঘুনাথপুর (১০টি), রামচন্দ্রপুর (৮টি), শ্রীরামপুর (৫টি), রামপুর (১২টি), রামনগর (৬টি), রামকৃষ্ণপুর (২টি) নামের পল্লী এবং মাধবগঞ্জের একটি বাঁধের নাম রঘুনাথ-সায়র রাম-নাম প্রচারের গুরুত্বই প্রকাশ করে।[২১] তাসখেলার সূচনাতেও এখানে রাম-নামের প্রাধান্য দেখা যায়।

মল্লভূমে প্রচলিত বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে দুর্গাপূজার অবসানে 'রাবণ বধ' অনুষ্ঠানটি অন্যতম। বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যপূর্ণ এই বিরাট অনুষ্ঠানটি এখন অনুষ্ঠিত হয় সুপ্রসিদ্ধ মল্লেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে এবং সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ রাম শঙ্করের বংশধরদিগের গৃহে।

লোক সংস্কৃতিব দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মল্লরাজ কেল্লাব মধ্যে অনুষ্ঠিত মনসা পূজা ও সাপ খেলাইবার নিমিত্ত ঝাঁপান উৎসব।[২২]

তৃতীয় উল্লেখযোগ্য উৎসবটি ছিল ভাদ্র-শুক্লা-দ্বাদশীর প্রত্যূষে অনুষ্ঠিত ইন্দ্রধ্বজ পূজা অনুষ্ঠান ও নূতন 'মল্লশক' বা মল্লাব্দ ঘোষণা দ্বারা নববর্ষের স্বাগতাভিনন্দন।[২৯]

চতুর্থতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে, পৌষ সংক্রান্তি হইতে ১লা মাঘ অবধি অনুষ্ঠিত 'এখান' উৎসব। মল্লরাজাগণ মহাসমারোহে ঐ সময়ে মৃগয়ায় বহির্গত হইতেন।[৩০] বস্তুতঃ এইসকল উৎসব অনুষ্ঠানে ধর্মীয় অনুভূতি ক্ষীণতর হওয়ায় উহারা কালে ধর্মনিরপেক্ষ লোক উৎসবের অঙ্গীভূত হইয়া যায়।

এইরূপ বিভিন্ন ধর্মমত সমন্বয়ের আদর্শটি মল্লভূমের প্রতিটি শিল্প ও সংস্কৃতিতে বর্তমান। পোড়ামাটির অপরূপ ভাস্কর্যে সুসজ্জিত মল্লভূমের দেবালয়গুলিতে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক ভাস্কর্যই প্রধান হইলেও সেই সঙ্গে শৈব, শাক্ত এবং রাম-বিষয়ক ভাস্কর্যগুলিও স্থান লাভ করিয়াছে।[৩১] মহিষাসুরমর্দিনী, কালী, শিব এবং রাম-রাবণের যুদ্ধের চিত্র অধিকাংশ মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ দেখা যায়। বহু মন্দিরে কৃষ্ণলীলার সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসসৈন্য পরিবৃত যুদ্ধরত দশানন, দশমুণ্ডধারী রাবণের সঙ্গে বানরসেনার অসংখ্য চিত্র, জোড়বাংলা মন্দিরের পশ্চিমদিকের প্রাচীরে অন্ধমুনির পুত্রবধ কাহিনী, শ্যামরায় মন্দিরদ্বারের উপরে রাম-বাবণের যুদ্ধদৃশ্য ও ছাদের উপরে সীতার অগ্নিপরীক্ষা প্রভৃতি রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে অঙ্কিত চিত্র রাম ও বিষ্ণুর অভেদত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করে। আবার বাঁকুড়া জিলার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে সাব্রাকোন গ্রামের কৃষ্ণমন্দিরে বিগ্রহের নাম রামকৃষ্ণ। এইরূপ ঐক্যমত ধর্মীয় চিন্তা জগতে সমন্বয়মূলক চিন্তার ফসল।[৩২]

এইরূপ ধর্মমত সমন্বয়ের প্রভাব মল্লভূমের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। কবিচন্দ্রের কয়েকটি পালাতে এইরূপ সহজ নম্র ধর্মমত সমন্বয়ের আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'শিবরামের যুদ্ধ' পালায় শিব ও রামের অভেদত্ব বর্ণনার দ্বারা শৈব ও রামায়েত উভয় ধর্মমতের মানুষকে কবি কাছে টানিতে চাহিয়াছেন।

অভেদ শিব রামে দেখ ভেদ নাই কভু।
না জানিঞা যুদ্ধ করিতে জান তবু প্রভু ॥

(শিবরামের যুদ্ধ, পু.পৃ. ৭)

কেবল অভেদত্ব বর্ণনা নহে রাম অর্থাৎ বিষ্ণুই শিবের ইষ্ট এবং গুরু এইরূপ উল্লেখের দ্বারা বৈষ্ণব ধর্মমতকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

শিব পড়িলেন রামের পায় শিবের পায় রাম।
কোলাকুলি দুইজনে দুইজনে প্রণাম ॥
দুঁহাকার প্রেমে দুঁহে হইল পুলকিত।
দেবতা সকল দেখে দুঁহার পীরিত॥

শিব রামে কোলাকুলি দেখি হনূমান।
শিবের ইষ্ট এই রাম কমলনয়ান।।
পুনঃ পুনঃ দুঁহাকার প্রেম আলিঙ্গন।
দুঁহাকার প্রেমকথা না যায় বর্ণন ।। (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ১০ক-১০)



RAMAYANA PAT : DURGA INTERVENING BETWEEN SIVA & RAMA ABOUT TO FIGHT
Dt. Hooghly, West Bengal. 17th-18th Century. Asutosh Museum of Indian Art. University of Calcutta

বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্ব ও নানা ধর্মীয় কলহ-বিবাদ প্রচলিত ছিল, দুই দেবতার মিলনের দ্বারা সে সকল তর্কজাল ও মতবিরোধের অবসানই এই পালাটির মাধ্যমে প্রচার করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় ।

মহাভারতের অন্তর্গত 'অর্জুনের দর্পচূর্ণ' পালাতেও কবিচন্দ্র এইরূপ দুই ধর্মমতের সমন্বয় সাধন করিবার উদ্দেশ্যেই একটি সুন্দর কাহিনী সংযোজন করিয়াছেন বলিয়া অনুমান। হনূমান ও অর্জুন এই দুই বীরের মধ্যে সংঘটিত কলহের অবসানকল্পে ও অর্জুনের মান রক্ষা করিতে শ্রীকৃষ্ণ হনূমানের নিকট রঘুনাথের বেশে এবং অর্জুনের নিকট গদাধর মূর্তিতে দর্শন দেন । অতঃপর রামভক্ত হনূমান এবং কৃষ্ণভক্ত অর্জুন উভয় বীর আপন আপন ভুল বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত চিত্তে স্ব স্ব ইষ্টদেবতার চরণে নিপতিত হন । এই পালাটির মাধ্যমে কবিচন্দ্র রামায়েত ও কৃষ্ণায়েত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের অবসান ঘটাইতে চাহিয়াছেন অতি কৌশলে ।

ধর্মীয় চিন্তার এবং অধ্যাত্ম চেতনার সঙ্গে লোক-সংস্কৃতির সম্পর্ক সুনিবিড় । এই লোক-সংস্কৃতির প্রধান বিষয় বিভিন্ন লোক-গীতি, পাঁচালি এবং কথকতা । ইহাদের মধ্যে

পাঁচালি এবং কথকতাই জনচিত্তে মুখ্য স্থান অধিকার করিয়া প্রাচীন বাংলার কাব্যকে গেয় কাব্যের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছে । প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের আখ্যায়িকা প্রধান ধারাটি অর্থাৎ রামায়ণ, মহাভারত এবং মঙ্গলকাব্যসমূহের হালকা চালের গানগুলি পাঁচালির মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করে । বিষ্ণুপুরের কথকতার সুনাম সর্বজনবিদিত। সঙ্গীতজ্ঞ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার লিখিয়াছেন,— মল্লরাজাদের আমলে বিষ্ণুপুরে প্রচুর ব্যক্তি কথকতা কর্মে নিযুক্ত ছিলেন । এই সকল কথকেরা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং সুকণ্ঠগায়করূপে জনসমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন । সঙ্গীতকেশরী অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ খুল্লতাত ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও খুল্লতাত ভ্রাতা রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কথকতায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন । অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রাজা গোপাল সিংহের রাজসভায় সঙ্গীতাচার্য পদে নিযুক্ত হইয়া রাজপুত্রদ্বয়কে ও যে কোনোও সঙ্গীত শিক্ষার্থীকে অকাতরে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন । তাঁহার সুযোগ্য পুত্র গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে অসাধারণ দক্ষতা লাভে সমর্থ হন ।[৩৩] রাজা রঘুনাথ সিংহের (২য়) আমলেই মল্লভূম সঙ্গীতচর্চার অন্যতম পীঠস্থানে পরিণত হয় বলিয়া জনশ্রুতি আছে ।[৩৪] কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী রাজা রঘুনাথ সিংহের (২য়) রাজত্বকালেই তাঁহার 'রামায়ণ' রচনা করেন । এই 'রামায়ণ' খানি মল্লভূমে এতই জনপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল যে, ইহার নাম পরে 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' নামে পরিচিত হয় ।[৩৫] এই জনপ্রিয়তাও উক্ত কথক, পাঁচালিকার এবং পালা গায়কদের প্রচারের ফল বলিয়া মনে হয় । ইহা প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, মহাকাব্যের আখ্যানসমূহকে ছোট ছোট পালার আকারে মল্লভূমে প্রথম প্রচার করেন কবিচন্দ্র । পরবর্তীকালে তাঁহার এই ধারাটিই বিকাশ লাভ করে। অবশ্য বাংলা সাহিত্যে এইরূপ পালাগানেব প্রচার ছিল প্রথমাবধি । আমরা কবিচন্দ্রের ভণিতাযুক্ত যে সকল পুথির সঙ্গে পরিচিত আছি তাহা কবির স্বহস্ত লিখিত নয়, ঐ পুথিসমূহে পালাগায়ক এবং লিপিকরেরা কবিচন্দ্রের মূল কাব্যখানিকে কতটা এবং কি পরিমাণে পরিবর্তন সাধিত করিয়াছেন তাহা অবশ্যই আমাদের জানা নাই । কবির স্বহস্ত লিখিত পুথি না পাওয়ায় এই সকল অনুলিখিত পুথিই আমাদেব আলোচনার একমাত্র পুঁজি । ইহা দ্বারা মূলের সন্নিকটবর্তী হওয়া কি সম্ভব ? ইহার উত্তরে এইকথা বলা যায় যে, সময়েব দিক হইতে পুথিলেখকেরা আমাদের অপেক্ষা কবির অধিক নিকটবর্তী বলিয়া তাঁহাদেব অনুলিপি হইতেও মূল বিষয়ের কিছুটা অনুমান করা যায়।

কবিচন্দ্রের পুথিসমূহ বিশ্লেষণ করিলে মনে হয় এই পালাগুলি পঠিত ও গীত হইত । কবিচন্দ্রের রচনার প্রধান গুণ সাবলীল ভাষায় পয়ার ও ত্রিপদীছন্দের ব্যবহাব এবং আবেগপূর্ণ উচ্ছ্বাস দ্বারা কাব্যের প্রাণরস সঞ্চার করা । এই দিক হইতে কবিচন্দ্রের রামায়ণখানি গীত হইবার উপযুক্ত । গীতপ্রধান প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে গানেরই জয়জয়কার । ইহার প্রধান কারণ গান ও কবিতায়, তাল ও যতির মধ্যে আদিমে একটা মিল ছিল ।

প্রাচীন কবিতা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত হইত এবং ইহাতে অন্ত্যমিল দ্বারা সুরের গাঁথনি রক্ষা করা যাইত। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, বাংলা রামায়ণ, মহাভারত, অন্নদামঙ্গল, কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি সমস্ত পুরাতন কাব্য গানের সুরে কীর্তিত হইত। এইজন্য শব্দের মধ্যে যাহা কিছু ক্ষীণতা ও ছন্দের মধ্যে যাহা কিছু ফাঁক ছিল সমস্তই গানের সুরে ভরিয়া উঠিত ; সঙ্গে চামর দুলিত, করতালি চলিত এবং মৃদঙ্গ বাজিতে থাকিত।"[৩৩]

কবিচন্দ্রের কাব্য হইতে ত্রিপদী ও পয়ারের যতি বিভাগ করিয়া দেখানো হইল। ত্রিপদীর যতি বিভাগ এইরূপ :-

শোকে স্থির : তর নয়/ কৈকেয়ীর : রাজা কয়/
দীনহীন : লইনু শ- : রণ।
খঞ্জমুখী : কর ত্রাণ/ রামচন্দ্র : মোর প্রাণ /
রক্ষা কর : অকাল ম - : রণ॥
লহ তুমি : ধন ধরা/প্রজা বাস : পুত্র দারা/
গজ বাজি : দিতে পারি : প্রাণে।
যাতে তোর : অভিলাষ/ পুরিব ম-: নের আশ/
একা মোর : রামচন্দ্র : বিনে ॥ /

(রঘুনাথের বনবাস, পু.প্. ৬-৭ক)

পয়ারের যতি বিভাগের উদাহরণ, —

আমার বি-: নাশে হৈল/ দোঁহার ম- : রণ।
জীবন বি- : হনে দোঁহে / তেজিব জী- : বন॥
ঝাঁট আও : তাঁর পাশে / আমি জীতে : জীতে।
কোপ নিবা - : রণ কর/ কয়্যা মোর : তাতে ॥

(রঘুনাথের বনবাস, পু.প্. ২৪ক)

উপরের ত্রিপদী ও পয়ারের উদাহরণ দুইটিকে যতি এবং চতুর্মাত্রিক তালে বিভাগ করিয়া দেখানো হইল। তবে গানে তাহা নানা তালে রূপায়িত হইতে পারে। আর কবিচন্দ্রের কাব্যে সর্বত্র বাগ এবং তালের কথা উল্লিখিত হয় নাই। সর্বত্র যতির নিয়ম অনুসৃতও হয় নাই। কোথাও কোথাও পয়ারের ১৪ অক্ষরের পরিবর্তে ১৭, ১৮ অক্ষর পর্যন্ত পাওয়া যায়, অথচ উচ্চারিত মাত্রা ১৪ই। সুরের প্রয়োজনেই অনেক সময় কথাগুলি টানিয়া গাওয়া হইত এইজন্যও ছন্দের নিয়ম রক্ষা করা সর্বদা সম্ভব হইত না। অক্ষরের এইরূপ অসমান প্রয়োগ নিম্নোক্ত ছত্র দুইটিতে স্পষ্ট :

অন্যকথা কইতে রাজার মুখে বাইরায় রাম।
নয়ন মুদিলে দেখে দূর্বাদলশ্যাম। (অঙ্গদ রায়বার, পু.প্. ৩ক)

প্রথম ছত্রটিতে ১৮ অক্ষর কিন্তু দ্বিতীয় ছত্রটিতে ১৪ অক্ষর পাওয়া যায়।

তবে ইহাও ঠিক পাঁচালির সম্পূর্ণ অংশ গান করা হইত না। কিছুটা কাহিনীর মত বর্ণনা করিয়া এবং কিছুটা সুর সহযোগে গান করা হইত। কখনও কখনও বর্ণনাময় অংশ গায়ক দ্রুততালে আবৃত্তি করিয়া যাইতেন।[৩৭] পাঁচালি যেমন সুরেলা গান, কথকতাও তাই। ইহারও কিছু অংশ বিশ্লেষিত হইত পাঠে এবং কিছু গানে। এইভাবেই পালাকারে রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনী কখনও আবৃত্তি করিয়া কখনও সুরে টানিয়া পড়া হইত। দোহাররা মূল গায়েনের সঙ্গে গানে সুর সংযোজন করিতেন।[৩৮] কথকতায় বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগ বিশেষ হয় না আর পাঁচালিতে তাহা অপরিহার্য। তবে জয়নারায়ণের লেখায় পাওয়া যায় —

"পাঁচালি অনেক ভাঁতি রামায়ণ সুর।
কতকথা তরজাতে শাড়িতে প্রচুর।।"[৩৯]

অর্থাৎ রামায়ণ, কথকতা, তরজা ও শাড়ি (সারি) গানেও পাঁচালির রীতি অনুসৃত হইত।

কবিচন্দ্রের পালাগুলি যে পঠিত ও গীত হইত তাহার আর একটি উদাহরণ, এইসব পুথির বহু স্থলে 'বন্দনা' ও 'ধুয়া'র উল্লেখ আছে। 'হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান' ও 'শিবরামের যুদ্ধ' পালায় পাওয়া যায় বন্দনা ও ধুয়ার উল্লেখ। 'শিবরামের যুদ্ধ' ও 'সীতাহরণ' পালায় আছে 'শ্রীরাগ'-এর নাম এবং অধিকাংশ পুথির শেষে পাওয় যায়, — যিনি পালাগান শুনিবেন অথবা গাওয়াইবেন তিনি অবশ্যই ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিবেন।

যেবা পড়ে যেবা শুনে যেজন গাওয়ায়।
ধন পুত্র হয় তার অন্তে স্বর্গ যায়।।

(লক্ষ্মণের শক্তিশেল, পু.পৃ. ১৫)

তৃতীয়তঃ কবিচন্দ্রের অধিকাংশ পালার বিপুল পাঠ তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে পাঠান্তরের বিভিন্নতা। 'রঘুনাথের বনবাস' পালার বিভিন্ন পাঠান্তরের পুথিতে কবিচন্দ্রের ভণিতা থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি পুথি এতই সংক্ষিপ্ত যে আদর্শ পাঠের সঙ্গে উহাদের সাদৃশ্য কম। এইরূপ সংক্ষিপ্ত পাঠের কিছু উদাহরণ 'নরমেধ যজ্ঞ' 'হরিশ্চন্দ্রের পালা', 'শ্রীরামের বনবাস', 'শিবরামের যুদ্ধ', 'অঙ্গুরী সংবাদ', 'কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ' এবং 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' পালা।

চতুর্থতঃ আব একটি উল্লেখ হইতেও কবিচন্দ্রের 'রামায়ণ' যে গানের জন্য রচিত হইয়াছিল তাহার দৃষ্টান্ত মেলে :

"কবিচন্দ্রের বসুদেব প্রথম গায়ন।
শঙ্কর রচিল পোথা গানের কারণ।।"[৪০]

বসুদেব গায়নই কবিচন্দ্রের 'রামায়ণ' খানি প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া উপর্যুক্ত ছত্রদ্বয়ে পাওযা যায়। তবে কবিচন্দ্রের এইসকল পালায় কিছু কিছু অসঙ্গতিও নজরে পড়ে। যেমন রামচন্দ্র কর্তৃক হনূমানকে অঙ্গুরীয় প্রদান প্রসঙ্গটি 'সীতার উদ্দেশ' পালাতেই উল্লেখ থাকার

কথা, কিন্তু উহা 'সীতাহরণ' এবং 'রাম সুগ্রীব মিলন' পালাতেও পাওয়া যায়। পাঁচালি গানের প্রভাবেই খুব সম্ভব এইরূপ নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করা হইয়াছে। মানুষের হৃদয়ক্ষেত্রে ধর্মের বীজটি বপন করাই ছিল কথক, পালাগায়ক বা পাঁচালিকারদের মুখ্য কাজ। এই দৃষ্টিকোণ হইতে পালাগুলি সঙ্গীতোচ্ছ্বাসে মুখরিত করিয়া তুলিবার জন্যই তাঁহারা কবির মূল কাব্যের বহু অংশ পরিবর্তিত করিয়া লইতেন। অনেক সময় এক কবির রচনা অপরের নামে যুক্ত করিয়া কিংবা ভণিতায় গায়কেরা নিজের নাম জুড়িয়া দিয়া আসর মাতাইয়া তুলিতেন। এই কারণে কবিচন্দ্রের পালাতেও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়া থাকিবে।

পঞ্চমতঃ বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর অঞ্চলে এখনও দুই একজন রামায়ণ-গায়কের সন্ধান পাওয়া যায় যাঁহারা কবিচন্দ্রের রামায়ণ-গায়ক নামে পরিচিত। কবিচন্দ্রের রামায়ণ যে মল্লভূমে অন্যান্য রামায়ণের মধ্যে অত্যধিক প্রচারিত এবং রচনা-শক্তিতে অদ্বিতীয় ছিল ইহাও তাহার একটি প্রমাণ। বাঁকুড়া জিলার ওন্দা থানার অন্তর্গত জামজুড়ি গ্রামের শ্রী কুচিনচন্দ্র গোস্বামী কবিচন্দ্রের রামায়ণ-গায়করূপে পরিচিত। তাঁহারা পাঁচপুরুষাবধি কবিচন্দ্রের রামায়ণ-গান করিয়া জীবিকানির্বাহ করিয়া আসিতেছেন। তিনি একজন মৃদঙ্গবাদকের সহযোগে বিভিন্ন রাগ ও তালের সমন্বয়ে প্রথমে কিছু বন্দনা পদ গান করিবার পর রামায়ণের আখ্যান গাহিয়া থাকেন। তাঁহার শ্রদ্ধা প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি, আর গর্ব কবিচন্দ্রের রামায়ণ-গায়ক নামের জন্য। কবিচন্দ্রের রামায়ণের স্বল্প প্রচার থাকিলে আজ তাঁহার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাইতাম কিনা সন্দেহ। বিষ্ণুপুরের শ্রী অনিল অধিকারী মৃদঙ্গবাদকের সহযোগে কবিচন্দ্রের রামায়ণ-গান গাহিয়া থাকেন। তবে কবিচন্দ্রের রামায়ণ-গায়ক নামে পরিচিত হইলেও তাঁহাদের গানে বাল্মীকি-কৃত্তিবাস-তুলসীদাসের রচিত আকর্ষণীয় অংশ বিশেষ কবিচন্দ্রের ভণিতার সঙ্গে যুক্ত হইতে দেখা যায়। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবিচন্দ্রের নামের ঐতিহ্যের চাইতেও এখন বড় প্রযোজন রুজি রোজগারের উপায়। তাই কবিচন্দ্রের নামের অন্তরালে কবিচন্দ্রের ঐতিহ্য রক্ষায় বিশ্বাসী গায়কেরা আসর জমানো গানের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। কেহ কেহ আবার কবিচন্দ্রের রামায়ণ-গায়ক, বর্তমানে এইরূপ পরিচয় দিতেও ভরসা পান না। পাঁচশত বৎসর পরে কৃত্তিবাসী রামায়ণে কৃত্তিবাসের মূল রচনাংশ উদ্ধার করা যেমন দুরূহ ব্যাপাব, প্রায় তিন শত বৎসর অতিক্রমের পর কবিচন্দ্রের রামায়ণ-গান হইতে কবিচন্দ্রের মূল কাব্যখানি লাভ করাও তেমনি দুষ্কর।

একদা মল্লরাজধানী নামে পরিচিত বিষ্ণুপুর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে, সেইসঙ্গে কথকতা এবং যাত্রাগানেও বিষ্ণুপুরের খ্যাতি ছিল যথেষ্ট। সঙ্গীত রত্নাকর রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'দ্বিতীয় দিল্লী বিষ্ণুপুর' গ্রন্থে উক্ত অঞ্চলের বহু কথক ও যাত্রাভিনেতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্ধবদেব ঘরিয়া ও বনমালী ওঝার কথকতা এবং উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাত্রাভিনয় অবশেষে জীবিকা

নির্বাহেব বৃত্তিতে পরিণত হয় । কিছু শিল্পী রামায়ণের কাহিনীকে অভিনয়যোগ্য করিয়া তোলেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন, — "স্বর্গীয় নন্দলাল রামায়ণের দল করিয়া যান । নন্দলাল সুকন্ঠ ও রামায়ণের গানে অতিশয় যশস্বী ছিলেন । নন্দলালের দলের রামায়ণ-গান তৎকালে জনসাধারণকে মুগ্ধ করিয়া দিত"।[৪১] আমাদের বিশ্বাস 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ'-খানির অত্যধিক জনপ্রিতার মূলেও এইসকল কথক ও রামায়ণ-গায়কদলেরই প্রচারের অনিবার্য ফল । কোনও পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া স্বাধীনভাবে পালা বচনা করাই ছিল কবিচন্দ্রেব নিজস্ব আর্ট । এইদিক হইতে পরবর্তীকালের রামায়ণ- গায়ক ও যাত্রাদলের খুব কাছেব মানুষ ছিলেন তিনি । যাত্রা এবং রামায়ণ-গানে এই রীতিই অনুসৃত হইয়া থাকে । এই সকল 'কথা - প্রধান সঙ্গীতে' রচয়িতার নাম থাকে প্রচ্ছন্ন। খুবসম্ভব এইহেতু বিষ্ণপুবেব সর্বাধিক জনপ্রিয় রামায়ণ-গানের স্রষ্টা কবিচন্দ্রও ধীরে ধীরে সরিয়া গিয়াছেন তাঁহারই রচনাব নেপথ্যে ।

এইরূপে মল্লভূমের অনন্য লোক-সঙ্গীতে যেমন ভাদুগানে, টুসু -গানে ও পট-সঙ্গীতেও কবিচন্দ্রের 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'ভাগবত' এবং 'শিবমঙ্গল' কাব্যের বিভিন্ন পালার প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয় । এই সব লোকগীতিতে কাহিনীর পরম্পরা বক্ষিত না হওয়ায় এবং রচয়িতার নাম না থাকায়, উহাদের গানে কোনও একজন বিশেষ কবির কাব্যকে অবিকৃতভাবে পাওয়া সম্ভব নহে । তবে শিবমঙ্গল কাব্যের লৌকিক পালাগুলি, যেমন 'মর্ছধরা' পালা, 'শঙ্খপরা ' পালা ইত্যাদি কবিচন্দ্রই প্রথম রচনা কবিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়, আর এইহেতু উক্ত কাহিনী পটুয়া-গীতিতে প্রচলিত হওয়ায় অনুমান করা যায় যে ঐ সকল কাহিনী কবিচন্দ্রের পালারই রূপভেদ মাত্র ।

মল্লভূমেব লোক-সঙ্গীতেই নয়, লোক-নৃত্যেও কবিচন্দ্রের প্রভাব অপরিসীম । বাঁকুড়া-সরাইকেল-পুরুলিয়ার সীমান্ত অঞ্চলে প্রচলিত ছৌনৃত্যে কবিচন্দ্রের রামায়ণের কোনও কোনও পালা অভিনীত হইতে দেখা যায় । কবিচন্দ্রই মল্লভূমে আখ্যায়িকাধর্মী রাম-কথা ও ভারত-পাঁচালি কাব্যের প্রথম সার্থক পালাগানের স্রষ্টা । 'শিবরামের যুদ্ধ' এবং 'অর্জুনেব দর্পচূর্ণ' পালা কবিচন্দ্রের কাব্যেই প্রথম পাওয়া যায় । ছৌনৃত্যে যুদ্ধনৃত্যগুলি অধিক পরিমাণে সমাদৃত হওয়ায় শিব ও রামের যুদ্ধ এবং অর্জুন ও হনুমানের দ্বন্দ্ব এবং পরিণামে উভয়েব মিলন কবিচন্দ্রের রচিত এইসকল বিষয়ই কালক্রমে উহাতে সাঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে । এই সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন, — "এই অঞ্চলের ছো-নাচে যে এত যুদ্ধ নৃত্যের অভিনয় হয়, তাহার অর্থই এই যে একদিনের গোষ্ঠী-সংগ্রাম বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তনের পর ধর্মীয় আনন্দানুষ্ঠানের রূপ লাভ করিয়া এই প্রকার যুদ্ধনৃত্যে পরিণত হইয়াছে"।[৪২] এই অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার সপ্তদশ শতাব্দীর খুব অধিক পূর্বের নয । এইদিক হইতেও এই অঞ্চলের লোকনৃত্যে কবিচন্দ্রের পালার নাটকীয উপাদান ও সহজ সরলভঙ্গী ব্যাপক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হইয়াছিল । বাহুল্য বর্জিত খণ্ড খণ্ড

আখ্যানসমূহ পালাকারে সুবিন্যস্ত হওয়ায় কবিচন্দ্রের 'রামায়ণ' খানি কেবল পাঁচালি ও যাত্রাগানেই অনুপ্রবেশের পক্ষে সহজতর হয় নাই, উক্ত অঞ্চলের নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে এমনকি লোকনৃত্যেও ইহার অবাধ অনুপ্রেবশ ঘটিয়াছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, — "Though the performance are not held on the basis of any written diction in either of the place, Yet by investigation it has been found that it is the Bengali Translation of the Ramayana by Kabichandra that is generally adopted for performance".[৪৩]

মধ্যযুগের জীবন ও সাহিত্য ছিল অনাড়ম্বর ধর্মকেন্দ্রিক। বিভিন্ন কবির অনুশীলিত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের আখ্যানসমূহ একই ধরনের পাঁচালিগান দ্বারা পরিশীলিত হইয়া জনগণের ভক্তি পিপাসা চরিতার্থ করিত। কবিকঙ্কণ-কৃত্তিবাস-কাশীরাম দাস-কবিচন্দ্রের সময় পর্যন্ত পৌরাণিক গ্রন্থাদির অনুবাদ ও বিভিন্ন দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক কাব্য প্রচুর লেখা হয়। তাই কবিচন্দ্রের প্রভাব পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যে কতখানি ফলপ্রসূ হইয়াছিল এবং আদৌ হইয়াছিল কিনা তাহা বলা কঠিন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য কবিচন্দ্রকে মধ্যযুগের বাংলার মানস সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার প্রতিনিধিস্থানীয় কবিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।[৪৪] তাহার কারণ তিনি যাত্রা সাহিত্যে কবিচন্দ্রের প্রভাবের ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন — "পরবর্ত্তীযুগের যাত্রা সাহিত্য যে অন্ততঃ বিষয় নির্বাচন ও ভক্তিরসাশ্রিত বিবৃতি প্রবণতার দিক দিয়া তাঁহার (কবিচন্দ্রের) নিকট পরোক্ষভাবে ঋণী তাহাও অস্বীকার করা যায় না।"[৪৫] এই প্রসঙ্গে আমরা দাশরথি রায়ের পাঁচালির কথা উল্লেখ করিতে পারি। শ্রদ্ধেয় হরিপদ চক্রবর্তী মহাশয় দাশরথি রায়ের পাঁচালিকে যেরূপে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় রাম-পাঁচালির বিষয়গুলি — শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন, দশরথের বিলাপ, ভরতের রাম-অন্বেষণ, সীতাহরণ, বালী বধ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, রাবণ বধ এবং রামচন্দ্রের দেশাগমন প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড ভাবে লিখিত হইয়াছে।[৪৬] ইহাদের সঙ্গে কবিচন্দ্রের রামায়ণের পালা-বিন্যাসের সাদৃশ্য আছে। তবে উক্ত গ্রন্থে পাঁচালি গানের উপযুক্ত রাগ ও তালের যেরূপ বিস্তারিত বিবরণ আছে তাহা কবিচন্দ্রের পুথিতে পাওয়া যায় না। দাশরথি রায়ের পাঁচালিই আবার পরবর্তী রামায়ণ পাঁচালিকারদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই সম্পর্কে হরিপদ চক্রবর্তী মহাশয় লিখিয়াছেন, — "পাঁচালীতে প্রচার প্রাধান্য সুস্পষ্ট, তদানীন্তন রক্ষণশীল সমাজের চৌহদ্দির মধ্যে ভক্তিবারি সিঞ্চন করিয়া মানুষের হৃদয়ক্ষেত্রে ধর্মের বীজ বপন করা এবং সুনীতি সদাচার — ঈশ্বর ভক্তিরূপ সুগন্ধ সুবর্ণি কুসুমরাজি প্রস্ফুটিত করাই ছিল পাঁচালীর মুখ্য কাজ। দাশরথির পাঁচালীতে এই লক্ষ্মণ সুপ্রকট। তাঁহার উত্তরসূরী — রসিক রায়, ব্রজ রায়, ঠাকুর দাস, নন্দ রায, মনোমোহন বসু প্রভৃতির মধ্যেও এই ধারা অনুসৃত হইয়াছে।"[৪৭]

এখন প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, এই সকল নবীন পাঁচালিকারেরা যে প্রাচীন পালাকেই তাঁহাদের যাত্রার উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ কি ? তাঁহারা তো সরাসরি সংস্কৃত গ্রন্থ হইতেই কাহিনীর উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিতেন । অবশ্য এই যুক্তিও একেবারে অগ্রাহ্য নয় । তবে ইহাও ঠিক, সর্বযুগে এবং সর্বকালেই সাহিত্যের একটি ক্রম পরিণতির ধারা থাকে । কৃত্তিবাস-কাশীরাম দাসের সাহিত্য নিষিক্ত পীযূষধারা যেমনভাবে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে সুদীর্ঘকাল পথ প্রদর্শন করিয়াছে, তেমনভাবে কবিচন্দ্রের কাব্য রচনার ধাবা পরবর্তীকালের বিশেষতঃ রাঢ় অঞ্চলের রামায়ণ-গায়কদলের উপর শতধারায বর্ষিত হইয়াছে । পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র তাঁহার 'গৌরীমঙ্গল' কাব্য রচনাকালে (ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে) কবিচন্দ্রের রচিত ভাগবতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[৪৮] আবার বর্ধমানের কবি প্রাণবল্লভ 'জাহ্নবীমঙ্গল' কাব্যে (১১০৪ সাল) কৃত্তিবাসের সঙ্গে একজন কবিচন্দ্রের বন্দনা করিয়াছেন ।[৪৯] ইঁনি পানুয়া গ্রামের কবিচন্দ্র বলিয়াই মনে হয় । অতএব বাঁকুড়া জিলার পার্শ্ববর্তী বর্ধমান জিলার কাটোয়ার নিকট বাঁধমুড়া গ্রামে ১২১২ বঙ্গাব্দে (১৮০৬ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করিয়া দাশরথি রায়ের পক্ষে কবিচন্দ্রের ধারা অনুসরণ করা একেবারে অসম্ভব নয় । দাশরথি রায় কৃত্তিবাসের প্রতি একনিষ্ঠতা মানিয়া চলিলেও পালা-বিন্যাসের ক্ষেত্রে কবিচন্দ্রকেই অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় । দাশরথি রায়ের কৃষ্ণলীলার কয়েকটি পালার নাম শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব, গোষ্ঠলীলা, কালীয় দমন, গোপীদের বস্ত্রহরণ, কলঙ্ক ভঞ্জন, অক্রূর সংবাদ, নন্দ বিদায়, উদ্ধব সংবাদ, রুক্মিণী হরণ এবং পারিজাত হরণ। কবিচন্দ্রের ভাগবতীয় পালার সঙ্গে এইসকল পালার নাম-সাদৃশ্য বর্তমান । কবিচন্দ্র পূর্ববর্তী কবি, এইহেতু দাশরথি রায়ের পক্ষে কবিচন্দ্রের প্রভাব একেবারে অস্বীকার করা যায় না ।[৫০] কবিচন্দ্রের রচনার প্রধান গুণ নীতিশিক্ষা এবং অহৈতুকী ভক্তিভাব । যেসকল পালায় নীতি ও ভক্তি সমন্বিত স্নিগ্ধভাব প্রতিফলিত সেই সকল পালার প্রচারও অধিক দেখা যায় । এইদিক হইতে 'হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান', 'দাতাকর্ণ', 'প্রহ্লাদ চরিত্র' এবং 'ধ্রুব চরিত্র' প্রভৃতি পালার নাম উল্লেখযোগ্য । ঊনবিংশ শতাব্দীর নবীন যাত্রাগানের ধারক ও বাহক গোবিন্দ অধিকারী, নীলকন্ঠ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, মতিলাল রায় এবং রামচরণ মুখোপাধ্যায়ের কৃষ্ণযাত্রার ভক্তিমূলক পালাতেও 'কলঙ্ক ভঞ্জন', 'কালীয় দমন', 'গোষ্ঠ বিহার' ও 'অক্রূর সংবাদ' নামগুলি পাওয়া যায় । এইরূপ নামের পালায় কবিচন্দ্রের ভণিতাতেও বহু পুথি মিলিয়াছে । এইরূপ সাদৃশ্য-বশতঃ মনে হয় পরবর্তী যাত্রাপালার লেখকগণ খুবসম্ভব নিজেদের অজ্ঞাতসারেই কবিচন্দ্রের রচনার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন । আর এই কারণেই ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'পরবর্তীযুগের যাত্রা সাহিত্যকে' কবিচন্দ্রের নিকট 'পরোক্ষভাবে ঋণী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।

যতদূর জানা যায় কবিচন্দ্রই প্রথম স্বর্গের শিবকে লইয়া লৌকিক পালা সৃষ্টি করেন। তাঁহার 'শিবমঙ্গল' কাব্যের পুথি দুষ্প্রাপ্য হইলেও 'মৎস্যধরা' পালা এবং 'শঙ্খপরা' পালার অনুরূপ কাহিনী পরবর্তী শিবমঙ্গলের কবি রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র এবং রামেশ্বর চক্রবর্তীর কাব্যেও পাওয়া যায়। পটুয়া-গানেও কবিচন্দ্রের পালার অনুরূপ শিবের মাছ-ধরা, দুর্গার ছদ্মবেশ ধারণ ও শিবকে ছলনা প্রভৃতি বিষয়গুলি গৃহীত হইয়াছে।[৫১]

কবিচন্দ্রের রচনার লোকরঞ্জন ক্ষমতা ও সুদূরপ্রসারী প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায় 'শিশুবোধক' নামক শিশু-পাঠ্য পুস্তকে। কবিচন্দ্রের 'দাতাকর্ণ', 'কলঙ্কভঞ্জন' এবং 'প্রহ্লাদ চরিত্র' পালা এই পাঠ্য পুস্তকটিতে মুদ্রিতাকারে পাওয়া যায়। তবে 'প্রহ্লাদ চরিত্রে' কবিচন্দ্রের নাম উল্লিখিত হয় নাই। সঙ্কলক কবিচন্দ্রের এই পালাগুলির মধ্যে শিশু-শিক্ষার উপকরণ খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন, এইহেতু উহাদের শিশুমনের উপযুক্ত অন্যান্য বিষয়ের মতই গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া উক্ত পাঠ্যপুস্তকে স্থান দিয়াছেন। কাজেই কবিচন্দ্রের এই পালাগুলি নীতি শিক্ষার বাহন হইয়া ওঠায় বিংশ শতাব্দীতেও শিশুমনের উপর উহারা ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

আধুনিক কালেও কবিচন্দ্রের রচনার অনুসৃতি ও অনুশীলন ব্যাহত হয় নাই। 'দাতাকর্ণ নাটক' প্রণেতা হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন — "এই উপাখ্যানটি শিশুবোধকের দাতাকর্ণ কবি প্রণেতা মহাত্মা কবিচন্দ্র কল্পনা বলে মহাভারতীয় উপাখ্যানরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার কল্পনার মহীয়সী ক্ষমতা প্রভাবে ইহাকে শাস্ত্রীয় ঘটনা বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। ইহা কবিবর কবিচন্দ্রের পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। আমিও তাঁহার কল্পনা-শক্তিকে নমস্কারপূর্ব্বক এই দাতাকর্ণ নাটক প্রণয়ন করিলাম"।[৫২]

কবিচন্দ্রের 'দাতাকর্ণ' পালা যদিও শাস্ত্রীয় বিষয় নহে, তথাপি কবিচন্দ্রের নিকট অধমর্ণের এই ঋণ স্বীকার প্রশংসনীয় কর্ম তাহাতে সন্দেহ নাই। আর কবিচন্দ্রের 'অঙ্গদ রায়বার' পালাটি দীর্ঘকাল যাবৎ কৃত্তিবাস হইতে আরম্ভ করিয়া বহু রায়বার পালার পুথিতে পরিবর্তিতাকারে অনুপ্রবিষ্ট হইতে দেখা যায়। কবিচন্দ্রের 'দাতাকর্ণ' পালাটি 'শিশুবোধক' নামক শিশুপাঠ্য পুস্তকে অযোধ্যারাম কবিচন্দ্রের নামেই পরিচিত হইয়া আসিয়াছে।

মধ্যযুগের অন্যান্য কবির তুলনায় কবিচন্দ্র যে হীনপ্রভ ছিলেন না এবং সমকালীন সাহিত্যভাণ্ডারে তাঁহার রচনার সংখ্যাধিক্য, ভাষারীতি ও বাক্‌ভঙ্গী যে তাঁহাকে অনন্য সাধারণ কীর্তির অধিকারী করিয়াছে তাহা প্রকাশ করিবার সময় সমুপস্থিত। তৎকালীন কাব্য রচনার ধারা আলোচনা করিলে কবিচন্দ্রকে কোনও বিষয়েই রসহীন বলিয়া মনে হয় না।

★ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীদাসের কাল ও বাসভূমি প্রভৃতি লইয়া একটি জটিল সমস্যা দেখা দিয়াছে। যেহেতু ইহা আমাদের গবেষণার বিষয় নয় সেইহেতু এই সম্পর্কে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

পাদটীকা

১।	চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	: রামাই পণ্ডিত বিরচিত শূন্য পুরাণ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৩৩৬ সাল।
২।	সুকুমার সেন	: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড অপরার্ধ, ২য় সং ১৯৬৫ খ্রীঃ, পৃ. ১৪১-১৪২
৩।	দীনেশচন্দ্র সেন	: বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, ২য় খণ্ড ১৯১৪ খ্রীঃ, পৃ. ১১২১
৪।	সুকুমার সেন	: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড অপরার্ধ, ২য় সং ১৯৬৫ খ্রীঃ, পৃ. ৯০
৫।	প্রদীপ কুমার সিংহ সম্পাদিত	: হেমলতা দেবী বিরচিত মানবী বিলাস, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, ১৩৮৭ সাল।
৬।	যদুনন্দন দাস বিরচিত	: কর্ণানন্দ, বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত, ২য় সং ১২২০ সাল।
৭।	A.P. Mallik	: History of Bishnupur Raj, 1921 A.D. P-116
৮।	প্রদীপকুমার সিংহ সম্পাদিত	: রাঢ়ের পদাবলী, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। পৃ.২
৯।	মণীন্দ্রমোহন বসু	: বাঙ্গালা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, ১৯৪৭ খ্রীঃ, পৃ. ৯৭
১০।	প্রাগুক্ত	: প্রাগুক্ত পৃ. ৯৭
১১।	রাধামাধব ঘোষ বিরচিত	: রামলীলা (আখ্যা পত্র ছিন্ন) Bankura Mukherjee Press, 1894-95. পৃ. ৩০৪
১২।	মাণিকলাল সিংহ	: পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি, প্রথম প্রকাশ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া ১৩৮৪ সাল। পৃ. ১৫২-১৫৩
১৩।	প্রাগুক্ত	: প্রাগুক্ত পৃ. ৩৩৩
১৪।	সুকুমার সেন	: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড অপরার্ধ, ২য় সং ১৯৬৫ খ্রীঃ, পৃ. ৪১৭ পাদটীকা।
১৫।	প্রাগুক্ত	: প্রাগুক্ত পৃ. ৬৮
১৬।	Amiya Kumar Banerji	: West Bengal District Gazetteers Bankura, 1968. P. 105
১৭।	সুকুমার সেন	: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড অপরার্ধ, ২য় সং ১৯৬৫ খ্রীঃ, পৃ. ৪৫৬-৪৫৭
১৮।	প্রাগুক্ত	: প্রাগুক্ত পৃ. ১৮৩
১৯।	প্রাগুক্ত	: প্রাগুক্ত পৃ.১৭৩

২০। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত পৃ. ১৯৩-১৯৪
২১। দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, ১ম খণ্ড, ১৯১৪, পৃ. ৩৭৯
২২। তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য লিখিত প্রবন্ধ : সীতারাম দাসের মনসা মঙ্গল, নারায়ণ পত্রিকা, অগ্রহায়ণ, ১৩২৫। পৃ. ৬৪-৬৯
২৩। সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড অপরার্ধ, ২য় সং ১৯৬৫ খ্রীঃ। পৃ. ৫২২
২৪। Ramesh Chandra Datta: The Aboriginal element in the population of Bengal. The Calcutta Review 1882 PP. 242-43
২৫। মাণিকলাল সিংহ : মল্লভূমের মল্লরাজা দেবতাদের আদি বৃত্তান্ত। কৌশিকী পত্রিকা, ৯ম-১০ম সংখ্যা, ১৯৭৪। পৃ. ৩৬
২৬। মাণিকলাল সিংহ : পশ্চিমরাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি, ১৩৮৪। পৃ. ১০৬-১০৭ এবং ১৩২-১৩৩ (জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব)
২৭। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : পশ্চিমবাংলার গ্রামের নাম (বাঁকুড়া জেলা)। ১৯৮০ খ্রীঃ।
২৮। মাণিকলাল সিংহ : মল্লভূমের মনসা পূজা ও ঝাঁপান, দেশ পত্রিকা, ৪১ বর্ষ, ৩রা নভেম্বর ১৯৭৩ খ্রীঃ পৃ. ৬৩-৬৬
২৯। চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত : মল্ল রাজধানীর অধুনালুপ্ত একটি উৎসবের স্মৃতিচারণ, বাঁকুড়া হিতৈষী, শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৩, বাঁকুড়া। পৃ. ৫৫-৫৯
৩০। মাণিকলাল সিংহ : মল্লভূমের শিকারোৎসব, দেশ, ৩৯ বর্ষ, ২৯ জুলাই ১৯৭২ খ্রীঃ। পৃ. ১৩৮৪-১৩৮৭
৩১। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাঁকুড়ার মন্দির, ১৯৬৪ খ্রীঃ। পৃ. ১২৬-১২৭
৩২। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত পৃ. ১২৮
৩৩। জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার সঙ্কলিত : সঙ্গীতকেশরী স্বর্গীয় অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বংশপরিচয়, ষষ্ঠ খণ্ড, ১৩৩৪ সাল। পৃ. ২৫৪
৩৪। A.P. Mallik : History of Bishnupur Raj, 1921 A.D. P-48
৩৫। সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড অপরার্ধ, ২য় সং ১৯৬৫ খ্রীঃ। পৃ. ৩৫৮
৩৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড (প্রবন্ধ), পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৩৬৮। পৃ. ১৩৮

৩৭। সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড অপবার্ধ, ২য় সং ১৯৬৫ খ্রীঃ। পৃ. ৮৪

৩৮। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : পদাবলী পরিচয়, ১৩৫৯ ; পৃ. ৬

৩৯। জয়নারায়ণ : করুণানিধান বিলাস, রাগ রাগিনী প্রসঙ্গ, (আখ্যাপত্র ছিন্ন) পৃ. ২৪৭

৪০। চিত্রা দেব সম্পাদিত : শঙ্কর কবিচন্দ্র রচিত বিষ্ণুপুরী রামায়ণ, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৬। ভূমিকা পৃ. VIII

৪১। সঙ্গীত রত্নাকর বমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : দ্বিতীয় দিল্লী বিষ্ণুপুর। বিষ্ণুপুর, ১৩৪৮ সাল। পৃ. ১৪৩

৪২। সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত এবং আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখিত রৈচায়িকা : পশ্চিম সীমান্তবঙ্গের লোক-সাহিত্য, ২য় মুদ্রণ ১৩৮২। পরিচায়িকা পৃ. চোদ্দ

৪৩। Asuthosh Bhattacharya: The Chhou dance of Purulia, 1972 A.D. P. 32.

৪৪। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রাচীন পুথি সংগ্রহ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থ সঙ্গমে, ১ম সং ১৩৬৯। পৃ. ১০৮

৪৫। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত পৃ.১০৮-১০৯

৪৬। হরিপদ চক্রবর্তী : দাশরথি রায়ের পাঁচালী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩২। পৃ. ৩৯৫-৪৭৫

৪৭। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত ভূমিকা. পৃ. ৯

৪৮। রাজা পৃথ্বীচন্দ্র বিরচিত, বিমান বিহারী মজুমদার সম্পাদিত: গৌরীমঙ্গল, এসিয়াটিক সোসাইটি। ১৯৭১। পৃ. ৫১১

৪৯। প্রণব রায় লিখিত : 'গঙ্গামঙ্গল', ও প্রাণবল্লভের জাহ্নবী মঙ্গল', বিশ্বভারতী পত্রিকা। বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮০। পৃ. ৩৩০

৫০। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৪র্থ খণ্ড, ১ম সং ১৯৭৩। (৭ম অধ্যায়ের সাহায্য গ্রহণ করা হইল- পৃ. ৫৯৩-৭০৯)।

৫১। গুরুসদয় দত্ত : পটুয়া-সঙ্গীত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯। পৃ. ১০৭-১১৬

৫২। হরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত : দাতাকর্ণ নাটক, কল্যাণপুর, হাবড়া, ১৩০৪ সাল। ভূমিকা পৃ.এক-দুই।

দশম অধ্যায়

।। বাংলা রামায়ণকার তিন কবিচন্দ্র ।।

বাংলা রামায়ণের কবিরূপে তিনজন দ্বিজ কবিচন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যায় । স্বল্প দূরত্বের মধ্যে অবস্থানহেতু এই তিন কবিচন্দ্রের পুথি সম্পর্কে বেশ কিছু মতবিরোধ আছে । দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ের জনপ্রিয় কবি কবিচন্দ্রের নামে অপর দুই কবির কাব্যের কিছু অংশ প্রচারিত হইয়া গিয়াছে। দ্বিজ কবিচন্দ্র ভণিতার দুই একটি পুথিও প্রচলিত আছে সর্বাধিক পরিচিত কবির নামে । অতএব প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করিতে এই ত্রয়ীর যথোচিত মূল্যায়ন একান্তই আবশ্যক । এই তিন কবির নাম কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী (পানুয়া নিবাসী, বাঁকুড়া), কবিচন্দ্র লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বৈঞিতল নিবাসী, গ্রাম-দক্ষিণবাড়, বাঁকুড়া) এবং কবিচন্দ্র ভবানীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি সাগরদিয়ার অধিবাসী । এই তিন কবির সম্পর্কে মূল জটিলতার কারণ তাঁহাদিগের কাব্যের বিষয়, উপাধি, বর্ণ ও অঞ্চল প্রায় এক ।

এই তিন কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রসঙ্গে বলা যায় যে, কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীই ইঁহাদিগের মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রাচীনতম ব্যক্তি । তিনি বিষ্ণুপুরেব মল্লরাজা বীর সিংহের (২য়) রাজত্বকাল (আঃ ১৬৫৬-১৬৮২ খ্রীঃ) হইতে রাজা গোপাল সিংহের (১ম) রাজত্বের কিছুকাল পর্যন্ত আনুমানিক প্রায় ছয়-সাত দশক সাহিত্যসাধনা করিয়াছেন এবং রাজা গোপাল সিংহের (১ম) সাহিত্যসভা অলঙ্কৃত করেন । অথচ অপর দুই কবির কাব্য সাধনার কালসীমা অতদূর পর্যন্ত পাওয়া যায় না । তাহা না হইলেও দ্বিজ লক্ষ্মণ, কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর 'রামায়ণ' রচনার কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার 'রামলীলা' কাব্য রচনা করেন বলিয়া অনুমান । একটি পুথির পুষ্পিকায় 'শ্রীশ্রী ছত্রসিংহ রণজিৎ শমসের বাহাদুরের' নাম পাওয়া যায় (ক.বি. ৩৬৪৩, পু.পৃ.২২) । মল্লরাজা গোপাল সিংহের (১ম) প্রায় সমসাময়িককালে ময়ূরভঞ্জ হইতে ঐ নামের এক আফগান সর্দার বগড়ী পরগণায় অধিকার বিস্তার করিয়া মঙ্গোলাপোতায় মন্দিরাদি নির্মাণ করেন বলিয়া জানা যায় ।[১] তবে উক্ত নাম কবির রচনার মধ্যে না পাওয়ায় উহা খুব নির্ভরযোগ্য প্রমাণ বলিয়া মনে হয় না । যাহাই হউক, এই দ্বিজ লক্ষ্মণ নিঃসন্দেহে মল্লভূমের কবি । তাঁহার পুথিতে নিবাসস্থলের যে নাম পাওয়া যায় তাহা বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত স্থান । কবির রচনায় পাওয়া যায়—

নিবাস বৈঞিতল গ্রাম দক্ষিণবাড় সীমা ।
বৈদ্যপাড়ার কাছে ঘর শ্রীলক্ষ্মণ নামা ।।

(ক.বি. ৩৬৪৩, পু.পৃ. ২২ক-২২)

দক্ষিণবাড় আধুনিক বাঁকুড়া জিলার জয়পুর থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম । এই গ্রামে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য প্রভৃতির একত্রিশটি পাড়া আছে । বৈতল এই গ্রামের পোষ্টঅফিস।[২] আর "বৈঞিতল"

এই আধুনিক বৈতল শব্দের পূর্বনাম।ঁ পানুয়া গ্রামের (কোতলপুর থানা) অদূরবর্তী স্থানে বৈঞ্তল বা দক্ষিণবাড়ের নিকট দ্বিজ লক্ষ্মণ কবিচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটে। কোন কোন অর্ধশিক্ষিত লিপিকর এই দুই পৃথক কবিসত্ত্বার কথা মনে না রাখিয়া অনুলিখনের কার্যে অগ্রসর হইয়াছেন। লিপিকরদের এই অজ্ঞেয়তা এবং দুই স্থানের নৈকট্য এই দুই কবির কাব্যকে 'দ্বিজ কবিচন্দ্র' নামের আড়ালে এক করিয়া ফেলিয়াছে। তবে দ্বিজ লক্ষ্মণ নিজেব সম্পর্কে যে সকল কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র :-

বাড়ুরী বাঙ্গাল লম্বোদরের সন্তান।
আটভাই মধ্যে তায় খট্যাল প্রধান ॥
ভাবাপন্ন সদাই চণ্ডী চরণের সুত।
লক্ষ্মণ গান প্রভু রামনাম পাপ চিত ॥ (ক.বি. ২৯, পু.পৃ. ৮)

পিতা লম্বোদর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আট পুত্রের মধ্যে তিনি খট্যাল (অর্থাৎ খুঁত ধরিতে পটু বা দোষ ধরাই যাঁহার স্বভাব)। কবির এক পুত্রের নাম নিমানন্দ। পুত্রের জন্য কবি রামচন্দ্রের নিকট আরোগ্য কামনা করিয়াছেন আদিকাণ্ডের পুথিতে —

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ গায় রামলীলা গীত।
পরাৎপর মাগি বর পদদ্বন্দ্বে।
আরোগ্য করিয়া রাখ পুত্র নিমানন্দে ॥ (ক.বি. ২৮, পু.পৃ. ৮ক)

পুত্র নিমানন্দ ছাড়াও আর একটি নাম পাওয়া যায় 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' পালার পুথিতে (ক.বি. ৩৬৪৩, পু.পৃ. ৭)। পার্বতীকে অভয় চরণে স্থান দানের কথায় মনে হয় ঐ নামটি কবির কন্যার নাম। নিজের মৃত্যুকষ্টের জন্য কবির ভয় ছিল, এইজন্য রামপদে নিজেকে বারে বারে সমর্পণ করার কথাও ব্যক্ত করিয়াছেন। কবি নিজেকে 'বাঙ্গাল' কেন বলিয়াছেন তাহা বোঝা গেল না। খুব সম্ভব তাঁহার পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তাঁহার একটি পুথি (ক.বি. ২৮৪ নং) পূর্ববঙ্গ হইতে প্রাপ্ত বলিয়া জানা যায়।

তৃতীয়জন ভবানীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সংক্ষেপে শঙ্কর নামে পরিচিত। তিনি নিজের পরিচয় দিয়াছেন এইভাবে —

সাগরদিয়্যার বন্দ রবিকবি সর্বানন্দ
গোবিন্দ তনয় বিজয়রাম।
তস্য পঞ্চ পুত্র দ্বিজ ভবানীশঙ্করাগ্রজ
রচিল তারার তত্ত্বজ্ঞান। (ক.বি. ৭৪, পু.পৃ. ১১ক)

এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়-লিপি হইতে জানা যায়, তিনি সাগরদিয়ার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের

রবিকরি সর্বানন্দ মেলের অন্তর্গত। পিতামহ গোবিন্দ এবং পিতা বিজয়রামের পঞ্চ পুত্রের মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ।[৪] কবির পুত্রের নাম অঞ্জন, তাঁহার জন্য তিনি প্রভু জানকীনাথের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন (সা. ২৬৯২, পু.পৃ. ৯ক, ১০)। এই ভবানীশঙ্করের রামকথার প্রতিটি পুথিতে শঙ্কর এবং দুইটি পুথিতে (ক.বি. ৭৪ এবং সা. ২৬৯২) রামশঙ্কর নাম পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত সমস্ত পুথিতে 'বন্দিয়া জানকীনাথ শ্রীশঙ্করে গায়' — এই বিশেষ ছত্রটির উল্লেখ আছে।

কবির কথা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি তিলকচন্দ্র রাজার রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন :-

শ্রীযুত তিলকচন্দ্র ক্ষেত্রি বর্ণ ধর্ম।
শ্রীরামশঙ্কর কহে তস্য দেশে জন্ম ।। (ক.বি. ৭৪, পু.পৃ. ১৪)

কবি স্পষ্টতঃ তাঁহার নিবাসস্থল কিংবা নিজের পৃষ্ঠপোষকের নাম উল্লেখ করেন নাই। 'তস্য দেশে জন্ম' বলিতে তিনি খুব সম্ভব বর্ধমানের মহারাজা তিলকচন্দ্র সিংহের (১৭৪৪-১৭৭০ খ্রীঃ) অধিকারভুক্ত অঞ্চলের কথাই বলিতে চাহিয়াছেন। তাহা হইলে তিনি কবিচন্দ্রের পরবর্তী কবি। বর্ধমান এবং বাঁকুড়া জিলা পাশাপাশি অবস্থিত। মল্লরাজা গোপাল সিংহের (১ম) পরবর্তীকালে বর্ধমানের মহারাজারা মল্লভূমের দক্ষিণ ও পূর্বাংশে অধিকার স্থাপন করেন। তাহার জন্যও কবি বর্ধমানের মহারাজার নাম উল্লেখ করিতে পারেন। আবার দেখা যায়, কবি জগৎরাম রায় বাঁকুড়া জিলার ভুলুই গ্রামের অধিবাসী, কিন্তু তাঁহার পৃষ্ঠপোষক কোনও মল্লনৃপতি নয়। তিনি তৎকালীন পঞ্চকোটের (শিখরভূমের) অধিকারভুক্ত রাজা রঘুনাথ নারায়ণের রাজত্বকালে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'অদ্ভুত রামায়ণ' গ্রন্থখানি রচনা করেন। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে মনে হয়, ভবানীশঙ্কর বর্ধমানের মহারাজা তিলকচন্দ্র সিংহের নাম উল্লেখ করিলেও কবির নিবাসস্থল মল্লভূমের মধ্যে অথবা সন্নিকটে হওয়া অসম্ভব নয়। বাস্তবক্ষেত্রেও পানুয়ার কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর সঙ্গে ভবানীশঙ্করের কাব্যের মিল ও একটি পুথিতে উভয়ের রচনার মিশ্রণ ঘটায় এই দুই কবিকে পরস্পরের নিকটবর্তী অঞ্চলের বলিয়াই মনে হয়।

মল্লভূম কথার উল্লেখ একমাত্র কবিচন্দ্রের কাব্যে :-

এই তিন কবির উপাধি কবিচন্দ্র। দ্বিজ লক্ষ্মণের 'নরমেধ যজ্ঞ' পালার দুইটি পুথিতে (ক.বি. ৬৮৫ এবং ৬৮৬ নং) এবং 'বালির পিণ্ডদান' পুথিতে (সা. ১৭৬৪ নং) কবিচন্দ্রের উল্লেখ আছে। ভবানী শঙ্করের 'যযাতি রাজার পালা' (সা. ১৭১৫ নং) এবং অযোধ্যাকাণ্ডের পুথিতে (ক.বি. ৪০) কবিচন্দ্র ভণিতা পাওয়া যায়। আর কবিচন্দ্র শঙ্কর

চক্রবর্তীর রাম-কথার সকল পুথিতেই আমরা 'কবিচন্দ্র' ভণিতা পাইয়াছি। এই তিনজনের মধ্যে একমাত্র তিনিই মল্লরাজ সভাকবির সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। অপর দুই কবির ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকের নাম এবং উপাধি লাভের বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। এই তিন কবিই ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত অতএব 'দ্বিজ' শব্দটিও মাঝে মাঝে নাম অথবা উপাধির পূর্বে পাওয়া যায়। তবে দ্বিজ কবিচন্দ্র বা কবিচন্দ্র বলিতে এখনও সকলে পানুয়া নিবাসী শঙ্কর চক্রবর্তীকেই নির্দিষ্ট করিয়া থাকেন। আর এই তিন কবির রচনার মধ্যে 'মল্লভূম' কথার উল্লেখ একমাত্র কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর কাব্যেই পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যে এমনকি আধুনিক বাঁকুড়া অঞ্চলেও মল্লভূমের কবিচন্দ্র নামে তিনিই সমধিক পরিচিত হইয়া আছেন।

তিন কবির জনপ্রিয়তার কারণ ঃ

এই তিন কবির কাব্য সম্পর্কিত জটিলতার মূল কারণ কবিনাম ও উপাধি সমস্যায় নিহিত, সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই জটিলতা দূর করিবার পর আমরা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কয়েকটি নূতন পালার রচনাকাররূপে এই তিন কবিকে চিহ্নিত করিতে পারি। এই অভিনব পালাগুলির মধ্যে পড়ে 'নরমেধ যজ্ঞ' বা 'যযাতি রাজার উপাখ্যান', 'শিবরামের যুদ্ধ', 'অঙ্গদ রায়বার', 'তরণীসেন বধ' এবং 'মহীরাবণ বধ' পালা। ইহাদের মধ্যে 'নরমেধ যজ্ঞ' বা 'যযাতি রাজার উপাখ্যান' তিন কবির নামেই পাওয়া যায়। তবে কবিচন্দ্রের উক্ত পালার একটি পুথিকে আমরা 'সূর্যবংশ কথা' পালা নামকরণ করিয়াছি। 'শিবরামের যুদ্ধ' পালা তিন কবির নামে পাওয়া গেলেও 'অঙ্গদ রায়বার' পালা কেবল কবিচন্দ্রের নামেই পাওয়া যায়। আর 'তরণীসেন বধ' ও 'মহীরাবণ বধ' পালা পাওয়া যায় কেবল দ্বিজ লক্ষ্মণ ও ভবানীশঙ্কর বা শঙ্করের ভণিতায়। এই পালাগুলি যে এই কবিত্রয়ের জনপ্রিয়তার কারণ তাহা আমরা এখানে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

কবিচন্দ্র :-

'সূর্যবংশ কথা' বা 'নরমেধ যজ্ঞ', 'শিবরামের যুদ্ধ' এবং 'অঙ্গদ রায়বার' পালার প্রথম সার্থক রচয়িতার সম্মান আমাদের ধারণায় কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীরই প্রাপ্য। তাহার প্রধান কারণ, এই তিনটি পালার পুথিসমূহে 'শঙ্কর' ও 'কবিচন্দ্র' ভণিতা দ্বারা কোনও সমস্যার সৃষ্টি হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ কবিচন্দ্র অগ্রবর্তী কবি আর তাঁহার সূর্যবংশ কথার বিষয়বস্তু বাল্মীকি রামায়ণের (বাল কাণ্ড ৬১-৬৫ সর্গ) কাহিনী অবলম্বনে রচিত। দ্বিজ লক্ষ্মণ ও ভবানীশঙ্করের পালার নাম 'যযাতি রাজার উপাখ্যান' উহার বিষয় কবিচন্দ্রের কাহিনীর সঙ্গে মেলে না। কাজেই কবিচন্দ্রের এই পালা দুইটি কাহারও অনুকরণে রচিত বলা যায়

না । অপর পালাটির নাম 'শিবরামের যুদ্ধ' । আমাদের মতে, এই পালাটির উদ্ভাবকও কবিচন্দ্র । অবশ্য এই সম্পর্কে অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসুর কথাও স্মরণযোগ্য । তিনি দ্বিজ লক্ষ্মণকেই এই পালার প্রথম রচয়িতা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন । তাঁহার মতে, "ক.বি. ২৮৪ নং পুথির (দ্বিজ লক্ষ্মণের পালার) তারিখ ১১০৫ সন বা ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দ । কবিচন্দ্র রঘুনাথ সিংহের রাজত্বকালে অর্থাৎ ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দের পরে রামায়ণ রচনা করেন অতএব শিবরামের যুদ্ধের পালা সর্বপ্রথম দ্বিজ লক্ষ্মণ রচনা করিয়াছিলেন, পরে সেই আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া কবিচন্দ্র স্বাধীনভাবে একটি পালা রচনা করেন, পরে তাঁহার এই পালাটিই কোন কোন পুথিতে কৃত্তিবাসের ভণিতায় চলিয়া যাইতেছে ।"[৭] আমরা শ্রদ্ধেয় মণীন্দ্রমোহন বসুর এই যুক্তি মানিয়া লইতে পারিনা । কারণ দ্বিজ লক্ষ্মণ পানুয়ার কবিচন্দ্রের পূর্ববর্তী কবিরূপে আমরা কোনও প্রমাণ পাই নাই । উপরন্তু তাঁহার পুথিসমূহের সন তারিখ লক্ষ্য করিলে দ্বিজ লক্ষ্মণকে কবিচন্দ্রের পরবর্তী কবি বলিয়াই মনে হয়। ক.বি. ২৮৪ নং পুথিটি পূর্ববঙ্গ হইতে প্রাপ্ত হইলেও পুথিটি মল্লভূমের লিপিকরের লেখা হইতে পারে । তাহা হইলে '১১০৫ সন'কে বঙ্গাব্দ বলিয়া উল্লেখ করা চলে না । উহা মল্লাব্দ সনও হইতে পারে, কারণ কবি নিজে মল্লভূম নিবাসী । দ্বিজ লক্ষ্মণের অন্যান্য পুথির অনুলিখনের কাল বঙ্গাব্দ এগার শতকের শেষ ও বার শতকের প্রথমার্ধ বলিয়া পাওয়া যায় । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুথির তালিকার প্রথম খণ্ডে (১৯২৬ খ্রীঃ) দেখা যায়, ক.বি. ১৯৮৫ নং সুন্দরাকাণ্ডের পুথিটি ১০৬১ সনে অনুলিখিত । উহা ভুলক্রমে দ্বিজ লক্ষ্মণের নামে ছাপা হইলেও আসলে উহা কৃত্তিবাসের পুথি । উহার একটি ভণিতাও দ্বিজ লক্ষ্মণের নয় । অতএব পুথির লিপিকাল ধরিয়া দ্বিজ লক্ষ্মণকে কবিচন্দ্রের পূর্ববর্তী কবি বলা যায় না, যেহেতু কবিচন্দ্রের বহু পুথি দ্বিজ লক্ষ্মণের উক্ত সন তারিখের বহু পূর্বের অনুলিখিত ।

দ্বিতীয়তঃ প্রাচীনতর কবির যুক্তি দ্বারা কবিচন্দ্রকে অনুকরণকারীর অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দিলেও পরবর্তীকালের লিপিকরদের প্রক্ষিপ্ত অভ্যাসের ফলরূপ আর একটি অভিযোগ এই সম্পর্কে উঠিতে পারে । সেক্ষেত্রেও বলা যায় ১১৩৯ সালে অনুলিখিত 'শিবরামের যুদ্ধ' পালার (সা. ৪২৭) একখানি খণ্ডিত পুথি কবিচন্দ্রের নামে পাওয়া যায় । আর প্রক্ষিপ্ত রচনার মধ্যে আসল কবির রচনাব কিছু না কিছু প্রভাব আসিয়া পড়ে । কবিচন্দ্রের 'শিবরামের যুদ্ধ' পালার পুথিসমূহে দ্বিজ লক্ষ্মণের কোনও প্রভাব নজরে পড়ে না । কবিচন্দ্র, দ্বিজ লক্ষ্মণ এবং ভবানীশঙ্কব তিনজনই 'শিবরামের যুদ্ধ' পালা রচনা করিয়াছেন । তিনজনের বিষয়বস্তু এক হইলেও একটি ছত্রও একজনের রচনা হইতে অন্যের রচনায় প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না । তিনটি রচনাই স্বতন্ত্রভাবে সমান্তরাল

রেখায় যেন প্রধাবিত। 'শঙ্কর' কিংবা 'কবিচন্দ্র' ভণিতা লিপিকরদিগের দ্বারা এই পালার পুথিসমূহে কোনও সমস্যার সৃষ্টি করে নাই।

কবিচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'অঙ্গদ রায়বার' পালা। এই পালাটি কবিচন্দ্রের এক অসামান্য কীর্তি। যদিও ফকিররাম কবিভূষণকে অনেকে 'অঙ্গদ রায়বার' পালার আদি স্রষ্টা বলিয়া মনে করেন, কারণ ফকিররামের ১০০৮ সনে অনুলিখিত অঙ্গদ রামায়ণের (ক.বি. ২৮৩ নং) সঙ্গে কবিচন্দ্রের রচনার কিছু কিছু মিল আছে; তথাপি ফকিররামের রচনাটি সম্পূর্ণ হিন্দী ভাষায় রচিত। তাঁহার এই পুথিটির ছন্দোদোষ মাঝে মাঝে অর্থবোধেও বিঘ্ন ঘটায়। কাব্যের সুললিত ভাব উক্ত পালায় মেলে না। 'অঙ্গদ রায়বার' পালাটি রচনার অনুপ্রেরণা কবিচন্দ্র ফকিররামের নিকট হইতে পাইয়া থাকিলেও কবিচন্দ্রের সাবলীল ভাব ও উত্তর-প্রত্যুত্তরের অপূর্ব চাতুর্য ফকিররামের রচনায় পাওয় যায় না। হাল্কাচালের সুদীর্ঘ ব্যঙ্গরসাত্মক কবিচন্দ্রের এই রচনাটি বাংলা সাহিত্যে বিদ্রূপাত্মক রচনার প্রথম সার্থক দৃষ্টান্ত। দ্বিজ লক্ষ্মণ কিংবা ভবানীশঙ্করের ভণিতায় এই পালার কোনও পুথি আমরা পাই নাই। একমাত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণে কবিচন্দ্রের 'অঙ্গদ রায়বার' পালাটি কিছুটা পরিবর্তিত আকারে পাওয়া যায়। অতএব এই পালার অবিস্মরণীয় জনপ্রিয়তার গৌরব কবিচন্দ্রের একারই প্রাপ্য।

দ্বিজ লক্ষ্মণ :-

দ্বিজ লক্ষ্মণের পুথিতে 'কবিচন্দ্র' ভণিতা থাকায় যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। 'যযাতি রাজার উপাখ্যান' দ্বিজ লক্ষ্মণের রচনা, তাহা পানুয়ার কবিচন্দ্রের রচনার সঙ্গে মিশিয়া যাইবার সম্ভবনা দেখা যায়। নচেৎ 'দ্বিজ কবিচন্দ্র গান পালা অভিলাষী' (ক.বি. ৬৮৬, পু.পৃ. ৫ক) এই ছত্রটির পরিবর্তন করিয়া দ্বিজলক্ষ্মণেরই অপর পুথিতে (ক.বি. ৬৮৫, পু.পৃ.৫ক) "দ্বিজ কবিচন্দ্র গান পার্শ্বায় নিবাসী" লেখা হইবে কেন ? 'পালা অভিলাষী' কে 'পার্শ্বায় নিবাসী' লেখার মধ্যে পানুয়ার কবিচন্দ্রকে স্পষ্টতঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। অথচ উক্ত পুথি দুইটিই দ্বিজ লক্ষ্মণ কবিচন্দ্রের। এইভাবে কবিচন্দ্রের নামের আড়ালে দ্বিজ লক্ষ্মণকে মুছিয়া ফেলিবার প্রচেষ্টা আরও দেখা যায় বিষ্ণুপুরী রামায়ণের মুদ্রিত গ্রন্থটিতে (প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ)। এই মুদ্রিত গ্রন্থে দ্বিজ লক্ষ্মণের 'শিবরামের যুদ্ধ' পালাই কবিচন্দ্রের ভণিতায় ছাপা হইয়া গিয়াছে। কৃত্তিবাস যেমন লিপিকর ও গায়েনদের দৌলতে নবকলেবর ধারণ করিয়াছেন, কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীও মল্লভূমে তেমনি লিপিকর ও গায়েনদের দ্বারা দ্বিজ লক্ষ্মণের কিছু রচনা অধিকার করিয়াছেন।

যাহাই হউক 'মহীরাবণ বধ' পালা পাওয়া যায় দ্বিজলক্ষ্মণের ভণিতায়। তিনি এই পালার প্রথম রচয়িতা কিনা সে সম্পর্কে কোনও প্রমাণ পাওয়া না গেলেও সর্বাণী নন্দনের 'মহীরাবণ বধ' পালায় দ্বিজ লক্ষ্মণের উল্লেখ হইতে মনে হয়, তিনি এই পালাটির প্রথম রচয়িতা হইতে পারেন :-

"ব্যাসের আদেশে রচে শ্রীযুত লক্ষ্মণ।
তাঁর পদ বন্দি গান সর্বাণীনন্দন।।"[৬]

আমরা কবিচন্দ্রের ভণিতায় মহীরাবণবধ পালার পুথি পাই নাই। ভবানীশঙ্করও 'মহীরাবণ বধ' পালা রচনা করিয়াছেন। দ্বিজ লক্ষ্মণের রচনার সঙ্গে তাঁহার রচনার কোনও প্রভেদ নাই। কবিচন্দ্রের ভণিতায় লিখিত পুথি না পাইলেই কবিচন্দ্র তাহা রচনা করেন নাই, এইরূপ বলাও আমাদের উদ্দেশ্য নহে। 'অঙ্গদ রায়বার' কিংবা 'শিবরামের যুদ্ধ' পালা যে কবিচন্দ্রের সাহিত্যিক খ্যাতিকে উচ্চাসনে স্থাপিত করিয়াছে তাহা ঐ দুই পালার পুথির বহর দেখিলেই অনুমান করা যায়। যদি মহীরাবণ বধ কিংবা তরণীসেনের যুদ্ধ পালা রচনার দ্বারা কবিচন্দ্র অনুরূপভাবে খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হইতেন, তাহা হইলে কি তাঁহার এই দুই পালার পুথি এমন অপ্রতুল হইতে পারিত?

ভবানীশঙ্কর :-

আমাদের কবিচন্দ্রের নাম শঙ্কর আবার ভবানীশঙ্করের সংক্ষিপ্ত নাম শঙ্কর। আমরা শঙ্কর ভণিতায় যত পুথি পাইয়াছি সবই ভবানীশঙ্করের রচনা, কারণ উহাতে তাঁহার বিশেষ পরিচয়পূর্ণ ছত্র 'বন্দিয়া জানকীনাথ শ্রীশঙ্করে গায়' — এই কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। এইহেতু এইরূপ ভণিতাযুক্ত পুথিগুলি কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর রচনা হইতে পারে না। কিন্তু দেখা যায় 'তরণীসেনের যুদ্ধ' বা 'তরণীসেন বধ' পালার পুথিগুলিতে শঙ্কর ভণিতা থাকায় অনেক গুণীব্যক্তিও এই পালাগুলিকে কবিচন্দ্রের রচনা বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, সে কথার উল্লেখ চতুর্থ অধ্যায়ে করা হইয়াছে। এই শঙ্কর কখনও ভবানীশঙ্কর আবার কখনও রামশঙ্কর নামে নিজের পরিচয় দিয়াছেন। শঙ্কর নামের জটিলতার অন্তরালে এযাবৎকাল বৈষ্ণবীয় ভক্তির উৎসারক হিসাবে কবিচন্দ্রের নামই চলিয়া আসিতেছে। অথচ কবিচন্দ্রের ভণিতায় একখানাও 'তরণীসেন বধ' পালার পুথি পাওয়া যায় নাই।

দ্বিজ লক্ষ্মণের ভণিতায় 'তরণীসেন বধ' পালার একটি পুথি পাওয়া যায় (বি.ভা. ১৮৯৩, খণ্ডিত)। তাহার সঙ্গে ভবানীশঙ্করের রচনার প্রভেদ না থাকিলেও এই পালার বহু পুথি ভবানীশঙ্করের বা শঙ্করের ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে। আমাদের মনে হয়, কবিচন্দ্র এবং দ্বিজ লক্ষ্মণ অপেক্ষা ভবানীশঙ্করের রচনাতেই রাক্ষস বংশে বৈষ্ণবীয় ভক্তির তীব্রতা

অধিক প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভক্তির সূত্রপাত অরণ্যকাণ্ডে রাবণের সীতাহরণের যুক্তিতে আর তাহার পরিণতি লঙ্কাকাণ্ডে তরণীর বৈষ্ণবীয় মহাসমরে। এই ভক্তিস্রোত একটু বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। রাবণ জানিতেন রামচন্দ্র স্বয়ং ঈশ্বর। তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে সীতা হরণের কৌশল করিতে হইবে, নচেৎ মুক্তি লাভ হইবে না। এই প্রসঙ্গে ভবানীশঙ্কর অরণ্যকাণ্ডে লিখিয়াছেন —

ভকতি করিয়্যা পূজিলে রাঘবে ত্বরায় লহিব গতি।
হরিয়্যা জানকী আনিবে ত্বরাত্যে আসিব কমলাপতি ॥
যদি বা সমরে কমললোচন না পারে মারিতে মোরে।
বধিয়া তাঁহাকে ঠাকুর হইয়্যা রাজুতি করিব ঘরে ॥
রামের সমরে যুঝিয়া মরিলে হইব আমার গতি।
কমললোচন বধিলে গোলোকনগরে হইব স্থিতি॥
রামের সমরে পরাণ তেজিলে জনম নহিবে আর।
ভাবিয়্যা রাবণ রাজন রাঘবচরণ করিল সার ॥

(ক.বি. ১৯০, পু.পৃ. ১৩-১৪ক)

অরণ্যকাণ্ডটি আদ্যন্ত এই ভক্তির সুরে গাঁথা। রাবণ যে উদ্দেশ্যে সীতা হরণের ছল খুঁজিয়াছেন, তরণীকুমারও সেই উদ্দেশ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন। উভয় পালার ভাব ও রচনাগত সাদৃশ্যে ঐ দুই বিষয় যে একই কবির রচনা তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। রাবণের উক্ত চিন্তার সঙ্গে তরণীর কথার মিল লক্ষ্য করার মত। ভবানীশঙ্করের 'তরণীসেনের যুদ্ধ' পালার উদ্ধৃতি প্রদত্ত হইল —

রামের বচন শুনিলেন কুমার তরণী।
স্তব কৈলে মোরে না বধিব রঘুমণি ॥
ভক্তিভাবে শত্রুকে না মারে রঘুনাথ।
যুদ্ধ করি মরি যদি শ্রীরাম সাক্ষাৎ ॥
তবে অনায়াসে পাব শ্রীরামচরণ।
কি কাজ করিব বৃথা রাখিয়া জীবন ॥
এতেক ভাবিয়া বীর রঘুনাথে বলে।
কি কারণে গাণ্ডীবাণ আপুনি তেজিলে ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া বাণ যুড়িলে ধনুকে।
প্রতিজ্ঞা রহিল কোথা না বধিলে মোকে ॥
তোমার যোগ্যতা রাম সব গেল জানা।

বৃথা গাণ্ডীবাণ সব বৃথা বীরপনা ।।
তরণীর বাক্য শুনি কুপিলা শ্রীরাম।
কোপে পাসরিলা ভক্তজন ভগবান ।।
যত দয়া হয়্যাছিল সব গেল দূরে।
কোপেতে গাণ্ডীব নিলা তরণী বধিবারে ।।

(ক.বি. ১৭৮, পু.পৃ. ১০-১১ক)

শত্রুভাবে ভজনা করিয়া রাবণের মতই তরণীকুমারও নরনারায়ণ রামচন্দ্রকে পাইতে চাহিয়াছেন। ধনুকের উপরে রাম নাম লিখিয়া রাঘবচরণ স্মরণ করিয়া তরণী যুদ্ধযাত্রা করেন।

রাঘবচরণ করিয়া স্মরণ তরণী চাপিল রথে।
জনম সফল চলিল দেখিতে জানকীনাথে ।।
ভাবিয়া রাঘবচরণ শ্রীশঙ্করে বলে।
শমন দমন কারণ শরণ লইলাম চরণতলে ।।

(ক.বি. ১৭৮, পু.পৃ. ৩)

অরণ্যকাণ্ডের পুথিটির সঙ্গে 'তরণীসেনের যুদ্ধ' পালার মিল শুধু ভাবের দিক হইতেই নহে, ছন্দের দিক হইতেও বর্তমান। দুইটি পুথিতে একই ছন্দ যাহা কবিচন্দ্রের রচনায় মেলে না। শঙ্কর নামের ভণিতা থাকায় এবং 'গোবিন্দ মঙ্গল' কাব্য রচয়িতারূপে পরিচিত কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীকেই এই বৈষ্ণবীয় রসের উদ্গাতা বলিয়া অনেকে মত পোষণ করিলেও বাস্তবে দেখা যায়, দ্বিজ লক্ষ্মণের সঙ্গে কবিচন্দ্রের সমস্যার মতই ভবানীশঙ্করের 'তরণীসেনের যুদ্ধ' বা 'তরণীসেন বধ' পালা কবিচন্দ্রের সাহিত্য-কীর্তির সঙ্গে অবিসংবাদীরূপে জড়িত হইয়া গিয়াছে।

কবিত্রয়ের কবিখ্যাতি :-

আমাদের এই আলোচনায় কবিচন্দ্রের কবিখ্যাতি তিন কবির মধ্যে ত্রিধা বিভক্ত হইয়া পড়িলেও প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করিয়া কবিচন্দ্রের প্রকৃত মূল্যায়ন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তরণীসেনের বৈষ্ণবীয় ভক্তি কবিচন্দ্রের সাহিত্যিক খ্যাতি হইতে বাদ দিলেও অঙ্গদ রায়বারের তির্যক বাক্‌চাতুরীতে বাংলা সাহিত্যে তিনি একক। তাঁহার অপরাজেয় এই বাক্‌ভঙ্গী পরবর্তীকালে ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যেই পরিলক্ষিত হয়। জনপ্রিয়তায় কৃত্তিবাসকে বাদ দিলে মধ্যযুগের কবিসমাজে তিনি প্রথম শ্রেণীর কবি। কোনও স্থানের সঙ্গে কাব্যের নাম যুক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত মধ্যযুগীয় সাহিত্যে বিরল। এইদিক হইতেও বিষ্ণুপুরী

রামায়ণের গৌরব কবিচন্দ্রের একারই প্রাপ্য। তাঁহার রচনার সহজ সরল ভাব এবং কাব্যগত মাধুর্য কোনও কালেই উপেক্ষার বিষয় নয়। তবে কাব্যগুণের উৎকর্ষে ও বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসের প্রাচুর্যে ভবানীশঙ্কর এবং কাহিনীর বিস্তার ও পারিপাট্যে দ্বিজ লক্ষ্মণের মান উন্নত হওয়া সত্ত্বেও, দ্বিজ কবিচন্দ্রের জনপ্রিয়তার ফলেই প্রদীপের তলায় অন্ধকারের মতই এই দুই কবি আজ ম্লান। এই কবিত্রয়ের সম্পূর্ণকাব্য উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত সাহিত্য-আসরে তাঁহাদের প্রকৃত স্থান নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য।

কাব্য রচনার উদ্দেশ্য :-

কবিচন্দ্রের কাব্যের সঙ্গে দ্বিজ লক্ষ্মণ ও ভবানীশঙ্করের কাব্যের প্রধান ব্যতিক্রম পালা রচনায় ও কাণ্ড বিভাগে। কবিচন্দ্রের কাব্যেব সম্পূর্ণ অংশই পালাকারে অনুলিখিত, আর অপর দুই কবির কাব্য কাণ্ডাকারে বিভক্ত। তবে দ্বিজ লক্ষ্মণ ও ভবানীশঙ্করের ভণিতায় বেশ কিছু পালাও পাওয়া যায়। কবিচন্দ্র পূর্ববর্তী কবি, এইহেতু তাঁহার প্রভাব এই দুই কবির পালাতেও পড়া অস্বাভাবিক নয়। কবিচন্দ্রের পালাগুলি খুব সম্ভব গীত হইত। গায়েনদের গুণেই কবিচন্দ্রের এক একটি পালার পাঠ ও পাঠান্তর প্রচুর। কবিচন্দ্রের তুলনায় ভবানীশঙ্করের 'তরণীসেনের যুদ্ধ', 'শিবরামের যুদ্ধ', ও 'মহীরাবণ বধ' পালার কিংবা দ্বিজ লক্ষ্মণের 'নরমেধ যজ্ঞ', 'শিবরামের যুদ্ধ' ও 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' পালার পুথি-সংখ্যা কম। দ্বিজ লক্ষ্মণের 'শিবরামের যুদ্ধ' পালার পুথি অন্যান্য পালার তুলনায় অধিক হইলেও কবিচন্দ্রের তুলনায় কম। 'মহীরাবণ বধ' পালার পুথি দ্বিজ লক্ষ্মণের ও ভবানীশঙ্করের ভণিতায় মাত্র একখানা করিয়া পাওয়া যায়। একইকালে ও একই কবিমানসের মধ্যে আবির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও এই কবিদ্বয়ের পালার অপ্রতুলতার কারণ খুব সম্ভব কবিচন্দ্র পূর্বতন কবি, মল্লভূম তথা রাঢ় অঞ্চলের জনমানসে প্রথমে তিনিই পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাই তাঁহার অধিকাংশ পালার বিপুল সমারোহ, আর উক্ত কবিদ্বয় কবিচন্দ্রের পরবর্তী কবি বলিয়াই হয়তো জনপ্রিয়তায় কবিচন্দ্রকে অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারেন নাই। পালাগুলির অনুলিখনও হয়তো এই কারণে স্বল্প।

যাহাই হউক এই তিন কবিই নিজের নিজের কাব্যকে 'রামলীলা' নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই নামকরণ হইতেই কাব্য রচনার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। নরনাবায়ণ রামচন্দ্রের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যেই তাঁহারা অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন। এইদিক হইতে বিশাল বাল্মীকির 'রামায়ণ' অপেক্ষা সংক্ষিপ্ততর 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'ই ছিল কবিগণের আদর্শস্থল। অন্ত্যমধ্যযুগের ধর্মীয় পরিমণ্ডলে নরশার্দূল রামচন্দ্রের ঐশ্বর্য উপলব্ধি অপেক্ষা নরনারায়ণ রামচন্দ্রের স্নিগ্ধমাধুর্যেমণ্ডিত নবদূর্বাদলশ্যাম মূর্তিটি ছিল অধিক

আকাঙ্ক্ষিত। জনমানসের আশা আকাঙ্ক্ষা দ্বারা উদ্বুদ্ধ রাঢ়-বঙ্গের কবিগণ অধ্যাত্ম রামায়ণের রাম-মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যকে সার্থকভাবে কাজে লাগাইয়াছেন। সামন্ততান্ত্রিক দেশের রাজপৃষ্ঠপোষক কবিগণ সাহিত্যে এমন ভক্তিভাব ঢালিয়া দিতে চাহিয়াছেন যাহা রাজন্যবর্গের পক্ষে উৎসাহোদ্দীপক এবং জনসাধারণের নিকটও আদর্শব্যঞ্জক। তাই রামচন্দ্র ও সীতার প্রতি আবেগ ঢালা ভক্তিভাবের পাশেই পাওয়া যায় রাবণসভায় অঙ্গদ ও হনূমানের বীরত্বের তীব্র আস্ফালন। ইহা যেন কোনও এক মল্লবীরের শত্রুপক্ষীয় রাজার প্রতি রণহুঙ্কার ও মল্লযুদ্ধের নমুনার চূড়ান্তরূপ। আবার বিস্ময় সৃষ্টি করে যখন তরণীর কাটামুণ্ড এক অলৌকিক শক্তিতে 'রাম-নাম' করিতে থাকে। অঙ্গদ ও তরণীবীরের জনপ্রিয়তা সর্বাধিক হওয়ায় এই দুই পালার অনুলিখন অন্যান্য কবির ভণিতায়ও হইতে থাকে। এই তিন কবিই রচনা করিয়াছেন 'শিবরামের যুদ্ধ' পালা। কোনও বিরোধী ভাবাদর্শ নহে, সম্পূর্ণ মৌলিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া রামমহিমা ঘোষণার ইহা এক অভিনব প্রয়াস। ইহার মূল প্রেরণা হয়তো পুরাণ কিংবা লোকজীবনে কিন্তু তাহার পরোক্ষ ফল ধর্মজীবনে। কৈলাসের শিব স্বয়ং ভৃত্য-হনূমান সহ রামচন্দ্রকে গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই অবিস্মরণীয় কাহিনীর প্রচার শুরু হয় এই তিন কবির কাব্যেই। অধ্যাত্ম রামায়ণে মহাদেবের মুখে রাম-মহিমা প্রচারের সঙ্গে এই পালার কোথায় যেন একটা মিল আছে। এই পালাটির দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় — কৈলাসবাসিনী ভবানীর রণস্থলে উপস্থিতি এবং যুদ্ধের পট পরিবর্তন। কাহিনীর দিক হইতে ইহা যেমন চমকপ্রদ, ভাবের দিক হইতেও অবিস্মরণীয়। মাতৃতান্ত্রিক বাংলাদেশে নারীর মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখাই সাহিত্যের বিধান। খুব সম্ভব এইরূপ ধারণার বশবর্তী বিরিঞ্চি ও বাসব কৈলাসবাসিনী পার্বতীকে প্ররোচিত করেন রণস্থলে উপনীত হইতে। নচেৎ সৃষ্টি লোপ পায়। ঘোর সংগ্রামের মধ্যে শিব ও রাম উভয় বীর পার্বতীকে মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান দেখিয়া লজ্জায় অভিভূত হন। পাছে নারীহত্যা হয় এই আশঙ্কায় উভয়ে অস্ত্র সংবরণ করেন। পার্বতীর উপস্থিতিতে উভয়ের মর্যাদাও পরস্পরের নিকট অক্ষুণ্ন থাকে। রাঢ়ের প্রত্যন্ত অঞ্চল বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার (বাগমুণ্ডি) সীমান্তবর্তী এলাকায় এই পালাটি লোক-নৃত্যে (ছৌনৃত্যে) অভিনীত হওয়ায় সাহিত্যের সঙ্গে সংস্কৃতির যোগসূত্রটি রক্ষিত হইতে দেখা যায়।

নরমেধ যজ্ঞ পালায় ভক্ত বালকের ঈশ্বরানুরাগ, শিবরামের যুদ্ধের পর রামচন্দ্রের অর্থাৎ বিষ্ণুর মহিমা প্রচার, তরণীর বৈষ্ণবীয় ভক্তিরস, অঙ্গদের ব্যঙ্গাত্মক পরিহাস-রসিকতা এবং মহীরাবণ বধ পালায় হনূমানের বীরত্ব-কৌশল প্রচার এই পালাগুলির উদ্দেশ্য হইলেও ভক্তি, বীর ও হাস্যরসের ত্রিবেণী ধারায় এই পালাগুলি রসসিক্ত। আধুনিক কাব্যরসের বিচিত্র আস্বাদ এই পালাসমূহে পাওয়া না গেলেও শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনের সহজ সরল

একমুখী ভাবের দ্বারা এই পালাগুলি পূর্ণ । তাহাতে নগববৈদগ্ধহীন গ্রাম্য-মাধুরীই ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায় । কবিচন্দ্র, দ্বিজলক্ষ্মণ ও ভবানীশঙ্কর ব্যতীত 'নরমেধ যজ্ঞ' বা 'যযাতি রাজার উপাখ্যান' এবং 'শিবরামের যুদ্ধ' পালা পাওয়া যায় কৃত্তিবাসের ভণিতায় ।

ফকিররাম কবিভূষণের পরেই 'অঙ্গদ রায়বার' পালা পাওয়া যায় কবিচন্দ্রের নামে । অন্যান্য কবির রায়বার পালাসমূহে কবিচন্দ্রের পরবর্তীকালের লিপিকাল পাওয়া যায় । 'তরণীসেনের যুদ্ধ' পালা দ্বিজ লক্ষ্মণ ও ভবানীশঙ্কর বা শঙ্কব ব্যতীত পাওয়া যায় কৃত্তিবাস ও দ্বিজ দয়ারামের ভণিতায় ।

দ্বিজ লক্ষ্মণ ও ভবানীশঙ্কর ব্যতীত 'মহীরাবণ বধ' পালা পাওযা যায় দ্বিজ সর্বাণীনন্দনের ভণিতায় । বলাবাহুল্য, কৃত্তিবাসের দুই তিনটি পুথি ব্যতীত অপর সকলের পুথিতে এই তিন কবির পরবর্তীকালের লিপিকাল নজরে পড়ে ।

তিন কবির প্রাপ্ত পুথির বিচার :-

কবিচন্দ্র, দ্বিজ লক্ষ্মণ এবং ভবানীশঙ্কর এই তিন কবির প্রাপ্ত পুথি আলোচনা করিলে দেখা যায় কাহারও কাব্যই সুবৃহৎ আকারের নয় । দ্বিজ লক্ষ্মণের আদি কাণ্ডের অন্তর্গত কিছু বিষয় বিভিন্ন নামে পাওয়া যায়, এইহেতু এই অংশে দ্বিজ লক্ষ্মণের কাব্যের গুরুত্ব কবিচন্দ্র এবং ভবানীশঙ্কর অপেক্ষা অধিক । অযোধ্যাকাণ্ডের অন্তর্গত বিষয় তিন কবির কাব্যেই সমান হইলেও কবিচন্দ্রের পালাব সংখ্যা তিনটি, আর ভবানীশঙ্করের অযোধ্যাকাণ্ডটির (ক.বি.৪০) মধ্যে কবিচন্দ্রের 'রঘুনাথেব বনবাস' পালার কিছু কিছু ছত্র প্রক্ষিপ্তভাবে (১-২০ পৃ.) পাওয়া যায় । দ্বিজ লক্ষ্মণেব অরণ্যকাণ্ড ও ভবানীশঙ্করের সুন্দরাকাণ্ডের পুথি একখানাও পাওয়া যায় নাই । তবে তিন কবিরই 'শিবরামের যুদ্ধ' পালা এবং কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের অন্তর্গত পুথি পাওয়া যায় । 'শিবরামের যুদ্ধ' পালার বিষয়বস্তু এক হওয়া সত্ত্বেও এই তিন কবির বচনা আশ্চর্যজনকভাবে প্রক্ষিপ্ততার অভিশাপ হইতে মুক্ত । আবার লঙ্কাকাণ্ডের অন্তর্গত বিষয় তিন কবিরই সমস্ত পুথি পালাকারে রচিত । কাহারও লঙ্কাকাণ্ড নামে একটি পুথিও পাওয়া যায় নাই । কবিচন্দ্রের নামে যেমন 'অঙ্গদ রায়বার' পালা, দ্বিজ লক্ষ্মণ ও ভবানীশঙ্করের ভণিতায় তেমন 'তবণীসেনের যুদ্ধ' বা 'তরণীসেন বধ' পালা পাওয়া যায়। অথচ বিপরীতভাবে কবিচন্দ্রের নামে তরণীসেন বধ বা দ্বিজ লক্ষ্মণ ও ভবানীশঙ্করের ভণিতায় অঙ্গদ রায়বারের পুথি একটিও পাওয়া যায় না । আবার তিন কবিরই উত্তরাকাণ্ডের অন্তর্গত পুথি একখানাও পাওয়া যায় নাই । নিম্নে এই তিন কবিব প্রাপ্ত পুথির তুলনামূলক সূচী প্রদত্ত হইল ; যথা :-

কবিচন্দ্র	দ্বিজ লক্ষ্মণ	ভবানীশঙ্কর
সূর্যবংশ কথা এবং	নরমেধ যজ্ঞ এবং	যযাতি রাজার পালা
নরমেধ যজ্ঞ	যযাতি রাজার উপাখ্যান	....
হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান	....	....
....	আদি কাণ্ড	....
....	শ্রীবামাদির জন্মকথা	....
....	রামচন্দ্রের গঙ্গাস্নান	....
....	মিথিলা খণ্ড	....
রঘুনাথের বনবাস	অযোধ্যা কাণ্ড	অযোধ্যা কাণ্ড
ভরতের পিতৃশ্রাদ্ধ	....	....
গয়াশ্রাদ্ধ পালা	বালির পিণ্ডদান	....
সীতাহরণ	....	অরণ্য কাণ্ড
শিবরামের যুদ্ধ	শিবরামেব যুদ্ধ	শিবরামের যুদ্ধ
রামসুগ্রীব মিলন	কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড	কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড
সীতার উদ্দেশ	সীতার উদ্দেশ	....
এবং		
অঙ্গুরী সংবাদ	....	....
অঙ্গদ রায়বার	....	....
কুম্ভকর্ণের রায়বার	....	....
....	রামেব নাগপাশ বন্ধন	....
....	ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ	....
....	বীরবাহুর যুদ্ধ	....
....	তরণীসেনের যুদ্ধ	তরণীসেনের যুদ্ধ
....	মহীরাবণ বধ	মহীরাবণ বধ
লক্ষ্মণের শক্তিশেল	লক্ষ্মণেব শক্তিশেল	....
সীতা সরমাব কথা	....	....
রাবণ বধ	....	....
সীতার পরীক্ষা	....	....
রঘুনাথের দেশাগমন	রঘুনাথের দেশাগমন	....
....	রাম কীর্তন	....

কাব্য বিচার :-

কবিচন্দ্র, দ্বিজলক্ষ্মণ এবং ভবানীশঙ্করের কাব্যে অধ্যাত্ম রামায়ণের উল্লেখ আছে । অধ্যাত্ম রামায়ণের সূচনা হরপার্বতীর প্রশ্নোত্তর ও সূত শৌনকাদি মুনি কর্তৃক পুনরায় কথিত রাম-কথা বর্ণনে । দ্বিজ লক্ষ্মণ ও ভবানীশঙ্করের কাব্যের মধ্যে এইরূপ হরগৌরী ও সূত শৌনকাদি মুনির প্রসঙ্গ পাওয়া যায় । কবিচন্দ্রের কাব্যে এইরূপ প্রসঙ্গের পরিবর্তে পাওয়া যায় 'ভাগবত' এবং অধ্যাত্ম রামায়ণের বিশেষ কয়েকটি অধ্যায়ের উল্লেখ । তবে কবিচন্দ্রের রামলীলা কাব্যখানি বাল্মীকি রামায়ণ, 'অধ্যাত্ম রামায়ণ', 'শ্রীমদ্ভাগবত' ও বিভিন্ন লৌকিক কাহিনীর সমন্বয়ে মিশ্রিত এক রামলীলা কাব্য । আর দ্বিজলক্ষ্মণ এবং ভবানীশঙ্করের কাব্যে 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এব অনুসরণ পাওয়া যায় না । তাঁহারা মূলতঃ অনুসরণ করিয়াছেন অধ্যাত্ম রামায়ণকে । দ্বিজ লক্ষ্মণ আবার 'রঘুনাথের দেশাগমন' পালায় অদ্ভুত রামায়ণের অনুসরণও করিয়াছেন । যদিও এই তিন কবির কোনও কাব্যকেই ঠিক অনুবাদের পর্যায়ে ফেলা চলে না, তথাপি কাহিনী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, কবিচন্দ্র অপেক্ষা এই দুই কবির ক্ষেত্রে অধ্যাত্ম রামায়ণের আস্বাদনই অধিক । 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' প্রসঙ্গে ভবানীশঙ্কর লিখিয়াছেন —

শিব শিবা সংবাদে অধ্যাত্ম রামলীলা ।
পঞ্চশত শ্লোকে ব্যাসদেব বিরচিল্যা ।।
বন্দিয়া জানকীনাথ শ্রীশঙ্কর গায় ।
আরণ্য কাণ্ডের দশ অধ্যা হৈল সায় ।। (ক.বি. ১৯০, পু.পৃ. ২৭)

আবার 'শিবরামের যুদ্ধ' পালাতেও ঐ কথার পুনরাবৃত্তি পাওয়া যায় ; যথা :-

শিবরাম সংবাদে অধ্যাত্ম রামলীলা ।
পঞ্চশত শ্লোকে ব্যাসদেব রচিলা ।।
সেবিয়া জানকীনাথ শ্রীশঙ্করে গায় ।
অরণ্যকাণ্ডের দশ অধ্যা হইল সায় ।। (ক.বি. ৬৩৭৩, পু.পৃ. ১)

দুইটি উদ্ধৃতিতেই অধ্যাত্ম রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের দশম অধ্যায়ের উল্লেখ পাওয়া যায় । দ্বিজ লক্ষ্মণের কাব্যে অধ্যাত্ম রামায়ণের উল্লেখ এইরূপ :-

অধ্যাত্ম শ্রীরামলীলা আদি কাণ্ড সায় ।
রামপদরজ বন্দি শ্রীলক্ষ্মণ গায় ।। (ক.বি. ২৭, পু.পৃ. ২০)

নৈমিষারণ্যভাগে আনন্দ হৃদয়ে ।
শৌনকাদি জিজ্ঞাসয় সূত মহাশয়ে ।।
★ ★ ★ ★ ★ ★
সূত কহে ধন্য শৌনকাদি তোমাদিকে ।

কহায়্যা রামের নাম মুক্ত কৈলে মোকে ।। (ক.বি. ২৮, পু.পৃ. ১)

ভবানী পুছিছেন বাণী কহিছেন শূলপাণি
কৈলাসশিখর মাঝে বসি ।
তুলিতে রামের রীত সদা অঙ্গ পুলকিত
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ প্রকাশি। (ক.বি. ২৯, পু.পৃ. ৮)

আদিকাণ্ডের এই তিনটি পুথিতেই দ্বিজ লক্ষ্মণ অধ্যাত্ম রামায়ণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন । আবার 'শিবরামের যুদ্ধ' পালার পুথিতে পাওয়া যায় —

হনূর হইল মনে রামের স্বঙরণে ।
বশিষ্ঠ মত ভণে দ্বিজ শ্রীযুত লক্ষ্মণে ।।
(বি.ভা. ১১২৭, পু.পৃ. ১১ক)

এই 'বশিষ্ঠ' বলিতে তিনি খুব সম্ভব যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন । তাঁহার কথায় বাল্মীকির উল্লেখও পাওয়া যায়, যথা — "বাল্মীকির মত দ্বিজ শ্রীলক্ষ্মণ গায়" (সা. ২৬৯৩, পু.পৃ. ১৪) । কাজেই মনে হয় দ্বিজ লক্ষ্মণের 'রামায়ণ' খানিও একখানা মিশ্র রামলীলা কাব্য।

কাহিনী বিশ্লেষণ : —

কবিচন্দ্রের 'সূর্যবংশ কথা' বা 'নরমেধ যজ্ঞ' পালার সঙ্গে ভবানীশঙ্করের ও দ্বিজ লক্ষ্মণের 'যযাতি রাজর উপাখ্যান' পালার প্রভেদ আছে । কবিচন্দ্রের পালায় পাওয়া যায় অম্বরীষ রাজার যজ্ঞে শুনঃশেফ নামক ব্রাহ্মণ বালকের কাহিনী । উহা বাল্মীকি রামায়ণ (বাল কাণ্ড/৬১-৬৫ সর্গ) হইতে গৃহীত । আর দ্বিজ লক্ষ্মণ ও ভবানীশঙ্করের কাব্যে পাই যযাতিরাজার পিতা নহুসের স্বর্গ লাভের আশায় আয়োজিত যজ্ঞে পূর্ণাহুতির জন্য ক্রীত কুশধ্বজ নামক ব্রাহ্মণ বালকের কাহিনী ।

অধিকাংশ 'নরমেধ যজ্ঞ' পালার পুথিতে কুশধ্বজের কাহিনী পাওয়া গেলেও কবিচন্দ্রের পালা এই ধারার ব্যতিক্রম । দ্বিজ লক্ষ্মণের আদিকাণ্ডের বিষয়সমূহ যেরূপ বিস্তৃতাকারে পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয়, তাঁহার কাব্যখানি কবিচন্দ্র ও ভবানীশঙ্করের তুলনায় বৃহৎ রচনা । দ্বিজ লক্ষ্মণের 'অযোধ্যাকাণ্ড'টি আকারে বড় হইলেও কবিচন্দ্রের ও ভবানীশঙ্করের এই অংশের রচনা কাব্যগুণে উৎকৃষ্ট । চরিত্র চিত্রণেও কবিচন্দ্রের রচনা অধিক পূর্ণাঙ্গ । কবিচন্দ্রের প্রত্যেকটি চরিত্র যেমন পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, উক্ত দুই কবির রচনায় চরিত্র তেমন ফুটিয়া ওঠে নাই । কবিচন্দ্রের 'ভরতের পিতৃশ্রাদ্ধ' পালায় কৈকেয়ী চরিত্রটি প্রথমে রক্তমাংসের এক নারী হইলেও পরে তিনি পূর্বকৃত অপরাধের জন্য রামচন্দ্রের নিকট শুধু

ক্ষমা চাহিয়া আত্মধিক্কারই করেন নাই, উপরন্তু নবনারায়ণ রামচন্দ্রের দেবত্ব মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এই পালাটির কাব্যময়তা সত্যই প্রশংসনীয়।

কবিচন্দ্রের 'গয়াশ্রাদ্ধ' পালার সঙ্গে দ্বিজ লক্ষ্মণের 'বালির পিণ্ডদান' পালার মিল থাকিলেও কবিচন্দ্রের সীতা দশরথকে পিণ্ডদানকালে পঞ্চ সাক্ষী রাখিয়াছিলেন, সে স্থলে দ্বিজ লক্ষ্মণের কাব্যে চারিজন সাক্ষীর নাম পাওয়া যায়।

কবিচন্দ্রের 'সীতাহরণ' পালার সঙ্গে ভবানীশঙ্করের অরণ্যকাণ্ডের বিষয়বস্তু তুলনীয়। কবিচন্দ্রের রচনাটি সংক্ষিপ্ত একটি পালা মাত্র। তাহাতে সীতা বিহনে রামচন্দ্রের দুরবস্থা ও আর্তি ফুটিয়া ওঠায় পালাটি কাব্যরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আর ভবানীশঙ্করের 'অরণ্যকাণ্ড'টি ভাবে, ভাষায় ও ছন্দে ও অপূর্ব রসমাধুর্যে পরিপূর্ণ যেন একখানি নিটোল মুক্তার মালা। অধ্যাত্ম রামায়ণের এতদূর প্রভাব অপর দুই কবির রচনায় পাওয়া যায় না। ভবানীশঙ্করের কবিত্বশক্তি সত্যই প্রশংসনীয়। রামচন্দ্রের নদী পার হইবার কালে নাবিকের উক্তিটি লক্ষণীয় —

শুন্যাচি শ্রবণে মুনির ঘরণী পাষাণ হইয়্যাছিল।
রামের চরণ ধূলির পরশে পাষাণ মানুষী হল্য ॥
সে রাম হইলে ওপার করিতে নাবিব নায়েতে কর্য্যা।
ভরণ পুষণ কারণ তরণী চাপিলে যাবেক তর্য্যা ॥

(ক.বি. ১৯০, পু.পৃ. ২)

রামচন্দ্রের পদস্পর্শে পাষাণী অহল্যা মুক্তি লাভ করে, কাজেই তাঁহার পদস্পর্শে কাষ্ঠনির্মিত তরণী যদি পরিবর্তিত হইয়া যায় তবে নাবিকের অন্নসংস্থান করিতে ব্যাঘাত জন্মিবে। এই ভাবনায় নাবিক রামচন্দ্রকে নদী পার করিতে অসম্মত হয়। অধ্যাত্ম রামায়ণের (আদি/৬ষ্ঠ অঃ) এই বিষয়টি তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস'-এও পাওয়া যায়। ভবানীশঙ্কর অধ্যাত্ম রামায়ণের যে পরিমাণ অনুসরণ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার রচনার গুণই প্রকাশ করে। অথচ কোথাও কাব্যগুণ অপেক্ষা ভাবানুবাদ প্রধান হইয়া ওঠে নাই। নাবিকের চরিত্রটিও বেশ জীবন্ত।

রাক্ষস বংশে বৈষ্ণবীয় ভক্তির প্রকাশ কবিচন্দ্রের কাব্যে পাওয়া গেলেও ভবানীশঙ্করের কাব্যেই আবেগঢালা ভক্তিভাবের প্রাণগঙ্গা প্রবাহিত। রামচন্দ্রের প্রতি ভক্তির অপূর্ব নিদর্শন মেলে রাবণের চিন্তার মধ্যে। সীতাহরণের পূর্বে রাবণের উক্তি এইরূপ :—

মানুষ নহেন রাঘব আপনি প্রধান পুরুষ ছলে।
ভূভার হরণ কারণ জনম লভিল্যা রঘুব কুলে ॥
ধনুক ধারণ কনক বরণ অনুজ আপনি শ্যাম।

জনকনন্দিনী সা রমা আপনি পুরুষবতন রাম ।।
ভজন করিব কমললোচন আপনি বিরোধভাবে ।
ভবানী ভবের পূজিত চরণ ত্বরায়ে দেখিব তবে ।।

★ ★ ★ ★ ★ ★

নিয়ত বিধাতা বাসব বাশুলি প্রণত যাঁহার পদে ।
সে রাম বরণ যুগলকমল রাবণ ভাবেন হৃদে ।।
দিবস রজনী রাবণ রামের বদন দেখিতে পায়।
প্রভাতে উঠিয়া সীতার হরণে মারীচ সদনে যায় ।।
ভাবিয়া রাঘব চরণকমল শ্রীরামশঙ্করে ভাষে ।
শমন দমন কাবণ শরণ লইনু চরণতলে ।।

(ক.বি. ১৯০, পু.পৃ. ১৩-১৪ক)

হয় কমললোচনকে বধ করিয়া রাক্ষস বংশে ভোগসুখ করিতে হইবে নচেৎ তাঁহার হস্তে মৃত্যুলাভ করিয়া বৈকুন্ঠ প্রাপ্ত হইতে হইবে । এইরূপ চিন্তা করিয়া রাবণ সীতা হরণে প্রবৃত্ত হন । ভক্তির চেয়ে বিরোধের পথেই ভগবানকে শীঘ্র লাভ করা যায় । রাবণের এই বিরোধভাবে ভজনা ভবানীশঙ্কব 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' (অরণ্য/৫ম অঃ/৫৯-৬১ শ্লোঃ) হইতে গ্রহণ করিয়াছেন । রাবণ সীতা হরণ করিতে আসিতেছেন জানিতে পারিয়া রামচন্দ্র সীতাদেবীকে এক বৎসরকাল অদৃশ্যভাবে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে বলেন (অধ্যাত্ম/ অরণ্য/৭ম অঃ) । ইহার পর অশোক কাননে সীতা অনাহারে আছেন জানিয়া বজ্রপাণি নিদ্রাদেবীকে সঙ্গে করিয়া কাননের সকল নিশাচরকে নিদ্রায় অচেতন করেন ও সীতাদেবীকে পায়স (অমৃত) ভক্ষণ করিতে দেন। ইহাও 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' হইতে গৃহীত —

নিদ্রাকে লইয়্যা ইন্দ্র নিজবাসে গেল ।
আধ্যাত্মিক মত রামশঙ্কর কহিল ।। (ক.বি. ১৯০, পু.পৃ. ২২ক)

অতঃপর কবন্ধবধ এবং শবরীর কাহিনীও কবি অধ্যাত্ম রামায়ণের অনুসারে রচনা করিয়াছেন। রাক্ষসরাজ দশাননকে ভবানীশঙ্কর যেরূপ ভক্তির পূত ধারায় অভিষিক্ত করিয়াছেন, ভক্তিভাব ও ছন্দের দোলায় কাব্যখানিকে যেমন উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন, কবিচন্দ্র সেরূপ করেন নাই । কবিচন্দ্রের 'সীতাহরণ' পালায় কেবলি পাওয়া যায় করুণসুরের সহজ একতান । তাহাতে রাঘবের জন্য রক্ষোরাজ দশাননের একবিন্দু নয়নাশ্রুও ঝরে নাই । দ্বিজ লক্ষ্মণের অরণ্যকাণ্ডটি পাওয়া যায় নাই । তবে তাঁহার 'বীরবাহুর যুদ্ধ' ও 'তরণীসেন বধ' পালায় রাক্ষসবংশে অনুরূপ ভক্তিভাব পরিস্ফুট । আর কবিচন্দ্রের ভণিতায় এই দুইটি পালা না মিলিলেও রাবণ যে প্রচ্ছন্ন ভক্ত তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে 'রাবণ কুম্ভকর্ণ সংবাদ' পালায় ।

'শিবরামের যুদ্ধ' পালায় কাহিনীগত তারতম্য বিশেষ নাই। শিবের উদ্যান বর্ণনা কবিচন্দ্রের কাব্যেই ব্যাপকত্ব লাভ করিয়াছে। তবে ফুলের উল্লেখ দ্বিজ লক্ষ্মণের কাব্যেই বেশি পাওয়া যায়। প্রকৃতি বর্ণনায় কবিচন্দ্র শোনাইয়াছেন বিহগের কলকাকলি, আর দ্বিজ লক্ষ্মণ তুলিয়া ধরিয়াছেন ফুলদলের শোভারাশি। ভবানীশঙ্কর এইক্ষেত্রে কোথাও মাত্রাতিরেক বর্ণনা দেন নাই। তবে কাহিনীর শেষাংশে ভবানীশঙ্করের কাব্যে কিছু বিশেষত্ব আছে। তিন কবির রচনাতেই দেখা যায়, হনূমান কর্তৃক নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে বীর লক্ষ্মণ মূর্ছাপন্ন হইয়া পড়েন। অবশেষে রামচন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া হনূমানকে অচেতন করিয়া ফেলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া শিব ও রামের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয় ও চণ্ডীর উপস্থিতিতে তাহার সমাপ্তি ঘটে। অতঃপর কবিচন্দ্রের কাব্যে পাওয়া যায় রামচন্দ্রের অনুরোধে মহাদেব আপন মাথার জটা হইতে মন্দাকিনীর ধারায় মৃতসঞ্চারিণী মন্ত্র দ্বারা লক্ষ্মণকে পুনর্জীবিত করিয়া তোলেন। দ্বিজ লক্ষ্মণের কাব্যে উমা দ্রুত কাননে গিয়া বারিসিঞ্চনে বীর লক্ষ্মণকে নিরাময় করেন, আর ভবানীশঙ্করের কাব্যে অম্বিকাদেবী কাননে গিয়া বামহস্তে পর্বত তুলিয়া ধরিলে বীর লক্ষ্মণ তাহার মধ্য হইতে ধনুর্বাণ হস্তে উঠিয়া দাঁড়ান। ভবানীশঙ্করের লক্ষ্মণ হনূমানের প্রতি 'মার মার' করিয়া ধাবিত হইলে পার্বতীমাতা দুইবাহু প্রসারিত করিয়া লক্ষ্মণকে কোলে তুলিয়া লন। শিব তখন রামচন্দ্রকে বলেন, 'একাদশ রুদ্রের মধ্যে বীর হনূমান মহারুদ্র'। শিব পুরাণের শতরুদ্র সংহিতায় (২০ অধ্যায়) এই কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। হনূমান শিবের অংশসম্ভূত এইরূপ উল্লেখ কবিচন্দ্র ও দ্বিজ লক্ষ্মণের রচনায় পাওয়া যায় না। তবে শিবের অনুচর হইলেও মূর্তিভেদে হনূমান সুগ্রীবের আজ্ঞাবহ বলিয়া জানায়।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের অন্তর্গত পুথিগুলি খণ্ডিত হওয়ায় কাহারই কাহিনী সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। কবিচন্দ্রের কাব্যে অধ্যাত্ম রামায়ণের অনুরূপ হেমাগন্ধর্বীর দাসী প্রভাবতীর সঙ্গে হনূমানের সাক্ষাৎলাভ (অধ্যাত্ম/কিষ্কিন্ধ্যা/৬ষ্ঠ অঃ) পর্যন্ত কাহিনী পাওয়া যায়। ভবানীশঙ্করের রচনাটি সুন্দর হইলেও সম্পাতি ও সুরেসার কাহিনী পর্যন্ত আর দ্বিজ লক্ষ্মণের কাব্যে বালী কর্তৃক অঙ্গদকে রামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ পর্যন্ত কাহিনী পাওয়া গিয়াছে।

কবিচন্দ্রের মত দ্বিজ লক্ষ্মণের কাব্যেও কিছু কিছু লৌকিক বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। 'সীতার উদ্দেশ' পালায় কবিচন্দ্র হনূমান কর্তৃক অশোক কাননে আম্রফল ভক্ষণ বিষয়টি 'মহানাটক' হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। আর দ্বিজ লক্ষ্মণের 'রঘুনাথের দেশাগমন' পালায় পবনপুত্র হনূমানের জন্ম ও অলৌকিক বিক্রম প্রসঙ্গটিও লৌকিক।

যে বৈষ্ণবীয় ভক্তির চরমপ্রকাশ ভবানীশঙ্করের কাব্যে পাওয়া যায় তাহার আংশিকভাব দ্বিজ লক্ষ্মণের খণ্ডিত পালাতেও বর্তমান। ভবানীশঙ্করের তরুণবীর তরণীসেন

যে ভক্তিভাবের বশবর্তী হইয়া জগদীশ্বর রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে ধনুর্বাণ ধারণ করিয়াছে, দ্বিজ লক্ষ্মণের বীরবাহু ও তরণীসেন সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মৃত্যুবরণ করিয়াছে। দ্বিজলক্ষ্মণ স্পষ্টতঃ লিখিয়াছেন —

বিভীষণ বলেন প্রভু করি নিবেদন।
বীরবাহু পরমবৈষ্ণব তপোধন॥
মরিব তোমার হাতে সার কৈল মনে।
নিবেদিলাম এই যুক্তি তোমার চরণে॥

(বি.সা. ৫৪২৩, পু.পৃ. ১৩ক)

বীরবাহু 'পরমবৈষ্ণব তপোধন' এই কথা দ্বারা বীরবাহুর চরিত্রটি কবি স্পষ্টভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন। দ্বিজ লক্ষ্মণের ভক্তিরস এই অংশে পরিষ্কার :—

বীরবাহু জানে এই বাণেতে মরণ।
ধনুক ফেলি জোড়হাথে করেন স্তবন॥
রাম পাদপদ্ম চায়া একদৃষ্টে রয়।
গুণে হইতে ব্রহ্মঅস্ত্র ছাড়ে দয়াময়॥
দূর্বাদলশ্যাম রাম ভাবেন অন্তরে।
বাণগোটা বাজে আস্যা স্কন্ধের উপরে॥
ভীষ্মবাণে মুণ্ড কেট্যা পাড়িল ভূতল।
মোকুলকুন্তল মাথা লোটায় ভূমিতল॥
কাটামুণ্ড রসনায় বলয়ে রামনাম।
স্বর্গে হৈতে পুষ্পরথ আল্য বিদ্যমান॥
যতেক দেবতা সব স্তব্ধমান হয়া।
ব্রহ্মলোকে লয়া গেলা সভে জড় হয়্যা॥

(বি.সা. ৫৪২৩, পু.পৃ. ১৪)

ভবানীশঙ্করের কাব্যেও এই ধরণের মিল লক্ষ্য করা যায় 'তরণীসেনের যুদ্ধ' পালায় :—

রথের উপরে লেখা নাম রাঘবের।
হেন রথে চাপিল তরণী বীরবর॥
শ্যামঅঙ্গে শোভা করে হাথের শরাসন।
পরম বৈষ্ণব হয় বিভীষণনন্দন॥ (ক.বি. ১৭৮, পু.পৃ. ৩-৪ক)

কিংবা

তরণীর মাথা পড়ে রাম পদতলে।
কাটামুণ্ড সঘনেতে রাম রাম বলে॥

রাম পদতলে মুণ্ড গড়াগড়ি যায় ।
বদনে রামের নাম উভবায গায় ।।
মোর অপরাধ ক্ষেমা কব নারায়ণ ।
দাসে দিয়া রাখ রাম রাতুলচবণ ।।
পতিতপাবন তুমি দেব চক্রপাণি ।
মায়া মোহে মোহিত রাম কর‍্যাছ আপনি ।।

(ক.বি. ১৭৮, পু.পৃ. ১২ক)

দ্বিজ লক্ষ্মণ ও ভবানীশঙ্করের কাব্যে বাক্ষসবংশীয় বীর তনয়েরা পরমবৈষ্ণবরূপে চিত্রিত হইয়াছে ও রামচন্দ্রের পদতলে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। এইরূপ বীরধর্মের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তিধর্মের সুচারু সমন্বয়ে পালাগুলি পূর্ণ । এইরূপ যুগ্মভাব সাহিত্যে নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সূচনা করে । দ্বিজ কবিচন্দ্রের কাব্যে যে ভক্তির সূত্রপাত এবং দ্বিজ লক্ষ্মণের কাব্যে যাহার বিকাশ দেখা যায়, ভবানীশঙ্করের কাব্যেই তাহার সার্থক এবং পূর্ণ পরিণতি ঘটে । যদিও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে ধর্মীয়ভাবই প্রধান বস্তু, আর কৃত্তিবাস হইতে আরম্ভ করিয়া সকল কবির রাম-কথার মূল উদ্দেশ্য ভক্তিভাব, তথাপি এই তিন কবির রচিত বীর ও ভক্তিভাবের অপূর্ব মিশ্রণে রচিত এই একক পালাগুলির স্বতন্ত্র মূল্য আছে ।

'মহীরাবণ বধ' পালায় মহীর ছলনা দ্বিজ লক্ষ্মণ ও ভবানীশঙ্কর একইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । হনূমানের কৌশলে মহীর চক্রান্ত হইতে রাম ও লক্ষ্মণের নিষ্ক্রান্তি লাভ এই পালার মুখ্য বিষয় ।

'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' পালায় কবিচন্দ্রের মত দ্বিজ লক্ষ্মণের কাব্যেও কালনিমা বধ ও গন্ধকালী অপ্সরার কাহিনী এবং হনূমান কর্তৃক সূর্যকে বগলে ধারণ কাহিনী পাওয়া যায়। তবে দ্বিজ লক্ষ্মণের পালায় একটি অতিরিক্ত প্রসঙ্গ আছে যাহা দ্বিজ কবিচন্দ্রের পালায় কিংবা 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এ পাওয়া যায় না । তাহা হইল, হনূমান গন্ধমাদন পর্বত লইয়া ফিরিয়া আসিলে বিভীষণের আলয় হইতে পাটশিল ও রাবণগৃহ হইতে মন্দোদরীর দুগ্ধ আনিবার জন্য রামচন্দ্রের আদেশ দান । হনূমান শ্বেতমক্ষিকা হইয়া তাহা আনিয়া বিরলে শিলে বাঁটিয়া দিলে লক্ষ্মণের নাসাপুটে সেই ঔষধ স্পর্শ করান হয় । ইহাতে ভগ্ন-শেল বাহির হয় । এই পালাটিতে দ্বিজ লক্ষ্মণের নিবাসস্থলের কথা জানা যায়, তাই পুথিটির (ক.বি. ৩৬৪৩) স্বতন্ত্র মূল্য আছে ।

কবিচন্দ্রেব 'রঘুনাথের দেশাগমন' পালাটি রামচন্দ্রের সীতা ও লক্ষ্মণসহ অযোধ্যায় আগমন ও দেশবাসীর আনন্দ এবং দুই একটি ক্ষুদ্র কাহিনী দ্বারা পূর্ণ । আর দ্বিজ লক্ষ্মণের

রচনায় কয়েকটি নূতন বিষয় সংযোজিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে রামচন্দ্র কর্তৃক রামেশ্বরে শিব প্রতিষ্ঠা, সাগরের বন্ধন মুক্তি, অঞ্জনা কর্তৃক রাম-সীতা ও হনূমানকে ভর্ৎসনা, হনূমানের জন্ম বৃত্তান্ত এবং হনূর বিক্রম, শৃঙ্গবের পুরে ও অযোধ্যায় আনন্দের উৎসব এবং লক্ষ্মণের হাস্য দর্শনে সকলের লাজে সঙ্কোচ, পরে লক্ষ্মণের কথায় সকলের ভ্রান্তি অপনোদন প্রভৃতি বিষয় বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায়। জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি লক্ষ্মণের আত্মত্যাগের ফলস্বরূপ লক্ষ্মণকে রামচন্দ্রের কোলদানে পালাটি সমাপ্ত। ইহাদের মধ্যে কেবল অঞ্জনা কর্তৃক রাম-সীতা ও হনূমানকে ভর্ৎসনা প্রসঙ্গটিই কবিচন্দ্রের কাব্যে পাওয়া যায়।

বিষয়বস্তুর পরেই আসে ভাষা ও ছন্দ আলোচনার প্রসঙ্গ। ছন্দের ক্ষেত্রে পয়ার ও ত্রিপদীর ব্যবহারই তিনজন কবির কাব্যে মুখ্যতঃ পাওয়া গেলেও ভবানীশঙ্কর ও দ্বিজ লক্ষ্মণ বহু স্থলে নর্তক ছন্দের ব্যবহার দ্বারা কাব্যের গুণগত মান ও কাব্য-সৌন্দর্য যথেষ্ট পরিমাণে বর্ধিত করিয়াছেন। ভবানীশঙ্করের 'অযোধ্যকাণ্ড', 'অরণ্যকাণ্ড' ও 'তরণীসেনের যুদ্ধ' এবং দ্বিজ লক্ষ্মণের 'বীরবাহুর যুদ্ধ' পালায় এই নর্তক ছন্দের দৃষ্টান্ত মেলে। দ্বিজ লক্ষ্মণ লিখিয়াছেন —

জানকী লইয়া চরণযুগলে বিনয় করহ যদি।
কুড়ারে আনিয়া পিরীতি করিলে মিলিব দয়ারনিধি ॥
নহিলে মরণসার করহ রাঘব রামের হাথে।
সমরে মরিলে মুকতি পাইবে জাইবে গোলোকপথে ॥
তনয় বচনে কুপিল রাবণ লোচন শাণিত ছটা।
ধিক্ রে জীবন যুদ্ধে কাতর কুপুত কুমতি বেটা ॥
ক্রোধ করিয়া কহিছে রাবণ চাহিয়া তনয় পানে।
রাঘবচরণে শরণ আশয় দ্বিজ লছিমন ভণে ॥

(বি.সা. ৫৪২৩, পু.পৃ. ৩ক)

এই নর্তক ছন্দের প্রকৃষ্ট উদাহরণ ভবানীশঙ্করের 'অরণ্যকাণ্ড'টি। তাঁহার কাব্যেই এই ছন্দের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়; যথা :—

নিকটে তরণী আনহ চরণ পাখালি তাহাতে উঠি।
তরণী আনিয়া নাবিকি রামের ধুয়াইল পদ দুটি ॥
তরণী উপরে বসিল্যা রাঘব জানকী লক্ষ্মণ সাথে।
নাবিকে তরণী বাহিয়্যা ওপারে রাখিল্যা কমলানাথে ॥
ভাবিয়্যা রাঘব চরণকমল শ্রীরামশঙ্করে ভাষে।

নাবিকে আশিস করিয়া গমন করিল মুনির বাসে ॥

(ক.বি. ১৯০, পু.পৃ. ২ক)

এই নর্তক ছন্দ বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রতিটি ছয় মাত্রায় গঠিত এক একটি পর্বের দ্বিতীয় অক্ষরে ঝোঁক পড়ে। ফলে একরূপ দোল বা তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। এই তরঙ্গের জন্য ইহাকে নর্তক ছন্দ বলা হয়।

এই ছন্দের ব্যবহার কবিচন্দ্রেব কাব্যে দৃষ্ট হয় না। অন্ত্য-মধ্যযুগে রচিত কবিদিগের ভাষার মধ্যে মিল প্রদর্শন করা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, তথাপি সাধারণভাবে উল্লেখ কবা চলে যে, এই তিন কবির অনুলিখিত পুথিসমূহের মধ্যে একই প্রকার ভাষাগত আঞ্চলিক প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে ভাব, ভাষা সর্বোপরি বিষয়গত সাদৃশ্যহেতু আমরা রামায়ণকার এই তিন কবিকে (কবিচন্দ্রকে) একই অঞ্চলের বলিয়া অনুমান করি।

পাদটীকা

১। L.S.S. O'Malley : Bengal District Gazetteers Midnapore, 1911. P. 166

২। অশোক মিত্র : পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা, চতুর্থ খণ্ড, ১৯৪৭ খ্রীঃ, পৃ. ১৮৬।

৩। 'বৈঞিতল' গ্রাম সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ জানাইয়াছেন উত্তরবাড় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর দে। উক্ত অঞ্চল পূর্বে মল্লরাজাদের অধীন ছিল বলিয়া তিনি প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত স্থান হইতে পানুয়া গ্রামের দূরত্ব ৩/৪ মাইল।

৪। পানুয়া গ্রামের (বাঁকুড়া) স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় জানাইয়াছেন, সাগরদিয়া নামক কোনও অঞ্চলের উল্লেখ বাঁকুড়া জিলায় এখন পাওয়া না গেলেও পানুয়া গ্রামের ২ মাইল উত্তরে 'সাগর মেঝিয়া' এবং ৪ মাইল পশ্চিমে 'সাগর ডাঙ্গা' নামক দুইটি গ্রামের অস্তিত্ব এখনও পাওয়া যায়।

৫। মণীন্দ্রমোহন বসু : বাঙ্গলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, ১৯৪৭ খ্রীঃ, পৃ. ১০৮।

৬। সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ১৯৬৫ খ্রীঃ। পৃ. ৪০৭ পাদটীকা।

একাদশ অধ্যায়

।। কৃত্তিবাস ও কবিচন্দ্র ।।

প্রকাশিত 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' ও মৎ সম্পাদিত 'রামায়ণ'-এর আলোচনা।।

।।এক।। কৃত্তিবাস ও কবিচন্দ্র :

কৃত্তিবাস সমগ্র বঙ্গের কবি, কবিচন্দ্র মল্লভূমের । কৃত্তিবাস খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বামায়ণ রচনা করিয়া গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে রাজসম্মানে ভূষিত হন । তাঁহার কাব্য-মুকুরে বঙ্গের যথার্থ প্রতিচ্ছবিটি ধরা পড়ে । এই রামায়ণরূপ দর্পণে বাঙালী স্বীয় প্রতিচ্ছবি দেখিয়া নবভাবে উদ্দীপিত হইয়া ওঠে । কৃত্তিবাসের সমস্ত চরিত্র বাঙালীর একান্ত আপনার জন বলিয়া আদৃত হইয়াছে প্রায় পাঁচশত বৎসরকাল । তাই তিনি বঙ্গের জাতীয় কবি । আর কবিচন্দ্র খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে বঙ্গের এক প্রত্যন্ত প্রান্তে মল্লরাজ সভার কবি । কবিচন্দ্র যে যুগে আবির্ভূত হইয়াছেন সেইযুগে কৃত্তিবাসের জনপ্রিয় 'রামায়ণ' কাব্যই বাংলার সাহিত্যাকাশকে সজীব ও প্রাণবন্ত করিয়া রাখিয়াছিল । অথচ বিস্ময়েব বিষয় এই যে, 'রামায়ণ' রচনাকালে তিনি কৃত্তিবাসের কাব্য দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া সম্পূর্ণ আপন মনের অনুপ্রেরণায় কাব্যের যে সুরটি ধরিয়াছেন তাহা তাঁহার একান্ত নিজস্ব । প্রবল শক্তিধর কবি কৃত্তিবাসের ভাবধারা হইতে মুক্ত থাকিয়াও তিনি মল্লভূমের জনচিত্তে স্থায়ী আসন লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার কাব্যের যথার্থ গৌরবই প্রকাশ করে । তিনি শুধু মল্লভূমের নহেন, "........ ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলার মানস সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার প্রতিনিধি স্থানীয় কবি"[১] রূপেও চিহ্নিত ছিলেন ।

উভয় কবিই সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন । কবিচন্দ্রের কাব্য রচনায় মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোকের উল্লেখ আছে, যাহার অনেকটাই মূল সংস্কৃত কাব্য হইতে উদ্ধৃত। মুদ্রিত 'কৃত্তিবাসী রামায়ণে' এইরূপ সংস্কৃত শ্লোকের দৃষ্টান্ত না মিলিলেও কবি যে, বাল্মীকির 'রামায়ণ' পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । তাঁহার আত্মকাহিনীতেও কৃত্তিবাস নিজেকে 'পণ্ডিত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । তবে কৃত্তিবাস এবং কবিচন্দ্র উভয়েই কাব্য রচনাকালে অহেতুক পাণ্ডিত্য প্রকাশ না করিয়া সজল বাংলাদেশের কোমল প্রকৃতির স্নেহাঞ্চলে বসিয়া আদিকবির অমরকাব্য বাংলাদেশের অনুকূলে বর্ণনা করিয়াছেন । কাজেই উভয় কবির কাব্যই অনুবাদ শাখার পর্যায়ভুক্ত হইলেও উহারা যথার্থতঃ রামকাহিনীর ভাবানুবাদ মাত্র ।

কাহিনী রচনার আদর্শ :

কৃত্তিবাস রচিত মূল 'রামায়ণ' খানি কি প্রকার ছিল তাহা এখন আব জানিবাব উপায়

নাই । তবে ইহাও ঠিক যে, বাল্মীকির রামায়ণকে মূল হিসাবে গ্রহণ করিলেও বাংলাদেশে প্রচলিত কিছু কাহিনী ও উপকথা তিনি তাঁহার রচনার মধ্যে স্থান দিয়াছেন ।

(ক) বাল্মীকি প্রসঙ্গে কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন —

"রাম জন্ম পূর্ব্বে ষষ্টি সহস্র বৎসর ।
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর ।।
রাম নাম স্মরণে যমের দায় এড়ি ।
ভবসিন্ধু তরিবারে রামপদ তরী ।।
বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ।
শুভক্ষণে বিরচিল ভাষা রামায়ণ।।"[২]

রাম জন্মের পূর্বেই 'রামায়ণ' রচিত হয় । অথচ বাল্মীকি-রামায়ণ (বালকাণ্ড,১ম সঃ) হইতে জানা যায় যে, বাল্মীকি যখন কাব্য রচনা করেন তখন রাম বর্তমান ছিলেন । অতএব এই তথ্য খুবসম্ভব তিনি লোকশ্রুতি হইতে গ্রহণ করেন । আর এই উদ্দেশ্যেই বঙ্গে 'রাম না জন্মিতে রামায়ণ' প্রবাদ কথার উদ্ভব হইয়া থাকিবে ।

(খ) ইহা ব্যতীত কৃত্তিবাস জৈমিনি-ভারতের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন । লবকুশ কর্তৃক রামায়ণগানের (উত্তরাকাণ্ড) প্রথম দুই ছত্রে পাওয়া যায় —

"এ সব গাইল গীত জৈমিনি ভারতে ।
সম্প্রতি যে গাই কিছু বাল্মীকির মতে ।।"[৩]

বাল্মীকির কাব্য ছাড়াও কৃত্তিবাস অন্যান্য কাব্য হইতেও যে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন এই সকল উক্তি তাহাবই প্রমাণ।

(গ) আবাব দেখা যায় লঙ্কাকাণ্ডের অন্তর্গত "সৈন্যগণসহ শ্রীরাম লক্ষ্মণেব চেতনা সঞ্চারার্থ বিভীষণ ও হনূমানের জাম্বুবানের সহিত পরামর্শ" প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন —

"নাহিক এসব কথা বাল্মীকি রচনে ।
বিস্তারিয়া লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে ।।
এক রামায়ণ শত সহস্র প্রকার ।
কে জানে প্রভুর লীলা কত অবতার ।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণে।
লঙ্কাকাণ্ড গাইলেন গীত রামায়ণে।।"[৪]

এই প্রসঙ্গটি অদ্ভুত রামায়ণের অন্তর্গত না হইলেও কৃত্তিবাসের নামে 'শতস্কন্ধ বাবণ বধ' পালা (ক.বি. ২১৭ নং) পাওয়া যায়, যাহা উক্ত গ্রন্থের প্রভাবে রচিত । তবে ঐ পালা কৃত্তিবাসের নামে পববর্তীকালের লিপিকরদের সংযোজন কিনা সে বিষয়ে সংশয় আছে ।

(ঘ) বিভিন্ন পুরাণ ও জনশ্রুতি হইতেও তিনি কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছেন। রাবণ বধার্থে রামচন্দ্রের 'অকালবোধন' ও 'দুর্গাপূজা' 'পদ্মপুরাণ'-এর পাতালখণ্ড হইতে সংগৃহীত। অষ্টশততম নীলপদ্ম অদৃশ্য হওয়ার ফলে শ্রীরামের চক্ষু উৎপাটনের প্রচেষ্টাও লোককল্পনার ফল।

(ঙ) আদিকাণ্ডের অন্তর্গত রত্নাকর দস্যুর বাল্মীকি মুনিতে রূপান্তর, লঙ্কাকাণ্ডের অন্তর্গত 'হনূমান কর্তৃক গন্ধকালী (ধান্যমালী) অপ্সরার উদ্ধার ও কালনেমিবধ' প্রভৃতি 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' হইতে গৃহীত হইলেও কৃত্তিবাস উক্ত গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু কবিচন্দ্রের কাব্যে 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' কাহিনীরই প্রাধান্য।

কবিচন্দ্র বাল্মীকি-রামায়ণের সঙ্গে 'অধ্যাত্ম রামায়ণ', 'শ্রীমদ্ভাগবত' ও বিভিন্ন পুরাণের আদর্শে সংক্ষেপে 'রামলীলা' কাহিনী রচনা করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যেও লোকশ্রুতির প্রভাব বর্তমান। লোকশ্রুতির প্রভাবেই 'শিবরামের যুদ্ধ' পালা, হনূমানকে অঞ্জনার ভর্ৎসনা এবং হনূমান কর্তৃক সূর্যকে কক্ষতলে স্থাপন প্রভৃতি কাহিনী যুক্ত হইতে দেখা যায়।

কৃত্তিবাসের মত কবিচন্দ্রও রামজন্মের পূর্বে মূল 'রামায়ণ' কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অজামিল উপাখ্যানে (সা. ১৭২১, ১-৪ পত্র, স, ১৭৩৫ শকাব্দ) পাওয়া যায় :-

নাম জপ্যা রত্নাকর বাল্মীকি মুনি হল্য।
রাম না জন্মিতে গ্রন্থ রামায়ণ কৈল্য ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৪ক)

বাল্মীকির প্রভাব :-

কৃত্তিবাস ও কবিচন্দ্র উভয়েই বাল্মীকির বর্ণনাভঙ্গী কতটা অনুসরণ করিয়াছেন তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

বাল্মীকির রামায়ণে পাওয়া যায় রাম-সীতা বনবাসে শৃঙ্গবেরপুরে উপস্থিত হইয়া একরাত্রি বৃক্ষতলে তৃণশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। পরে ভরত তথায় আগত হইয়া শয্যা'পরি তাঁহাদের চিহ্ন দেখিয়া বলিয়াছেন —

"ইয়ং শয্যা মম ভ্রাতুরিদমাবর্ত্তিতং শুভম্।
স্থণ্ডিলে কঠিনে সর্ব্বং গাত্রৈর্বিমৃদিতং তৃণম্॥১৩॥
মন্যে সাভরণা সুপ্তা সীতাস্মিঞ্ছয়নে শুভা।
তত্র তত্র হি দৃশ্যন্তে সক্তাঃ কনকবিন্দবঃ ॥১৪॥
উত্তরীয়মিহাসক্তং সুব্যক্তং সীতয়া তদা।
তথা হ্যেতে প্রকাশন্তে সক্তাঃ কৌশেয়তন্তবঃ ॥"১৫॥ (অযোধ্যা/৮৮ সর্গ)

অনুঃ-

"আমার ভ্রাতা রামের এই শয্যা, এই তাঁহার অঙ্গ পরিবর্তনের মনোহর চিহ্ন রহিয়াছে, এই পরিষ্কৃত কঠিন ভূতলে তাঁহার গাত্রদ্বারা তৃণ সমস্ত মর্দ্দিত হইয়াছে। এই শয্যাতে স্থানে স্থানে সংলগ্ন কনককণা সকল দেখা যাইতেছে, অতএব আমার বোধহয় যে, সেই মনোহারিণী সীতাদেবী সালঙ্কারা হইয়াই ইহাতে শয়ন করিয়াছিলেন। তৎকালে সীতাদেবীর উত্তরীয় বস্ত্র নিশ্চয়ই এই স্থানে সংসক্ত হইয়াছিল ; কেননা, কৌশেয়বস্ত্রের সূত্র সকল এইস্থানে সংলগ্ন হইয়া শোভা পাইতেছে।"[৫]

ভরতের এই বর্ণনা প্রসঙ্গে কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন --

"তৃণশয্যা দেখিলেন এক বৃক্ষতলে ॥
তদুপরে শুয়েছিল রাম বনবাসী।
তৃণলগ্ন আছে পট্ট কাপড়ের দশী॥
কাপড়ের দশীতে স্খলিত আভরণ।
ঝিকিমিকি করে যেন সূর্য্যের কিরণ ॥
তাহা দেখি ভরত চিন্তেন সকাতরে।
কেমনে শুইল প্রভু খড়ের উপরে ॥
কেমনে লক্ষ্মণ ছিলা কেমনে জানকী।
চিনিলাম আভরণ করে ঝিকিমিকি॥"[৬]

কবিচন্দ্র এই অংশের ভাবার্থ করিয়াছেন এইরূপ :-

শুতিয়া আছিলা রাম বিছায়্যা তৃণ।
সীতার আভরণবিম্বু আছে তাঁর চিন॥
তা দেখিয়া ভরত বুক নাই বান্ধে।
আহা মরি হায় হায় বলি ভরত কান্দে।
রাজনন্দিনী সীতা কোমল শরীরে।
কেমনে শুতিয়া ছিলে তৃণের উপরে॥

(ভরতের পিতৃশ্রাদ্ধ, পু.পৃ. ২)

কৃত্তিবাস ও কবিচন্দ্রের এই দুই উদ্ধৃতি হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, উভয়েই বাল্মীকি-রামায়ণের মূল ভাবকে অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনায় অগ্রসর হইয়াছেন।

কৃত্তিবাস কাহিনী বর্ণনে ও চরিত্রচিত্রণে যথাসম্ভব বাল্মীকির ভাব অনুসরণ করিয়া কিছুটা বিস্তারেব দিকেও মন দিয়াছেন। তুলনায় কবিচন্দ্র যথাসম্ভব সংক্ষেপে বর্ণনাভঙ্গীতে স্বকীয়তা বক্ষা করিয়াছেন। সীতার চরিত্র তুলনা করিলে এই পার্থক্য কিছুটা ধবা পড়িবে।

জনকনন্দিনী সীতা রামচন্দ্রের সঙ্গে বনবাসী হইতে চাহিলে তিনি প্রথমে তাঁহাকে বনে লইয়া যাইতে অস্বীকার করেন, তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সীতাদেবী স্বামীকে কঠোর বাক্যে বিদ্ধ করিয়াছেন। বাল্মীকির কাব্যের (অযোধ্যা/৩০ সর্গ/২-৪ শ্লোঃ) সীতার উক্তির ভাবানুবাদ পাওয়া যায় কৃত্তিবাসের কাব্যে ; যথা :-

"পণ্ডিত হইয়া বল অবুঝের প্রায়।
কেন হেন জনে পিতা দিলেন আমায় ॥
নিজ নারী রাখিতে যে করে ভয় মনে।
বল তায় বীর বলে কোন ধীর জনে ॥
রাজ্য নিতে ভরত না করিল অপেক্ষা।
তার রাজ্যে স্ত্রী তোমার কিসে পায় রক্ষা ॥"[৭]

রামচন্দ্রের প্রতি সীতার মনোভাব এইস্থলে বাল্মীকির অনুরূপ হইলেও কৃত্তিবাসের সীতার উক্তিতে যে ব্যঙ্গের তির্যকতা দেখা যায় তাহা কবিচন্দ্রে নাই। কবিচন্দ্রের সীতা অনেক বেশী লাজ-নম্র, পতিগতপ্রাণা বালিকাবধূ ; যথা :-

সীতা বলে কারে এত যোগ কহ তুমি।
স্বর্গে অভিলাষ নাঞি বন যাব আমি ॥
যুবতীর পতি গতি রহিতে নারিব।
এড়্যা গেলে অহে নাথ পরাণে মরিব॥

(রামচন্দ্রের বনবাস পালা, পু.পৃ. ১১)

এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও পাওয়া যায়। বনগমনের পূর্বে শ্বশ্রূমাতা রাণী কৌশল্যা পুত্রবধূ সীতাকে স্বামিসেবা সম্পর্কে উপদেশ দিতে গেলে কৃত্তিবাসের কাব্যে সীতার উক্তি কতকটা প্রৌঢ়া নারীর মত শোনায় যাহা বাল্মীকির সীতার অনুরূপ (অযোধ্যা/৩৯সর্গ/২৬-৩০ শ্লোঃ)।

"জানকী বলেন গো কৌশল্যা ঠাকুরাণী।
স্বামিসেবা করিতে যে আমি ভাল জানি ॥
স্বামিসেবা করি মাত্র এই আমি চাই।
তে কারণে ঠাকুরাণী বনবাসে যাই ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়াছি যত পিতৃঘরে।
ইতব স্ত্রীলোক প্রায় না ভাব আমারে ॥
মায়ের অধিক যে আমার ভাব ব্যথা।
হিত উপদেশ তেঁই শিখাইল মাতা ॥

তাঁর কথা শুনিয়া কহেন মহারাণী ।
তোমা হেন বধূ আমি ভাগ্য করি মানি ।।”[২]

বাল্মীকির সীতার অনুরূপ কৃত্তিবাসের সীতাও স্বামিসেবা সম্পর্কে তিনি পিতৃগৃহ হইতেই শিক্ষালাভ করিযাছেন বলিয়া জানাইয়াছেন । শ্বশ্রুমাতার প্রতি ব্যবহারের মধ্যেও কৃত্তিবাসের সীতা অপেক্ষা কবিচন্দ্রের সীতার চিত্র অনেক বেশী নম্রভাবের :-

সীতা বলে অগো মাতা পালিব তোমার কথা
বুঝাইলে একে একে যত ।
জে কহিলে মোর জানা তার ছাড়া কি বাজে বীণা
চক্র বিনে নাঞি চলে রথ ।
পতি বিনে সদাক্লেশ সুখের নাহিক লেশ
ভ্রাতৃ বন্ধু মিথ্যা যত জনা ।।

(রঘুনাথের বনবাস, পু.পৃ. ১৬ক)

এই অংশেও দেখা যায় কবিচন্দ্র বাল্মীকির ‘তন্ত্রীহীন বীণা’ এবং ‘চক্রবিহীন রথ’ এইরূপ দুই তিনটি উপমা (অযোধ্যা /৩৯ সর্গ/২৯ এবং ৩০ শ্লোঃ) গ্রহণ করিয়া উক্ত অংশের ভাবানুবাদ করিয়াছেন মাত্র । উপরের দুইটি দৃষ্টান্ত হইতে শুধু চরিত্র চিত্রণেই নহে ভাষায় পর্যন্ত কবিচন্দ্রের কাব্যে বাল্মীকি অথবা কৃত্তিবাসের অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না । উপরন্তু কবিত্ব সম্পদের মোহময়ী আকর্ষণশক্তি পাঠকচিত্তকে সর্বদা রসাবিষ্ট করিয়া রাখে । এইরূপ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করাই অনন্যশক্তির অধিকারী কবির কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ।

বাঙালীয়ানার প্রভাব :-

কৃত্তিবাসের কাব্যে সামাজিক আচার ব্যবহার বাংলাদেশের অনুরূপ। রামচন্দ্রাদির জন্মের পর পাঁচ দিনে ‘পাঁচুটি’, ছয়দিনে ষষ্ঠীপূজা, আটদিনে ‘অষ্টকলাই’, ত্রয়োদশ দিনে জননাশৌচান্ত এবং ছয়মাসে অন্নপ্রাশন প্রভৃতির বর্ণনা পাওয়া যায় । ভবত রামচন্দ্রের দর্শনাভিলাষী হইয়া গুহকের আতিথ্য গ্রহণ করেন । তখন গুহক যে সকল খাদ্যদ্রব্য দ্বারা অতিথির আপ্যায়ন করেন তাহার মধ্যে রোহিত-চিতলমাছ হইতে আরম্ভ করিয়া দধিদুগ্ধ, নারিকেল, গুবাক, কদলী-আম্র-পনস প্রভৃতি বাঙালীর রুচিকর ভোজ্যবস্তুর উল্লেখ পাওয়া যায় । ভরদ্বাজ আশ্রমে রামচন্দ্রকে যে সকল ভোজ্যবস্তু দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয় তাহাও বাঙালীর রসনালোভন উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী । কাব্যের উপমা অলঙ্কারও বাংলাদেশের প্রচলিত ভাব সম্পদ হইতে গৃহীত । এই সকল ক্ষেত্রে কৃত্তিবাস আর্য আদর্শ রক্ষা করার

বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। কৃত্তিবাসের কাব্য বাঙালীর সমাজজীবনের নানা চিত্তাকর্ষক বিবরণে পূর্ণ। কবিচন্দ্রের কাব্যে বাঙালীর নানাবিধ আচার আচরণের বর্ণনা বিশেষ নাই। খুব সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি নিয়ম তাঁহার কাব্যে আসিয়া পড়িয়াছে ; যেমন দন্তে তৃণ ধারণ করা এবং কোনও কার্য শুরু করার পূর্বে পান দান করা ইত্যাদি। তবে বাক্‌ভঙ্গীতে ও সংস্কারবোধে বাঙালীয়ানার প্রভাব কবিচন্দ্রে ষোল আনা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কৃত্তিবাস ও কবিচন্দ্রের কাব্যের তুলনা :-

শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে মুদ্রিত (১৮০৩ খ্রীঃ) কৃত্তিবাসী রামায়ণের সঙ্গে পরবর্তীকালের মুদ্রিত গ্রন্থগুলির আকাশপাতাল প্রভেদ দেখা যায়। গায়েনদের প্রচারের গুণেই কৃত্তিবাসের কাব্য এমন বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে। তাঁহার কাব্যে বাল্মীকি রামায়ণের ও অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রভাব ছাড়াও পাওয়া যায় অদ্ভুত রামায়ণের প্রভাব। 'শতস্কন্ধ রাবণবধ' (ক.বি. ২৪১, লিপিকাল ১২৫০ সন) পালাটি ইহার অন্যতম উদাহরণ। কৃত্তিবাসের তুলনায় কবিচন্দ্রের 'রামায়ণ' আকারে ছোট এবং কাহিনীও যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত। অতএব কৃত্তিবাসের নামে প্রচারিত সমস্ত রাম-কথার প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়া কেবলমাত্র যে সকল বিষয় উভয় কবির কাব্যে পাওয়া যায় এখানে তাহাদের বিষয়েই আলোচিত হইবে। কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' আলোচনার জন্য শ্রদ্ধেয় হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং সাহিত্য সংসদ হইতে প্রকাশিত (১ম সং, ১৩৬৪ সাল) গ্রন্থটিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিলেও কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত যে দুইটি পালা ইহাতে স্থান লাভ করে নাই, তাহাদের বিষয়েও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। এইহেতু কৃত্তিবাসের কাহিনীকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া আলোচনায় অগ্রসর হইতে হইয়াছে। প্রথমটি অমুদ্রিত বিষয়, যাহা পালাকারে পাওয়া যায় এবং দ্বিতীয়টি মুদ্রিত বিষয়, যাহা গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ। আবার আলোচনায় সুবিধার জন্যই কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত উক্ত অপ্রকাশিত পালা দুইটি যাহা কবিচন্দ্রের নামেও পাওয়া যায়, তাহাদের তুলনা প্রথমে করা হইল।

(ক) কৃত্তিবাসের ভণিতায় দুইটি অপ্রকাশিত বিষয়, যাহা কবিচন্দ্রের কাব্যেও পাওয়া যায়, উহাদের নাম — 'নরমেধ যজ্ঞ' বা 'যযাতি রাজার উপাখ্যান' এবং 'শিবরামের যুদ্ধ' পালা। কবিচন্দ্রের 'নরমেধ যজ্ঞ' এবং 'সূর্যবংশ কথা' পালার উভয় পুথিতেই শূনঃশেফ নামক দ্বিতীয় কাহিনীটিতে মিল আছে, এবং তাহা বাল্মীকির 'রামায়ণ' (বালকাণ্ড/৬১-৬২ সর্গ) হইতে গৃহীত। উহাতে অম্বরীষ রাজার নরমেধ যজ্ঞে শূনঃশেফ নামক ব্রাহ্মণ বালককে ক্রয় করা হয় বলিদানের উদ্দেশ্যে। আর বিশ্বামিত্রের নির্দেশে উক্ত বালক যজ্ঞ স্থলে গোবিন্দের কৃপায় মুক্তি লাভ করে। বালকের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত যজ্ঞ যে

কারণে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সেই অম্বরীষ রাজার পিতা ত্রিশঙ্কুকেও গোবিন্দ শাপ হইতে মুক্ত করিয়া দেন। আর কৃত্তিবাসের কাব্যে যযাতি রাজার পিতা নহুষের স্বর্গপ্রাপ্তি উপলক্ষে আয়োজিত যজ্ঞানুষ্ঠানে কুশধ্বজ নামক ব্রাহ্মণ বালককে নরবলির উদ্দেশ্যে ক্রয় করার কাহিনী পাওয়া যায়। ইহাতেও কুশধ্বজের স্তবে সন্তুষ্ট গোবিন্দ যযাতির পিতা নহুষকে যমদ্বার হইতে মুক্ত করিয়া দেন। কৃত্তিবাসের পালায় কবিচন্দ্রের রচনার মত বিশ্বামিত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয নাই, আর কৃত্তিবাসের এই কাহিনীটি 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' এবং আদিকাণ্ডের বিষয় বলিয়া দুইটি 'যযাতি রাজার উপাখ্যান' (ক.বি. ১নং এবং ক.বি. ৩৭৮৮ নং) পালায় উল্লেখ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় পালা 'শিবরামের যুদ্ধ'। কৃত্তিবাসের ভণিতায় প্রচারিত 'শিবরামের যুদ্ধ' (ক.বি. ২৪৪ নং, লিপিকালহীন) পালাটি কবিচন্দ্রের পালার তুলনায় বর্ণাঢ্যহীন এবং বিষয়বস্তুতেও নূতনত্ব কিছু নাই। তবে পালাটি অরণ্যকাণ্ডের বিষয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কবিচন্দ্রের 'শিবরামের যুদ্ধ' পালায় কোনও কাণ্ডেব নাম উল্লিখিত হয় নাই।

কৃত্তিবাসের নামে প্রচারিত 'যযাতি রাজার উপাখ্যান' এবং 'শিবরামের যুদ্ধ' এই দুইটি পালা কাহিনী বিন্যাসে এবং ভাবের গাম্ভীর্যে কোনও ভাবেই কবিচন্দ্রের রচনার সমকক্ষ নয়।

(খ) কৃত্তিবাসের মুদ্রিত (রামায়ণ) গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সঙ্গে কবিচন্দ্রের রামায়ণের তুলনা:-

আদিকাণ্ড :-

কৃত্তিবাসের আদিকাণ্ডের অন্তর্গত কেবল হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানের সঙ্গেই কবিচন্দ্রের রচনার মিল পাওয়া যায়। এই কাহিনীটির উৎস মার্কণ্ডেয় পুরাণ (পূর্বখণ্ড) হইলেও হরিশ্চন্দ্রের পুত্র বোহিতাশ্বেব মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কবিচন্দ্রের কাব্যে পাওয়া যায় শিবের ক্রোধের ফল, আর কৃত্তিবাসের কাব্যে পাই বিশ্বামিত্রের অভিশাপ দান। শ্মশানে রাণীর প্রতি ডোমরূপী হরিশ্চন্দ্রের ব্যবহার কবিচন্দ্রেব কাব্যেই অধিক চিত্তাকর্ষক। কৃত্তিবাসের কাব্যে একটি নূতন বিষয় সংযোজিত হইয়াছে, যাহা কবিচন্দ্রের কাব্যে পাওয়া যায় না। তাহা হইল, নারদেব প্রশ্নের উত্তরে রাজা হরিশ্চন্দ্র স্বর্গে আগমনের হেতু সম্পর্কে আপন পুণ্যকর্মের কথা নিজমুখে ঘোষণা করেন। তাহার ফলস্বরূপ রাজার রথ মধ্যপথে নামিয়া পড়ে, তিনি আব স্বর্গলাভ করিতে পারেন না। হিন্দুর পাপ-পুণ্য সম্পর্কে একটি সাধারণ সংস্কারবোধ ইহার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কৃত্তিবাসের সঙ্গে কবিচন্দ্রের কাব্যের প্রধান মিল বাল্মীকি মুনি কর্তৃক রামনামের মাহাত্ম্য বর্ণনায়। এই কাহিনীটি 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এ অযোধ্যাকাণ্ডের (৬ষ্ঠ অধ্যায়), অন্তর্গত। কবিচন্দ্রের কাব্যে 'রামচন্দ্রের বনবাস' পালায় ইহার যথাযথ অনুসরণ পাওয়া যায়। কিন্তু কৃত্তিবাসের কাব্যে আদিকাণ্ডের একেবারে প্রথমে এই কাহিনীটি বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে বাল্মীকি মুনির পূর্বপরিচয় হিসাবে চ্যবন মুনির পুত্র রত্নাকর নাম প্রদত্ত হইয়াছে। 'চ্যবন' এবং 'রত্নাকর' এই দুইটি নাম 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' কিংবা কবিচন্দ্রের কাব্যে পাওয়া যায় না। উক্ত দুই কাব্যে শুধু কিরাতদের সংসর্গে বাল্মীকি মুনির কিরাত বেশ ধারণের কথাই আছে। আর বাল্মীকি মুনির নিকট সাত ঋষির আগমনের স্থলে কৃত্তিবাসের কাব্যে কেবল ব্রহ্মা ও নারদ এই দুই মুনির উল্লেখ দেখা যায়। রাম-নাম প্রচারই এই কাহিনীটির উদ্দেশ্য।

অযোধ্যাকাণ্ড :

কৃত্তিবাসের অযোধ্যাকাণ্ডের অন্তর্গত কাহিনীর সঙ্গে কবিচন্দ্রের 'রামচন্দ্রের বনবাস' পালার বিষয়বস্তুর মধ্যে বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না।

কৃত্তিবাসের অযোধ্যাকাণ্ডের অন্তর্গত জয়ন্তকাকের নেত্র বিদ্ধকরণ এবং শত্রুঘ্ন কর্তৃক কুঁজীকে প্রহার কবিচন্দ্রের পালায় পাওয়া যায় না। তবে অন্যান্য বিষয়ে মিল আছে। কবিচন্দ্রের 'গয়াশ্রাদ্ধ' পালার সঙ্গে কৃত্তিবাসের কাব্যের মিল থাকিলেও কৃত্তিবাসের কাব্যে এই স্থলে লক্ষ্মণ একেবারে নিরুত্তর। তুলনায় কবিচন্দ্রের লক্ষ্মণ দশরথকে সীতাদেবী কর্তৃক বালির পিণ্ডদান প্রসঙ্গে রামচন্দ্রের অবিশ্বাস দূর করিবার জন্য মাঝে মাঝে আইন সংক্রান্ত বিধি বিধানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বিপদে সীতাদেবীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুক্তি উপস্থাপন করার মধ্যে ভ্রাতৃজায়ার প্রতি দেবর লক্ষ্মণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বোধটি সুপ্রকট হইয়া উঠিয়াছে। কৃত্তিবাসের কাব্যে এই কাহিনীর শেষে গয়া-মাহাত্ম্য নামে একটি মূল্যবান অংশ সংযোজিত হইয়াছে, যাহা কবিচন্দ্রের কাব্যে পাওয়া যায় না। গয়াসুর নামক দৈত্য বধ করিয়া বিষ্ণু স্বীয় পাদপদ্ম গয়াসুরের মস্তকোপরি স্থাপন করেন। সেই বিষ্ণুপদে গয়াশিরে পিণ্ড দান করিলে পিতৃগণ মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হন। এইহেতু গয়াধামের এত প্রসিদ্ধি।

অরণ্যকাণ্ড :

কৃত্তিবাসের অরণ্যকাণ্ডের সঙ্গে কবিচন্দ্রের 'সীতাহরণ' পালার তুলনা করার সর্বপ্রধান অসুবিধা কবিচন্দ্রের এই পালাটি অতি মাত্রায় সংক্ষিপ্ত। ইহাতে কৃত্তিবাসের শূর্পণখার পরিবর্তে পাওয়া যায় খণ্ডমা রাক্ষসীর নাম। কৃত্তিবাসের কাব্যে বিরাধ রাক্ষস

বধ, বাতাপি ও ইল্বল নিধন, শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদন, খর-দূষণবধ, সীতা কর্তৃক লক্ষ্মণকে তিরস্কার এবং শবরী উপাখ্যান পাওয়া যায়। আর কবিচন্দ্রের পালায় কাহিনী খুব সংক্ষিপ্ত, তাহাতে শবরীর কাহিনীর পরিবর্তে মাছরাঙ্গার কাহিনী ও হনূমান-অঞ্জনার প্রসঙ্গ, এই দুই ক্ষুদ্র কাহিনী সংযোজিত হইয়াছে। তবে কবিচন্দ্রের এই পালাটি সংক্ষিপ্ত হইলেও কবিচন্দ্রের রচনার গুণেই এক একটি চিত্রধর্মী ঘটনা মনে গভীর রেখাপাত করে।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড :-

কৃত্তিবাসের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের বিষয়, বেশ বিস্তৃত। তুলনায় কবিচন্দ্রের 'বামসুগ্রীব মিলন' পালাটি সংক্ষিপ্ত। রাম সুগ্রীবের মিত্রতা, সীতা উদ্ধারে সুগ্রীবের প্রতিজ্ঞা, বালীর পরাক্রম, বালীকে হত্যা করিয়া সুগ্রীবকে রাজ্যদানে প্রতিজ্ঞা, শ্রীরাম কর্তৃক বালীবধ, তারার বিলাপ, শ্রীরামের বিরহ বর্ণনা, লক্ষ্মণের দৌত্য এবং সুগ্রীবের নানাদিকে সৈন্যপ্রেরণ প্রভৃতি বিষয়ে উভয় কাব্যের মধ্যে মিল থাকিলেও কোনও কোনও বিষয় কবিচন্দ্রের কাব্যে দুই চারিটি ছত্রেই সমাপ্ত।

অতঃপর কবিচন্দ্রের কাব্যে 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' হইতে হনূমান ও স্বয়ংপ্রভা যোগিনীর বিষয় (কিষ্কিন্ধ্যা/৬ষ্ঠ অঃ) গৃহীত হইয়াছে। কবিচন্দ্রের কাব্যে অবশ্য স্বয়ংপ্রভা নামের পরিবর্তে পাওয়া যায়, 'প্রভাবতী' এবং কৃত্তিবাসের কাব্যে পাই 'সম্ভবা' নামক কন্যার উল্লেখ। রামানুচর হনূমানাদির দর্শনের ও সীতার সন্ধান-বার্তা হনূমানের নিকট প্রদানের পর এই যোগিনীর শ্রীরামচরণ দর্শন ও মুক্তিলাভ ঘটে। অধ্যাত্ম রামায়ণের এই বিষয় কবিচন্দ্রে পাওয়া গেলেও কৃত্তিবাসে এই মুক্তিলাভের কথা উল্লিখিত হয় নাই।

ইহার পর কৃত্তিবাসেব কাব্যে সংযোজিত হইয়াছে সীতা অন্বেষণে বানরগণের যুক্তিতর্ক এবং সম্পাতির কাহিনী। কবিচন্দ্রের এই পালার পুথিটি খণ্ডিত হওয়ায় এই শেষ অংশ পাওয়া যায় নাই।

সুন্দরাকাণ্ড :

কৃত্তিবাসের সুন্দরাকাণ্ডের সঙ্গে কবিচন্দ্রের 'সীতার উদ্দেশ' পালার প্রভেদ সামান্য। উভয় কাব্যেই হনূমানের অশোকবনে প্রবেশ, হনূমান কর্তৃক সীতাকে রামচন্দ্রের অঙ্গুরীয় দান, হনূমান কর্তৃক আম্রবন ধ্বংস ও রাক্ষস সংহার, ইন্দ্রজিতের হনূমানকে বন্দীকরণ, রাবণ কর্তৃক হনূমানকে 'দণ্ডপ্রদান, হনূমান কর্তৃক লঙ্কাদাহন, হনূমানেব কিষ্কিন্ধ্যায় আগমন ও সীতার বার্তা প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে মিল আছে। রামচন্দ্রের প্রত্যয় লাভের উদ্দেশ্যে কৃত্তিবাসের কাব্যে হনূমানকে সীতার শিরোমণি প্রদানের কথা পাওয়া যায়, পরিবর্তে কবিচন্দ্র উল্লেখ কবিয়াছেন সীতার কঙ্কণ প্রদানেব কথা।

ইহার পর কৃত্তিবাসের কাহিনী বহু বিস্তৃত। তাহাতে আরও পাওয়া যায় হনূমানের জন্মবৃত্তান্ত, সুরসা কর্তৃক হনূমানকে বাধা প্রদান, মৈনাক পর্বতের সঙ্গে হনূমানের মিলন, হনূমানের সিংহিকা বধ ও লঙ্কায় প্রবেশ, চামুণ্ডার লঙ্কাত্যাগ, ত্রিজটার স্বপ্ন, বিভীষণের লঙ্কাত্যাগ, নল কর্তৃক সেতুবন্ধন, শ্রীরামের লঙ্কায় শিব প্রতিষ্ঠা এবং ভস্মলোচন বধ প্রভৃতি। কবিচন্দ্রের এই পালাটিতে এই সকল অংশ পাওয়া যায় নাই।

লঙ্কাকাণ্ড :

কৃত্তিবাসের লঙ্কাকাণ্ডটি যেমন ব্যাপক কবিচন্দ্রের এই অংশের পালাগুলি সেইরূপ ব্যাপক ও বর্ণাঢ্য হইলেও তাঁহার সমস্ত পালা পাওয়াও যায় নাই। অতএব কবিচন্দ্রের ভণিতায় যে ছয়খানা পালা পাওয়া যায় এই অংশে কেবল তাহার কথাই আলোচিত হইল। 'অঙ্গদ রায়বার', 'রাবণ কুম্ভকর্ণ সংবাদ', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'রাবণ বধ', 'সীতার পরীক্ষা' এবং 'রঘুনাথের দেশাগমন' প্রভৃতি পালার সঙ্গে উভয় কাব্যের মধ্যে মিল আছে। তবে কৃত্তিবাসের কাব্যে লক্ষ্মণের পুনর্জীবন লাভের পর হনূমান সুগ্রীবের নিকট হইতে পুরস্কার স্বরূপ নানাপ্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য লাভ করে। এই পুরস্কার লাভের কথা কবিচন্দ্রের 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' পালায় পাওয়া যায় না। উভয় কাব্যেই এই অংশে হনূমান কর্তৃক গন্ধকালী অপ্সরার উদ্ধার ও কালনেমি বধ গৃহীত হইয়াছে। অধ্যাত্ম রামায়ণের ধান্যমালী অপ্সরাকে কৃত্তিবাস ও কবিচন্দ্র উভয়েই গন্ধকালী নাম প্রদান করিয়াছেন। ভরত কর্তৃক হনূমানকে বাঁটুল নিক্ষেপ ও সূর্যকে হনূমানের কক্ষতলে স্থাপন এই দুইটি উপকাহিনী খুব সম্ভব লোক-কল্পনার ফল।

কৃত্তিবাসের লঙ্কাকাণ্ডে বাল্মীকি-রামায়ণের বহু বিষয় এবং লোকশ্রুতিমূলক কিছু কাহিনী গৃহীত হইয়াছে, যাহা কবিচন্দ্রের রচনায় পাওয়া যায় না। তাহার মধ্যে— রাবণকে অম্বিকার অভয় দান, রামচন্দ্রের অকালে দেবীর বোধন এবং দুর্গোৎসব, নীলপদ্ম অপহরণে শ্রীরামের চক্ষুদানের সঙ্কল্প, হনূমান কর্তৃক চণ্ডীপাঠে ভ্রম উৎপাদন ও রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ, রাবণের নিকট শ্রীরামের রাজনীতি শিক্ষা, শ্রীরাম কর্তৃক শিবপূজা, হনূমানের নিজ বক্ষোমধ্যে রামনাম প্রদর্শন এবং হনূমানের ভোজন প্রভৃতি কৃত্তিবাসের এই অতিরিক্ত বিষয়সমূহ কবিচন্দ্রের পালায় পাওয়া যায় নাই। ইহার কারণ খুব সম্ভব কবিচন্দ্র তাঁহার 'রামায়ণ' রচনার জন্য মূলতঃ 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' ও 'শ্রীমদ্ভাগবত' গ্রন্থকেই আদর্শরূপে মানিয়া লইয়াছিলেন। উক্ত দুই গ্রন্থে শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা ও ঈশ্বরত্ব প্রকাশেই কাহিনীর সার্থকতা লাভ হওয়ায় বহু অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বর্জিত হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রের দেবত্ব প্রকাশ এবং অধ্যাত্ম রামায়ণকে অনুসরণ করার ফলেই খুব সম্ভব রাম-কথার বহু বিষয় কবিচন্দ্রের কাব্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি নীতি উপদেশমূলক কাহিনী

যাহা কৃত্তিবাসী রামায়ণের মুদ্রিত সংস্করণে পাওয়া যায় না, তাহা কবিচন্দ্রের কাব্যে গৃহীত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখ করা যায় — মাছরাঙ্গা কাহিনী, কৃষাণের স্বদেশপ্রীতি ও রামচন্দ্রকে অঞ্জনার অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন।

কৃত্তিবাসের উত্তরাকাণ্ডটিও বেশ বিস্তৃত, কিন্তু কবিচন্দ্রের নামে এইরূপ একটি পালাও পাওয়া যায় নাই। খুব সম্ভব কবিচন্দ্র তাঁহার রামায়ণকে রাম ও সীতার লীলা কথায় পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। এইজন্য রাম ও সীতার অযোধ্যায় আগমন ও রামচন্দ্রের সিংহাসন প্রাপ্তিতে কাহিনী সমাপ্ত করিয়া কাব্যটিকে মিলনান্তক কাব্যে রূপায়িত করিয়াছেন।

এই তুলনামূলক আলোচনা হইতে আমরা একটি সত্যে উপনীত হই যে, বঙ্গে কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করিলেও কবিচন্দ্র অতি স্বচ্ছন্দে কৃত্তিবাসের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া কাহিনী নির্বাচনে ও পালা-বিন্যাসে আপন অভিরুচিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি কাহারও অনুকরণ না করিয়া বরং নিজেকে অনুকরণের যোগ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন।

উভয় কাব্যের মূলভাব ভক্তিরস। বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্রের মহিমা উভয় কবিই জনগণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। সুজলা সুফলা বাংলাদেশে তিনি নবদূর্বাদলশ্যামরূপে বন্দিত। উভয় কবি বিষ্ণুর সঙ্গে শিবের মহিমাও জ্ঞাপন করিয়াছেন। কবিচন্দ্রের 'শিবরামের যুদ্ধ' পালায় দেখা যায়, শিব স্বয়ং তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর হনূমানকে সীতা উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া দেন। সেই সময় হইতে হনূমান রামচন্দ্রের সেবক হইয়া যায়। আর কৃত্তিবাসী রামায়ণে শিবকেই হনূমানরূপে আবির্ভূত হইতে দেখা যায়। লঙ্কাযুদ্ধের পর অযোধ্যায় ভোজনের আয়োজন করা হইলে সীতাদেবী রন্ধন করিয়া অন্ন পরিবেশন করিতে থাকেন। যতবার তিনি হনূর পাতে অন্ন দিয়া ব্যঞ্জন আনিতে যান ততবারই দেখেন হনূর পাত খালি। অবশেষে সীতাদেবী বুঝিতে পারেন বানররূপে গঙ্গাধর আসিয়াছেন, এইহেতু সীতাদেবী হনূর মাথায় 'নমঃ শিবায়' বলিয়া অন্ন স্পর্শ করাইলে হনূর ভোজন পর্ব সমাধা হয়।

"ধ্যানযোগে মা জানকী দেখিলা সত্বর।
বানররূপেতে অবতার গঙ্গাধর ॥
কপিরূপে বসেছেন কৈলাসের পতি।
উদর পূরাতে পারে কাহার শকতি ॥"[১]

অঙ্গদ রায়বার :

কবিচন্দ্রের কাব্যের সর্বপ্রধান আকর্ষণ 'অঙ্গদ রায়বার' পালা। এই পালাটির ভাব ও ভাষার নিদর্শন কৃত্তিবাসের এবং আরও কয়েকজনের রায়বার পালার মধ্যে পাওয়া

যায় । কৃত্তিবাস কবিচন্দ্রের পূর্ববর্তী কবি হইলেও ডঃ সুকুমার সেন বলিয়াছেন, "যদি শুধু প্রাপ্ত পুথি লইয়া বিচার করিতে হয় তবে কৃত্তিবাস ও কাশীরামকে সপ্তদশ শতাব্দের আগে ধরা উচিত নয় ।"[১০] আমরা কৃত্তিবাসের যে সকল পুথি পাইয়াছি তাহা সবই পরবর্তীকালের, এইহেতু এই সকল পুথিতে অন্য কবির রচনা প্রক্ষিপ্ত হওয়া অসম্ভব নয় । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বাংলা পুথির তালিকার ৯৪নং অঙ্গদ রায়বারের পুথিটিতে পাওয়া যায় কবিচন্দ্রের রচনার সাক্ষাৎ । অথচ তাহাতে ভণিতা প্রদত্ত হইয়াছে কৃত্তিবাসের । এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ মনে করেন, কবিচন্দ্রের 'অঙ্গদ রায়বার' পালাটিই কৃত্তিবাসের কাব্যে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে । এই সম্পর্কে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, "দুঃখের বিষয়, তথাকথিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ কবিচন্দ্রের সমস্ত রচনাগুলি বেমালুম আত্মসাৎ করিয়া এবং নিজদেহে কৃত্তিবাসের নামের সীলমোহর লাগাইয়া তাঁহারই স্বত্ব সাব্যস্তপূর্বক আজ পর্যন্ত সমানে বাজারে চলিতেছে।"[১১] ডঃ সুকুমার সেনও কৃত্তিবাসী রামায়ণের অঙ্গদ রায়বার পালাটি কবিচন্দ্রের রচনা হইতে গৃহীত বলিয়া মনে করিয়াছেন ।[১২] আবার কৃত্তিবাসের কাব্যে কবিচন্দ্রের প্রভাব প্রসঙ্গে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "স্থানে স্থানে কৃত্তিবাসের রচনার সঙ্গে তাঁহার অনেক রচনা মিশিয়া গিয়াছে — যেমন শিবরামের যুদ্ধ ও অঙ্গদের রায়বার । প্রাচীন কৃত্তিবাসী পুঁথিতে এই দুই পালা পাওয়া যায় না । কবিচন্দ্রের রচনা দুইটি নকলনবিশ বা রামায়ণ গায়কদের কৃপায় কৃত্তিবাসের পুঁথিতে প্রবেশ করিয়াছে ।"[১৩]

অতএব কবিচন্দ্রের রচনাটি কৃত্তিবাসের কাব্যে কতখানি গৃহীত হইয়াছে তাহা জানা আবশ্যক । আমরা কৃত্তিবাসের কয়েকটি মুদ্রিত গ্রন্থকে পরীক্ষামূলকভাবে ধরিয়া আমাদের সিদ্ধান্তে অগ্রসর হইতে পারি ।

কবিচন্দ্রের 'অঙ্গদ রায়বার' পালার সূচনা এইরূপ :-

বন্দ গেলা সিন্ধু রামচন্দ্র হৈলা পার ।
বানরে বেড়িল আসি লঙ্কার দ্বার ।।
শ্রীরাম বলেন মিতা আর কেন বিলম্ব ।
করে কেন্নাই রাবণ রাজা যুদ্ধের আরম্ভ ।।
সাগর পার বল্যা তার বড় ছিল আঁটুনী ।
এখন সে বোল ফুরাঞা গেল কি বলে তা শুনি ।।

(ক.বি. ১৬৩, পু.পৃ. ১)

কবিচন্দ্রের এই অংশের সঙ্গে কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে অনুরূপ অংশ উদ্ধৃত করিলে উভয় রচনার পার্থক্য কতখানি তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে । এই প্রসঙ্গে শ্রীরামপুর মিশন

প্রেস হইতে প্রথম মুদ্রিত (১৮০৩ খ্রীঃ) কৃত্তিবাসী রামায়ণের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল :

"বন্দ গেল সাগর কটক হইল পার ।
দিনে দিনে রাবণ রাজার টুটে অহঙ্কার ॥
ফাঁফর হইল রাজা গুণে মনে মনে ।
শুক সারণ দুইচরকে ডাক দিয়া আনে ॥
শুক সারণ বলি তোরে রাজ্যের প্রধান ।
চর্চ্চিয়া আইস রামের কটক হইয়া সাবধান"॥

(প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ কাণ্ড, পৃ.৪)

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের শুরু এইরূপ —

"বান্ধা গেল সাগর কটক হৈল পার ।
দিনে দিনে রাবণের টুটে অহঙ্কার ॥
ফাঁফর হইয়া রাজা ভাবি মনে মনে ।
দুই চর শুক আর সারণেরে ভণে ॥
শুন শুক সারণ তোমরা বুদ্ধিমান।
চর্চ্চ গিয়া রামের কটক কি প্রমাণ ॥"

(সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত ১ম সং ১৩৬৪ সাল, পৃ. ২৪২)

সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠও উপরে বর্ণিত দুই গ্রন্থের অনুরূপ :

"বান্ধা গেল সাগর কটক হইল পার ।
দিনে দিনে রাবণ রাজার টুটে অহঙ্কার ॥
অহঙ্কার টুটিয়া রাজার বাঢ়ে অভিমান ।
অভিমানে খসিয়া পড়ে হাথের গুয়া পান ॥
ফাঁফর হইল বাবণ রাজা গণে মনে মনে ।
শুক সারণ দুই চর ডাক দিয়া আনে॥"

(ভারবী প্রকাশিত, ২য় সং ১৯৮১ খ্রীঃ। পৃ. ১৭৪)

উপরে বর্ণিত কবিচন্দ্রের 'অঙ্গদ রায়বার' পালার সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণের তিনটি সংস্করণে মিল থাকিলেও উহা ভাবগত মিল। আর রচনাগত মিল কৃত্তিবাসের প্রত্যেকটি সংস্করণে প্রায় একরূপ। আবার কৃত্তিবাসী রামায়ণে অঙ্গদ রায়বার অংশের প্রারম্ভে যে অংশটি পাওয়া যায় তাহা কবিচন্দ্রের পালায় পাওয়া যায় না। কৃত্তিবাসী রামায়ণেব উক্ত অংশটি এইরূপ, —

"পঞ্চদিন দুই কটকে হয়না হানাহানি ।
রাম বলেন রাবণ রাজা যুদ্ধ না দেয় কেনি ।।
বিভীষণ বলেন গোসাঁঞি কর অবগতি।
দুই কটকের রোলে রাবণের স্থির নহে মতি ।।
বিপক্ষ লাগিয়া রাবণ রণে না দেয় হানা ।
নিশ্চয় জানিতে দূত পাঠাও একজনা ।।"

(শ্রীরামপুরে মুদ্রিত সংস্করণ ষষ্ঠ কাণ্ড ১৮০৩ খ্রীঃ । পৃ. ৩৮)

এই অংশটি ত্রৈলোক্যনাথ দত্তের প্রকাশিত 'কৃত্তিবাসী-রামায়ণ' (সুধার্ণব যন্ত্রে মুদ্রিত ১২৯৪ সাল, পৃ.১৪) হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সমস্ত মুদ্রিত কৃত্তিবাসী রামায়ণেই পাওয়া যায় । অথচ কবিচন্দ্রের অঙ্গদ রায়বারের কোনও পাঠে উহা পাওয়া যায় না । মনে হয় কৃত্তিবাসের রচনা প্রথমে ঐভাবে পাওয়া গিয়াছিল, পরে কবিচন্দ্রের রচনার প্রভাবে কৃত্তিবাসের পালাতেও অনুরূপ তির্যক্‌ভাব অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকিবে ।

কৃত্তিবাস অপেক্ষা কবিচন্দ্রের এই পালায় লঘু-চপল ভাব ও ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা প্রাধান্য লাভ করায় শ্রোতাসাধারণের অভিলষিত উক্ত কবিচন্দ্রের রচনাই কৃত্তিবাসের পালার ভাব ও ভাষাকে পরিপূর্ণভাবে অধিকার করিয়া ফেলে । তথাপি কবিচন্দ্রের 'অঙ্গদ রায়বার' পালায় যে পরিমাণ সুসংহত ভাব, ভাষার অকৃত্রিমতা এবং ব্যঙ্গের তির্যকতা রক্ষিত হইয়াছে কৃত্তিবাসের অঙ্গদ রায়বারে ততদূর রক্ষিত হয় নাই । এইরূপ রসবৈচিত্র্য সৃষ্টি হওয়ায় কবিচন্দ্রের 'অঙ্গদ রায়বার' পালা এ যাবৎকাল পাঠকচিত্তকে যতদূর আকৃষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছে, কবিচন্দ্রের অনুকৃত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত গুণাবলীর অভাবে কৃত্তিবাসের অঙ্গদ রায়বার অংশ পাঠকচিত্তকে ততদূর আকৃষ্ট করিতে পারে নাই ।

আমরা কবিচন্দ্রের 'অঙ্গদ রায়বার' পালার কয়েকটি ছত্রের সঙ্গে কৃত্তিবাসের প্রকাশিত রামায়ণের তিনটি সংস্করণ হইতে কিছু ছত্র পাশাপাশি উল্লেখ করিয়া কবিচন্দ্রের রায়বারের প্রভাব কৃত্তিবাসের রচনাকে কতদূর প্রভাবিত করিয়াছিল তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, যথা —

অঙ্গদ রায়বার পালার তুলনামূলক আলোচনা :-

কবিচন্দ্রের রচনা	কৃত্তিবাসী রামায়ণ	কৃত্তিবাসী রামায়ণ	কৃত্তিবাসী রামায়ণ
(ক.বি. ১৬৩ নং)	(শ্রীরামপুরে মুদ্রিত, প্রথম প্রকাশ,১৮০৩খ্রীঃ	(হবেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, ১ম সং, ১৩৬৪ সাল) ১৯৫৭ খ্রীঃ	(সুখময মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ভাববী প্রকাশিত, ২য সং, ১৯৮১ খ্রীঃ)
১। বাবণ বলিবেক এই বানবা আসে প্রতি জাতে। ইহা বৈ তাব বীর নাইক সুগ্রীবের সাথে।।পু.পৃ.১	হনূমান দেখিয়া কুপিবে লঙ্কেশ্বব। মনে কবিবে এই বানরা আইসে বারে বারে ॥ পৃ. ৩৯	হনূমান দেখিয়া কুপিবে লঙ্কেশ্বব। ইহা বিনা বাম সৈন্যে বীব নাহি আর ॥ পৃ. ২৫২	হনূমান দেখিযা কুপিবে লঙ্কেশ্বর। মনে করিবে এই বানবা আইসে বাবে বাবে ॥ পৃ. ১৯১
২। অঙ্গদ বলেন গোসাঞি এবা কোন কথা। আমি নখে ছিঁড়্যা আন্যা দিব রাবণেব মাথা পু.পৃ. ২ক	অঙ্গদ বলে গোসাঞি এবে কোন কথা। নখে ছিঁড়িয়া আনিব বাবণের দশ মাতা। পৃ. ৪০	অঙ্গদ বলেন প্রভু এবা কোন কথা। নখে ছিঁড়ি আনিব তাহাব দশমাথা। পৃ. ২৫৩	অঙ্গদ বলে রঘুনাথ এবা কোন্ কথা। নখে ছিণ্ডিযা ফেলিব তার দশগোটা মাথা।পৃ.১৯১
৩। কার্তবীর্যার্জুন তোবে তৃণ করাল্য দাঁতে। তাঁর দর্পচূর্ণ হইল পবশুবামেব হাতে। পু.পৃ. ৬ক	কার্ত্তিকবীর্য্যার্জুন যখন কেলি কবে জলে। তার আগে গেলে তুমি নর্মদার কূলে। পৃ. ৪৭	কার্ত্তবীর্য্য যখন সে ক্রীড়া করে জলে। তাব আগে গেলি তুই নর্ম্মদার কূলে। পৃ. ২৫৮	কার্ত্তবীর্য্যার্জুন যখন কেলি কবে জলে। হেন বেলা গেলি তুই নর্মদাব কূলে। পৃ. ১৯৫
৪। ধন্য রাণী মন্দোদবী সাবাস তোব মাকে। এক যুবতী শতেক পতি ভাব কেমনে রাখে। পু.পৃ. ৪ক	-----------	ধন্য নারী মন্দোদবী ধন্য রে তোব মাকে। এক যুবতী এত পতি ভাব কেমনে রাখে। পৃ. ২৫৫	ভাল ভাল মন্দোদরী ঘোষে ত্রিভুবনে। এক যুবতী এতেক পতি ভাব বাখে কেমনে। পৃ. ১৯৪
৫। চেড়ীব উচ্ছিষ্ট খালেক কোন বাপ পাতালে। কোন বাপ তোব বন্দী ছিল অর্জুনেব অশ্বশালে ॥ পু.পৃ. ৪ক	এক বাবণ হারিয়াছে অর্জুনেব ঠাঁই। আব বাবণ বালিব দ্বাবে চেড়ীব আঠে খাই ॥ পৃ. ৪৮	কোন্ বাপ সে চেড়ীর অন্ন খাইল পাতালে। কোন্ বাপ বাঁধা ছিল অর্জুনের অশ্বশালে॥ পৃ. ২৫৫	এক রাবণ হারিয়াছিল অর্জুনেব ঠাঞি। আব বাবণ বলিদ্বাবে পরাভব পাই ॥ পৃ. ১৯৫
৬। তোবে একে একে কঞা দিলাঙ সকল বাপেব কথা। ইহা সভাতে কাজ নাইক তোব যুগী বাপটি কথা॥ পু.পৃ. ৪ক	আর বাবণ আমাব বাপ বান্ধিলেক লেজে। পবিচয দেহ কেবা আছ ইহার মাঝে ॥ পৃ. ৪৮	একে একে কৈলাম তোব সব বাপের কথা। সবারে কাজ নেই তোর যোগী বাপটি কোথা ॥ পৃ. ২৫৫	আর বাবণে মোব বাপ বাঁধিযাছিল লেজে। পবিচয দেহ কিবা সে আছে ইহাব মাঝে ॥ পৃ. ১৯৫

কবিচন্দ্রের রচনা	কৃত্তিবাসী রামায়ণ	কৃত্তিবাসী রামায়ণ	কৃত্তিবাসী রামায়ণ
(ক.বি. ১৬৩ নং)	(শ্রীরামপুরে মুদ্রিত, প্রথম প্রকাশ, ১৮০৩খ্রীঃ)	(হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, ১ম সং, ১৩৬৪ সাল) ১৯৫৭ খ্রীঃ	(সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ভারবী প্রকাশিত, ২য় সং, ১৯৮১ খ্রীঃ)
৭। কামবসে মত্ত হঞা পড্যা গেলি ফাঁদে। বাঙন হঞিঞা হাত বাড়াইলি চাঁদে ॥ পু.পৃ. ৬ক	---------	অহঙ্কারে মত্ত হয়ে পড়ে গেলি ফাঁদে। বামন হইয়া হাত বাড়াইলি চাঁদে ॥ পৃ. ২৫৭	--------
৮। কুপিল বাবণ রাজা অঙ্গদেব বোলে। যেন তপ্ত তৈলে দিলে অধিক উথুলে ॥ পু.পৃ. ৭ক	কুপিল রাবণ রাজা অঙ্গদের বোলে। কুড়ি চক্ষু পাখাল করি অগ্নি হেন জ্বলে ॥ পৃ. ৪৯	কুপিল বাবণ রাজা অঙ্গদের বোলে। কুড়ি চক্ষু রক্ত করি অগ্নি হেন জ্বলে ॥ পৃ. ২৫৮	কুপিল বাবণ বাজা অঙ্গদের বোলে। অগ্নি হেন কুড়ি চক্ষু পাকল করে জ্বলে ॥ পৃ. ১৯৫
৯। -------	কিসের তবে চাহ বাবণ পাকল কবি আঁখি। মাকড়ের ডিম্ব হেন তোর লঙ্কা দেখি ॥ পৃ. ৫১	কি হেতু দেখিসরে পাকল কবি আঁখি। মাকড়ের ডিম্ব হেন তোর লঙ্কা দেখি ॥ পৃ. ২৫৯	কি কাজে বাবণ বাজা পাকল কব আঁখি। মাকড়ের ডিম্ব হেন তোর লঙ্কা দেখি॥ পৃ. ১৯৭

কবিচন্দ্রের অঙ্গদ রায়বারের সঙ্গে কৃত্তিবাসের তিনটি মুদ্রিত সংস্করণের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সাহিত্য রত্ন) প্রকাশিত (সাহিত্য সংসদ, ১ম সং ১৩৬৪ সাল) কৃত্তিবাসী রামায়ণের অঙ্গদ রায়বার অংশেই কবিচন্দ্রের অঙ্গদ রায়বারের প্রভাব অধিক মাত্রায় বর্তমান। তুলনায় অন্যান্য কৃত্তিবাসী রামায়ণের মুদ্রিত সংস্করণে এই প্রভাব কম। তথাপি কৃত্তিবাসী রামায়ণের এই মুদ্রিত সংস্করণগুলিতে রচনাগত এক প্রকার ধারা লক্ষ্য করা যায়। শ্রদ্ধেয় হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁহার কৃত্তিবাসী রামায়ণ গ্রন্থের (১ম সং ১৩৬৪ সাল) ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "রামায়ণ সম্পাদনে আমরা সাধারণতঃ বটতলার ধারা বজায় রাখিয়াছি," (ঐ, পৃ. ২)। অতএব দেখা যায়, কৃত্তিবাসী রামায়ণের বটতলার সংস্করণেই কবিচন্দ্রের প্রভাব অধিক। এই প্রসঙ্গে আমরা ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের উল্লেখ দ্বারা আমাদের কথার উপসংহারে আসিতে ইচ্ছা করি —

"অঙ্গদের রায়বারের উৎকৃষ্ট বিদ্রুপাত্মক পংক্তিগুলি কৃত্তিবাসের নহে, — উহা 'কবিচন্দ্র' নামধেয় কোন অজ্ঞাত মহাজনের ভণিতাযুক্ত। বটতলার বামায়ণে রামচন্দ্র সীতার জন্য যে সুললিত পদ্যে বিলাপ করিয়াছেন তাহা খুব সম্ভব কৃত্তিবাস সে ভাবে

লিখিয়া যান নাই । ইহা শুনিয়া কোন কোন কৃত্তিবাস-ভক্ত পাঠকের দুঃখ হইতে পাবে — কিন্তু কঠিন সত্যের আঘাতে জীবনের কত প্রাণ-প্রিয় ধারণা বিসর্জন দিতে হয়, — এই জীবন-স্বপ্ন ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে স্বপ্নরাজ্যের অন্তর্গত কত ছোট ছোট স্বপ্ন নিত্য নিত্য ভাঙ্গিয়া যায় ; — দুরন্ত নেংটা শিশুটির ন্যায় সত্য ক্রীড়াচ্ছলে আমাদের সুকুমার বৃত্তির ফুলগুলি লইয়া টানাহেঁচড়া করিতে ভালবাসে।"[১৪]

দুই । ॥ প্রকাশিত 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ'

ও

মৎ সম্পাদিত 'রামায়ণ'-এর আলোচনা ॥

'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৮৬ বঙ্গাব্দে, জি. ভরদ্বাজ অ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা-৯ হইতে । ইহার সঙ্গে আমাদের সম্পাদিত 'রামায়ণ' খানির আলোচনাব প্রয়োজন আছে । ১২০৮ সালে লিপিকৃত কবিচন্দ্রের রামায়ণের একখানা পুথি সম্পাদনা করিয়া ডঃ চিত্রা দেব বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে বিষ্ণুপুরী রামায়ণকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করায় তিনি আমাদের সকলের নিকট সবিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন । এই গ্রন্থের সম্পাদনাকর্মের ফলে বাংলা রামায়ণের আলোচনার ক্ষেত্র আরও প্রশস্ত হইয়াছে বলা চলে । এই গ্রন্থেব 'আদিকাণ্ড' এবং 'সুন্দর কাণ্ড'টি অনুপম । তথাপি আমাদেব সম্পাদিত পুথিসমূহের সঙ্গে এই গ্রন্থটির এবং ভূমিকায় সম্পাদিকার কিছু মন্তব্যের সঙ্গে আমাদের মতের পার্থক্য রহিয়াছে । এইহেতু এইরূপ প্রভেদগুলি সম্পর্কে সামান্য আলোচনা আবশ্যক । প্রথমে বহিরাঙ্গিক প্রভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা হইল, যথা —

(ক) আমাদের সম্পাদিত পালার গুরুত্ব :-

প্রথমতঃ মুদ্রিত গ্রন্থটি ১২০৮ সালে লিপিকৃত একটি পুথির নকল । কবিচন্দ্রের রামায়ণের কাণ্ডাকাবে গ্রথিত আর একখানা সম্পূর্ণ পুথির কিংবা আংশিকভাবে খণ্ডিত দ্বিতীয় আব একখানা পুথির কথাও আমাদের জানা নাই । অতএব পরবর্তীকালে অনুলিখিত এই পুথিটি যে বিশেষভাবে সুবিন্যস্ত হইয়াছিল তাহা কবিচন্দ্রের অন্যান্য (রামায়ণের পালার) পুথিগুলির সঙ্গে তুলনা করিলে স্পষ্টতঃ ধরা পড়ে । আমাদের সম্পাদিত অধিকাংশ আদর্শ পাঠের পুথির লিপিকাল এই ১২০৮ সালে লিপিকৃত পুথিটির পূর্ববর্তী এবং চারিটি পালা ইহার প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে অনুলিখিত ; যেমন — 'রঘুনাথের বনবাস' পালা ১১৩২ সালে (সা.চি. ২৫০নং) লিপিকৃত, ইহা মল্লসন বলিয়া মনে হয় না কারণ এই

পালার অপর পুঁথিটি (ক.বি. ৩৯নং) ১০৫০ সনে (মল্লসন) অর্থাৎ ১১৫১ বঙ্গাব্দে লিপিকৃত হয়। এই দুইটি পুথির মধ্যে পাঠভেদ নিতান্ত সামান্য। এই পালার ১২০০ সালের অধিকাংশ পুথিতে অত্যধিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আমাদের সম্পাদিত 'অঙ্গদ রায়বাব' পালা ১০৫৯ সন অর্থাৎ ১১৬০ সালে, 'রাবণ কুম্ভকর্ণ সংবাদ' পালা ১০৬১ সন অর্থাৎ ১১৬২ সালে এবং 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' পালা ১১৩৮ সালে (মল্লসন বলিয়া মনে হয় না) লিপিকৃত হয়। আর কয়েকটি পালা মুদ্রিত গ্রন্থ অপেক্ষা খুব প্রাচীন না হইলেও পূর্ববর্তী বলিয়া এইস্থলে উল্লেখ করা চলে। উহাদের মধ্যে 'হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান' ১০৮৭ সন অর্থাৎ ১১৮৮ সালে, 'সীতা হরণ' পালা ১১৯৭ সালে এবং 'রঘুনাথের দেশাগমন' পালা ১১৯৬ সালে লিপিকৃত হয়।[১৮] অতএব ২ / ৪ টি পালা ব্যতীত আমাদের নির্বাচিত আদর্শ পাঠের পুথিগুলি মুদ্রিত গ্রন্থেব সময়ের পূর্ববর্তী। পূর্ববর্তীকালে লিপিকৃত এই পুথিসমূহের কাব্যগত সৌন্দর্য আমাদের রসচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করায় এই পুথিগুলিই কবিচন্দ্রের রচনার প্রকৃত রস উপলব্ধির পক্ষে সহায়ক হইবে বলিয়া এত গুরুত্বপূর্ণ মনে হইয়াছে। শুধু কাব্যরসেই নয় কাহিনীর বিস্তারেও পালাগুলি সমান গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের সম্পাদিত 'রঘুনাথেব বনবাস' পালার উল্লিখিত পুথি দুইটির পাঠ, মুদ্রিত গ্রন্থের অযোধ্যাকাণ্ড অপেক্ষা সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। উহার কাব্যরস উপলব্ধির জন্য এই অধ্যায়ের শেষে উভয় সম্পাদিত অংশ হইতে উদ্ধৃতি সহযোগে উভয়ের সামান্য পার্থক্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এই কাব্যগত সৌন্দর্য কেবল এই একটি পালাতেই নহে বরং আমাদের সম্পাদিত সকল পালাতেই বর্তমান।

(খ) মুদ্রিত গ্রন্থে প্রক্ষেপ :-

দ্বিতীয় বিষয় মুদ্রিত বিষ্ণুপুরী রামায়ণেব গ্রন্থনেব বিন্যাস কলা। অধিকাংশ পুথিতে লিপিকরের ঔদাসীন্য ও অবহেলা যেমন নজবে পড়ে মুদ্রিত এই গ্রন্থটিতে তাহা পাওয়া যায় না। গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ইহা যে, কোনও এক কুশলী ও বিচক্ষণ লিপিকবেব দ্বারা অনুলিখিত হইয়াছিল তাহা অতি সহজে ধবা পড়ে। লিপিকরের নকলনবিশীর গুণেই কাব্যটি একদিকে যেমন হইয়া উঠিয়াছে সমৃদ্ধ, অপবদিকে তেমনি ঘটিয়াছে দ্বিজ লক্ষ্মণ কবিচন্দ্রের রচনার অনুপ্রবেশ। কৃত্তিবাসের কাব্যের মতই কবিচন্দ্রের এই পুথিটিও প্রক্ষিপ্ত অংশের বাহুল্য হইতে মুক্ত নহে। এই গ্রন্থে 'শিববামের যুদ্ধ' অংশটি সম্পূর্ণই দ্বিজ লক্ষ্মণ কবিচন্দ্রের রচনা। কোনও বিচ্ছিন্ন পালাব সমষ্টি না হইয়াও সম্পূর্ণভাবে লিখিত এবং কবিচন্দ্রের গ্রাম পানুয়া হইতে প্রাপ্ত এই পুঁথিটিব মধ্যেও দ্বিজ লক্ষ্মণ কবিচন্দ্রের খ্যাতি আত্মসাৎ করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

মুদ্রিত গ্রন্থের শিবরামের যুদ্ধ অংশের সঙ্গে এই পুথিটির পূর্বে লিপিকৃত দ্বিজ লক্ষ্মণের একটি 'শিবরামের যুদ্ধ' পালার (ক.বি. ২৮৪ নং, লিপিকাল ১১০৫ সন) ভণিতাসমূহ পাশাপাশি উপস্থাপিত করিলে এই বিষয়টি পরিষ্কার হইয়া উঠিবে ; যথা -

দ্বিজ লক্ষ্মণের 'শিবরামের যুদ্ধ' পালা (ক.বি. ২৮৪ নং)	মুদ্রিত গ্রন্থের শিবরামের যুদ্ধ (১৩৮৬ বঙ্গাব্দ)
১। এতভাবি ভগবান প্রবেশিলা বনে । রচিল অদ্ভুত কথা শ্রীযুত লক্ষ্মণে ।। পু.পৃ. ২	এতভাবি ভগবান প্রবেশিলা বনে । অদ্ভুত আশ্চর্য কথা কবিচন্দ্র ভণে ।। পৃ. ৫১
২। কুপিল বানর বাজিল সমর দ্বিজ শ্রীলক্ষ্মণে ভণে ।। পু.পৃ.৩ক	কুপিল বানর বাজিল সমর দ্বিজ কবিচন্দ্র ভণে ।। পৃ. ৫২
৩। কামগতি উপনী(তি) আপন উদ্যানে । বশিষ্ঠের মত বলেন শ্রীযুত লক্ষ্মণে ।। পু.পৃ.৫	কামগতি উপনীতি আপন উদ্যানে । বশিষ্ঠের মত বলি কবিচন্দ্র ভণে ।। পৃ. ৫৪
৪। শ্রীযুত লক্ষ্মণে গায় অপূর্ব কথন । সর্ব পাপ মুক্ত হয় জে করে শ্রবণ ।। পু.পৃ. ৭-৮ক	দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় অপূর্ব কথন । সর্ব পাপে মুক্ত হয় যে করে শ্রবণ ।। পৃ. ৫৭
৫। আদ্য উপান্তক যত কহিলা পার্বতী। শ্রীযুত লক্ষ্মণ গায় লক্ষ্মণ চলে শীঘ্রগতি ।। পু.পৃ.৮	আদ্য উপান্ত যত বলেন ভগবতী । দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় চলিলা শীঘ্রগতি ।। পৃ. ৫৮
৬। শ্রীযুত লক্ষ্মণ দ্বিজ আদেশ পাইয়া নিজ কোনগতি হবেক আমার ।। পু.পৃ. ৯ক	শ্রীযুৎ কবিচন্দ্র দ্বিজ আদেশ পাইয়া নিজ কোনগতি হবেক আমার ।। পৃ. ৫৮
৭। দ্বিজ শ্রীলক্ষ্মণ করিলা বর্ণন কারণ রামকে জানি পু.পৃ. ৯	কবিচন্দ্র কন করিল বর্ণন কেবল রামকে জানি ।। পৃ. ৫৯
৮। শ্রীযুৎ লক্ষ্মণ গান অপূর্ব কথন । শুনিলে অধর্ম পাপ বিমোচন ।। পু.পৃ. ১০	সুগ্রীবের কথা শুন্যা হনূমান যায় । বাল্মীকি বন্দিয়া দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ।। পৃ. ৬০

উপরে বর্ণিত এই ভণিতাসমূহ কেবল উদাহরণ হিসাবে প্রদত্ত হইল। দ্বিজ লক্ষ্মণের যে কোনও 'শিবরামের যুদ্ধ' পালার সঙ্গে মুদ্রিত গ্রন্থের এই শিবরামের যুদ্ধ অংশ আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, দ্বিজ লক্ষ্মণের ঐ পালাটি অবিকৃতভাবে সম্পূর্ণই এই গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে। ক.বি. ২৮৪ নং পুথিটি দ্বিজ লক্ষ্মণের 'শিবরামের যুদ্ধ' পালার অন্যান্য পুথির মধ্যে প্রাচীনতম (১১০৫ সন), এইহেতু ঐ পুথিটি হইতেই উদ্ধৃতি সহযোগে উভয়ের পার্থক্য দেখান হইল। মুদ্রিত গ্রন্থের সর্বশেষ ভণিতার ছত্র দুইটি কেবলমাত্র পরিবর্তিত আকারে পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন আর কোনও ছত্রে বিশেষ পরিবর্তন নজরে পড়ে না। এই গ্রন্থের লঙ্কাকাণ্ডে মহীর ছলনা এবং রঘুনাথের দেশাগমনের পর লক্ষ্মণের হাসির কারণ বর্ণনায় দ্বিজ লক্ষ্মণের রচনার সঙ্গে (ক.বি. ১৮৮ এবং ক.বি. ৩৬২৭) কেবল ভাবগত মিল পাওয়া যায়।

(গ) **পালা শব্দটি সম্পর্কে অভিমত :-**

তৃতীয়তঃ মুদ্রিত বিষ্ণুপুরী রামাযণের (১৩৮৬ সাল) ভূমিকায় সম্পাদিকা "পালা কথাটি সন্দেহজনক", বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (ভূমিকা, পৃ. XIV)। কিন্তু ঐ কথার পূর্বেই তিনি পালা সম্পর্কে দুইটি ছত্র উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা :-

"তিন শয় ষাটি পালা আনন্দিত মনে।
কবিচন্দ্র চক্রবর্তী করিল রচনে ॥" (প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃ. XIV)

কোনও একটি পুথি হইতে প্রাপ্ত ছত্র দুইটিকে তিনি স্বীকার না করিলেও উহা আমাদের আলোচনাকে সমর্থন করে। আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, কবিচন্দ্রের সমস্ত রচনাই পালা। একমাত্র মহাভারতের কয়েকটি পুথিতে পর্ব-বিভাগ দেখা যায়। কবিচন্দ্রের 'শিবমঙ্গল', 'অনাদিমঙ্গল', 'রামায়ণ', 'ভাগবতামৃত-শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গল' এবং মহাভারতের অধিকাংশ পুথিই পালাকারে রচিত। আমরা যতদূর জানি, পালাগানের দ্বারাই কবিচন্দ্রের এই কাব্যসমূহ এতকাল জনসমাজে প্রচলিত ছিল। কাজেই 'পালা' কথাটিকে তিনি অস্বীকাব কবিলেও আমরা কবিচন্দ্রের শত শত পালাকারে লিখিত পুথিকে কোনও মতেই অস্বীকার কবিতে পারি না।

(ঘ) **মুদ্রিত গ্রন্থে শঙ্কর নামের উল্লেখ :-**

চতুর্থতঃ মুদ্রিত বিষ্ণুপুরী রামায়ণের কয়েকটি ভণিতায় 'শঙ্কর' নামের উল্লেখ আছে, যাহা আমাদের দৃষ্ট পুথিগুলিতে পাওযা যায় না। কবিচন্দ্রেব নাম শঙ্কব অতএব তাঁহার পুথিতে উক্ত নাম থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু দেখা যায়, এই সকল বহুল প্রচারিত

পুথিতে কবিচন্দ্র ভণিতাতেই পুথি অনুলিখিত হইয়াছে । তাঁহার পরিচয়-জ্ঞাপক অংশ পাওয়া গিয়াছে 'রঘুনাথের বনবাস' পালায় :-

চক্রবর্তী মুনিরাম অশেষ গুণের ধাম
তস্য সুত কবিচন্দ্র গায় । (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ২৬)

'নরমেধ যজ্ঞ', 'হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান' এবং 'গয়াশ্রাদ্ধ' পালায় পাওয়া যায় 'কবিচন্দ্র চক্রবর্তী' ভণিতা ।

আর মুদ্রিত গ্রন্থের বহু ভণিতাতে কবিচন্দ্রের সঙ্গে 'শঙ্কর' নামের উল্লেখও পাওয়া যায় ; যথা :-

"কবিচন্দ্রের বসুদেব প্রথম গায়ন ।
শঙ্কব রচিলা পোথা গান রামায়ণ"।। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১)

আমাদের সম্পাদিত পুথিসমূহের সঙ্গে মুদ্রিত গ্রন্থের এই অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় ।

রচনাগত প্রভেদ :-

মুদ্রিত গ্রন্থ এবং আমাদের সম্পাদিত পুথি সমূহ :

(ক) **তিনটি অতিরিক্ত পালা (আমাদের সম্পাদিত)**

প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, দুই সম্পাদিত পুথির পাঠেই প্রচুব প্রভেদ বর্তমান । মুদ্রিত গ্রন্থটি সম্পর্কে জানা যায় যে, উহা একখানা অখণ্ডিত পুথি । এইহেতু বহু এমন অংশ যাহা উহাতে আছে, তাহা আমরা পালাকারে পাই নাই । আবাব আমরা পালাকারে এমন কয়েকটি পুথি পাইয়াছি যাহা মুদ্রিত গ্রন্থে স্থান লাভ করে নাই । উহাদেব মধ্যে নাম করা যাইতে পারে (এক) 'সূর্যবংশকথা' এবং 'নরমেধ যজ্ঞ' পালা, (দুই) 'হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান' এবং (তিন) 'গয়াশ্রাদ্ধ' পালা । এই তিনটি বিষয় মুদ্রিত গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই । নানা অনুসন্ধানের ফলে 'কবিচন্দ্র চক্রবর্তী' ভণিতাযুক্ত এই পালার পুথিগুলিকে কবিচন্দ্রের রচনা হইতে এখন আর বিযুক্ত করা চলে না ।

(খ) **মুদ্রিতগ্রন্থে অতিরিক্ত অংশ :-**

মুদ্রিতগ্রন্থে স্থান লাভ কবিয়াছে অথচ আমরা বিভিন্ন গ্রন্থালয়ের পুথিশালায় এবং কবির স্বগ্রাম পানুয়ায় খোঁজ করিয়াও যে সকল বিষয় লাভ করি নাই তাহা হইল, আদিকাণ্ডের অন্তর্গত কিছু কাহিনী এবং তরণীসেনের যুদ্ধ, মহীরাবণ ও ইন্দ্রজিৎ বধ পালা ।

(ঘ) **উভয় সম্পাদনার তিন স্তর :-**

এইখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, উভয় সম্পাদনাব পুথিতে যে মিল পাওয়া যায়,

তাহা কোথাও কাহিনীগত, কোথাও ভাবগত এবং কোথায়ও ছত্রগত মিল। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উভয় পাঠে প্রতি ছত্রে ছত্রে মিল পাওয়া যায় না। মুদ্রিত গ্রন্থ অপেক্ষা আমাদের আদর্শ পাঠের পুথিসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিস্তারিত আকারে পাওয়া যায়।

নিম্নে উভয় সম্পাদিত পাঠের বিষয়বস্তুগত মিল ও পার্থক্য নির্ণীত হইল।

আদিকাণ্ড

এই অংশে মুদ্রিত গ্রন্থে যে সকল বিষয় পাওয়া যায় সেই বিষয়ের একখানা পুথিও আমরা পাই নাই। আবার আমাদের প্রাপ্ত 'সূর্যবংশকথা' বা 'নরমেধ যজ্ঞ' এবং 'হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান' পালা মুদ্রিত গ্রন্থে স্থান লাভ করে নাই। অতএব এই ক্ষেত্রে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

অযোধ্যাকাণ্ড

মুদ্রিত গ্রন্থের অযোধ্যাকাণ্ডের সঙ্গে আমাদের 'রঘুনাথের বনবাস' ও 'ভরতের পিতৃশ্রাদ্ধ' পালায় মিল থাকিলেও প্রতি ছত্রে ছত্রে মিল পাওয়া যায় না। এই অংশে উভয় পাঠে কাহিনীগত এবং ভাবগত মিল বর্তমান। উভয়ের মধ্যে ছত্রগত মিল পাওয়া যায় না। মুদ্রিত গ্রন্থে কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা পর্যন্ত কাহিনী অতিমাত্রায় সংক্ষিপ্ত। সে স্থলে 'রঘুনাথের বনবাস' পালা বেশ বিস্তৃত। ইহাতে দশরথ কর্তৃক রামকে রাজত্বদানের ইচ্ছা, রামচন্দ্রের রাজত্বলাভের আশায় রাণী কৌশল্যার প্রার্থনা, রামচন্দ্রের অভিষেক কার্যে বাধাদানের উদ্দেশ্যে মন্থরার কুমন্ত্রণা ও কৈকেয়ীর মতিভেদ, রাজপুরীর উৎসব-সজ্জা এবং রামচন্দ্র কর্তৃক মাতাকে রাজ-আজ্ঞা জ্ঞাপন প্রভৃতি অতিরিক্ত অংশ আছে, যাহা মুদ্রিত গ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই।

মুদ্রিত গ্রন্থে মন্থরার মন্ত্রণা হইতে কাহিনী আরম্ভ। তাহার পর কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা, বিমাতার মুখে পিতার আদেশ শ্রবণ, লক্ষ্মণের বিক্রম, কৌশল্যার বিলাপ, সীতা ও লক্ষ্মণসহ রামের বনগমন অংশ এক হইলেও এবং উভয়ের মধ্যে কাহিনীগত ও ভাবগত মিল থাকিলেও প্রতি ছত্রে ছত্রে মিল পাওয়া যায় না। মুদ্রিত গ্রন্থে বনবাসের প্রাক্কালে মন্থরার কার্যকলাপে একটু অতিরঞ্জন আছে। কৈকেয়ীর পরিবর্তে সীতাব কুণ্ডল ধরিয়া মন্থরাই টানাটানি করিতে থাকে। বনগমনেব পর মুনিদিগের আশ্রমে রাত্রিবাস, রত্নাকর দস্যুর কথা এবং অন্ধক মুনির পুত্রবধ কাহিনী উভয় কাব্যে প্রায় এক।

মুদ্রিত গ্রন্থে ভরতের দেশাগমন থাকিলেও আমাদের 'ভরতের পিতৃশ্রাদ্ধ' পালাটি কাহিনীর বিস্তারে এবং কাব্যগত সৌন্দর্য সৃষ্টিতে উল্লেখনীয়। ভরতের শ্রাদ্ধক্রিয়া কয়েক ছত্রে সমাপ্ত। তারপর রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে ভবতের বনগমন, রামচন্দ্র ও ভরতের মিলন, ভরতের

দেশে প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি বিষয় মুদ্রিত গ্রন্থের সঙ্গে বিষযগত মিল ভিন্ন ছত্রগত মিল দৃষ্ট হয় না। কৈকেয়ী কর্তৃক রামচন্দ্রের অবতারত্ব স্বীকার এবং স্বীয় কৃতকর্মের অপরাধহেতু ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা এই পালাটি সমাপ্ত। এই অতিরিক্ত অংশ মুদ্রিত গ্রন্থে প্রদত্ত হয় নাই। এই কবিত্বময় অংশটি দ্বারা 'ভরতের পিতৃশ্রাদ্ধ' পালাটির গুণগতমান যথেষ্ট বর্ধিত হইয়াছে। আমাদের সম্পাদনায় 'গয়াশ্রাদ্ধ' পালা নামে একটি অতিরিক্ত পালা এই স্থলে প্রদত্ত হইয়াছে, যাহা মুদ্রিত গ্রন্থটিতে পাওয়া যায় না।

অরণ্যকাণ্ড

মুদ্রিত গ্রন্থের অরণ্য কাণ্ড এবং আমাদের 'সীতাহরণ' পালায় মিল কেবল কাহিনীগত। জটায়ু পক্ষীর ও মাছরাঙ্গার কাহিনী উভয়েব মধ্যে পাওয়া গেলেও মুদ্রিত গ্রন্থে মণ্ডুকেব কাহিনী পাওয়া যায়, যাহা 'সীতাহরণ' পালার পুথিতে পাওয়া যায় না। তাহার পরিবর্তে এই পালার পুথিসমূহে অঞ্জনা কর্তৃক হনূমানকে সীতা উদ্ধারের নিমিত্ত সম্মতি দান প্রসঙ্গ পাওয়া যায়, তাহা আবার মুদ্রিত গ্রন্থে নাই। উভয়ের মধ্যে ছত্রগত মিল নাই বলিলেই চলে। মুদ্রিত গ্রন্থে সীতা কর্তৃক লক্ষ্মণকে চারিটি ছত্রে ভর্ৎসনা প্রসঙ্গ আছে, যাহা আমাদের 'সীতা হরণ' পালায় অনুপস্থিত।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

প্রথমে বলা হইয়াছে যে, মুদ্রিত বিষ্ণুপুরী রামায়ণের 'শিবরামেব যুদ্ধ' অংশ দ্বিজ লক্ষ্মণের (কবিচন্দ্রের) রচনা। এইহেতু আমাদের পালার সঙ্গে এই স্থলে মুদ্রিত গ্রন্থটির তুলনা করা অপ্রাসঙ্গিক।

আমাদের 'রামসুগ্রীব মিলন' পালার সঙ্গে মুদ্রিত গ্রন্থের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের বহু স্থলে ছত্রগত মিল বর্তমান। মুদ্রিত গ্রন্থের হনূমানের দৌত্য, রাম-সুগ্রীবের মিত্রতা (পৃ.৬১-৬২) এবং বালীবধ ও তারার শোক (পৃ. ৬৭-৬৯) অংশের সঙ্গে উভয়ের মধ্যে ছত্রগত মিল দেখা যায়।

সুগ্রীবের বাক্যে রামের প্রতীক্ষা এবং সুগ্রীবের চর প্রেরণ এই দুই বিষয়ের উল্লেখে মুদ্রিত গ্রন্থ সমাপ্ত। ইহার পর আমাদের পালায় আরও অতিরিক্ত কাহিনী পাওয়া যায়। হনূমান কর্তৃক বিন্ধ্য পর্বতের গুহামধ্যে প্রভাবতী নামক এক যোগিনীর সাক্ষাৎ লাভ ও মুক্তি প্রসঙ্গ এই পালায় 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' হইতে গৃহীত হইয়াছে, যাহা মুদ্রিত গ্রন্থে নাই। এই পালার পুথিটি খণ্ডিত হওয়ায় কাহিনীর শেষ পাওয়া যায় নাই।

সুন্দরাকাণ্ড

মুদ্রিত গ্রন্থের এই কাণ্ডটিকে ক্রটিহীন বলা চলে, তবে আমাদের 'সীতার উদ্দেশ' পালা একেবারেই লৌকিক বিষয় । মুদ্রিত গ্রন্থে বিভীষণের প্রতিজ্ঞা, জাঙ্গাল ভাঙ্গা, জাঙ্গালে শিবলিঙ্গস্থাপন, শিবের প্রতি রাবণের অনুযোগ, সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালীর সাহায্য এবং হনূমানের কোপ এই অতিরিক্ত অংশগুলি আমাদের প্রাপ্ত পালায় পাওয়া যায় নাই । পরিবর্তে হনূমানের আম্রভক্ষণ, লঙ্কাদাহন ও লেজের অগ্নিতে হনূমানের মুখপোড়া হওয়ার কাহিনী বিস্তৃতভাবে এই পালায় স্থান লাভ করিয়াছে ।

লঙ্কাকাণ্ড

এই কাণ্ডেব অন্তর্গত আমাদের প্রাপ্ত পালাসমূহ (রাবণবধ ভিন্ন) মুদ্রিত গ্রন্থ অপেক্ষা আকাবে বড । 'অঙ্গদ রায়বার' ব্যতীত 'রাবণ কুম্ভকর্ণ সংবাদ', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' এবং 'সীতার পরীক্ষা' পালার সঙ্গে মুদ্রিত গ্রন্থের বিষয়গত মিল পাওয়া গেলেও ক্বচিৎ ছত্রগত মিলের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় । মুদ্রিত গ্রন্থে রামচন্দ্রকে ইন্দ্রের বরদান, রামসীতার পুষ্পবাসর, হনূমানের দর্পচূর্ণ এবং লক্ষ্মণের কৃচ্ছ্রসাধন এই অতিরিক্ত বিষয়গুলি আছে যাহার একটিও আমাদের প্রাপ্ত পুথিতে পাওয়া যায় নাই । অন্যদিকে 'রঘুনাথের দেশাগমন' পালাটিতে কৃষাণের কাহিনী এবং হনূমান ও অঞ্জনার প্রসঙ্গ পাওয়া যায় যাহা মুদ্রিত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না । মুদ্রিত গ্রন্থে রামলক্ষ্মণের নাগপাশ, ইন্দ্রজিৎ বীরবাহু এবং সুবাহুর যুদ্ধ, তরণীসেন বধ, অরণির উপাখ্যান, মহীরাবণ উপাখ্যান এবং রামচন্দ্রের দেবীস্তব পাওয়া যায়, যাহার একটিও আমরা পাই নাই ।

মুদ্রিত গ্রন্থে উত্তরাকাণ্ড প্রদত্ত হয় নাই । আমরাও উক্ত বিষয়ে কোনও পালার সন্ধান পাই নাই ।

(ঘ) **আমাদের সম্পাদিত পালার কাব্যগুণ :-**

এখন উভয় সম্পাদিত পুথিব কাব্যগুণ আলোচনা করা যাইতে পারে । মুদ্রিত গ্রন্থের অযোধ্যাকাণ্ডের সঙ্গে আমাদের সম্পাদিত 'রঘুনাথের বনবাস' পালাটির সাদৃশ্য অধিক, এইহেতু এই অংশ হইতে উভয়ের কয়েকটি তুলনামূলক অংশ উদ্ধৃত করিয়া উভয়ের পার্থক্য বিচাব করা যাইতে পারে ।

মুদ্রিত গ্রন্থে দশরথের নিকট কৈকেয়ীর বর প্রার্থনার ভাষা এইরূপ :-

(১ম উদাহরণ) পূর্বে তুমি বরদ্বয় দিয়াছ আপনে ।
চোদ্দ বৎসরের তরে রাম জাকু বনে ।।

অযোধ্যায় ভরথে কর অভিষিক্ত ।
রাম জটা বাকল পর‍্যা পুরী হোকু ত্যক্ত ।।
কৈকইয়ের কথা শুনা শোকে রাজা আর্ত।
রাম রাম বল্যা কান্দে নাই জ্ঞানমাত্র ।। (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮)

মুদ্রিত গ্রন্থের এই অংশের অনুরূপ আমাদের সম্পাদিত পুথি হইতে সামান্য অংশ উদ্ধৃত হইল ; যথা :-

বর দিয়া মহারাজা পুর মোর আশ ।
অবিলম্বে রঘুনাথে দেহ বনবাস ।।
শিরে জটা মোর কাছে বাকল পরুক ।
আভরণ রঘুনাথ সকল ছাড়ুক ।।
রাম বনে যাউক চৌদ্দ বৎসরের তরে ।
না গেলে তেজিব প্রাণ কহিনু তোমারে ।।
বনবাসে রামচন্দ্র না জায যাবৎ ।
ভূমেতে পড়িয়া আমি থাকিব তাবৎ ।।
এত বাক্য শুনে যদি কৈকেয়ীর মুখে ।
বিষাদের শেল বাজে ভূপতির বুকে ।।
অবনী লোটায়্যা রাজা কান্দে অবিরত ।
বৃক্ষ যেন পীড়া পায় হয়্যা বজ্রাহত ।।

(রঘুনাথের বনবাস, পু.পৃ. ৬ক)

মুদ্রিত অংশের সঙ্গে 'রঘুনাথের বনবাস' পালার উক্ত উদ্ধৃতিটি তুলনা করিলে দেখা যায়, এই পালার ভাষা যেমন সাবলীল রচনায় অলঙ্কারের প্রভাবও তেমন স্পষ্ট । 'বিষাদের শেল বাজে ভূপতির বুকে' এবং 'বৃক্ষ যেন পীড়া পায় হয়্যা বজ্রাহত', — এই দুই অলঙ্কার প্রয়োগ ইহার কাব্যগত সৌন্দর্য যেমন বর্ধিত করিয়াছে, মুদ্রিত অংশে তেমন নহে । এইরূপ উদাহরণ এই পালাটির সর্বত্রই ফুটিয়া উঠিয়াছে ।

মুদ্রিত গ্রন্থে ভাষা মাঝে মাঝে বেশ আড়ষ্ট কিন্তু আমাদের সম্পাদিত পুথিতে তাহা পাওয়া যায় না, যথা :-

(২য় উদাহরণ) রঘুনাথের বলে রাজা হবেক ভরত ভাই ।
ধনধরা প্রজা দিব ভরথের ঠাঁই ।।
লোক দিয়া সত্বরে ভরথে আনাঅ সতা।
রাজা কর‍্যা ভাই সঙ্গে কয়্যা যাব কথা ।।

বৃদ্ধ জনক জননী ভরথে সমর্পিব।
ভাগ্য বড় ভরথ রাজা লোচনে দেখিব॥ (মুদ্রিত গ্রন্থ, পৃ. ১৯)

আমাদের সম্পাদিত পালায় পাওয়া যায় ---

কৈকেয়ীরে কহে রাম সাধ মা আমার কাম
ভরতে ডাকায়্যা আন সতা
হিত পথ নীত কয়্যা ভরতেরে রাজ্য দিয়া
বনবাসের কয়্যা যাব কথা ॥
পিতা মাতা ধন ধবা সমর্পিব নিজ দারা
হাতে হাতে প্রাণের লক্ষ্মণে ।
চৌদ্দ বৎসব বনে জাব আর দেখা কোথা পাব
আসি বা না আসি বাঁচ্যা প্রাণে॥

(রঘুনাথের বনবাস, পু.পৃ. ৮-৯ক)

এই দুই উদ্ধৃতি তুলনা কবিলে উপরের কথার যথার্থতা স্পষ্ট হয় । মুদ্রিত গ্রন্থে রামচন্দ্রের উক্তিতে একটা ইচ্ছা ব্যক্ত হইতে দেখা যায় মাত্র, আর 'রঘুনাথের বনবাস' পালার উদ্ধৃতিটিতে অনুজের প্রতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হৃদয়ের মমত্ব ও প্রাণের ব্যাকুলতা প্রকাশিত হইয়াছে, সেইসঙ্গে যুক্ত হইয়াছে আত্মজিজ্ঞাসা ।

বনগমনের পূর্বে রামচন্দ্র সীতাকে প্রবোধ সহকারে অযোধ্যায় শ্বশুর শাশুড়ীর সেবাচর্যা করিয়া চৌদ্দ বৎসর অতিবাহিত করিতে উপদেশ দিলে সীতা তাহা অস্বীকার করিয়া রামচন্দ্রের সঙ্গে বনে যাইতে প্রস্তুত হন । এই অংশের পাঠ এইরূপ :—

(৩য় উদাহরণ) রাম বলে বনবাসে যাইতে নারিবে ।
বনের যন্ত্রণা নানা বহু কষ্ট পাবে ॥
এ অঙ্গে কেমন কর‍্যা বাকল পরিবে ।
তিক্ত কটু ফলামূল কেমনে খাইবে ॥
তৃণপত্রের শয্যায় শুইবে কেমনে ।
চোদ্দ বৎসর যে থাকিতে হবে বনে॥
জানকী বলেন প্রভু তুমি নাথ যার ।
কিবা ঘরে বনচরে দুঃখ নাই তার ॥
তোমাছাড়া একদণ্ড আমি নাই জিব ।
দেখিতে না পাবে আর পরাণে মরিব॥
জীবনে মরণে যুবতীর পতি গতি।

ছাড়্যা গেলে পাছু যাব তোমার সঙ্গতি ॥
সীতার বুঝিয়া ভাব দিলা অনুমতি ।
লক্ষ্মণের বাহু ধর্যা কহে রঘুপতি ॥ (মুদ্রিত গ্রন্থ, পৃ. ২১)

আমাদের সম্পাদিত পাঠে এই অংশটি আরও বিস্তৃত —

রাম কহে বাপের আজ্ঞাতে বন জাই ।
কুলের নন্দিনী তুমি থাক এই ঠাঞি ॥
বনের অনেক দোষ চলিতে নারিবে ।
দুর্গম দারুণ দূর বড় কষ্ট পাবে ॥
কন্টক কন্দর কুশ পর্বত পাষাণ।
শুনিয়া সিংহের ধ্বনি হারাবে পরাণ ॥
ব্যাঘ্র ভল্লুক শিবা বনে সর্প কত ।
সরভ মর্কট গণ্ডা বন্যজন্তু যত ॥
নদনদী দুরবার দুর্গম সরণি ।
বিষম বনের পথ নাহিক তরণী ॥
ফলমূল কটুতিক্ত বনের আহার ।
অপর ভক্ষের তাতে নাহিক সঞ্চার ॥
তৃণপত্রের শয্যায় শুইতে হবেক ।
নিরাশ্রয়ে ভ্রমিতে বড় হব ঠেক ॥
বল্কল অজিন তুমি কেমনে পরিবে ।
বনের যাতনা নানা যাইতে নারিবে ॥
চৌদ্দ বৎসর বনে বসত আমার ।
উপবাস কখন কখন নিরাহার ॥
নানামত রামচন্দ্র কহিলেন তাঁরে।
জানকী কহেন প্রভু না ছাড়িহ মোরে ॥
তোমা সঙ্গে জাব আমি তুমি নাথ যার ।
কোন ভয় নাঞি মোর কিবা দুঃখ তার ॥
তিক্ত কটু ফল তোমার ভক্ষ অবশেষ ।
অমৃত সমান মোরে না হবেক ক্লেশ ॥
বল্কল অজিন মোরে পট্টের বসন ।

তৃণ পত্র শয্যা মোর পালঙ্ক যেমন ।।
তোমা ছাড়া একদণ্ড রহিতে নারিব।
চৌদ্দ বৎসর নাথ কেমনে গোঙাব ।।
সীতার বুঝিয়া মন প্রভু দিল সায় ।
রামলীলা রামায়ণে কবিচন্দ্র গায় ।।

(রঘুনাথের বনবাস, পু.পৃ. ১১-১২ক)

মুদ্রিত গ্রন্থে রামচন্দ্রের উক্তি যেমন স্বল্প সীতার প্রত্যুক্তিও তেমন দুই চারি ছত্রে সমাপ্ত । আর 'রঘুনাথের বনবাস' পালায় রামচন্দ্রের বর্ণনা দীর্ঘ হওয়ায় তাহাতে অরণ্যের রূপ বেশ ভয়াল হইয়া উঠিয়াছে । যে কোনও নারী উহা শ্রবণ করিলে সেখানে গমন করিতে ভীত ও শঙ্কিত হইয়া পড়িবে । কিন্তু সীতা কোমলা হইলেও সাধারণ নারী নহেন তিনি অন্তরে জানেন স্বয়ং রামচন্দ্র যাঁহার স্বামী তাঁহার কোথাও ভয় নাই । সীতার নিকট তখন তিক্ত ফলের স্বাদ 'অমৃত সমান', 'বল্কল অজিন' তাঁহার নিকট 'পট্টের বসন' এবং 'তৃণপত্র শয্যা' তাই দুঃখহীন 'পালঙ্ক যেমন' । 'রঘুনাথের বনবাস' পালার এইরূপ রসাত্মক বর্ণনা যেমন শ্রুতি-সুখকর তেমনই হৃদয়গ্রাহী । অন্যান্য পালাগুলিও এইরূপ বিস্তারিত এবং কবিত্বময় ।

পাদটীকা

১। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ (প্রবন্ধ), সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থ সঙ্গমে, ১ম সং ১৩৬৯ । পৃ. ১০৮

২। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত : রামায়ণ, কৃত্তিবাস বিরচিত, সাহিত্য সংসদ, ১ম প্রকাশ ১৩৬৪ সাল । কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, পৃ. ১৫৮

৩। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত পৃ. ৫২২

৪। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত পৃ. ৩০৬

৫। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত ও অনূদিত : বাল্মীকি রামায়ণ ১৩১১ বঙ্গাব্দ । অযোধ্যা ৮৮ সর্গ, ১৩-১৫ শ্লোঃ । পৃ. ৩৪০

৬। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত : রামায়ণ, কৃত্তিবাস বিরচিত, সাহিত্য সংসদ, ১ম সং, ১৩৬৪ সাল । পৃ. ১১৭

৭। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত অযোধ্যা, পৃ. ৯৮
৮। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত পৃ. ১০২
৯। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত পৃ. ৪২৩
১০। সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড অপরার্ধ, ২য় সং ১৯৬৫, পৃ. ৪০৫
১১। দীনেশচন্দ্র সেন : বৃহৎ বঙ্গ, ২য় খণ্ড, ১৩৪২ সাল। পৃ. ৯৮০
১২। সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড অপরার্ধ, ২য় সং ১৯৬৫, পৃ. ৩৫৮
১৩। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ৩য় খণ্ড, ১ম সং ১৯৬৬। পৃ. ১০৪৭
১৪। দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সং ১৩৫৬ সাল। পৃ. ২৮১
১৫। মল্লভূমে দশ শতকে অনুলিখিত পুথির সনের সঙ্গে ১০১ বৎসর যোগ করিয়া বঙ্গাব্দে পরিণত কবা হইল।

দ্বাদশ অধ্যায়

।।কবিচন্দ্রের 'রামায়ণ' ও বাংলা রামায়ণ।।

মধ্যযুগে বাংলাভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত ও অনূদিত কাব্য বাংলা রামায়ণ। বাংলা রামায়ণের কবিগণের সংখ্যাও অন্যান্য কাব্যের কবিদিগের তুলনায় অধিক। এই রামায়ণের কবিগণ তাঁহাদের কাব্য রচনাকালে কবিগুরু বাল্মীকিকে বন্দনা করিলেও বিভিন্ন রাম-কথার প্রভাবকে গ্রহণ করায় তাঁহারা ব্যাসদেবকেও প্রণতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। কবিচন্দ্রের কাব্যে এইরূপ দৃষ্টান্ত বহু পাওয়া যায়। 'এক রামায়ণ শত সহস্র প্রকার' — অতএব এই বিভিন্ন প্রকার রাম-কথা বঙ্গের সমাজমানসে নানাভাবে পরিশীলিত হইয়া কবির কাব্যে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। বাল্মীকি-রামায়ণের পরেও ব্যাস রচিত মহাভারতের বনপর্বে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের দশম ও একাদশ অধ্যায়ে সংক্ষেপে রাম-কথা প্রচারিত হইয়াছে। জৈমিনি মহাভারত এবং বিভিন্ন পুরাণ ও উপপুরাণে নানাভাবে রামকথার রূপভেদ পাওয়া যায়। আবার আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রচারিত 'অদ্ভুত রামায়ণ' ও 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ'-এ পাওয়া যায় প্রণেতা বাল্মীকির নাম। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রচারিত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অন্তর্গত অধ্যাত্ম রামায়ণে বেদব্যাসের নামই উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থের বিষয় বাল্মীকি কৃত মূল রামায়ণের অনুগত হইলেও উহাদের মধ্যে পার্থক্যও কম নয়। রামায়ণের কাহিনীকে রামভক্তির অত্যুজ্জ্বল আদর্শ দ্বারা অলৌকিক এবং আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া উহাতে নবতর রূপদানের প্রচেষ্টা এই সকল কাব্যে দেখা যায়। রামভক্তিতত্ত্ব প্রচার করাই এই সকল রাম-কথার মূল উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত এই সকল রাম-কথার পাশে আরও কয়েকটি রামায়ণ প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে 'রামোপাখ্যান'টি বাল্মীকি কৃত রামায়ণেরই একটি স্বতন্ত্র ও সংক্ষিপ্তরূপ বলিয়া মনে করা হয়। রাম-কথা কালে কালে বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনে বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত হইতে থাকে। ইহারই ফলস্বরূপ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে রাম অবতাররূপে পরিচিত হইয়া ওঠেন। বৌদ্ধ-রামায়ণ এবং জৈন-রামায়ণে তাহার আভাস পাওয়া যায়। বৌদ্ধদের রামায়ণ 'দশরথ জাতক' ও 'লঙ্কাবতার সূত্র' নামে পরিচিত, আর জৈনদের প্রসিদ্ধ রামায়ণ 'পউম-চরিঅ'। এই সকল রামায়ণের রচনাকাল সম্পর্কে নানা মতভেদ থাকিলেও আমরা এই আলোচনায় বাংলা রামায়ণে ইহাদের প্রভাব কতটা ক্রিয়াশীল হইয়াছিল তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

আমরা কবিচন্দ্রের 'রামায়ণ' আলোচনাকালে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বাল্মীকি-রামায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া 'শ্রীমদ্ভাগবত', 'অধ্যাত্ম রামায়ণ', 'মহানাটক', 'শিব পুরাণ' এবং বিভিন্ন লোককথার প্রভাব তাঁহার কাব্যকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত

করিয়াছে, কিন্তু কোথায়ও 'জৈন-বামায়ণ' কিংবা 'দশরথ জাতক'-এর ছায়াপাত ঘটে নাই। তবে বাংলা রামায়ণ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি দ্বারা উদ্বুদ্ধ কবিগণও কাহিনী রচনার আকর্ষণে কিছু পরিমাণে জৈন-রামায়ণের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাল্মীকি-রামায়ণে আর্য-সংস্কৃতি ও আর্য-মহিমা ঘোষিত হইয়াছে, আর বৌদ্ধ এবং জৈন-রামায়ণে রাবণ ও রাক্ষসবংশকে মহিমান্বিত রূপদানের প্রচেষ্টা দেখা যায়। জৈন-রামায়ণের প্রসিদ্ধ কবিদিগের মধ্যে বিমলসূরী, গুণভদ্র এবং হেমচন্দ্র আচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য। জৈন-রামায়ণের কাহিনী অনুসারে রামচন্দ্রের হারেমে বহু সুন্দরীর মধ্যে সীতা, প্রভাবতী, রতিনিভা এবং শ্রীদামা এই চারিজন স্ত্রীর নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীদামা সীতার প্রতি ঈর্ষাবশতঃ তাঁহাকে রাবণের প্রতিকৃতি অঙ্কন করিতে বলেন। সীতাদেবী তাহাতে জানান যে, তিনি রাবণের পদযুগল দর্শন করিয়াছেন কিন্তু মুখ কখনও দর্শন করেন নাই। তখন সতীনেরা রাবণের ঐ পদযুগল অঙ্কিত করিয়া তাঁহাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে বলিলে সীতাদেবী সপত্নীগণের অনুরোধে ও নির্দেশানুসারে রাবণের পদযুগল অঙ্কিত করিয়া দেন। তাহার পর সপত্নীগণ অতি সঙ্গোপনে রামচন্দ্রকে তাহা দর্শন করাইয়া সীতার প্রতি রামচন্দ্রের মনোভাব পরিবর্তন করিতে সচেষ্ট হন।[১]

বাঙালী রামায়ণকারগণ তাঁহাদের পরমপ্রিয় রামচন্দ্রের চবিত্রের প্রতি এইরূপ কটাক্ষ সহ্য করিতে পারেন নাই। এইহেতু সীতার বনবাসের কারণ কিছুটা পরিবর্তিতরূপে বাংলা রামায়ণে গৃহীত হইয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামচন্দ্রের ভ্রাতৃবধূরাই সীতাকে রাবণের প্রতিকৃতি অঙ্কন করিতে বলেন (উত্তরাকাণ্ড/সীতার বনবাস)। আর কবি চন্দ্রাবতী তাহা কৈকেয়ী-কন্যা এবং মন্থরার মন্ত্র-শিষ্যা কুকুয়ার দ্বারা সংসাধিত কবেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনেব সম্পাদিত গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে, —

"বসিছিল কুকুযা গো শুইল পালঙ্কেতে।
আবার সীতারে কয় গো রাবণ আঁকিতে॥
এড়াতে না পারে সীতা গো পাখার উপর।
আঁকিলেন দশমুণ্ড গো রাজা লঙ্কেশ্বর॥
শ্রমেতে কাতর সীতা গো নিদ্রায় ঢলিল।
কুকুয়া তালের পাখা গো বুকে তুলি দিল"॥[২]

অনেকেই ইংরাজী সাহিত্যে শেক্সপীয়ার রচিত ইয়াগো চরিত্রের সঙ্গে এই কুকুয়া চবিত্রটির তুলনা করিয়া থাকেন। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে বচিত, ইংরাজী সাহিত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কবির পক্ষেও সমসাময়িক সমাজ হইতে গৃহীত অনুরূপ ইয়াগো চরিত্র সৃষ্টি করা যে অসম্ভব নয়, ময়মনসিংহের মহিলাকবি চন্দ্রাবতীর এই কুকুয়া চরিত্রটি তাহাব প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কুকুয়ার উক্তিটি এইরূপ :-

"বিশ্বাস না কর দাদা গো দেখহ আসিয়া ।
তোমার সীতা নিদ্রা যায় গো রাবণ বুকে লইয়া ।।
পরের কথা কানে লইলে গো নিজের সর্বনাশ ।
চন্দ্রাবতী কহে রামের গো বুদ্ধি হইল নাশ"।[৩]

এইরূপে সীতার প্রতি রামের সন্দেহ জাগাইয়া কুকুয়া তাহার অভীপ্সা চরিতার্থ করে । সীতার জন্ম-রহস্য সম্পর্কে চন্দ্রাবতী জৈন-রামায়ণের কিংবা 'অদ্ভুত রামায়ণ'-এর কাহিনী দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন । এই দুই রামায়ণের মতে সীতা মন্দোদরীর কন্যা । আবার রাধামাধব ঘোষের 'বৃহৎ সারাবলী' অবলম্বনে রচিত 'রামলীলা' কাব্যেও (সীতার বনবাস) পাওয়া যায় তিন জায়ের প্ররোচনায় সীতা কর্তৃক রাবণের প্রতিকৃতি অঙ্কনেব কথা ।[৪] বাল্মীকি-রামায়ণে সীতা কর্তৃক রাবণের এইরূপ প্রতিকৃতি অঙ্কনের উল্লেখ নাই ।

জৈন-রামায়ণে লক্ষ্মণের চরিত্রও যথেষ্ট মসীলিপ্ত । উহাতে বনবাসকালে লক্ষ্মণের বিজয়াপুরের রাজা মহীধারার রাজকন্যা বনমালার সঙ্গে পূর্ব পরিচয় প্রসঙ্গ পাওয়া যায় । লক্ষ্মণের আটজন স্ত্রীর নাম বিশাল্য, রূপবতী, বনমালা, কল্যাণ মালিকা, রত্নমালিকা বা রতিমালা, জিতপদ্মা বা গীতপদ্মা, ভায়াবতী বা ভগবতী এবং মনোরমা।[৫]

বাল্মীকি-রামায়ণের পুরুষকারের জীবন্ত প্রতিমূর্তি লক্ষ্মণ চরিত্রটি ইহাতে যথেষ্ট দীপ্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে । অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ভবানীচরণের বা ভবানীনাথের 'লক্ষ্মণ দিগ্‌বিজয়' (সা. ৫৪৬) কাব্যের লক্ষ্মণ চরিত্র অনুরূপ আদর্শে রচিত । ভবানীচরণ লিখিয়াছেন, রাম কর্তৃক আদিষ্ট লক্ষ্মণ ত্রিভুবন বিজয়ে বহির্গত হইলে ইন্দ্রকন্যা চন্দ্রকলাকে এক নির্জন সরোবরে দেখিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন । ঐ সময়ে তিনি ধনুঃশর নিক্ষেপ করিয়া হতচেতন অবস্থায় ভূমিতে বসিয়া পড়েন এবং হনূমানের নিকট যুদ্ধ বিজয়ের প্রতি অনিচ্ছা প্রকাশ করেন । লক্ষ্মণের এইরূপ চিত্তবিক্ষেপের কথা অন্য কোনও রামায়ণে আছে বলিয়া শোনা যায় না ।

জৈন-রামায়ণের ক্ষীণ প্রভাব ব্যতীত বৌদ্ধ প্রভাবিত 'দশরথ জাতক' এবং 'লঙ্কাবতার সূত্র'-এর বিষয় বাংলা রামায়ণে পাওয়া যায় না । এই জাতক কাহিনীর বিষয় অতি সংক্ষিপ্তভাবে এইরূপ, — বারাণসীতে দশরথ নামে এক মহারাজা ছিলেন । তাঁহাব জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম রামপণ্ডিত, কনিষ্ঠ পুত্রের নাম লক্ষ্মণকুমার এবং কন্যার নাম সীতা । মহারাজার দ্বিতীয়া স্ত্রী তাঁহার পুত্র ভরতকুমারের জন্য সিংহাসন প্রার্থনা করিলে, রাজা প্রথমা পত্নীর সন্তানদের বনবাসে পাঠাইয়া দেন । তাঁহারা ১২ বৎসর বনবাস যাপন করেন । দশরথের মৃত্যুর তিন বৎসর পর রামপণ্ডিত অবণ্য হইতে সীতা ও লক্ষ্মণকুমার সহ প্রত্যাবর্তন করেন । অবশেষে তিনি সীতাকে অগ্রমহিষীর পদে বরণ করিয়া রাজপদে

অধিষ্ঠিত হন। উহাতে রাজা শুদ্ধোধন ছিলেন দশরথ ; রাহুল-জননী ছিলেন সীতা ; আনন্দ ছিলেন ভরত ; সারিপুত্র ছিলেন লক্ষ্মণ এবং বুদ্ধ নিজে ছিলেন রামপণ্ডিত।[৬] ইহাতে রাম-রাবণের যুদ্ধ প্রসঙ্গ নাই। 'দশরথ জাতক' যেমন বৌদ্ধ প্রভাবিত গ্রন্থ 'লঙ্কাবতার সূত্র'-এও তেমনি বুদ্ধের মহিমা ব্যক্ত। তবে 'লঙ্কাবতার সূত্র'-এ রামের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। উহার প্রথম অধ্যায়ে কেবল ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক লঙ্কাদ্বীপের রাজা রাবণের নিকট বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইতে দেখা যায়। ভগবান বুদ্ধ এক সময়ে সমুদ্রতীরে মলয় পর্বতশিখরে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময়ে দশানন কর্তৃক আমন্ত্রিত জ্ঞানী বুদ্ধদেব রাবণের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। রাবণ সপরিবারে সপারিষদ ভগবান বুদ্ধের নিকট শরণ গ্রহণ করিলে ভগবান তাঁহাদের নিকট মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। পরিশেষে সমগ্র দ্বীপবাসী সানন্দে বৌদ্ধ সঙ্ঘের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই গ্রন্থে রাবণ, তাঁহার ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ এবং অমাত্য শুক ও সারণের নাম পাওয়া যায়। তবে রামের নাম পাওয়া যায় না।[৭]

দশরথ জাতক এবং লঙ্কাবতার সূত্রের বিষয় বাংলা রামায়ণে গৃহীত না হইলেও খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে রামানন্দ যতী রচিত 'রামলীলা' কাব্যে তিনি নিজেকে বুদ্ধের অবতার বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। রামানন্দ লিখিয়াছেন —

'সর্ব্বশক্তিমত আর ইচ্ছা কালিকার।
কলিযুগে রামানন্দ বুদ্ধ অবতার"।[৮]

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে উড়িষ্যায় অচ্যুতানন্দ বুদ্ধের ধর্মনীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, সে কথা পাওয়া যায় তাঁহার 'শূন্যসংহিতায়'। আর রামানন্দ যতী নিজেকেই বুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি নিজেকে শাক্ত এবং কালী বিশ্বাসীও বলিয়াছেন। ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় দ্রব্য সিংহের রাজত্বকালে নবাব ইক্রাম খাঁ পুরীর দারুব্রহ্মের বিগ্রহ আক্রমণ করেন। রামানন্দ খুব সম্ভব সেই সময়ে কিংবা কিছু পরে তাঁহার কাব্য রচনা করিয়া থাকিবেন। তাঁহার কাব্যেও দারুব্রহ্মকে রক্ষা করার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি দারুব্রহ্ম এবং রামচন্দ্রকে বুদ্ধ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

'লঙ্কাবতার সূত্র'-এ বুদ্ধ কর্তৃক দশাননকে উপদেশ প্রদানের দ্বারা রাবণকে বুদ্ধের অনুরাগী ও ভক্তরূপে প্রচার করা হইয়াছে। দক্ষিণভারতে রাম অপেক্ষা রাবণই আদর্শ নৃপতি রূপে সম্মানিত। বাংলা রামায়ণে ইহার আভাস পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে রাবণের নিকট শ্রীরামের রাজনীতি শিক্ষা এবং জগৎরাম ও রামপ্রসাদ রচিত রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে রাম-রাবণ সংবাদে ভক্তিযোগ-কথা এইরূপ প্রভাবের ফল কিনা বলা যায় না। এই দুই ঘটনায় রাবণ একজন ভক্ত এবং বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞরূপে চিত্রিত

হইয়াছেন। অবশ্য 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ' -এ বশিষ্ঠমুনি কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে গূঢ়তত্ত্ব-কথা বর্ণিত হইতে দেখা যায়। তাহাতেও ভক্তিযোগ অতি সূক্ষ্মতত্ত্বের উপর আধাবিত, তবে উহাতে রাবণের চরিত্রকে মহিমান্বিতরূপে প্রকাশ করা হয় নাই। এই কারণে মনে হয়, বঙ্গসমাজে লঙ্কার দশানন সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা উক্ত গ্রন্থের প্রভাবে হইয়া থাকিবে।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের সূক্ষ্ম দর্শনতত্ত্ব অপেক্ষা 'অদ্ভুত রামায়ণ' ও 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এর প্রভাবই বাংলা রামায়ণে গভীর ফলপ্রসূ হইয়াছিল। কবি কৃত্তিবাস হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বাংলা রামায়ণকারের কাব্যে উক্ত দুই গ্রন্থের প্রভাব অল্পাধিক পাওয়া যায়। 'অদ্ভুত রামায়ণ'-এর অন্তর্গত সীতার উৎপত্তি বিবরণ অর্থাৎ সীতা মন্দোদরীর কন্যা, হনূমানের নিকট রামচন্দ্রের সাংখ্য-জ্ঞানযোগ বর্ণনা ও নিজস্বরূপ উদ্ঘাটন, সীতার হাস্যতত্ত্ব বর্ণনা, সহস্র স্কন্ধ রাবণ বধ এবং পুষ্করদ্বীপ হইতে রামচন্দ্রের দেশে আগমন প্রভৃতি কাহিনী বিভিন্ন বাংলা রামায়ণে পাওয়া যায়।[৯] আর 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এর অন্তর্গত বাল্মীকির পূর্ববৃত্তান্ত, ছায়া সীতার কল্পনা, স্বয়ংপ্রভার কাহিনী, হনূমান কর্তৃক ধান্যমালী অপ্সরার শাপমোচন ও কালনেমি বধ, রাবণের অভিচার-হোম এবং ইন্দ্রজিৎ বধের উপায় প্রভৃতি বিষয় অধিকাংশ বাংলা রামায়ণে গৃহীত হইয়াছে।[১০] তবে এই সকল কাহিনী যথাযথভাবে কোনও বাংলা রামায়ণেই পাওয়া যায় না। কোথাও সংক্ষেপে কোথাও আংশিক পরিবর্তিতরূপে এই সকল বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়।

"সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো"।[১১]

বাল্মীকির রামায়ণ সম্পর্কে নারদ কথিত অনুরূপ উক্তি বাংলা রামায়ণের ক্ষেত্রেও অনস্বীকার্য। বঙ্গের কবিগণের মনোলোকে যে সৃজনশক্তি কার্য করিয়াছে তাহার সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মিল লক্ষণীয়। বাল্মীকির মহাকাব্য বাংলা রামায়ণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও তাহাতে পাওয়া যায় নানা ঘটনার সংঘাত ও বিচিত্র কাহিনীর সমাবেশ। এইরূপ নানা পরিবর্তন ও নূতন ঘটনা সংযোজনের মধ্য দিয়াই বাংলা রামায়ণে রামচন্দ্রের দেবত্বের বিলসন ঘটিয়াছে। বাঙালীর দৃষ্টিতে রামচন্দ্র 'নরচন্দ্রমা' মাত্র নহেন, তিনি বিষ্ণুর অবতার। বাংলা রামায়ণে অদ্ভুত রামায়ণের ব্যাপক প্রভাব ক্রিয়াশীল হইলেও কবিচন্দ্রের 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' খানি এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। কৃত্তিবাসের ভণিতায় শতস্কন্ধ রাবণ বধ পালা পাওয়া যায় যাহা অদ্ভুত বামায়ণের বিষয়, কিন্তু কবিচন্দ্রের নামে এইরূপ কোনও পালার সন্ধান মেলে না। একটি যুগেব বিশেষ একটি প্রভাব হইতে

কবিচন্দ্র যে নিজের কাব্যকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত রাখিতে পারিয়াছিলেন ইহা তাঁহার রচনার শক্তিই প্রকাশ করে। অথচ মধ্যযুগে রচিত অধিকাংশ বাংলা রামায়ণে অদ্ভুত রামায়ণের বহু বিষয় গৃহীত হইতে দেখা যায়। অদ্ভুত রামায়ণের অলৌকিক ও অবাস্তব বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া কবিচন্দ্র তৎকালে যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রামায়ণ সম্পর্কে কম গুরুত্বপূর্ণ কথা নহে।

অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রভাবেই কবিচন্দ্রের কাব্যখানি অতি সংক্ষিপ্ত এবং তীব্র একমুখী। বিষ্ণুপুরী রামায়ণের বাল্মীকি মুনি কর্তৃক রামনাম মাহাত্ম্য বর্ণন, সীতা অন্বেষণকালে হনূমানকে প্রভাবতী যোগিনীর পরিচয়দান ও তাহার মুক্তিলাভ, গন্ধকালী অপ্সরার শাপমোচন এবং কালনেমি বধ প্রভৃতি কাহিনী অধ্যাত্ম রামায়ণের অনুসরণে রচিত। তবে অধ্যাত্ম রামায়ণের স্বয়ংপ্রভা যোগিনীর পরিবর্তে কবিচন্দ্রে পাওয়া যায় প্রভাবতীর নাম এবং ধান্যমালী অপ্সরার পরিবর্তে পাওয়া যায় গন্ধকালী অপ্সরার প্রসঙ্গ।

বাংলা রামায়ণের আদিকবি কৃত্তিবাস খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাল্মীকি-রামায়ণের অনুবাদ কার্যে অগ্রসর হন। তিনি বহুবার বাল্মীকিমুনির নাম উল্লেখ করিলেও তাঁহার সপ্তকাণ্ড রামায়ণে মহাকবির প্রভাবের প্রতিফলন সামান্য। বাল্মীকির বালকাণ্ড ও যুদ্ধকাণ্ডের নাম কৃত্তিবাসে হইয়াছে আদিকাণ্ড ও লঙ্কাকাণ্ড। বাল্মীকির বীর্যবান রাম, কৃত্তিবাসের কাব্যে কোমলতার আধার ভগবান রাম। অদ্ভুত রামায়ণের অন্তর্গত শতস্কন্ধ রাবণ বধ পালা কৃত্তিবাসের ভণিতায় পাওয়া যায়, সে কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। তাঁহার কাব্যে অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে যে-সকল বিষয় গৃহীত হইযাছে তাহার মধ্যে রত্নাকর দস্যুর বাল্মীকিমুনিতে রূপান্তর, হনূমান কর্তৃক গন্ধকালী অপ্সরার উদ্ধার ও কালনেমি বধ এবং লক্ষ্মণ কর্তৃক যজ্ঞাগারে ইন্দ্রজিৎ বধ কাহিনী প্রধান। তবে বাল্মীকিমুনির পূর্বনাম যে 'রত্নাকর' তাহা অধ্যাত্ম রামায়ণে নাই। কৃত্তিবাস এই নাম অন্য কোনও প্রসঙ্গ হইতে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। কবিচন্দ্রও বাল্মীকিমুনির রামনাম প্রচারের কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন এবং অধ্যাত্ম রামায়ণের সম্পূর্ণ অনুরূপ তাঁহার কাব্যেও বাল্মীকিমুনির প্রথম জীবনে কিরাতদের সংসর্গে দস্যুত্বলাভ ও পরে রামনামের প্রভাবে বাল্মীকিমুনিতে রূপান্তর কাহিনী পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার পূর্বনামের কোনও উল্লেখ কবিচন্দ্রের কাব্যে পাওয়া যায় না।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কবি অদ্ভুতাচার্য বা নিত্যানন্দ আচার্য অদ্ভুত রামায়ণের আদর্শে কাব্য রচনা করিলেও বাল্মীকিমুনির কাহিনী তিনিও গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে বাল্মীকিমুনির পূর্বনাম পাওয়া যায় 'যদু' বা 'মদন আকাটি'। কৃত্তিবাসী রামায়ণে রত্নাকর দস্যুর পিতার নাম পাওযা যায় চ্যবন, কিন্তু আমরা জানি বাল্মীকিমুনির পিতার প্রকৃত নাম প্রচেতস্। যাহাই হউক, বাংলা রামায়ণে কাহিনী

বিন্যাসের এইরূপ পরিবৃত্তি প্রায় সকল কবির কাব্যেই বর্তমান। অদ্ভুতচার্যের রামায়ণ সম্পর্কে ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী[১১] এবং রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়ই সর্বাধিক তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। বজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় কর্তৃক ১৩১৩ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১ম সংখ্যা, পৃ. ৫৭-৬৪) প্রকাশিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণের গজকচ্ছপের উপাখ্যান, বিনতা ও গরুড়ের কাহিনী, শিবপার্বতীর বিবাহ, কার্তিকের জন্মবৃত্তান্ত, রাবণের জন্মকথা, দধীচি ও চিত্রকেতুর উপাখ্যান এবং সূর্যবংশ কথা প্রভৃতি বিষয় আদিকাণ্ডে স্থান লাভ করিয়াছে। অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণে সীতা মন্দোদরীর কন্যা এবং শতস্কন্ধ রাবণ বধ পাওয়া যায়, যাহা সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণ হইতে গৃহীত। তাঁহার রচিত আদিকাণ্ড হইতে উত্তরাকাণ্ড পর্যন্ত পুথি পাওয়া যায়। রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় কর্তৃক অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ (আদ্যকাণ্ড) রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ হইতে ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। উহাতে অদ্ভুতাচার্যের পিতার নাম শ্রীনিবাস আচার্য এবং তিনি অমৃতাকুণ্ডা গ্রামের অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ আছে, যথা :-

"করতোয়ার পশ্চিমে আত্রাইর উত্তরকূলে।
মহাপুণ্যস্থান সেই পুরাণেতে বোলে॥
অমৃতাকুণ্ডা গ্রাম নাম অধিকারী তার।
শ্রীনিবাস আচার্য্য সাধুর আচার।" (প্রাগুক্ত, মুখবন্ধ-পৃ.২)

সমগ্র বঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণের একচ্ছত্র প্রভাব থাকা সত্ত্বেও খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেব মধ্যে অদ্ভুতাচার্য উত্তরবঙ্গের করতোয়া ও আত্রাই নদীর বিস্তীর্ণ উপকূল-ভাগকে তাঁহাব রাম-কথার সুধারসে অভিষিক্ত করেন। ইহার ঠিক একশত বৎসর পরে পশ্চিম রাঢ় তথা দামোদর নদের দক্ষিণাংশকে রামায়ণী গানের ভক্তিবাবি ধারায় সরস ও স্নিগ্ধ করেন কবিচন্দ্র। বাঙালী সমাজের নিখুঁত চিত্র, বাঙালীর ভাবপ্রবণতা ও দুর্বলতার চিত্র অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণে যেমন পাওয়া যায় কবিচন্দ্রের কাব্যে তেমন নহে। এই উচ্ছ্বাস-বিহ্বল আসর জমানো কাহিনীর অভাব ঘটিলেও কবিচন্দ্রের রচনার সর্বপ্রধান গুণ কথার পরিমিতি ও কবিত্বের প্রবাহ। তবে উভয় কবির কাব্যই ভক্তিরসে নিষিক্ত।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষে পূর্ববঙ্গে ময়মনসিংহের ফুলেশ্বরী নদীব তীরে রাম কথার করুণরসের মধুর তান তুলিযা ধরিয়াছিলেন কবি চন্দ্রাবতী। শোনা যায়, কবি চন্দ্রাবতীর রামায়ণখানি ময়মনসিংহের মহিলাগণের সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত গান গাহিবার প্রধান উপজীব্য (সৌরভ ১৩২০ সাল, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৪০)। তাঁহার কাব্যে কিছু আঞ্চলিক ভাব ও উপকরণ প্রবেশ লাভ কবায় এবং কবিচন্দ্রের বিষ্ণুপুবী রামায়ণেও

পশ্চিম রাঢ়ের কিছু মানসিকতার প্রকাশ ঘটায় ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় এই দুই কবির কাব্যকে 'আঞ্চলিক-রামায়ণ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।[১৩] ভাব ও ভাষার অকৃত্রিমতা এবং কবিত্বের সহজ প্রবাহ, এই দুইগুণে বঙ্গের দুই প্রান্তের এই দুই কবি এখনও আমাদের হৃদয়ে সমান শ্রদ্ধার আসনে বিরাজিত ।

উভয় কাব্যই নির্মল জলপ্রবাহের মত সহজ ও অবাধ । কিন্তু কাহিনীগত বিচারে উভয় কবির কাব্যে প্রচুর প্রভেদ বর্তমান । কবিচন্দ্র মূলতঃ অবলম্বন করিয়াছেন অধ্যাত্ম রামায়ণের বিষয় আর কবি চন্দ্রাবতী গ্রহণ করিয়াছেন অদ্ভুত রামায়ণের বৈচিত্র্য । উভয় কবিই অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন চরিত্র চিত্রণে ।

জনপ্রিয়তার মানদণ্ডে ফুলিয়ার কৃত্তিবাসকে যদি বলা যায় সমগ্র বঙ্গের কবি, তাহা হইলে চন্দ্রাবতীকে উল্লেখ করিতে হয় পূর্ববঙ্গের কবি এবং অদ্ভুতাচার্য বা নিত্যানন্দকে বলা চলে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের কবি । আর ঠিক অনুরূপ জনপ্রিয়তার সৌকর্যে কবিচন্দ্রকেও নিঃসন্দেহে দক্ষিণ পশ্চিম রাঢ়ের কবি বলিয়া চিহ্নিত করা যায় । খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে আরও কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবির নাম জানা যায়, তাঁহাদের মধ্যে অনন্তকন্দলী এবং শঙ্কর দেবের রামায়ণ, রামশঙ্কর দত্ত (ভিষক্) রচিত রামায়ণ, কৈলাসবসুর 'অদ্ভুত রামায়ণ', ষষ্ঠীবব ও গঙ্গাদাস সেনের রামায়ণ, গুণরাজ খানের 'ভারত রামায়ণ' এবং দ্বিজ গঙ্গা নারায়ণের রামলীলা কাব্যই প্রধান ।

অনন্তকন্দলী ও শঙ্কর দেব সম্পর্কে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন — "অনন্ত রামায়ণ মূলতঃ বাল্মীকির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রচিত হইলেও ইহাতে অধ্যাত্ম রামায়ণ ও মহানাটকেরও ছায়া পড়িয়াছে, ...।"[১৪] অনন্তকন্দলী ও শঙ্কর দেব আসামবাসী হইলেও ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহাদের রচিত রামায়ণের ভাষাকে বঙ্গভাষা বলিয়া দাবী করিয়াছেন ।

রামশঙ্কর দত্ত রায় (ভিষক্) ঢাকা জিলার মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত বায়রা গ্রামের কবি । তাঁহার রামায়ণখানি সুবৃহৎ, কিন্তু তাঁহার রামায়ণ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না । তবে মুন্‌শী আবদুল করিম সঙ্কলিত ১৩২০ সালের বাঙ্গলা প্রাচীন পুথির বিবরণ (১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃ. ১০৯-১১০) নামক পুথির তালিকায় এই কবির ভণিতা প্রদত্ত হইয়াছে । তাহা হইতে জানা যায় যে, কবি রামশঙ্কর বাল্মীকি-রামায়ণ, 'অদ্ভুত রামায়ণ' ও 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' অবলম্বনে তাঁহার কাব্য রচনা করেন —

"কৈলাস শিখরে বস্যে ভবানী শঙ্কর ।
শ্রীরাম কথায় দোঁহে পুলক অন্তর ।।
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণান্তর্গত রামায়ণী কথা ।

পার্বতী যাহার শ্রোতা মহাদেব বক্তা ॥
"বাল্মীকি রচিত গ্রন্থ শ্লোক অনুসারে ।
কৃত্তিবাস আদি কবি পদবন্দ করে ॥
বাল্মীকি বশিষ্ঠ আর অদ্ভুত গ্রন্থকার।
মহাভাগবত আদি পুরাণ প্রচার ॥
এই সব গ্রন্থ শুনি শ্লোক অনুসারে ।
পদবন্দ করি কহে ভিষক্ শঙ্করে।" (প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০)

অন্যান্য ভণিতায় পাওয়া যায় রামশঙ্করের উল্লেখ :-
"অদ্ভুতাচার্য্য কবি সরস্বতী বরে ।
পদবন্দ করি কহে শ্রীরামশঙ্করে॥" (প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০)
ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়' গ্রন্থে (২য় খণ্ড, ১৯১৪ খ্রীঃ পরিশিষ্ট- পৃ. ১৮২১-১৮২৫) এই কবির রচিত কাব্য হইতে কিছু অংশ মুদ্রিত হইয়াছে ।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত কৈলাস বসুর কাব্যে (সা. ৫৬৬ নং, খণ্ডিত) অদ্ভুত রামায়ণের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ পাওয়া যায় । খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে জৈমিনি ভারতের প্রভাবে কবি ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস সেন, ইঁহারা দুইজন পিতাপুত্রে মিলিয়া একখানা অতি সুন্দর রামায়ণ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, ইঁহাদের বাসস্থান ঝিনারদি।[১৫]

গুণরাজ খানের 'ভারত রামায়ণ' বা সংক্ষিপ্ত রামায়ণ (সা. ১০৫৫, খণ্ডিত) মহাভারতের অন্তর্গত বনপর্বের রাম-কথা অবলম্বনে রচিত। ষষ্ঠীবরের উপাধিও 'গুণরাজ' বলিয়া জানা যায় । উক্ত ষষ্ঠীবরই এই গুণরাজ খান কিনা তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না ।

দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ ছিলেন কৃত্তিবাসের খুল্লতাত ভ্রাতা লক্ষ্মীধরের পৌত্র সুষেণ পণ্ডিতের সন্তান । তাঁহার 'রামলীলা' নামক একখানি খণ্ডিত পুথি (ক.বি. ২৭৩১, লিপিকাল ১২৩৯ সাল) পাওয়া যায় ; ভণিতা এইরূপ :—

ভবানীমঙ্গল গীত স্মরণে ভক্তের প্রীত
রচিল শ্রীগঙ্গানারায়ণ । (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৩৯)

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন দ্বিজ দুর্গারাম প্রণীত রামায়ণ, কৃত্তিবাসের পরে রচিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।[১৬] ইঁহার সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না ।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ঘনশ্যাম দাসের 'সীতার বনবাস' নামক একখানা পুথির কথা জানা যায় যাহা জৈমিনি-ভারতে বর্ণিত লবকুশের যুদ্ধ বিবরণ অবলম্বনে রচিত ।[১৭]

দ্বিজ মধুকন্ঠের ভণিতায় লিখিত রচনাংশে কবিচন্দ্রের রচিত কয়েকটি সুপরিচিত ছত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১১]

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হয় কৃষ্ণদাস পণ্ডিতের সংক্ষিপ্ত রামায়ণ। ইহাতে বক্তা স্বয়ং রামচন্দ্র। ইহার কাহিনী অতি সংক্ষিপ্ত এবং সরলভাবে লিখিত।[১২]

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত বাংলা রামায়ণের সংখ্যাই সর্বাধিক। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পাতগুা নিবাসী ভবানী দাস (ঘোষ) রচনা করিয়াছেন 'রামচন্দ্রেব স্বর্গারোহণ' পালা (সা. ৫৪৭, ১-৫০ পত্র, সম্পূর্ণ, লিপিকাল ১২৫৯ সাল)। তাঁহার কাব্যে মুনিশাপে রামচন্দ্রের স্মৃতিভ্রংশ হওয়ার উল্লেখ আছে;

মুনিশাপ হতে সব পাসরিয়া ছিলা।
শাপ দূর হৈয়া রাম সকল স্মরিলা ॥ (প্রাগুক্ত, পু.পৃ. ৪৯)

ভবানী দাসের 'উত্তরাকাণ্ড' বা 'রামকাণ্ড' নামেও একখানা পুথি পাওয়া যায়। (বি.ভা. ৩নং)।

ভবানীনাথের লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়ের কথা পূর্বে বলা হইয়াছ। তাঁহার ভণিতা এইরূপ:-

"জয়চন্দ্র নরপতি বসিক সুজন অতি
সভাসদ ভবানী-ব্রাহ্মণ।
মধুরস হেন জানি লক্ষ্মণের যে কাহিনী
সুরচিত কৈল দ্বিজবর"॥[১৩]

ইঁহার রচনা নীরস এবং একঘেয়ে। 'শ্রীরামের অভিষেক' (সা. ১৯৩১, সম্পূর্ণ) নামক পুথিতেও ভবানী নাথের ভণিতা পাওয়া যায়। খুব সম্ভব এই দুই কাব্য একই ব্যক্তির রচনা।

এই গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে 'বাংলা রামায়ণকার তিন কবিচন্দ্র' প্রসঙ্গে আমরা কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী, দ্বিজ লক্ষ্মণ এবং ভবানীশঙ্করের রামায়ণ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এই স্থলে এই তিন কবির রচনা সম্পর্কে সংক্ষেপে বলিতে পারি যে, ইঁহাদের রামায়ণ রচনার আদর্শ এক, তাহা অধ্যাত্ম রামায়ণেব অনুসরণ। তথাপি তিন কবির রচনাই যথেষ্ট মৌলিকতায় পূর্ণ। দ্বিজ লক্ষ্মণেব আদিকাণ্ডের দুই একটি বিষয় ব্যতীত তিন কবির রচনাই যথেষ্ট প্রসাদগুণ বিশিষ্ট। ভবানীশঙ্করের রচনার কাব্যগুণ এবং বৈষ্ণবীয় ভক্তির প্রতিফলন অন্যান্য কবির পুথিতে প্রক্ষিপ্ত হওয়া অসম্ভব নয়। দ্বিজ লক্ষ্মণ এবং ভবানীশঙ্কর বা শঙ্কর উভয়েই রচনা করিয়াছেন 'তরণীসেনের যুদ্ধ' পালা ও 'মহীরাবণ বধ' পালা। দ্বিজ লক্ষ্মণের 'বীরবাহুর যুদ্ধ' পালার বৈষ্ণবীয় ভক্তির প্রতিফলন 'তরণীসেনের যুদ্ধ' পালাতেও বর্তমান। উভয় কবির কাব্যেই পাওয়া যায় তরণীবীরের রথের উপরে ও

অঙ্গে রামনাম লেখা। এমনকি রামচন্দ্রের বাণে তরণীর দেহ দ্বিখণ্ডিত হইবার পরেও কাটামুণ্ড ভূমিতে পড়িয়া রাম নাম করিতে থাকে। দ্বিজ লক্ষ্মণ লিখিয়াছেন, মহাদেবও রামভক্ত তরণীকে শিবলোকে রাখিতে পারেন নাই :-

শুনিলেন পঞ্চানন প্রসন্ন বয়ানে।
কাটামুণ্ড চলেছে বলিয়া রাম নামে ॥
বাসবে ডাকিয়া হর বলেন বচনে।
তরণীর মাথা-গোটা আনহ এখানে ॥
বুঝিল বিধাতা মোরে প্রসন্ন হইল।
পঞ্চমুখ ছিল বিধি ছয়মুখ দিল ॥
হনূমান ডাকি বলে সদাশিবের ঠাঁই।
হেনমাথা রাখিতে প্রভুর আজ্ঞা নাই ॥(বি.ভা. ১৮৯৩, পু.পৃ. ১২)

রামনামের প্রভাবেই তরণীর বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি ঘটে। ভবানীশঙ্করের 'তরণীসেনের যুদ্ধ' পালার সঙ্গে দ্বিজ লক্ষ্মণের রচিত এই পালার মধ্যে মূলগত প্রভেদ নাই। তথাপি ভবানীশঙ্করের পালাটিই অত্যধিক প্রচার লাভ করে। এই দুই কবিই তরুণ রাক্ষসবীরদের প্রতি যথেষ্ট মমত্ব প্রদর্শন করিয়া রাক্ষস-চরিত্রেও ভক্তিরসের অনুলেপন দিয়াছেন। মনে হয়, এই দুই কবির পালার প্রভাবেই পরবর্তীকালে কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত 'তরণীসেন বধ' ও 'বীরবাহুর যুদ্ধ' পালাতে ভক্তিরস অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। কবিচন্দ্র, দ্বিজলক্ষ্মণ এবং ভবানীশঙ্কর পালা রচনায় যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিলেও কবিচন্দ্রই এই ব্যাপারে অগ্রণী।

বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা চৈতন্য সিংহের রাজত্বকালে দ্বিজ সীতাসুত 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' ও 'অদ্ভুত রামায়ণ' অবলম্বনে একখানা 'রামলীলা' কাব্য রচনা করেন, উহাতে ভণিতা এইরূপ :—

দ্বিজ সীতাসুত কহে বাল্মীক পুরাণ।
মহারাজা চৈত সিংহের জয় কর রাম ॥ (সা.চি. ৩০৩, পু.পৃ. ১৪০ক)

সীতাসুতের কাব্যে গানের রাগের নাম বহুস্থলে লিখিত আছে। তাঁহার লঙ্কাকাণ্ডের উক্ত পুথিটিতে অধ্যাত্ম রামায়ণের মত গন্ধকালী অপ্সরার শাপমোচন ও হনূমান কর্তৃক কালনেমি বধ কাহিনী পাওয়া যায়।

রামানন্দ যতী এবং রামানন্দ ঘোষ খুব সম্ভব এক ব্যক্তি। তাঁহার রামায়ণের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। বিরুদ্ধ ধর্মাবলম্বীর প্রতি তাঁহার কাব্যে একটা স্পষ্ট প্রতিবাদ ধ্বনিত হইতে দেখা যায়। তিনি কালী উপাসক হইলেও নিজেকে বুদ্ধ অবতাব বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে কবি জগৎরাম রায় তাঁহার পুত্র রামপ্রসাদের সহযোগিতায় 'অদ্ভুত অষ্টকাণ্ড রামায়ণ' নামে একখানা সুবৃহৎ বাম-কথা নিবন্ধ রচনা করেন । এই কাব্যের আদি কাণ্ড ও পুষ্কর কাণ্ডটি সম্পূর্ণ 'অদ্ভুত রামায়ণ'-এর (সংস্কৃত) আদর্শে রচিত ।[১১]

রাধামাধব ঘোষেব 'বামলীলা' কাব্যটিতে সমস্ত রাম-কথার সারবস্তু একত্রীভূত হওয়ায় রচনায় কাব্যরসেব আস্বাদ কম পাওয়া যায় । ইহাতেও অধ্যাত্ম রামায়ণ ও বৃহৎ সারাবলী গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হইয়াছে । সীতা-সরমার কথোপকথনের পরে কবিচন্দ্রের 'অঙ্গদ রায়বার' পালা হইতে কিছু ছত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে মনে হয়।[১২]

রঘুনন্দন গোস্বামী রচিত 'রাম রসায়ন' কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব বর্তমান । তিনি বর্ধমান জিলার মাড়ো গ্রামে ১১৯৩ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার সুবৃহৎ 'রামরসাযন' গ্রন্থে বাল্মীকি ও তুলসীদাসেব প্রভাব পাওয়া যায় ।[১৩] তিনি বৈষ্ণবধর্ম মতকেই কাব্যে প্রাধান্য দিয়াছেন ।

দ্বিজ দুলালের কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে (সা. ২৬২৯) অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রভাব বর্তমান ।

রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বাল্মীকি-বামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ ও অদ্ভুত রামায়ণের প্রভাবে একখানা রামায়ণ কাব্য রচনা করেন । তাঁহার রচনায় রামচন্দ্রেব আক্ষেপটি পদাবলীব প্রভাবে বসময় হইয়া উঠিয়াছে ।[১৪]

মেদিনীপুর জিলার কোনকুড়্যা গ্রামের কবি কমললোচন দত্ত রচনা করিয়াছেন (১৮৪২ খ্রীঃ) 'রামভক্তি রসামৃত'। তাঁহার রচনায় আদ্যন্ত রামভক্তির সহজ নম্র সুর প্রবাহিত । কবির স্বহস্ত-লিখিত পুথিসমূহে (ক.বি. ৩২৪৩, ৩২৪৪, ৩২৪৫ এবং ৩২৪৬ নং) তিনি নিজের সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ প্রদান করিয়াছেন । ১৭৬৪ শকাব্দে (১৮৪২ খ্রীঃ) তাঁহার রচনা সমাপ্ত হয় । অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রভাবে তাঁহার কাব্যে ছায়া সীতার (অরণ্য কাণ্ড) বিষয় পাওয়া যায় । কবিচন্দ্রের মতই সীতা কর্তৃক গয়ায় দশরথকে বালির পিণ্ডদান কাহিনী তিনিও গ্রহণ করিয়াছেন ।

শিবচন্দ্র সেন রচিত সারদামঙ্গলটি কবি ভারতচন্দ্রের প্রায় সমসাময়িককালে বচিত হয় । ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, "শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গাপূজা রামায়ণে সারদা মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক, এইজন্য কবি রামায়ণকে সারদামঙ্গল আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন"।[১৫]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোচবিহারের রাজা হরেন্দ্র নারায়ণ (আঃ ১৮৪৭ খ্রীঃ) বাল্মীকি-রামায়ণের অনুবাদ কার্যে অগ্রসর হন । তিনিই প্রথম মূলানুগ অনুবাদ কর্মের প্রচেষ্টা শুরু করেন । তাঁহার কাব্যখানির কিয়দংশ মুদ্রিতাকারে পাওয়া যায় (হরেন্দ্র নারায়ণ গ্রন্থাবলী, ৫ম খণ্ড)।[১৬]

মহানন্দ চক্রবর্তী বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের পদ বন্দনা করিয়া কাব্য রচনা কবেন

(সা. ১৯৬২, ১৯৬৩ এবং ১৯৬৪, তিনটিই খণ্ডিত পুথি)। তাঁহার পুথি তিনটি সাঁওতাল পরগণা জিলার পাকুড় হইতে প্রাপ্ত। তিনি আদিকাণ্ডে অদ্ভুত কাহিনীর কথা উল্লেখ করায় মনে হয় অদ্ভুত রামায়ণের আদর্শে তাঁহার কাব্য রচিত হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাল্মীকি-রামায়ণের অনুবাদ করিয়া গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অসাধারণ গৌরবেব অধিকারী হইয়াছেন। তিনি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মূল রামায়ণের মর্মার্থ গ্রহণ কবিয়া তাঁহার অনুবাদ গ্রন্থকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করিয়া সৃষ্টি করেন।[১৭]

রাজকৃষ্ণ রায় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বাল্মীকি রামায়ণের পশ্চিম ভারতীয় সংস্করণ অবলম্বনে অনুবাদ কার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন।[১৮] বাংলা রামায়ণ অনুবাদ সাহিত্যের অন্তর্গত হইলেও অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কবিগণের রচনায় মূলতঃ বিভিন্ন রাম-কথার ভাবানুবাদই নজরে পড়ে। বাল্মীকিকে স্মরণ করিয়াও তাঁহারা বিভিন্ন লোকশ্রুতিমূলক কাহিনীর প্রভাবকে একেবারে পরিহার করিতে পারেন নাই। প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বাল্মীকি রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ কার্য শুরু হয়। এইদিক হইতে কবি গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রচেষ্টা সকল বঙ্গভাষাভাষীর নিকটই আদরনীয়। তথাপি কোনও একটি শতাব্দীতে কোনও একটি সাহিত্য-ধারার নির্বিশেষে পরিসমাপ্তি ঘটে না। সেইহেতু আক্ষরিক অনুবাদ কার্য সূচনার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন ভাবানুবাদ রচনার ধারা যে একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহাও বলা চলে না। কেননা অষ্টাদশ শতাব্দীর পরেও পুবাতন ধারার অনুবর্তন যথেষ্ট পাওয়া যায়। এইরূপ একটি রামায়ণ দুর্গাবর দাসের অরণ্য কাণ্ড। উহাতে কৃত্তিবাসী-বামায়ণ ও অদ্ভুত রামায়ণের প্রভাব পাওয়া যায়।[১৯]

আবার ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র রচিত 'ভূষণ্ডী বামায়ণ' খানি (সা.প.প. ১৩১০, অতিরিক্ত সংখ্যা, পৃ. ১৯৭-১৯৮) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পদ সংখ্যা ৪০৭। ভণিতা এইরূপ —

"শ্রীরামচরণপদ্ম করিয়া বন্দন।
ভূপ পৃথ্বীচন্দ্র রচে গীত রামায়ণ"॥ (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮)

'রাবণের কবিতা'টি (সা.প.প. ১৩১০, অতিরিক্ত সংখ্যা, পৃ. ২৫৯, ৪১৪ নং) কৃত্তিবাসের ভণিতায় রচিত হইলেও ভাষায় চট্টগ্রামের প্রভাব পাওয়া যায। ইহার পদ সংখ্যা ১২৩।

'ফালুয়া রামায়ণ' (সা.প.প. ১৩১০ সাল, অতিরিক্ত সংখ্যা, পৃ. ১৯৮) নামে পরিচিত রাম-কথা চট্টগ্রামে প্রচলিত ছিল। চট্টগ্রামে রামায়ণ গানের সময় 'ফাল' বা লাফ দিয়া গান গাওয়া হয় বলিয়া উহার ঐরূপ নাম হইয়াছে।[২০]

সৌদামিনী দেবী কর্তৃক পয়ারাদি ছন্দে রচিত অদ্ভুত রামায়ণেব একটি অনুবাদ

গ্রন্থের (১২৯৭ সাল) সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই অনুবাদটি প্রায় মূলানুগত ।

এই সকল রামায়ণ ছাড়াও দুই একটি পালা যাঁহাদের নামে পাওয়া গিয়াছে এখানে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে ; যথা :—

(দ্বিজ) অভিরাম (শ্রীরাম চরিত, এ.জি. ৬০০৫, সম্পূর্ণ)
উৎসবানন্দ (লবকুশের যুদ্ধ, এ.জি. ৫৪৩১, ১৭ পত্র, সম্পূর্ণ)
কাশিনাথ (কালনেমির রায়বার, ক.বি. ১৯৪, সম্পূর্ণ)
কুমুদানন্দ দত্ত (শ্রীরামেব অশ্বমেধ পালা, সা ৫৬৩, খণ্ডিত)
কেশব মিত্র (উত্তরা কাণ্ড, বি.ভা. ১০৯৬, খণ্ডিত)
খোশল শর্মা (খোট্টা অঙ্গদের রায়বার, ক.বি. ২৬৮, সম্পূর্ণ)
গঙ্গাদাস সেন (লবকুশের যুদ্ধ, ক.বি. ২৩৪, ইঁনি কবি ষষ্ঠীবরের পুত্র বলিয়া পরিচিত)
গৌরীকান্ত (অদ্ভুত বামায়ণ, এ.জি. ৬৭৪৪, খণ্ডিত)
(দ্বিজ) তুলসী (অযোধ্যা কাণ্ড, ক.বি. ৫৮২৬, সম্পূর্ণ)
(দ্বিজ) দয়ারাম (লঙ্কা কাণ্ড, বি.ভা. ৫৮৫৯, খণ্ডিত, ইঁহার রচিত 'তরণীসেনের যুদ্ধ' পালা পাওয়া যায়।)
ধর্মদাস (উত্তরা কাণ্ড, বি.ভা. ২৬২৫, ১-১১ পত্র, খণ্ডিত)
(দ্বিজ) পঞ্চানন (উত্তরা কাণ্ড, ক.বি. ২৩৫, খণ্ডিত)
ফকিররাম কবিভূষণ (অঙ্গদ রামায়ণ, ক.বি. ২৮৩, সম্পূর্ণ)
বলরাম দাস (অরণ্য কাণ্ড, এ.জি. ৪০৮৩, সম্পূর্ণ)
ভিকন শুক্লদাস (অরণ্য কাণ্ড, ক.বি. ৪৫, খণ্ডিত)
মতিরাম (কুম্ভকর্ণের রায়বার, ক.বি. ২৭৩৬ এবং দশরথের পিণ্ডদান ক.বি. ৩৩৩৫, সম্পূর্ণ)
(দ্বিজ) মাণিকচন্দ্র (সুন্দরা ও লঙ্কা কাণ্ড, ক.বি. ১৯১, খণ্ডিত)
রসিক কবি (তাড়কা বধ, বি.ভা. ৩১৮০, ৩পত্র, খণ্ডিত)
(দ্বিজ) রাম (বিভীষণের রায়বার, ক.বি. ২৭০, জয়রামপুর নিবাসী)
রাম কেশব দেব (সহস্রগিরি রাবণ বধ, বা প্রা.পু.বি. ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৪৩)
রাম গোবিন্দ দাস (লঙ্কাকাণ্ড, বি.ভা. ৫৯২০, ৪-২৭৬ পত্র)
রাম নারায়ণ (উত্তরাকাণ্ড, ক.বি. ২৯৪১ এবং ২৬৬, সম্পূর্ণ)
রামপ্রসাদ (লঙ্কাকাণ্ড, ক.বি. ১৯২, ২-১৭ পত্র, খণ্ডিত)
রামরুদ্র (সুন্দরা কাণ্ড, ক.বি. ৯৬, খণ্ডিত)
শিবরাম (লক্ষ্মণের শক্তিশেল, ক.বি. ১৯৩, সম্পূর্ণ)

সম্পদ রায় (কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, সা.প.প. ১৩১০, অতিরিক্ত সংখ্যা, পৃ. ১৮০)
(দ্বিজ) সাফল্যরাম ও দ্বিজ ধনঞ্জয় (গয়াশ্রাদ্ধ পালা, বি.ভা. ৬১৫১, খণ্ডিত)
সূয়র রায় (লবকুশের যুদ্ধ, ক.বি. ১৭৯৬, সম্পূর্ণ)
হরধর দত্ত (কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, ক.বি. ১৯৯, খণ্ডিত) ইনি সম্ভবতঃ কবি নহেন।
হরেকৃষ্ণ দাস (অঙ্গদ রায়বার, বি.ভা. ৫৬৮৫, খণ্ডিত)
হরিচরণ এবং দ্বিজ মধুকন্ঠ (দুইটি ভণিতা পাওয়া যায়, ক.বি. ২৮৬, খণ্ডিত)
(দ্বিজ) হট্টু শর্মা (লঙ্কাকাণ্ডের ১ খানা পত্র, সা. ১০৬০, খণ্ডিত)

বাণীকন্ঠ, দ্বিজ নিধিরাম (ক.বি. ২৫৪), দ্বিজ কানুরাম (ক.বি. ১২৫), কবিকঙ্কণ (বি.ভা. ২৭১), দ্বিজ বিদ্যাপতি (ক.বি. ২৪৮, মাত্র ১টি ভণিতা বিদ্যাপতির অন্যান্য ভণিতা ফকির বামের) এবং দ্বিজ মাধবের (সা.প.প. ১৩১০, অতিবিক্ত সংখ্যা, পৃ. ২২১, ৩৬১ নং পদ) ভণিতায় রামবিষয়ক পদ পাওয়া যায়। আবার ভণিতাহীন বহু পালা পাওয়া গিযাছে যাহাদের মধ্যে হনূমানের রায়বার, শূর্পণখার রায়বাব এবং কালনেমির রায়বার ইত্যাদি পালাই প্রধান।

মধ্যযুগের এই রামায়ণ সমুদয়ের ধর্মীয় প্রভাব ছাড়াও ইহাদের কাব্যগত প্রভাব এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীটি একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত এই সকল রামায়ণের করুণরস বাঙালী-মানসের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যকেই বিকশিত করিয়াছে। বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্র বেদনার রসে অভিষিক্ত হইয়া বাঙালীর দৈনন্দিন মানবীয় মর্ত্যচেতনার পীঠস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। রামচন্দ্রের মহত্ত্ব ও সীতার সতীত্বের আদর্শকে বাঙালী বাস্তব আদর্শ রূপে গ্রহণ করিয়াছে। বাংলা রামায়ণে আখ্যায়িকার বৈচিত্র্য মহাভারতের তুলনায় কম, ইহার শান্তরস ও পারিবারিক জীবন, বাঙালী জীবনাদর্শের সহিত সহজ সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। উপমা ও অলঙ্কার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বাঙালী কবিগণ বাংলাদেশের প্রচলিত বাগ্‌ভঙ্গীকেই গ্রহণ করিয়া উহা সর্বসাধারণের উপযুক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

বাংলা রামায়ণ বাঙালীর ঘরের কাব্য, তাহাতে আর্য মহিমার প্রকাশ থাকিলেও বাল্মীকির সৃষ্ট সকল চরিত্র বিভিন্ন বাঙালী কবির হাতে পড়িয়া বাঙালীব একান্ত আপনজনে পরিণত হইয়াছে। দশরথ বাঙালী পিতার মতই স্নেহাতুর, কৌশল্যা স্নেহশীলা বাঙালী-মা, সীতা বাঙালী ঘরের নিপীড়িতা বধূ, আর কৈকেয়ী, বাঙালী ঘরের ধিক্কৃতা এক জীবন্ত বিমাতার প্রতীক। বাংলার রমণীগণের মধ্যে যে দার্ঢ্য, সহিষ্ণুতা ও কোমলতার প্রকাশ সেকালে দেখা গিয়াছিল, সীতা-চরিত্রে তাহারই সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়াছে। মধ্যযুগে বঙ্গে বিধর্মীব উৎপীড়নে গৃহে ও সমাজে যে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব ঘটিয়াছিল, তাহা হইতে

জাতির উদ্ধারের নিমিত্ত — নারীর আপন মর্যাদাবোধের জন্য সংযম ও শালীনতার এবং পুরুষসমাজে সংহতি রক্ষার জন্য পৌরুষ ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। বাঙালী জাতি দীর্ঘকাল বাংলা রামায়ণ-রূপ দর্পণে আপনার প্রাণের ও মনের প্রতিচ্ছায়া দর্শনে নবভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। বাল্মীকির সংস্কৃত ভাষায় রচিত রামায়ণের কাহিনী বাংলাদেশে যে এত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ, বাংলা রামায়ণের কবিদিগের দ্বারা প্রচারিত রাম-কথাই রামায়ণ-গান ও কথকতার মাধ্যমে লোকশিক্ষা ও লোক-মনোরঞ্জনের উপায়রূপে পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙালী কবিগণ রাক্ষসবীরদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন। তরণীসেন, বীরবাহু, ইন্দ্রজিৎ এবং বিভীষণ প্রভৃতি রাক্ষস বীরগণ রামচন্দ্রের প্রতি ভক্তিতে ও মানবিক গুণাবলীর বিকাশে হনূমান এবং অঙ্গদবীরের মতই সমান সমৃদ্ধ। এমনকি রাবণও শেষ পর্যন্ত বৈরসাধনের অন্তরালে আত্মগোপনকারী ছদ্মবেশী ভক্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন রাম-কথা অবলম্বনে বঙ্গে বহু রামায়ণ বচিত হইয়াছে। বাল্মীকির 'নরচন্দ্রমা' রামচন্দ্র যেমন বাঙালীর নিকট বিষ্ণুর অবতার, তেমনি অনার্য সভ্যতার ধারক ও বাহক রাবণ ও রাক্ষসেরাও শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত ও অনুচর। বাল্মীকি-রামায়ণে পাওয়া যায় না এমন বহু কাহিনী বাংলা রামায়ণে পাওয়া যায়, যেমন — রত্নাকর দস্যুর বাল্মীকিত্ব লাভ, হরিশ্চন্দ্র রাজার উপাখ্যান, রঘুর দিগ্বিজয়, হনূমানের সূর্যকে কক্ষতলে ধারণ, হনূমানের প্রার্থনায় উগ্রচণ্ডার লঙ্কাত্যাগ, সীতা কর্তৃক হনূমানকে আম্র প্রদান, তরণীসেনের রামভক্তি, মহীরাবণের কালীভক্তি, রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব, রাবণ কর্তৃক রামকে রাজনীতি শিক্ষাদান, রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি গঠনের পরিকল্পনা, লবকুশের যুদ্ধ, সীতার মাহাত্ম্য বর্ণনা, শতস্কন্ধ রাবণ বধ এবং রাম-রাস ইত্যাদি। বাংলা রামায়ণকারগণ বিভিন্ন উৎস হইতে এই সকল বিষয় সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের কাব্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়াছেন। 'অদ্ভুত রামায়ণ' ও 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' ব্যতীত 'মহাভারত', বিভিন্ন পুরাণ, উপপুরাণ, 'মহানাটক' ও লোকশ্রুতি হইতেও বহু বিষয় বাংলা রামায়ণে গৃহীত হইয়াছে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর বাঙালী কবিদিগের কাব্য রচনায় ভক্তিধর্মের অভিনব প্রকাশ প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়। রাম-সীতার রাস ও পূর্বরাগাদির বর্ণনায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের প্রভাব অনস্বীকার্য।

অধ্যাত্ম রামায়ণে (উত্তরা কাণ্ড/৩য় অঃ) আছে, রাবণ সনৎকুমারের মুখে অবগত হইয়াছিলেন যে, যাঁহারা বিষ্ণুর হস্তে নিহত হন তাঁহারা পরমপদে অধিরূঢ় হন। ইহা জানিতে পারিয়া রামচন্দ্রের হস্তে মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিয়াই রাবণ বৈদেহীকে হরণ করিয়াছিলেন। আবাব সুন্দরকাণ্ডে (২য় অঃ) দেখা যায়, মৈথিলিকে হরণ করা অবধি

রাবণ রামচন্দ্রকেই অবিরত ধ্যান করিতেন। অধ্যাত্ম রামায়ণের এই ভক্তিবাদ বাংলা রামায়ণে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বাংলা রামায়ণে রক্ষোরাজ দশানন হইতে আরম্ভ করিয়া তরণী সেন, বীরবাহু, অতিকায় এবং মহীরাবণ প্রভৃতি সকল রাক্ষসবীরই সংগ্রামের পরিণতির কথা জ্ঞাত হইয়াও রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া একে একে বীরের মৃত্যু বরণ কবিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহাদের আজন্মসঞ্চিত পাপরাশি অনুতাপের অশ্রুতে বিধৌত হইয়া গিয়াছে। রাক্ষসবংশের অন্তর্জ্বালা বাঙালী কবিগণ অতি সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার অপর কারণ, বাঙালী কবিগণ দুর্দান্ত দুর্বৃত্ত জগাই মাধাইকে দেখিয়াছেন, আর শ্রবণ করিয়াছেন প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের জীবনমহিমা। বাস্তবে এইরূপ উদাহরণ আছে বলিয়াই বাঙালী রামায়ণকারগণ রাবণ ও তাঁহার রাক্ষসকুলকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে বিচার করিয়াছেন।

কৃষ্ণায়েত ও রামায়েত সম্প্রদায়ের কিছু বিরোধের অবসান এই যুগের কাব্যে আভাসিত হইয়াছে। কবিচন্দ্রের রচিত 'অর্জুন ও হনূমানের কক্ষা' পালায় এইরূপ সমন্বয়ের প্রভাব স্পষ্ট। আবার রঘুনন্দনের রাম রসায়নের গরুড়ের কাহিনীটিতে সম্প্রদায়গত বিভেদের সামান্য প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। গরুড় রামচন্দ্রকে কৃষ্ণের বেশ ধারণ করিতে বলিলে হনূমান তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করে। যদিও বৈষ্ণবদের নিকট রাম ও কৃষ্ণ উভয়ই বিষ্ণুর অবতার, তথাপি দুই একটি চিত্রে এইরূপ অন্তর্বিরোধের সামান্য প্রভাব পাওয়া যায়।

বাংলা রামায়ণে রামের চণ্ডীপূজার দ্বারা শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হইয়াছে। কালিকাপুরাণ ও দেবী ভাগবতের অন্তর্গত চণ্ডীপূজা ও নীলপদ্মের পরিবর্তে রামচন্দ্রের চক্ষুদানের উদ্যোগ কাহিনী কৃত্তিবাসী রামায়ণে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তাহা বাংলাদেশে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। কয়েকটি বাংলা রামায়ণে লঙ্কার দ্বার-রক্ষক দেবীব নাম পাওয়া যায় কালী (লঙ্কা কাণ্ড)।

বৈষ্ণব ও শাক্ত মতবাদের মত শৈব প্রভাবও বাংলা রামায়ণে ক্রিয়াশীল হইয়াছিল। অনার্যেরা ছিলেন শিবের উপাসক, আর আর্যেরা বিষ্ণুর। খুব সম্ভব এই কারণে রাক্ষসদের শৈব বলিয়া মনে করা হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাণী কৌশল্যা রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের পূর্বে শিবপূজায় নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণে সেই সময় শিবের নাম উল্লিখিত হয় নাই। কবিচন্দ্রের 'শিবরামের যুদ্ধ' পালাতে দেখা যায় হনূমান প্রথমে শিবভক্ত ছিল, পরে বামচন্দ্রের প্রতি তাহার আনুগত্য প্রকাশ পায়। কবিচন্দ্রের এই পালাটিতে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মমত সমন্বযের প্রভাব স্পষ্ট। কৃত্তিবাসী রামায়ণে পাওয়া যায়, কৈলাসের শিব স্বয়ং হনূমানরূপে আসিয়া সীতাদেবী কর্তৃক প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করেন (লঙ্কাকাণ্ড)। শৈব ও

বৈষ্ণব ধর্মমত সমন্বয়ের বহুবিধ প্রচেষ্টার মধ্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি অন্যতম বিষয় শ্রীরামের লঙ্কায় শিব প্রতিষ্ঠা (সুন্দরা কাণ্ড)। রামচন্দ্র কর্তৃক শিব প্রতিষ্ঠিত হইলে মহেশ সশরীরে আবির্ভূত হন এবং শিব ও রাম উভয়ে উভয়কে গুরুরূপে বন্দনা করেন। এইরূপ মিলনসাধনের প্রয়াস মধ্যযুগের বাংলা রামায়ণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মূল রামায়ণে দেখা যায় যে, রামের জীবৎকালে বাল্মীকি জীবিত ছিলেন এবং রামের রাজত্বকালের ঈষৎ পরেই তিনি 'রামায়ণ' রচনা করিয়া থাকিবেন (বাল কাণ্ড/১ম সর্গ)। কিন্তু বাংলা রামায়ণে পাওয়া যায়, রাম জন্মিবার প্রায় ষাট হাজার বৎসর পূর্বে বাল্মীকিমুনি তাঁহার অমর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। খুব সম্ভব লোকশ্রুতি হইতে এইরূপ ধারণা বাংলা বামায়ণে গৃহীত হইয়াছিল। বঙ্গে এই কারণে 'রাম না জন্মিতে রামায়ণ'— এই প্রবাদটির উদ্ভব হইয়া থাকিবে। বাংলা রামায়ণে বাঙালী জীবনের সংস্কারগুলি বহুলাংশে প্রতিফলিত হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, বাংলা রামায়ণ মহাকাব্যের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে কিনা? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মনীষীগণ বাল্মীকির কাব্যকে জাত মহাকাব্য (Epic) বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু বাংলা রামায়ণ বাল্মীকির মহাকাব্য অনুসরণ করিয়াও শিল্প সৌন্দর্যে ও গঠনরীতিতে বাল্মীকির মহাকাব্যের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। কৃত্তিবাস স্পষ্টতঃ তাঁহাব কাব্যকে 'পাঁচালি কাব্য' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কবিচন্দ্র বলিয়াছেন 'রামলীলা' বা 'রামমঙ্গল'। অতএব মধ্যযুগে রচিত বাংলা রামায়ণ যে সাধারণ পাঁচালি কাব্য তাহাতে অতিশয়োক্তি কিছু নাই।

আধুনিক বাঙালীর জীবনে ও মননে মধ্যযুগীয় জীবনরসে পুষ্ট সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ আকর্ষণবোধ পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু বাংলা রামায়ণকার কবিদিগের রচনাতে জীবনরসাশ্রিত এক অপূর্ব কাব্যচেতনারই সুপ্রকাশ ঘটিতে দেখা যায়। বাংলা রামায়ণে নরনারায়ণ রামচন্দ্রের দেবত্ব বিঘোষিত হইলেও তাঁহার মানবিক দিকটিও সমান প্রস্ফুটিত। নররূপী দেবতাব বন্দনা গান করিলেও কবিচন্দ্র ছিলেন যথেষ্ট পরিমাণে সমাজ সচেতন কবি। এইহেতু রামচন্দ্রের চরিত্রের মহত্ত্ব এবং খণ্ড খণ্ড সামাজিক চিত্রই তাঁহার কাব্যে প্রাধান্য লাভ কবিয়াছে। ক্ষমার অবতার রামচন্দ্র সাধারণ গুহক চণ্ডালকে 'মিতা' সম্বোধনে ভূষিত করিয়া তাহার সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করেন। রামচন্দ্রের প্রতি গুহকেব 'তুই' সম্বোধন শ্রবণে লক্ষ্মণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলে, রামচন্দ্র ভ্রাতাকে শান্ত করিয়া সাধারণ মানুষের ভাষাজ্ঞানেব ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনপূর্বক তাহাদের হৃদয়ের আন্তবিক আগ্রহ ও আকুলতার প্রতিই লক্ষ্মণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। মাছরাঙ্গা পক্ষী এবং অঞ্জনার ধৃষ্টতাকেও তিনি পরম সহিষ্ণুতায় নীরবে ক্ষমা করিয়াছেন এবং প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা

লক্ষ্মণের জন্যই লঙ্কাজয়ের বাসনা পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন। আবার অন্যান্য রামায়ণে যেখানে পাওয়া যায় রাবণের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে জটায়ুর প্রাণত্যাগের কথা, সেখানে কবিচন্দ্রের কাব্যে পাওয়া যায় রামচন্দ্রের পদ্মহস্ত স্পর্শে জটায়ুর প্রাণলাভের কথা । লঙ্কাজয়ের নিমিত্ত বানর, অঙ্গদ ও হনূমানাদির সঙ্গে যে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা রামচন্দ্র সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাও মহৎ নেতার গুণাবলীকেই উদ্ঘাটিত করিয়াছে । কবিচন্দ্রের কাব্যে সাধারণ এক কিষাণের জন্মভূমির প্রতি মমত্ববোধ বেশ জীবন্তরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে । তাহার জন্মভূমির প্রতি আকর্ষণবোধ যে কোনও দেশপ্রেমিক মানুষের চিত্তকে দেশপ্রেমে উদ্বোধিত করিবে । এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবিক উপাদান কাব্যে উদ্ঘাটিত করিয়া কবিচন্দ্র যথার্থ শিল্পীর সুমহান্ দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন । বাংলাদেশে প্রচলিত রাম-কথাকে তিনি বাণীময়, চিত্রময় ও গীতিময় করিয়া সর্বজনপ্রিয় করিয়া তোলেন । রামায়ণ বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনবেদ । তাহার সার্থকতম, সুন্দরতম এবং মহত্তম প্রকাশের অনুভূতি এই রামায়ণ কাব্যে রসরূপ লাভ করায় তাহা জনমানসে গভীর রেখাপাত করিতে সমর্থ হইয়াছিল ।

সেই কোন স্মরণাতীতকালে রামায়ণের ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, আদিকবির সেই শাশ্বত সঙ্গীতধ্বনি যুগ যুগ বাহিত হইয়া 'মধুর-করুণ তানে' আজিও হৃদয়কে বিধুর করিয়া তুলিতেছে, সেই সুরের প্রতিধ্বনি শোনা যায় আধুনিককালের কবির কণ্ঠে —

"শুধু সেদিনের একখানি সুর চিরদিন ধরে বহু বহু দূর
কাঁদিয়া হৃদয় করিছে বিধুর, মধুর-করুণ তানে ;
সে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে যে মহারাগিণী আছিল ধ্বনিতে
আজিও সে গীত মহাসঙ্গীতে বাজে মানবের কানে ।"

(পুরস্কার — সোনার তরী ।)

বাংলা রামায়ণ এই সুমহান্ সঙ্গীত ধ্বনিরই সার্থকতম প্রকাশ ।

পাদটীকা

জৈন রামায়ণের বিষয় নিম্নোক্ত গ্রন্থদ্বয় অবলম্বনে প্রদত্ত হইয়াছে ।

১। Dinesh Ch. Sen : The Bengali Ramayanas, Calcutta University, 1920, P. 208

এবং

রবিসেন আচার্য : পদ্মচরিতম্ (দরবারীলাল ন্যায়তীর্থ দ্বারা

সংশোধিত) ৩য় খণ্ড, ৯৪ পর্ব; পৃ. ১৯৮-১৯৯। (মাণিকচন্দ্র-জৈনগ্রন্থমালা নং ৩১, বীর নিঃ সংবত ২৪৫৫) ১৯২৮/২৯ খ্রীঃ।

২। দীনেশচন্দ্র সেন : পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩২। পৃ. ২৬৬

৩। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত পৃ. ২৬৮

৪। বাধামাধব ঘোষ : 'রামলীলা' (আখ্যাপত্র ছিন্ন) বাঁকুড়া হইতে মুদ্রিত।

৫। Dinesh Ch. Sen : The Bengali Ramayanas, Calcutta University, 1920, P. 208

এবং

রবিসেন আচার্য : পদ্মচরিতম্ ন্যায়তীর্থ পণ্ডিত, দরবারী লাল দ্বারা সংশোধিত। (প্রকাশিত, মাণিকচন্দ্র-দিগম্বর-জৈন গ্রন্থমালা, বীর (নিঃ সংবত ২৪৫৫) ১৯২৮/২৯ খ্রীঃ। তৃতীয় খণ্ড, ৯৪ পর্ব, পৃ. ১৯৭-১৯৮।

৬। ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত : দশরথ জাতক-৪৬১, জাতক ৪র্থ খণ্ড, করুণা প্রকাশনী, কলি-৯ পৃ. ৮৭-৯১ হইতে উক্ত কাহিনী গৃহীত।

৭। Daisetz Teitaro Suzuki : The Lankavatara Sutra. (Tr. for the first time from the original Sanskrit) London, 1932. PP. 1-21

৮। নগেন্দ্র নাথ বসু : বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ এবং উৎকলে বুদ্ধাবতার ও বৌদ্ধধর্মের পুনরভ্যুদয়, - হরপ্রসাদ সংবর্ধন লেখমালা, প্রথম খণ্ড, ১৩৩৮ সাল, পৃ. ২৪২

৯। তারাকান্ত কাব্যতীর্থ অনূদিত : অদ্ভুত রামায়ণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৩১১ সাল।

১০। পঞ্চানন তর্করত্ন অনূদিত : অধ্যাত্ম রামায়ণ, ২য় সং, ১৩৩৫ সাল।

১১। রবীন্দ্রনাথ : ভাষা ও ছন্দ-রবীন্দ্র বচনাবলী ৩য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৩৬৮ সাল। পৃ. ৯১৭

১২। নলিনীকান্ত ভট্টশালী : মহাকবি কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ । আদি কাণ্ড, ঢাকা, ১৯৩২ । ভূমিকা ।

১৩। আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাল্মীকির রামায়ণ ও বাঙ্গালীর রামায়ণ- বিশ্ববাণী, শারদীয়া সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৮৪ । পৃ. ৩৭৭

১৪। দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সং, ১৩৫৬ সাল, পৃ. ৮৭

১৫। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত পৃ. ২৮৫-২৮৬

১৬। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত পৃ. ২৮৬

১৭। দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত : বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, ১ম খণ্ড ১৯১৪ খ্রীঃ পৃ. ৫৪১-৫৪৯

১৮। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত পৃ. ৫৩৯-৫৪১

১৯। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত পৃ. ৫৫৩-৫৫৮

২০। উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত : ভবানীনাথের লক্ষ্মণ দিগ্বিজয় ৩০ নং ফকিরচাঁদ চক্রবর্তী লেন, কলিকাতা । (সনের উল্লেখ নাই) পৃ. ৭৯

২১। অজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত : রামপ্রসাদী-জগদ্রামী রামায়ণ, ১ম সং, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা।

২২। রাধামাধব ঘোষ রচিত : রামলীলা কাব্য (আখ্যাপত্র ছিন্ন) বাঁকুড়া মুখার্জী প্রেস হইতে প্রকাশিত । পৃ. ১৭৪

২৩। কিশোরী মোহন গোস্বামী সম্পাদিত : রঘুনন্দন গোস্বামী বিরচিত শ্রীরাম রসায়ন, কলিকাতা, ১৩০৮ সাল ।

২৪। নীলরতন মুখোপাধ্যায় : রামমোহনের রামায়ণ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০২ সাল, ১ম সংখ্যা। পৃ. ১-১০

২৫। দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সংস্করণ ১৩৫৬ সাল । পৃ. ২৮৭

২৬। মণীন্দ্রমোহন বসু : বাঙ্গলা সাহিত্য ২য় খণ্ড, ১৯৪৭ খ্রীঃ পৃ.১৬৯-১৭০

২৭। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত পৃ. ১৭৪-১৭৭

২৮। প্রাগুক্ত : প্রাগুক্ত পৃ. ১৬৯-১৭০

২৯। তরুণকান্ত ভট্টাচার্য : দুর্গাবরী বাংলা রামায়ণ, — সুবর্ণ লেখা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪। পৃ. ৬০৫-৬০৬

৩০। বাংলা রামায়ণের কবিদিগের সময়কাল নির্ণয়ের জন্য প্রধানতঃ তিনটি গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে —

(ক) দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সং, ১৩৫৬ সাল।

(খ) দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, ১ম খণ্ড, ১৯১৪।

(গ) মণীন্দ্রমোহন বসু : বাঙ্গলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, ১৯৪৭ খ্রীঃ।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

(ক) বাংলা গ্রন্থ

অদ্ভুতাচার্য বিরচিত (রজনীকান্ত চক্রবর্তী সম্পাদিত) : অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ, আদ্যকাণ্ড (১ম সং), রঙ্গপুর : সাহিত্য পরিষৎ কার্যালয়, রঙ্গপুর, ১৩২০ (১৯১৩)।

অভিরাম দাস (পীযূষ কান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত) : গোবিন্দ বিজয় (১ম সং), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, : ১৩৭৬ (১৯৬৯)

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাঁকুড়ার মন্দির (১ম সং), সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৩৭১ (১৯৬৪)

" : বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি (২য় সং), ১৯৭৫ খ্রীঃ।

" : পশ্চিম বাংলার গ্রামের নাম জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৮০

অশোক মিত্র : পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা (বাঁকুড়া) ৪র্থ খণ্ড, (গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া) ১৯৬১।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড (২য় সং), মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৩৭০ (১৯৬৩)

" : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ২য় খণ্ড (২য় সং), মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৩৭৮ (১৯৭১)

" : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড (১ম সং), মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৬৬ খ্রীঃ।

" : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৪র্থ খণ্ড (১ম সং), মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৩৮০ (১৯৭৩)।

আনন্দময় মুখোপাধ্যায় : রামায়ণ যুগে ভারত সভ্যতা, ফার্মা. কে. এল. মুখার্জী, কলিকাতা, ১৯৪৭।

আশা দাস : বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি (১ম সং), ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, ১৩৭৬ (১৯৬৯)

আশুতোষ ভট্টাচার্য	:	বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (৩য় সং), এ. মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৩৬৪ (১৯৫৮)
”	:	বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (৪র্থ সং), এ. মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৩৬৪ খ্রীঃ।
”	:	বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (৫ম সং), এ. মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৭০ খ্রীঃ।
”	:	বাংলা মঙ্গলকাব্যেব ইতিহাস (৬ষ্ঠ সং), এ. মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৩৮১ (১৯৭৫)
”	:	বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড (৩য় সং), ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, ১৯৬২ খ্রীঃ।
”	:	বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড (১ম সং), ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, ১৩৭২ (১৯৬৫)
”	:	বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকব, তৃতীয় খণ্ড (১ম সং), ডি.এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৭৪ (১৯৬৭)।
” (সম্পাদিত)	:	কৃত্তিবাসী রামায়ণ, অখিল ভারত জনশিক্ষা প্রচার সমিতি, কলিকাতা ।
আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত	:	সুবর্ণলেখা স্মারক গ্রন্থ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪।
উইলিয়াম কেবী সম্পাদিত	:	কৃত্তিবাসী বামায়ণ, ১-৫ খণ্ড (১ম সং), শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, ১৮০৩ ।
ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত	:	দশরথ জাতক- ৪৬১, জাতক, ৪র্থ খণ্ড। করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা।
কবিচন্দ্র জয়গোবিন্দ দাস	:	শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত (১ম সং), সনাতন গোস্বামীর ভাগবতামৃতের অনুবাদ। বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা।

কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্র (সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শুভেন্দুসুন্দর সিংহরায় দ্বারা সম্পাদিত) : বাশুলীমঙ্গল বা বিশাল লোচনীর গীত (১ম সং), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬৪ (১৯৫৭)।

কবিচন্দ্র মোহান্ত বিদ্যাভূষণ অনূদিত : বাল্মীকি রামায়ণ, বালকাণ্ড (১ম সং), অসমীয়া ভাষায় অনূদিত, গুরহাটী, আসাম, ১৯৬২ ।

কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী বিরচিত (মাখনলাল মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত) : ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গল (১ম সং), রাধাবাজার কলিকাতা এজেন্সি-আই.ডি.এল. প্রেস, কলিকাতা, ১৩৪১ (১৯৩৪)।

কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী (মাখনলাল মুখোপাধ্যায় সংগৃহীত এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত) : শ্রীশ্রীশীতলামঙ্গল (১ম সং), পানুয়া রামকৃষ্ণ পাঠাগাব, বাঁকুড়া, ১৩৬৮ (১৯৬১)।

কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী (চিত্রাদেব সম্পাদিত) : বিষ্ণুপুরী রামায়ণ (১ম সং), জি.ভরদ্বাজ অ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৩৮৬ (১৯৭৯) ।

কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী বিরচিত (চিত্রাদেব সম্পাদিত) : মহাভারত (১ম সং), সাহিত্যলোক, কলি, ১৩৮৯ (১৯৮২)।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ : চৈতন্য চরিতামৃত (৩য় সং), সুলভ লাইব্রেবী, কলিকাতা, চৈতন্যাব্দ ৪৪১।

কৃষ্ণরাম দাস (সত্য নারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত) : কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮।

কেদারনাথ মণ্ডল সম্পাদিত : কৃত্তিবাসী রামায়ণ (১ম সং), মেদিনীপুর, ১৩২৭ (১৯২০)।

কেদারনাথ মজুমদার : রামায়ণের সমাজ, কলিকাতা, ১৩১৬ (১৯০৯)।

গুরুসদয় দত্ত : পটুয়া-সঙ্গীত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯।

গোপালদাস চৌধুরী ও প্রিয়বঞ্জন সেন : প্রবাদ বচন (১ম সং), বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড. কলিকাতা, ১৩৬৭ (১৯৬০)।

চণ্ডীদাস বিরচিত (বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত)	:	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (৪র্থ সং), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৬ (১৯৪৯)।
চিত্রাদেব সম্পাদিত	:	শঙ্কর কবিচন্দ্র বিরচিত বিষ্ণুপুরী রামায়ণ (১ম সং), জি.ভরদ্বাজ অ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৩৮৬ (১৯৭৯)।
জগদ্রাম ও রামপ্রসাদ (অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত)	:	অদ্ভুত অষ্টকাণ্ডে সম্পূর্ণ রামপ্রসাদী জগদ্রামী রামায়ণ, (১ম সং), কলিকাতা, ১৩৬১ (১৯৫৪)।
জয়নারায়ণ	:	করুণানিধানবিলাস, (আখ্যাপত্র ছিন্ন)
জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী	:	প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার, ১ম খণ্ড, (২য সং), ডি.এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৮২ (১৯৭৫)।
”	:	আর্যা সপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ (১ম সং), সান্যাল এ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৩৭৮ (১৯৭১)।
জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার সঙ্কলিত	:	সঙ্গীতকেশরী স্বর্গীয় অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ পরিচয, ষষ্ঠ খণ্ড, ১৩৩৪ (১৯২৭)।
তমোনাশ দাশগুপ্ত	:	প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম সং), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৫৮ (১৯৫১)।
তরুণদেব ভট্টাচার্য	:	বাঁকুড়া (১ম সং), ফার্মা.কে.এল.এম. প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৮২।
তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	:	পানুয়ার ইতিকথা (১ম সং), পানুয়া রামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার, বাঁকুড়া, ১৩৬৭ (১৯৬০)।
”	:	কদম্বের আত্মকথা, পানুয়া রামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার, বাঁকুড়া, ১৯৬২ ।
(হিন্দীকবি) তুলসীদাস বিরচিত (সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত অনূদিত)	:	রামচরিত মানস (২য় সং), খাদি প্রতিষ্ঠান, কলিকাতা, ১৩৫২ (১৯৪৬)।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার : ঠানদিদির থলে, বাংলার ব্রতকথা, বাংলার কথা সাহিত্য, ৩য় সংখ্যা (৩য় সং), ১৩৫২ (১৯৪৫)।

দীনেশচন্দ্র সেন (সম্পাদিত) : বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, ১ম খণ্ড (১ম সং), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯১৪ ।

" : বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, ২য় খণ্ড (১ম সং), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯১৪ ।

" : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৫ম সং), গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা, ১৩৩৪ (১৯২৭)।

" : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৮ম সং), দাশগুপ্ত এ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৩৫৬ (১৯৪৯)।

" (সম্পাদিত) : পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা (চন্দ্রাবতীব রামায়ণ) (২য় সং), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; ১৯৩২।

" (সম্পাদিত) : কৃত্তিবাসী রামায়ণ, ডি. ভট্টাচার্য, কলিকাতা, ১৯২৬।

" : বৃহৎবঙ্গ, ১ম খণ্ড (১ম সং), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪১ (১৯৩৪)।

" : বৃহৎবঙ্গ, ২য় খণ্ড (১ম সং), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪২ (১৯৩৫)।

দীনেশচন্দ্র সেন (রবীন্দ্রনাথ লিখিত ভূমিকা) : রামায়ণী কথা (সপ্তদশ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ), জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৩৭০ (১৯৬৩)।

দেবকুমার চক্রবর্তী : বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি (১ম সং), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা, ১৯৭২।

নগেন্দ্রনাথ বসু : বিশ্বকোষ-ক-কার্য্য (৩য় ভাগ, বস্ত্রকবিবাহ (১৮শ ভাগ) বিশ্বকোষ, মৎস্য দ্বাদশী-মিব্, বিশ্বকোষ কার্যালয় কলিকাতা, ১৩০১ (১৮৯৪)।

নগেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত বারিধি প্রণীত : বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (১ম ভাগ), ব্রাহ্মণকাণ্ড (২য সং), কলিকাতা, ১৩১৮ (১৯১১)।

(শ্রীল) নরহরি চক্রবর্তী : শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর, চৈতন্য মঠ, মায়াপুর, নদীয়া, ১৩৪৭ (১৯৪০)।

নলিনীকান্ত ভট্টশালী : মহাকবি কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৬।

নিত্যানন্দ দাস : প্রেমবিলাস, ২য় সং, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, সন ১৩২০ (১৯১৩)।

নীহাররঞ্জন রায : বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব (১ম সং), বুক এমপোরিয়ম, কলিকাতা, ১৩৫৬ (১৯৪৯)।

পঞ্চানন মণ্ডল : পুঁথি পরিচয়, ১ম খণ্ড (১ম সং), বিশ্বভারতী, ১৩৫৮ (১৯৫১)।

” : পুঁথি পরিচয়, ২য় খণ্ড (১ম সং), বিশ্বভারতী, ১৩৬৪ (১৯৫৭)।

” : পুঁথি পরিচয়, ৩য় খণ্ড (১ম সং), বিশ্বভারতী, ১৩৬৯ (১৯৬৩)।

” : বর্ধমান সাহিত্য সভা প্রকাশিকা-২, বর্ধমান সাহিত্য সভা, ১৩৫১ (১৯৪৪)।

পঞ্চানন রায় ও প্রণব রায় : ঘাটালের কথা, ১ম সং, বাণীসংসদ, কলিকাতা, ১৩৮৪ (১৯৭৭)।

পূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর সম্পাদিত : সপ্তকাণ্ড কৃত্তিবাসী রামায়ণ (৪র্থ সং), কলিকাতা, ১৩৫৬ (১৯৪৯)।

পৃথ্বীচন্দ্র বিরচিত (বিমান বিহারী মজুমদার সম্পাদিত) : গৌরীমঙ্গল (১ম সং), এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭১।

(স্বামী) প্রজ্ঞানানন্দ : সঙ্গীত ও সংস্কৃতি, ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস, উত্তরভাগ (১ম সং), শ্রীরামকৃষ্ণ, বেদান্ত মঠ, কলিকাতা।

প্রদীপকুমার সিংহ সম্পাদিত : রাঢ়ের পদাবলী (১ম সং), বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, ১৯৮০।

প্রবোধচন্দ্র সেন : রামায়ণ ও ভারত সংস্কৃতি (১ম সং), জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৩৬৯ (১৯৬২)।

" : ছন্দ জিজ্ঞাসা (১ম সং), জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৩৮১ (১৯৭৪)।

ফকিরনারায়ণ কর্মকার : বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী (১ম সং), পাবলিশার্স ওন্‌লি, কলিকাতা, ১৩৭৪ (১৯৬৮)।

বাল্মীকি রচিত (শিশিরকুমার নিয়োগী অনূদিত এবং ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী লিখিত ভূমিকা) : রামায়ণ, (বালকাণ্ড-উত্তরাকাণ্ড) গদ্যে সাবানুবাদ (১ম সং), এ. মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৩৬৫ (১৯৫৮)।

বাসন্তী চৌধুরী : বাংলার বৈষ্ণব সমাজ সঙ্গীত ও সাহিত্য, (১ম সং), বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৩৭৫ (১৯৬৮)।

বিনয় ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ১ম ভাগ, (১ম সং), পুস্তক প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৫৭।

বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় : সংস্কৃত নাটকে রামায়ণের প্রভাব (১ম সং), বিমলারঞ্জন প্রকাশন। (প্রকাশকাল নাই)।

বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রণীত (বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও অনূদিত) : সাহিত্য দর্পণঃ (১ম সং), পুস্তকশ্রী, কলিকাতা, ১৩৭৬ (১৯৬৯)।

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় : যাত্রাগানের ইতিবৃত্ত (১ম সং), আশা প্রকাশনী, ১৩৮৪ (১৯৭৭)।

বৃন্দাবন দাস ঠাকুর (বাধাগোবিন্দনাথ সম্পাদিত) : চৈতন্য ভাগবত (আদিখণ্ড-অন্ত্য খণ্ড), সাধনা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৬৬-৬৭।

বেণীমাধব ভট্টাচার্য সঙ্কলিত : শিশুবোধক, কলিকাতা, ১২৭৮ (১৯৭১)।

ভবানীনাথ বিরচিত (উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত) : লক্ষ্মণ দিগ্‌বিজয়, ফকিরচাঁদ লেন, (প্রকাশকাল নাই)।

ভবানীশঙ্কর দাস বিরচিত (রাজচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত) : মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা (১ম সং), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩২৩ (১৯১৬)।

(কবি) ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদ ও মধুসূদন চক্রবর্তী বিরচিত (প্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত) : বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী, (১ম সং), বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, ১৩৫৬ (১৯৪৯)।

মদনমোহন গোস্বামী সম্পাদিত : ভারতচন্দ্র, সাহিত্য আকাদেমী, ১৯৬১।

মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত : চর্যাপদ (পুনর্মুদ্রণ), কমলাবুক ডিপো, কলিকাতা, ১৯৫৯।

" : বাঙ্গলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড (১ম সং), কমলা বুক ডিপো, কলিকাতা, ১৩৫৪ (১৯৪৭)।

মনোহর দাস : অনুরাগবল্লী (৩য় সং), বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা, গৌরাব্দ ৪৪৫ (১৯৩১)।

মাখনলাল মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত : ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গল (১ম সং), রাধাবাজার কলিকাতা এজেন্সি, আই.ডি.এল. প্রেস, কলিকাতা, ১৩৪১ (১৯৩৪)।

মাণিকলাল সিংহ : পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি (১ম সং), দি নিউ মিনার্ভা প্রেস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুর শাখা, বাঁকুড়া, ১৩৮৪ (১৯৭৭)।

যদুনন্দন দাস : কর্ণানন্দ (২য় সং), রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত, বহরমপুর, ১২২০ (১৯১৩)।

যোগেশচন্দ্র বসু : মেদিনীপুরের ইতিহাস, ১ম ভাগ কলিকাতা, ১৩২৮ (১৯২১)।

রঘুনন্দন গোস্বামী বিরচিত (অরুণোদয় রায় দ্বারা প্রকাশিত) : শ্রীরাম রসায়ন, বঙ্গবাসী প্রেস, কলিকাতা, ১৩০৮ (১৯০১)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গ্রাম্য সাহিত্য, লোক সাহিত্য, কবিজীবনী, সাহিত্য, রামায়ণ, প্রাচীন সাহিত্য, সঙ্গীত চিন্তা, বাংলা ছন্দ, সঙ্গীতের মুক্তি, ভাষা ও ছন্দ, সোনার তরী, পয়ার ও দ্বাদশাক্ষর ছন্দ- রবীন্দ্র রচনাবলী (৩য়, ১৩শ, ১৪শ খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩৬৮ (১৯৬১)।

রবীন্দ্রনাথ মাইতি : চৈতন্য পরিকর (১ম সং), বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৩৬৯ (১৯৬২)।

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : দ্বিতীয় দিল্লী বিষ্ণুপুর (১ম সং), বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩৪৮ (১৯৪১)।

রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, প্রাচীন যুগ (৬ষ্ঠ সং), জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা; ১৯৭৪।

" : বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, মধ্য যুগ (২য় সং), জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স, কলিকাতা; ১৩৮০ (১৯৭৪)।

" : বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, আধুনিক যুগ (২য সং),জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স কলিকাতা; ১৩৮১ (১৯৭৬)।

রাজশেখর বসু সম্পাদিত : বাল্মীকি রামায়ণ (৭ম মুদ্রণ), এম.সি.সরকার এ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা, ১৩৮৩ (১৯৭৬)।

রাধামাধব ঘোষ বিরচিত : রামলীলা, বাঁকুড়া মুখার্জী প্রেস, বাঁকুড়া।

রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র (আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত) : শিবায়ন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৬৩ (১৯৫৬)।

(দ্বিজ) রামদেব (আশুতোষ দাস কর্তৃক সম্পাদিত) : অভয়ামঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭।

(কবি) রামাই পণ্ডিত বিরচিত (চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত) : শূন্যপুরাণ বসুমতী সাহিত্য মন্দিব, কলিকাতা, ১৩৩৬ (১৯৫৯)।

(কবি) রামেশ্বর বিরচিত (পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত) : শিবায়ন, রামেশ্বর রচনাবলী (১ম সং), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭১ (১৯৬৪)।

(কবি) রূপরাম বিরচিত (সুকুমার সেন ও পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত) : ধর্মমঙ্গল, ১ম খণ্ড, বর্ধমান সাহিত্য সভা, বর্ধমান, ১৩৫১ (১৯৪৪)।

রোহিনীনন্দন সরকার ও চন্দ্রনাথ বসু অনূদিত : জৈমিনি ভারত (১ম সং), মহাভারত কার্যালয়, কলিকাতা, ১২৯০ (১৮৮৩)।

শিবরতন মিত্র সঙ্কলিত : বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক, ২য় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩২৬ (১৯১৯)।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে (১ম সং) মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৩৬৯ (১৯৬২)।

(গৌড়কবি) সন্ধ্যাকার নন্দী বিরচিত (রাধাগোবিন্দ বসাক অনূদিত) : রামচরিত, জেনারেল পিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৫৩।

সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম সং), ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৩৪৭ (১৯৪০)।

" : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ (৪র্থ সং), ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৬৩।

" : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ (১ম সং), ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৭০ (১৯৬৩)।

" : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ (২য় সং), ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৭২ (১৯৬৫)।

সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত (৭ম সং), ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৬৯ (১৯৬২)।

" : ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস (১ম সং), কলিকাতা, ১৩৬৮ (১৯৬১)।

সুখময় মুখোপাধ্যায় : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, (১ম সং), জি. ভরদ্বাজ এ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৩৮১ (১৯৭৪)।

" : বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময় (১ম সং), ভারতী বুক ষ্টল, কলিকাতা, ১৯৭৩।

" : কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ (২য় সং), ভারবী প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯৮১।

সুবোধ ঘোষ : কিংবদন্তীর দেশে (১ম সং), নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৬১ (১৯৫৪)।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান (১ম সং), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৩৬৯ (১৯৬২)।

সৌদামিনী দেবী কর্তৃক অনূদিত : অদ্ভুত রামায়ণ (১ম সং), সিমুলিয়া, কলিকাতা, ১২৯৭ (১৮৯০)।

হরিপদ চক্রবর্তী : দাশরথি রায়ের পাঁচালী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩২।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় : দাতাকর্ণ নাটক (১ম সং), কল্যাণপুর, হাবড়া, ১৩০৪ (১৮৯৭)।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : পদাবলী পরিচয়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা, ১৩৫৯ (১৯৫২)।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা) : কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ (১ম সং), সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৩৬৪ (১৯৫৭)।

হেমলতাদেবী বিরচিত (প্রদীপকুমার সিংহ সম্পাদিত)	:	মানবীবিলাস (১ম সং), বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, ১৩৮৭ (১৯৮০)।
হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য	:	যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায় (১ম সং), চলন্তিকা, কলিকাতা, ১৩৭৪ (১৯৬৭)।

(খ) **সংস্কৃত গ্রন্থ**

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীত (রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত)	:	ঋগ্বেদ সংহিতা, ১ম খণ্ড (১ম সং), হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭৬।
কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীত (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অনূদিত)	:	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড), বিশ্বকোষ প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৮ (১৯১১)।
কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীত (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃতানুবাদ)	:	শ্রীমদ্ভাগবতম্ (নবম স্কন্ধ), বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত, মুর্শিদাবাদ, ১৩০৬ (১৮৯৯)।
কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীতম্ (পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত এবং অনূদিত)	:	অধ্যাত্ম-রামায়ণম্, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণান্তর্গতম্, (২য় সং), ৬নং ভবানীদত্ত লেন, বঙ্গবাসী ইলেক্‌ট্রো মেসিন যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩৩৫ (১৯২৮)।
”	:	কূর্মপুরাণম্ (২য় সং), কলিকাতা, ১৩৩২ (১৯২৫)।
”	:	দেবী পুরাণম্ (২য় সং), কলিকাতা, ১৩৩৪(১৯২৭)।
”	:	স্কন্দ পুরাণম্ (নাগর খণ্ড), কলিকাতা, ১৮১৮।
”	:	পদ্মপুরাণম্ (স্বর্গ খণ্ড), বঙ্গবাসী প্রেস কলিকাতা, ১৩১৩ (১৯০৬)।
”	:	পদ্ম পুরাণম্ (পাতাল খণ্ড), ২য় সং, কলিকাতা, ১৩১৮ (১৯১১)।
”	:	শিব পুরাণম্, বঙ্গবাসী প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৪ (১৯০৭)।

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস (পুষ্পেন্দ্রকুমার ও নাগসরণ সিং সম্পাদিত)	: শিবমহাপুরাণম্, নাগ পাবলিশার্স, জওহরনগর, দিল্লী, (প্রকাশকাল নাই)।
কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীতম্ (হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ও অনূদিত)	: মহাভারতম্, ৪র্থ খণ্ড (বনপর্ব), সিদ্ধান্ত যন্ত্রে মুদ্রিত, কলিকাতা, ১৩৪০ (১৯৩৩)।
কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীতম্ (মহেশচন্দ্র পাল অনূদিত)	: মার্কণ্ডেয় পুরাণম্, কলিকাতা, ১৮১২শকাব্দ(১৮৯০)।
কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ভট্টাচার্য বিরচিত (পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত বীরেশনাথ বিদ্যাসাগর কৃত বঙ্গানুবাদ)	: তন্ত্রসার, বঙ্গবাসী সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৩৪ (১৯২৭)।
কৃষ্ণানন্দ আগম বাগীশ সঙ্কলিত (উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত)	: বৃহৎ তন্ত্রসার (১০ম সং), বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা।
বাল্মীকি প্রণীতম্ (তারাকান্ত কাব্যতীর্থ ভট্টাচার্য অনূদিত)	: অদ্ভুত রামায়ণম্, বঙ্গবাসী সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩১১ (১৯০৪)।
বাল্মীকি প্রণীতম্	: যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণম্। বঙ্গবাসী সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩১১ (১৯০৪)।
বাল্মীকি প্রণীতম্ (পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত ও অনূদিত)	: রামায়ণম্ (৩য় সং), বঙ্গবাসী কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩১১ (১৯০৪)।
রবিসেন আচার্য (দরবারী লাল ন্যায়তীর্থ দ্বারা সংশোধিত ও সম্পাদিত)	: পদম চরিতম্ ১-৩ খণ্ড, মাণিকচন্দ্র-দিগম্বর জৈন গ্রন্থমালা সিরিজ-২৯, ৩০, ৩১, বোম্বাই, বীর. নিঃ সংবত ২৪৫৪-২৪৫৫ (১৯২৮-২৯)।

হনূমত বিরচিতম্ (মধুসূদন মিশ্র ও জীবানন্দ বিদ্যাসাগর কৃত ব্যাখ্যা)	:	মহানাটকম্ (৩য় সং), গিরীশ যন্ত্রে মুদ্রিত, কলিকাতা, ১৯৩৯)।
হনূমত বিরচিতম্ (কালীপদ তর্কাচার্য কৃত বঙ্গানুবাদ)	:	মহানাটকম্ (৫ম অঙ্ক পর্যন্ত), সংস্কৃত বুক ডিপো, কলিকাতা, ১৯৪৫।

(গ) **<u>বাংলা প্রবন্ধ</u>**

অমূল্য ধন রায়ভট্ট	:	শ্রীল ঠাকুর কবিচন্দ্র ভট্ট. ভক্তি, আশ্বিন ও কার্তিক ১৩৩১।
আশুতোষ ভট্টাচার্য	:	বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে বাল্মীকির রামায়ণ, জীবনানন্দ। রামায়ণ সংখ্যা, বৈশাখ আষাঢ় ১৩৮৩।
ক্ষুদিরাম দাস	:	বাঙ্লা ছন্দ, সুনীতিকুমার ও আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ, বাংলা সাহিত্য, পত্রিকা, পঞ্চম বর্ষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭-৭৮।
গঙ্গাগোবিন্দ রায়	:	মল্লভূমির প্রাচীন গ্রন্থকার কবিচন্দ্র ও মল্লনৃপতিগণ, অভিযান পত্রিকা (দ্বিতীয় বর্ষ, ৪৮ শ সংখ্যা) ৬ই জুন, ১৯৪৩।
গোকুলচন্দ্র ঘোষ	:	কবিচন্দ্র, অভিযান পত্রিকা, বাঁকুড়া, ২৯শে অক্টোবর ১৯৪৪।
গোকুল লাল দে	:	প্রাচীন বাঁকুড়ার সাহিত্য কৃতি, ফাল্গুনী, পৌষ, ১৩৫৬।
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী	:	বাংলায় জীমূতবাহনের কাহিনী, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৩-৪ সংখ্যা, ১৩৬৭।
চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত	:	মল্লরাজধানীর অধুনালুপ্ত একটি উৎসবের স্মৃতিচারণ, বাঁকুড়া হিতৈষী, বাঁকুড়া। শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮৩।
তরুণদেব ভট্টাচার্য	:	বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা, বীরহাম্বীর বৃত্ত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৮৭ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা কার্তিক-পৌষ ১৩৮৭।

ত্রিপুরা বসু : "মঙ্গল কাব্যের অনালোচিত অধ্যায় ঃ নবাবিষ্কৃত কবি ও কাব্য শঙ্করের শীতলামঙ্গল", সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৮৪।

নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায় : প্রাচীন বাঁকুড়ার সাহিত্য কৃতি (গোপাল লাল দে লিখিত প্রবন্ধের পাদটীকায় মন্তব্য) ফাল্গুনী, পৌষ ১৩৫৬।

নলিনীকান্ত ভট্টশালী : কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ, ভারতবর্ষ, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯।

নিখিলনাথ রায় : বিষ্ণুপুরের কথা, পঞ্চপুষ্প, জ্যৈষ্ঠ ৩য় বর্ষ, ১ম খণ্ড ১৩৩৭ সাল। আষাঢ় ৩য় বর্ষ, ১ম খণ্ড ১৩৩৭।

নিমাই দাস চট্টোপাধ্যায় : মল্লভূমির বিস্মৃত রত্ন, অভিযান পত্রিকা, ২০শ বর্ষ, ২৪শ সংখ্যা, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৬০।

পঞ্চানন মণ্ডল : 'জয়দেবের ওড়িয়া দাবীর আপত্তি খণ্ডন, আর্য পত্রিকা, পূজা সংখ্যা, ১৩৭৯।

প্রণব রঞ্জন রায় : 'গঙ্গামঙ্গল ও প্রাণবল্লভের জাহ্নবী মঙ্গল' বিশ্বভারতী পত্রিকা, ২৮শ বর্ষ, আষাঢ় ১৩৮০।

ব্যোমকেশ মুস্তফী : কবিচন্দ্র অযোধ্যারাম-'সত্যনারায়ণ কথা', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১ম সংখ্যা, ১৩০৮।

মাখনলাল মুখোপাধ্যায় : 'কবিচন্দ্র ও বিষ্ণুপুরী রামায়ণের ভূমিকা, ফাল্গুনী পত্রিকা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭।

মাণিকলাল সিংহ : 'মল্লরাজাদের পারিবারিক পরিচয়, বিশ্ববাণী পত্রিকা, ৩৫শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৮০।

" : মল্লভূমের মনসা পূজা ও ঝাপান, দেশ পত্রিকা, ৪১শ বর্ষ, ৩রা নভেম্বর ১৯৭৩।

" : মল্লভূমের শিকারোৎসব, দেশ পত্রিকা, ৩৯ শ বর্ষ. ২৯শে জুলাই ১৯৭২।

" : মল্লভূমের মল্লরাজা দেবতাদের আদিবৃত্তান্ত, কৌশিকী. ৪র্থ বর্ষ. ভাদ্র আশ্বিন ১৩৮১। (১৯৭৪)

রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত : 'দেশাবলী বিবৃতি', ১০। বিষ্ণুপুর। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১ম-২য় সংখ্যা ১৩৫৫।

রাজেন্দ্রলাল আচার্য (শিশিরকুমার নিয়োগী সম্পাদিত ও অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য অনূদিত) : 'রামায়ণের অনুধ্যান', বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ (আদিকাণ্ড)। বরদা এজেন্সী, কলিকাতা ১৩৪৩ (১৯৩৬)।

শশিভূষণ বিশ্বাস : মল্লভূমি, ঐতিহাসিক চিত্র, ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১৩০৬।

(ঘ) বাংলা অভিধান

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস : বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, ১-২ খণ্ড (২য় সং), দি ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৯৩৭।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ : ভারত কোষ, পঞ্চম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৮০ (১৯৭৩)।

হরিদাস দাস কর্তৃক সঙ্কলিত : শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, ২য়-৪র্থ খণ্ড (১ম সং), হরিবোল কুটির, নবদ্বীপ ৪৭১ চৈতন্যাব্দ (১৯৫৭)।

(ঙ) বাংলা পুথির তালিকা

(মুন্‌শী) আবদুল করিম সঙ্কলিত : বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা ১৩২০। ২য় খণ্ড, ১৩২১।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সঙ্কলিত : বাংলা পুথির বিবরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। কলিকাতা, ১৩৫১ (১৯৪৪)।

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত : বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয়, প্রথম খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৭৮।

এশিয়াটিক সোসাইটি কলিকাতা	:	বাংলা পুথির তালিকা (গভর্ণমেন্ট সংগ্রহ)। (Descriptive Catalogue of Vernacular Manuscripts of Royal Asiatic Society of Bengal. Vol-I and Vol-IX)
"	:	Catalogue of Printed Books and Manuscripts in Sanskrit belonging to the Oriental Library of the Asiatic Society of Bengal. (Fasciculus-II).
এশিয়াটিক সোসাইটি কলিকাতা	:	সংস্কৃত ও বাংলা পুথি:- Notices of Sanskrit Manuscripts First Series-Vols.I-IX (R.L.Mitra), Vols.X-XI. Second Series-Vols. I-IV. by H.P. Sastri. ed.
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (কলিকাতা)	:	বাংলা পুথির তালিকা, প্রথম খণ্ড, বসন্তরঞ্জন রায় এবং বসন্তকুমার চাটার্জী সম্পাদিত। ১৯২৬। (Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts Vol-I, 1926.)
"	:	বাংলা পুথির তালিকা, প্রথম খণ্ড, মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত, ১৯৪০। (A General Catalogue of Bengali Manuscripts in the Library of the University of Calcutta.Vol-I, 1940
"	:	প্রাচীন পুথির পরিচয় (২য় খণ্ড), মণীন্দ্রমোহন বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত, ১৯৬৪।
বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম রাজশাহী	:	বাংলা পুথির তালিকা, মণীন্দ্রমোহন চৌধুরী সঙ্কলিত। ১৯৫৬।
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (কলিকাতা)	:	বাংলা পুথির তালিকা (হস্তলিখিত)।
"	:	প্রাচীন পুথির বিবরণ, - বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (১৩০১-১৩৫০ সাল)

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (শান্তিনিকেতন) : বাংলা পুথির তালিকা, তিন খণ্ড (হস্তলিখিত)।

" : বিশ্বভারতী পুঁথি পরিচয়, ১ম খণ্ড (১৯৫১), ২য় খণ্ড (১৯৫৭) এবং ৩য় খণ্ড (১৯৬৩)- পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত।

বিষ্ণুপুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া : বাংলা পুথির তালিকা (হস্তলিখিত)।

Mitra Notice : Vol-I to IV (সংস্কৃত পুথির তালিকা)

K. Krishnamachariar : History of Classical Sanskrit Literature 1937, Index.

(চ) <u>ইংরাজী গ্রন্থ</u>

Abu-Fazl-I-Allami : AIN-I-AKBARI, Vol.II, tr. into English by Colonel H.S. Jarrett., Further annotated by Jadu Nath Sarkar. Royal Asiatic Society of Bengal, Calcutta.1949.

Abu-L-Fazl : The Akbarnama, tr. by H. Beveridge, Vol.III Published by the Royal Asiatic Society of Bengal, Calcutta.1939.

Amiya Kumar Banerji : West Bengal District Gazetteers Bankura; West Bengal, 1968.

Arthur A. Macdonell : A History of Sanskrit Literature, 2nd ed. (Indian). M.R.M.L. Oriental, Delhi, 1961.

A. P. Mallick : History of Bishnupur Raj. Calcutta.1921

Asutosh Bhattyacharya: Chhau Dance of Purulia. Rabindra Bharati University, Calcutta; 1972.

Sri Aurobindo : Valmiki and Vyasa. Sri Aurobindo Birth Centenary, Vol.III. Pandicherry; 1972

Avinanda K.S.Ramswami Sastri (ed.) : Ramcharit. Oriental Institute Baroda,1930.

Charles Stewart : The History of Bengal, from the first Mohammedan Invasion, 2nd ed. Bangabasi office, Calcutta ; 1910.

Daisetz Teitaro Suzuki (ed.) : The Lankavatara Sutra. A Mahayana Text. tr. from the original Sanskrit. George Rout'ledge and Sons. Ltd., London ; 1932

David J. Mc Cutchion : Late Mediaeval Temples of Bengal. The Asiatic Society ; 1972.

Dinesh Chandra Sen : The Bengali Ramayanas. University of Calcutta ;1920.

E. Washburn Hopkins : The Great Epic of India — Its Character and origin. Punthi Pustak, Calcutta ; 1969 (Reprinted).

F.W. Robertson : Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Bankura 1917-1924 Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta ; 1926.

Ghulam Hussin Salim : Riyazu-S-Salatin, tr. into English from Persian with Notes, by Maulavi Abdus Salam, Asiatic Society, Calcutta ; 1904. (A History of Bengal).

Hermann Jacobi : The Ramayana, Das Ramayana, tr. from German by S.N. Ghosal, Baroda ; 1960.

J. Grants Analysis (W.K.Firminger.ed.) : The Fifth Report from the Select Committee of the House of Common's on the Affairs of the East India Company, Dated 28th July. 1812.. Vol-I and Vol-II.

New ed. by W.K. Firminger. Vol-I and Vol-II, R. Cambray & Co., Calcutta. 1916-1917. Vol-III. 1918.

J. Muir : Original Sanskrit Texts on the Origine and History, the people of India, Vol-IV (2nd ed. rev.) London. 1873.

Jadunath Sarkar : History of Aurangzib. Vol-V. M.C.Sarkar and Sons. Calcutta, 1924.

Jadunath Sarkar : History of Bengal, Vol.II. Dacca ; 1948.

James Hastings (ed.) : Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol.-X. T & T Clark, Edinburgh. 1963.

J. D. Begler and A. Cunningham : Archeological Survey of India Report, in 1872-'73. Vol.VIII, Delhi, 1966.

J. N. Mitra : The Ruins of Vishnupur, Vishnupur, 1940.

J. Z. Holwell : Interesting Historical Events, Relative to the Provinces of Bengal, and the Empire of Indostan, London. MDCCL XVI (1766)

K. K. Dutta : Alibardi and his times, Calcutta University; 1939.

L. S. S. O'Malley : Bengal District Gazetteers Bankura, Vol.XIV. Calcutta, 1908.

Mirza Nathan : Baharistan-I-Ghaybi, Tr. by Dr. M.I. Borah, Vol.I, University of Dacca ; 1936.

(Rai) Monmohan Chakravarti Bahadur : A History of the changes in the Jurisdictions of Districts in Bengal 1757-1915, Calcutta, 1916.

M. Krishnamachariar : History of Classical Sanskrit Literature. Tirumalai-Tirupati Devasthanams, Madras 1937.

M. Winternitz : A History of Indian Literature, Vol-I. Part-II, 2nd ed., Calcutta University : 1963.

Nagendra Nath Sidhanta Ratna ed. and P.C.Bagchi's Introduction : Adhyatma Ramayana, Part-I, Introduction, Sanskrit Series No. XI, Calcutta. 1935.

Nundolal Dey : The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India. 3rd ed. 1971.

R. A. G. Carson : 'Coins' Ancient, Mediaeval and Modern, 2nd ed., London : 1970.

R. D. Banerji : History of Orissa, Vol.II Calcutta, 1951.

R. G. Bhandarkar : Vaishnavism Shaivism and Minor Religions Systems. Indological Book House. Varanasi, 1965.

Sandhyakar Nandi (Haraprasad Sastri ed.) : Ramcharit. Calcutta, 1910.

W. B. Oldham : Some Historical and Ethnical Aspects of the Burdwan District, Calcutta ; 1894.

W. W. Hunter : A Statistical Account of Bengal. Vol.IV, London-1877. D. K. Publishing, Calcutta. 1973. (Indian Reprint).

W. W. Hunter : The Annals of Rural Bengal, Vol-I, London, 1868.

(ছ) ইংরাজী প্রবন্ধ

Asutosh Bhattacharyya : 'Oral Tradition of the Ramayana in Bengali'. Lecture delivered in Ramayana Seminar held at Delhi 8th Dec. 1975.

Rajendra Hazra : The Brhannandikes'vara and the Nandikes'Vara Purana (B.S.Law Volume. Pt. II).

Rajendra Hazra : The Devi Bhagavata. Journal of Oriental Research, Madras. 1953, Vol.XXI.Pts.I-IV.

Do : The Mahabhagavata Puran, a work of Bengal. Indian Historical Quarterly. March, 1952.

Do : The Devi Puran, New Indian Antiquary, Vol.V. 1942-43.

R.C. Datta : 'The Aboriginal Element in the Population of Bengal' ; The Calcutta Review, Vol. LXXV, 1882.

(জ) অন্যান্য বিষয়

(The) Indian Empire Administrative, : The Imperial Gazetteer of India, Vol. VI, Argaon to Burdwan (Bankura). Clarendon Press Oxford ; 1908.

: Census of India 1961. Vol., XVI, Part. X B. 1971.

: Report of the Census of Bengal, 1872.

Govt. Notification No. 514 L.R. dated the 21st Jan. 1920 : Jurisdiction List District Bankura. P.S. Bankura (Also adopted as villages under the Bengal Tenancy Act.)

Major Rennel's map published under the authority of the Government of Bengal. C.O. Donel. (Director of Surveys Bengal) : Province of Bissunpour (Mulboom) and its adjoining areas.

The provinces of Midnapour, Burdwan, Hooghly, Bissunpore and Panchete :

The Original Map of Scale 5 miles = 1" in British Method. The map is drawn on the basis of survey in the year 1767-1774. Surveyor Rennel and others have been surved.

পরিশিষ্ট

অধ্যাপকদের অভিমত

A) Prof. Dr. Asit Kumar Bandyopadhyay, Ex. Head of the Dept. of Bengali, Calcutta University.

............................the researcher has meticulously collected all materials from brittle pages of old country made paper and documents kept in the archives and other government sources.

............................the present work seems to me more objective methodical and scientific.

............................I have come to the conclusion that the work may be deemed as one of the finest discourses on medieval, Bengali literature.

B) Prof. Dr. Pranab Ranjan Ghose, Ex.Head of the Dept. of Bengali, Calcutta University.

............................Her work is an ambitious Painstaking, broad based research on Regional Ramayana of Kabichandra Sankar Chakraborti. She has produced a scholarly work with deep penctration in the subject. She deserves all praise from our intellectuals.

C) Prof. Dr. Madan Mohan Goswami, Ex. Head of the Dept. of Bengali, Jadavpur University.

............................It is a thorough study of the life and works of the poet from all possible angles based on data collected from established personalities in the field as also from other local persons.

.... (it) bears evidence of sincere effort in the long work of survey.

"Bishnupuri Ramayana"

(A Synopsis)

'Bishnupuri Ramayana' of Kavichandra Shankar Chakraborty was written during the period of King Raghunath Singha II(1696 to 1712 A.D) of Mallabhum, presently included in the Bankura District. It was the period of reign of Badsha Aurongazeb when the political environment of India was changing very fast at the influence of the European traders. The Bengalees were very much depending on religious beliefs and social bindings for their own safety and solidarity. Naturally this religious dependency became the main stream of the contemporary Bengali Literature. Simultaneously the same religious consciousness has been expressed through the thematic translations of different Mangal Kavyas, Ramayana, Mahabharata and Bhagbata. Even at the later part of the Middle ages this religious instinct prevailed in the spiritual consciousness. Kavichandra was very much influenced by this spiritual consciousness and his poetic genius enriched the Bengali Literature. He was born in a remote village Panuya of the Bankura District. But he became so famous by his creations that King Gopal Singha I of Mallabhum donated a piece of land (28 Bighas) and emblamed him with 'Virboully' as a token of respect.

Besides the Ramayana, Kavichandra Shankar Chakraborty also wrote a number of big Kavyas and numerous small Pālās and Vandanas. Among these Shiva Mangal or Shivayana. written during the reign of King Bir Singha II of Mallabhum (1656-1682 A.D.), Bhagabatamrita or Gobindamangal written during the reign of King Durjan Singha (1682-1694 A.D.), Anadi Mangal and Ramayana, Written during the reign of King Raghunath Singh II (1696-1712 A.D.) and the Mahabharata, Written during the reign of King Gopal Singh I (1712-1748 A.D.) need special reference. The most popular Kavya of Kavichandra was the Rama Mangal or Ramayana. During the later period on account of its vast popularity this Ramayana

became famous as 'Bishnupuri Ramayana'. This is assumption of the renowned scholars.

On the Ramayana of Kavichandra about 310 manuscripts have been traced out from the old puthis preserved in different libraries in Bengal. These separate puthis have to arrange according to the story. The oldest and the complete puthis have to be taken as the ideal of each Pālās. After scientific additing of these puthis it appears that the Ramayana Kavya of Kavichandra is based on theme of Valmiki's Ramayana, Adhyatma Ramayana and tenth Adhyaya under 9th Skanda of Bhagbata, some Purans and folk tales. Moreover the naming of various pālās has some novelty. Some of the pālās are the result of Kavi's imagination. He happens to be the first to compose the 'Siva Ramer Yudhya' and 'Angad Raybar' pālās. These pālās were sung by the Ramayana gayakas for the recreation of the people during that age. So we find various reading of a Pālā of Kavichandra. As a result there is lots of interpolation between the Kavichandra's Puthi and other Ramayanas written during that period. It is presumed that Dwija Lakshmana and Bhabani Shankar, famous poets after Shankar Kavichandra, also received the title 'Kavichandra'. Due to this the puthis composed by these three Kavichandras were identified seperately after thorough study. Moreover there were many other poets under names Kavichandra and Shankar, which created much confusion. That is why attempt has been made to clear out the confusion first. After that the main Kavya has been taken into account. Kavichandra was the title of Shankar Chakraborty. But in his puthi he was identified as Kavichandra.

During the 15th century Kavi Krittibus translated the Ramayana in Bengali which enriched the area of Gourabhumi with Bhakti Cult. The Ramayana of Krittibus has 7 Kandas from Adikanda to Uttarakanda. After 250 years i.e. in between 17th and 18th centuries Bishnupuri Ramayana was written. But it lacks influence of the Ramayana by Krittibus. Kavichandra tried to compose his palas on the basis of main Rama episode concentrating from the birth of Rama upto his incarnation to the thrown Uttarakanda of Ramayana was

not included in it. Moreover it did have no influence of Advhuta Ramayana. Ramchandra was depicted as the deity Narayana and Krishna (Naba Durbādala Shyāma). He was very cautious in depicting the Godlyness of Ramchandra. All of his Pālās are short and free from exaggeration. He was an instance to the Poets who wrote Ramayana during the later years. Because the same stream is found present in the Pālās of the poets after Kavichandra. During the later years the influence of Kavichandra's poetic style is found present in the Pānchāli, Kathakatā, Chhou Dānce and other folk cultures of Bengal. So many instances of folk cultures as depicted in his Kavya have been reflected in the social and cultural life of the later years. His thinking on rationalization of different religions was reflected in his pālā 'Shiba Rāmer Yuddha'. So far popularity is concerned Kavichandra was a first grade poet, next to Krittibus. It was a very rare instance in the litarature of that age to entangle a place name with a Kavya. From that angle Kavichandra's Bishnupuri Ramayana stands as an example. Its ideas, language, alankāras and lamenting and amusing Rasa, which have very deep human touch are all universal.

ভুল সংশোধন

পৃষ্ঠা সংখ্যা	অশুদ্ধ রূপ	শুদ্ধ রূপ
৩২	১	১ (বাংলাদেশ)-এর উপরে হইবে
৬৫	নব বাল্মীকর (কবিতার ষষ্ঠ ছত্র)	নব বাল্মীকির
৭৮	তারাপদ মুখোপাধ্যায় (পাদটীকা)	তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
৮৩	ওল্ডহাম	ওল্ডহ্যাম
৮৩	উপর্যুক্ত	পূর্বোক্ত
১১০	গণিতের আর্য	গণিতের আর্যা
১২৫	পরান (২বার)	পরানো
১৭৪	উপর্যুক্ত	পূর্বোক্ত
৩০৯	চতুর্থ অধ্যায়।	চতুর্থ অধ্যায়ে ।
	কবিচন্দ্রের মত ।	কবিচন্দ্রের মতন ।
৩১০	কবিচন্দ্রের মতই	কবিচন্দ্রের মতনই ।
৩২৮	জামমুড়ি (চিঠির ঠিকানায় নীচে)	জামজুড়ি
৩৮০	উভয়ের মধ্যে ছত্রগত মিল পাওয়া যায় না।	(বাদ)
৪৩২	Panctration	Penetration